صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ

সলাতুন নবী স.

[নবী স.-এর নামায যেমন ছিলো]

মুফতি গোলামুর রহমান
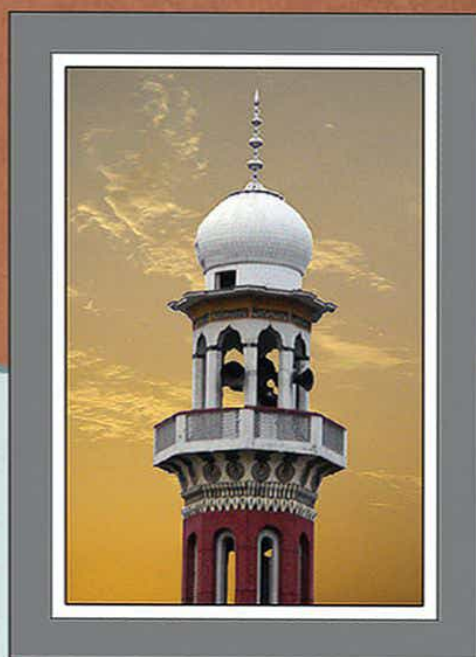
সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ

সলাতুন নবী স.

[কুরআন-হাদীসের আলোকে নবী কারীম স. এর তহারত ও সলাত সম্পর্কীয় একটি সহীহ দলীল-ভিত্তিক গ্রন্থ]

গ্রন্থনায়

মুফতি গোলামুর রহমান

দাওরায়ে হাদীস ও ইফতা : দারুল উলূম, দেওবন্দ, ভারত।
মুহতামিম : ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা, ফুলবাড়ীগেট, খুলনা।
পেশ ইমাম : বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প জামে মসজিদ, শিরোমণি, খুলনা।

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী (দা. বা.)-এর দুআ ও অভিমত

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহর যিনি মানব জাতির হিদায়াতের জন্য মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন নাজিল করেছেন। কুরআনের হিদায়াত মেনে চলা সকলের জন্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে কারীমকে একটি খতিয়ানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আর নবী কারীম স.-এর ২৩ বছরের জিন্দেগী সেই খতিয়ানের নকশা। খতিয়ানে জমীনের দাগ নম্বর থাকে কিন্তু আকৃতি থাকে না। জমীনের অবস্থান-আকৃতি নকশার মধ্যে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কুরআনে এমন অনেক বিধান রয়েছে যা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ছুন্নাতের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে "নামায কায়েম করো"। "যাকাত প্রদান করো"। কিন্তু নামায ও যাকাত আদায়ের রূপরেখা কুরআনের কোথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। বরং এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা ছুন্নাহর মধ্যে রয়েছে। কুরআনের খতিয়ান এবং ছুন্নাহ'র নকশা বুঝার জন্য সাহাবায়ে কিরাম আমীনের ভূমিকা পালন করেছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ করা ব্যতীত কুরআন-ছুন্নাহর সঠিক বুঝ পাওয়া সম্ভব নয়। এর মধ্যেই হক সীমাবদ্ধ। আমাদের সমাজের একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী ইমামগণের অনুকরণকে শির্ক বলে অপপ্রচার করে থাকে যা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অবান্তর। কারণ তাকলীদের মাধ্যমে মুকাল্লিদগণ মূলত গবেষক ইমামগণ কর্তৃক কুরআন-ছুন্নাহর সমন্বয়ক ব্যাখ্যারই অনুকরণ করে থাকে। তাদেরকে স্বতন্ত্র মাননীয় বিশ্বাস করে না।

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুফতি গোলামুর রহমান তার 'সলাতুন নবী' নামক এ কিতাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে, মুকাল্লিদদের প্রত্যেকটি আমল হয়তো সরাসরি কুরআন-ছুন্নাহ থেকে সংগৃহীত বা কুরআন-ছুন্নাহর নির্যাস। আমি এ কিতাবের কিয়দংশ পড়েছি। আমার দৃষ্টিতে এ কিতাবের সার্বিক বিষয় সন্তোষজনক মনে হয়েছে। মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে আমি এ কিতাব ও লেখকের কবুলিয়াতের দুআ করছি।

(মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী)

মুফতি আঃ শাকুর যশোরী দামাত বারাকাতুহুম-এর আন্তরিক অভিব্যক্তি

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে রসূলুল্লাহ স.-এর ওফাত হয়ে গেছে। এতিম উম্মতের পথনির্দেশিকা হিসেবে রেখে গেছেন মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন এবং অসংখ্য হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার। উলামায়ে কিরামের নির্ভরযোগ্য জামাতকে বানিয়ে গেছেন তাদের রাহবর। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তথা উলামায়ে উম্মত কুরআন-হাদীসের মূলনীতিকে সামনে রেখে এ উম্মতকে সিরাতে মুসতাকীমের দিকে অহর্নিশ রাহবরী করেছেন এবং করছেন। অন্য দিকে রসূলুল্লাহ স. থেকে যুগের দূরত্ব যতই বাড়ছে প্রবৃত্তিপূজারী ফিতনাবাজদের সংখ্যা ততই আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাদের সুদূরপ্রসারী টার্গেট হলো মুসলিম উম্মাহকে তাদের ধর্মীয় রাহবর তথা নায়েবে রসূল উলামায়ে কিরামের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। শরীআতের বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদেরকে অজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারী বানিয়ে ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে তাদেরকে শতধাবিভক্ত একটা দুর্বল ও মেরুদন্ডহীন যাতি হিসেবে দাঁড় করানো।

সময়ের দাবী অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহকে সেই ফিতনাবাজদের খপ্পর থেকে রক্ষা করে হেদায়াতের ভিত্তিমূলের উপর সুশৃঙ্খলিত করার তাকীদে পূর্বসূরি উলামায়ে কিরাম মাযহাবের ভিত্তি রচনা করে গেছেন। যার বরকত ও কল্যাণে আজ অবধি উক্ত ফিতনাবাজ বিজাতীয় চরেরা এ উম্মতকে দ্বীন ও শরীআতের ব্যাপারে সর্বতোভাবে রাহবরহীন করতে পারেনি। আজো তারা অনুসরণ করে চলছে উলামায়ে কিরামকে। অনুসরণ করছে চার মাযহাবের কোন একটিকে। আলহামদুলিল্লাহ আজো তাদের মাঝে টিকে আছে ঈমানী বন্ধন।

হানাফী, মালেকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের গোড়াপত্তনকারী উলামায়ে কিরাম উম্মতের জন্য কোন নতুন শরীআত রচনা করেননি। বরং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধানাবলির একটি নির্মল ও স্বচ্ছ পদ্ধতি উম্মতের

সামনে পেশ করেছেন মাত্র। মাযহাবের এ শৃঙ্খলা প্রবৃত্তিপূজারী-দের স্বার্থ হাসিলে সুস্পষ্ট বাঁধা হওয়ায় তারা এর বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগে আছে সেই শুরু থেকেই। তাদের বিরোধি-তা অব্যাহত রয়েছে একবিংশ শতাব্দীর এ কালেও। ঈমান-আকিদা, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, কুরবানী ও বিবাহ-তালাকসহ দ্বীনের অসংখ্য বিষয়ে চলছে তাদের বিরোধি-তার নির্লজ্জ আঘাত।

প্রবৃত্তিপূজারীদের অপচেষ্টা ও ফিতনাবাজদের সীমাহীন দৌরাত্মের মুকাবিলায় দ্বীন ও শরীয়তের ভাবধারা অক্ষুণ্ন রেখে মুসলিম উম্মাহকে সীরাতে মুস্তাকীমের সঠিক দিশাদানের মহান লক্ষ্য সামনে রেখে এ কালের এক মহান ব্যক্তিত্ব দক্ষিণ বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত মাওলানা মুফতি গোলামুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম-এর সুনিপুণ কলমে রচিত হয়েছে "সলাতুন নবী স." নামে এক সুবিশাল গ্রন্থ। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত 'নামায'-এর সহীহ মাসআলা এবং কুরআন-ছুন্নাহ ভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে যার পাতায় পাতায়। রয়েছে হাদীসের সনদ, খায়রুল কুরূনের আমলী রূপ, হাদীস পরখকারী মুহাদ্দিসগণের মতামত সম্বলিত হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং প্রথিতযশা ফকীহগণের গবেষণালব্ধ অমূল্য সমাধান। কিতাবটির শুরুতে রয়েছে শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী শরীআতের মৌলিক বিষয় সম্পর্কীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা যা তালেবে ইল্‌মদের জন্য অমূল্য পাথেয় হবে।

নিজের ইল্‌মী, আমলী ও তাসনীফী দৈন্যদশার কারণে এমন একটি গ্রন্থ রচনার কল্পনাও করতে পারিনি। তবে অসীম কুদরতের মালিক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অপার কৃপায় এ অমূল্য গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে হযরতের পাশে থেকে নানামুখী চেষ্টা করেছি। মাসআলা চয়ন, হাদীসের দালীলিক ভিত্তি অনুসন্ধান, অনুবাদ, বিষয়বস্তুর যথার্থতা, ভাষার সাবলিলতা ও সহজীকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে একসাথে কাজ করেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে নিজেদেরকে

'আহলে হাদীস' পরিচয় দানকারী ভাইগণ কর্তৃক সৃষ্ট মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা অবলম্বনে বিগত ফেব্রুয়ারি-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রন্থটির একাংশ প্রকাশ করা হয়েছিলো। আলহামদুলিল্লাহ তখন গ্রন্থটির প্রতি পাঠকদের ব্যাপক সাড়া দেখে এটি আরো সুডবন্যস্ত ও সুদৃঢ় করার তাকিদ অনুভূত হয়। উক্ত অনুভূতির ফসল হিসেবে আরো সুডবন্যস্ত, সুদৃঢ়, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ঐ বছর আগস্ট মাসে।

এ পর্যায়ে আমরা পূর্ণ গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করেছি। আমার বিশ্বাস, এটা সুহৃদ পাঠকদের আন্তরিক দুআ ও মহান আল্লাহ্র অসীম দয়া বৈ আর কিছুই নয়। তাই পাঠকদের জন্য থাকছে দুআ ও ভালোবাসা এবং মালিকের দরবারে এ নিআমতের শুকরিয়াবাণী উচ্চারিত হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ'।

আশা করি মহান আল্লাহর অপার কৃপায় গ্রন্থটি সর্বমহলে সমাদৃত হবে। সত্যান্বেষী, ইল্মপিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের ইল্মী পিপাসা নিবারণ করবে। উম্মতকে সহীহ মাসআলার সঠিক দিশা দিবে। উলামায়ে কিরাম থেকে দূরে অবস্থানকারী মানুষদেরকে তাঁদের কাছে টেনে আনবে। প্রবৃত্তিপূজারীদের বোধোদয় ঘটাবে এবং ফিতনাবাজদের দৌরাত্ম নিয়ন্ত্রণ করবে।

পাঠকদের কাছে নিবেদন, গ্রন্থটি অত্যন্ত সচেতনতার সাথে অধ্যয়ন করুন এবং নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুন। প্রবৃত্তিপূজারীদের খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচান ও অপরকে বাঁচতে সহযোগিতা করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী হাসিলে আত্মনিয়োগ করুন। আল্লাহ আমাকে আপনাকে ও সকলকে কবুল করুন। আমীন

মুহতাজে দুআ
মুফতি আঃ শাকুর যশোরী

সম্পাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد! فقد قال الله تعالى :
اتل ما اوحی الیک من الکتب واقم الصلوة ، الآية. وقال تعالى
: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ـ

ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামায। এ কারণে নামায ও নামাযের মাসলা-মাসায়েল নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে প্রচুর। ফেকাহ ও ফতুয়ার কিতাবাদিতে নামাযের মাসায়েল সম্বন্ধে রয়েছে বিস্তৃত সব অধ্যায়। ফকীহ ও মুফতীগণ যদিও সব মাসআলার দলীল-প্রমাণ মাসআলার সঙ্গে উল্লেখ করেননি, তবে কুরআন-হাদীছের বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা এসব মাসআলা পরিবেশন করেছেন। কিন্তু ইদানিং কিছু লোক মাসআলার সঙ্গে দলীল না দেখে মনে করছেন এবং মন্তব্যও করছেন যে, এসব মাসআলার কোন দলীল নেই। এভাবে তারা সমাজকে বিভ্রান্তও করছেন। তাদের ভুল ভাঙ্গানোর জন্য এবং সমাজকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে দলীল-প্রমাণসহ মাসায়েল বর্ণনা করার। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখেই ইমদাদুল উলূম রশিদিয়া মাদরাসা, ফুলবাড়ীগেট, খুলনা-র মুহতামিম ও সুযোগ্য মুফতি মাওলানা গোলামুর রহমান সাহেব "সলাতুন নবী স." নামক এ গ্রন্থটি রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। আমার বিচারমতে গ্রন্থটি উদ্দীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একটি সফল গ্রন্থ। লেখক এ গ্রন্থে বিশেষভাবে যে কাজগুলো করেছেন তা হল–

- পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযসহ প্রায় সব ধরনের নামাযের মাসায়েল দলীলাদিসহ বর্ণনা করেছেন।
- নামাযের জন্য প্রয়োজনীয় তাহারাত– উযূ, গোসল, তাইয়াম্মুম ও আযান-ইকামাত ইত্যাদির মাসায়েলও বর্ণনা করেছেন।
- যারা মাযহাব মানার প্রয়োজন নিয়ে বিভ্রান্তি কিংবা দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন, লেখক তাদের বিভ্রান্তি কিংবা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করার জন্য যথেষ্ট দলীল-প্রমাণভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন।
- যারা মনে করেন বা বলেন যে, হানাফী মাযহাবের নামাযের পক্ষে সহীহ দলীলাদি নেই, হানাফী মাযহাবের নামায রসূল স.-এর নামায থেকে ভিন্ন, লেখক প্রত্যেকটি মাসআলার

প্রামাণ্য আলোচনার মাধ্যমে তাদের ভুল ধারণা ভাঙ্গানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, হানাফী মাযহাবে বর্ণিত নামাযের পদ্ধতি সহীহ ও সুদৃঢ় দলীলাদির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যিকার বিচারে অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় হানাফী মাযহাবের নামাযই রসূল স.-এর নামাযের নিকটতর।

● সকলেই কুরআন-হাদীছের দলীলাদি বুঝতে সক্ষম নয়। কেননা দলীলাদি বুঝার নীতি ও পদ্ধতিই অনেকের জানা নেই। এ কারণে লেখক গ্রন্থের শুরুতে কুরআন-হাদীছের দলীলাদি বুঝার জন্য অতি প্রয়োজনীয় কিছু উসূল বা নীতি সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা সাধারণ মানুষসহ তালাবা ও সাধারণ উলামা সকলেরই প্রভূত উপকারে আসবে ইনশা আল্লাহ।

আমি গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত দেখেছি। মা-শা-আল্লাহ লেখক সহজ-সাবলীল ভাষায় সবকিছু উপস্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত গ্রহণযোগ্য দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে যেকোনো পাঠক বুঝবেন লেখক গ্রন্থটি সংকলনে যথেষ্ট মেহনত করেছেন, প্রচুর পড়াশোনা ও ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছেন। আল্লাহ তাঁর মেহনতকে কবুল করুন। তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আমি সম্পাদনাকালে ভাষাগত মামুলি কিছু সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় বিশেষ স্থানগুলোতে কিছু কিছু তথ্যগত ও অন্যান্য পরিবর্তন এনে দিয়েছি। বেশ কিছু শিরোনাম বদলে দিয়েছি, বেশ কিছু শিরোনাম সংযোজন করেছি। দুআ করি আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটি দ্বারা পাঠকদের উপকৃত করুন। আমীন!

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
১১. ১১. ২০১৬

লেখকের কথা

হানাফী মাযহাবের আমলের ক্ষেত্রে সাধারণত ফিক্হ-এর

কিতাবের দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। এ কারণে অনেকের মধ্যেই এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে যে, হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হয়তো এর উপরই। অথচ তা কখনই নয়। বরং এর প্রতিটি আমলের ভিত্তিই কুরআন-ছুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিয়াস ও ইজতিহাদের সাহায্য আমরা তখনই গ্রহণ করে থাকি যখন কুরআন-ছুন্নায় স্পষ্ট সমাধান খুঁজে পাওয়া না যায়। কুরআন-ছুন্নাহ'র আলোকে ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হলে তা পরিত্যাগ করে কুরআন হাদীস গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন জগদ্বিখ্যাত ইমাম হযরত আবু হানিফা নু'মান ইবনে ছাবিত রহ. নিজেই। তিনি বলেন, হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব। অবশ্য সহীহ হাদীসে একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়ে থাকলে সাধারণত একাধিক আমলের সমন্বয়ক হয় এমন হাদীসটি আমরা গ্রহণ করে থাকি যাতে রসূলুল্লাহ স.-এর কোন কথা আমাদের আমল থেকে ছুটে না যায়। সুতরাং জাহেরী-দের দৃষ্টিতে হানাফীদের কোন আমলের হুবহু রূপ হাদীসে দৃষ্টিগোচর না হলেও মুজতাহিদগণের দৃষ্টিতে এর প্রত্যেকটিই দলীল-ভিত্তিক।

হানাফী মাযহাবে বর্ণিত নামাযের পদ্ধতির সুদৃঢ় দলীল সর্বস্তরের মানুষের সামনে তুলে ধরতে আমার এ সামান্য মেহনত পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি। কিতাবটির নাম রাখা হয়েছে "সলাতুন নবী স."। আশা করি নিজেদের আমলের মজবুত ভিত্তি দেখে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ পরিতৃপ্ত হবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত অন্যায় অভিযোগক-ারীদেরও কিছুটা চৈতন্য সৃষ্টি হবে।

এ সামান্য খেদমত জাতির সামনে পেশ করার মত অবস্থানে আমাকে উন্নীত করতে পিতা-মাতার পরে সকল উস্তাদ ও মুরব্বিগণের অবদান স্মরণ করছি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরতুল আল্লাম মুফতি আবুল কাসেম দামাত বারাকাতুহুমকে যিনি আমাকে সন্তানতুল্য স্নেহে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্মরণ করছি মুফতি আঃ শাকুর যশোরী, মাওঃ মাসূম বিল্লাহ, প্রফেসর ড. এম এ বাশার, মাওঃ মুহসিনুদ্দীন খান এবং

মুফতি ইমরান ইবনে ঈসাকে। অন্যান্য কাজে সহযোগিতার জন্য আরো স্মরণ করছি মুফতি ঈসা ইবনে হায়দার, মুফতি হাসান জামিল, মুফতি আসাদুল্লাহ, মুফতি মুহসিন উদ্দীন, মাওলানা আব্দুস সাত্তার, মুফতি আবু সালেহ, মুফতি সাআদ এবং মুহাম্মাদ আজাদ হোসেনসহ আরো অনেককে।

বিশেষভাবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্রে আমার প্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর শোকর জ্ঞাপন করছি, তিনি আমার এ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আদ্যোপান্ত দেখে সম্পাদনা করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই সম্পাদনা গ্রন্থটির মান বর্দ্ধন ও সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

সবশেষে পাঠক সমীপে আরজ, তারা যেন এ সামান্য খেদমত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করেন। আর কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে কল্যাণকামী বন্ধু হিসেবে তা জানিয়ে দেন।

মুফতি গোলামুর রহমান

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : ইস্তিঞ্জা

অধ্যায় ২ : পবিত্রতা অর্জন

অধ্যায় ৩ : অযু ভঙ্গের কারণ

অধ্যায় ৪ : গোসলের বিবরণ

অধ্যায় ৫ : তায়াম্মুম

অধ্যায় ৬ : সতরের বিধান

অধ্যায় ৭ : নামাযের ওয়াক্ত

অধ্যায় ৮ : আযান-ইকামাত

অধ্যায় ৯ : নামায

অধ্যায় ১০ : কুরআন পাঠ

অধ্যায় ১১ : রুকু-সিজদা

অধ্যায় ১২ : বৈঠক

অধ্যায় ১৩ : সালামের পর করণীয়

অধ্যায় ১৪ : বিবিধ মাসআলা

অধ্যায় ১৫ : জামাতের আহকাম

অধ্যায় ১৬ : ইমামতি

অধ্যায় ১৭ : জুমুআর নামায

অধ্যায় ১৮ : ঈদের নামায

অধ্যায় ১৯ : তারাবীহ

অধ্যায় ২০ : বিতির

অধ্যায় ২১ : সফরের বিধান

অধ্যায় ২২ : নফল নামায

অধ্যায় ২৩ : জানাযা

কিতাবে ব্যবহৃত কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা

১। সিহাহ সিত্তার হাদীসের মূল ইবারতের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ইসলামিয়া

কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীস নম্বরের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদের নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

২। মুয়াত্তা মালেকের ক্ষেত্রে অনুবাদের সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

৩। ত্বহাবী শরীফের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ইসলামিয়া কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং শামেলা থেকে হাদীস নম্বর পেশ করা হয়েছে।

৪। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার হাদীস নম্বর শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার তাহকীকসহ দারুল কিবলা থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৫। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের হাদীস নম্বর হাবীবুর রহমান আজমী রহ.-এর তাহকীকসহ আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৬। শরহু মাআনীল আছারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নুখাবুল আফকারের পৃষ্ঠা ও খণ্ড নম্বরের ক্ষেত্রে ওজারাতুল আওকাফ, কাতার হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৭। মাজমাউয যাওয়ায়েদের হাদীস নম্বর মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৮। খুলাছাতুল আহকামের পৃষ্ঠা ও খণ্ড নম্বরের ক্ষেত্রে মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

৯। মুসনাদে আহমাদের হাদীস নম্বর ও হাদীসের স্তর বর্ণনা শায়খ শুআইব আরনাউতের তাহকীকসহ ৫২ খণ্ডে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

১০। মুসতাদরাকে হাকেমের হাদীস নম্বর ইমাম যাহাবীর ‘তালখী-স’সহ দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

১১। ইমাম বায়হাকী রহ.-এর আস-সুনানল কুবরার হাদীস নম্বর দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া

হয়েছে।

১২। তাকরীবুত তাহজীবের রাবী নম্বর আল-মাকতাবাতুত তাউফী-কিয়্যাহ, কায়রো হতে প্রকাশিত কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে।

১৩। সিয়ারু আলামিন নুবালার রাবীদের তবকা এবং ক্রমিকের বরাত দেয়ার ক্ষেত্রে মুআস্‌সাসাতুর রিসালা থেকে প্রকাশিত কিতাবের বরাত দেয়া হয়েছে।

১৪। ফতওয়ায়ে শামীর বরাত দেয়ার ক্ষেত্রে দারুল ফিকর-বৈরুত থেকে প্রকাশিত কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে।

১৫। বাদায়েউস সানায়ে'-এর বরাত দেয়ার ক্ষেত্রে দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া থেকে প্রকাশিত কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে।

১৬। হাদীসের স্তর বর্ণনার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর মন্তব্য পেশ করা হলে তা 'আল মাকতাবাতুশ শামিলা'র উপর নির্ভর করা হয়েছে। আর অন্যান্য কিতাবের কাগজী ছাপা দেখা হয়েছে।

১৭। কিতাবে বর্ণিত মাসআলার দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে বুখারী-মুসলিম থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি এবং পূর্ণ সনদও পেশ করা হয়নি। কারণ সামগ্রিক বিবেচনায় উক্ত কিতাব দুটির সব হাদীস সহীহ বলে উম্মত মেনে নিয়েছে।

১৮। তিরমিযীর হাদীসের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত ইমাম তিরমিযী রহ.-এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।

১৯। এছাড়া অন্যান্য কিতাবের হাদীসের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের মন্তব্য পেশ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শায়খ নাসীর উদ্দীন আলবানীর মন্তব্য এজন্য পেশ করা হয়েছে যে, মাযহাব বিরোধীরা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম হাদীস বিশারদ বলে মনে করে এবং নিজেদের মুরুব্বি হিসেবে মান্য করে।

২০। হাদীসের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেখানে রিজাল শাস্ত্রের কোন ইমামের মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে রাবীদের হালাত রিজাল শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীসের স্তর নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

২১। এ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হানাফী মাযহাবের আমলের দলীল পেশ করা। এ বিষয়ের সকল হাদীস একত্রিত করা নয়। এ কারণে শুধু দলীলের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলোই আনা হয়েছে।

২২। ইস্তিঞ্জা, অযু-গোসল ও নামাযের করণীয় কাজের দলীল পেশ

করা মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় তা পূর্ণভাবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আর বর্জনীয় কাজের দলীল বর্ণনা উদ্দেশ্য না হওয়ায় তা শুধু কয়েকটি মাসআল-ার ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৩। 'আমাদের মতামত' বা 'আমাদের আমল' বলে কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা হানাফী মাযহাবের মতামত ও আমল বুঝানো হয়েছে।

২৪। প্রায় প্রতিটি মাসআলা প্রথমে হাদীস থেকে প্রমাণ করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত মাসআলার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের অবস্থান নির্ভরযোগ্য ফতওয়ার কিতাব থেকে পেশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুদ্রণ ও সংস্করণের ভিন্নতায় হাদীস নম্বর এবং খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং কোন মুদ্রণের সাথে কিতাবে উল্লিখিত উদ্ধৃতির অমিল পরিলক্ষিত হলে সামান্য আগে/পরে খুঁজলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই মিলে যাবে।

কুরআন থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন এবং কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ সকলের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি; আছে কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?" (ছূরা ক্বমার: ১৭) কুরআনের উপদেশগুলো যেহেতু আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন কওমের ঘটনা এবং উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন সেহেতু তা বুঝা সহজ। পক্ষান্তরে আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রে ঘটনা এবং উদাহরণের মাধ্যম না থাকায় তা বুঝা কষ্টসাধ্য। তাই কঠিন বিষয় বোধগম্য করতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর রসূলকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه "যখন আমি কুরআন পাঠ করি, অর্থাৎ জিবরাঈল আপনাকে পাঠ করে শুনায় তখন আপনি তার অনুকরণ করুন। আর এর বর্ণনা আমারই দায়িত্বে"। (ছূরা কিয়ামাহ: ১৮-১৯) আবার তাঁর প্রতি দায়িত্ব দিয়েছেন কুরআনের বাণী উম্মতকে ব্যাখ্যা করে শুনাতে। ইরশাদ হচ্ছে: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষের জন্যে যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তাদেরকে তা বুঝিয়ে দেন।" (ছূরা নাহল: ৪৪) এ নির্দেশটি বিশেষভাবে আহকামের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ

পালনে রসূলুল্লাহ স. ছিলেন সদা তৎপর। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কুরআন বুঝিয়েছেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায়ের স্বীকৃতিও পেয়েছেন। (বুখারী-৬৩২৮) অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম তাবিঈদেরকে কুরআন বুঝিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের পরবর্তীদেরকে বুঝিয়েছেন। আর এটাই কুরআন থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি। এ নিয়মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের ঐ ব্যাখ্যাই তুলে ধরেছেন যা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনেছেন ও বুঝেছেন। যদিও বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো রসূলুল্লাহ স.-এর নাম উহ্য রেখেছেন। এ ধারাবাহিকতায় তাবিঈন, তাবে তাবিঈন ও তাঁদের পরবর্তী মুফাসসিরগণ কুরআনের কোন ব্যাখ্যা তুলে ধরার পূর্বেই বর্ণনা করে থাকেন যে, "আমি আমার উস্তাদ অমুকের নিকট থেকে এ ব্যাখ্যা শুনেছি, তিনি তাঁর উস্তাদ থেকে এ ব্যাখ্যা শুনেছেন"। এ নিয়ম অগ্রাহ্য করে শুধু নিজের

বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা কুরআন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার বিরুদ্ধে কুরআন-হাদীসের ভাষা অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদঃ আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করেছেন। হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ তাআলার সাথে এমন কিছুকে শরিক করা যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এমন কিছু বলা যা (তিনি বলেছেন মর্মে) তোমরা জানো না। (ছুরা আরাফ-৩৩)

শিক্ষণীয়ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন মর্মে নিশ্চিত জানা না থাকলে তাঁর প্রতি কোন কথার সম্বন্ধ করা হারাম। এ ব্যাপারে ইমাম তবারী রহ. বেশ কিছু হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য বর্ণনা করার পরে বলেন,

وهذه الأخبار شاهدةٌ لنا على صحة ما قُلنا: من أنّ ما كان مِن تأويل آيِ القرآن الذي لا يُدرَك علمه إلا بنَصِّ بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بنَصْبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القِيلُ فيه برأيه.

এ সকল হাদীস ঐ কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় যে, কুরআনের আয়াতের এমন ব্যাখ্যা যা রসূল স. থেকে জেনে নেয়া বা তাঁর কায়েমকৃত ইঙ্গিত থেকে বুঝে নেয়া ব্যতীত অনুধাবন করা যায় না এমন বিষয়ে কারো নিজস্ব মতামত দেয়া বৈধ নয়। (তাফসীরে তবারী: ১/৭৮)

কুরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত দেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে রসূল স. বলেন,

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রসূল স. ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো তাদের নবীগণের সাথে মতবিরোধ করা এবং আল্লাহ'র কিতাবের কিয়দংশ দ্বারা অন্য অংশের সাথে বিরোধ বাঁধানোর কারণে। কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ হয়নি যে, তার কিয়দংশ দ্বারা অন্য অংশকে মিথ্যা প্রমাণ করা হবে। বরং কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার কিয়দংশ দ্বারা অন্য অংশকে সত্যায়ন করার জন্য। সুতরাং যা পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে পারো তার উপর আমল করো। আর যে বিষয়ে তোমার অজ্ঞতা রয়েছে তা আলেমের নিকট সোপর্দ করো। (মুসনাদে আহমদ: ৬৭০২ সংক্ষেপিত)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح হাদীসটি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ: ৬৭০২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয়: এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের উপর আমল করার জন্য সে ব্যাপারে নিজের পূর্ণ অবগতি থাকতে হয় অথবা আলেমগণের নিকট থেকে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী আমল করতে হয়। এ পন্থা পরিহার করে নিজের অজ্ঞতা সত্ত্বেও কোন আলেমের শরণাপন্ন না হওয়া এবং নিজ মতে কোন আমল নির্ধারণ করে সেটাকে কুরআনের আমল বলে প্রচার করা বা নিজে গ্রহণ করা সবটাই নিষিদ্ধ।

কুরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত দেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে রসূল স. আরো বলেন,

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(رَوَاه التِرْمِذِيُّ فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ–۲/۱۲۳)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা আমার থেকে নিশ্চিতভাবে না জেনে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি কুরআনের কোন বিষয়ে নিজের মতানুসারে কথা বলে সেও যেন তার আবাস জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (তিরমিযী-২৯৫১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ-২৬৭৫ নম্বরে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনুল কারীমে নিজের মতানুসারে কিছু বলার অর্থ হলো জাহান্নামের পথ অবলম্বন করা। তবে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসে পারদর্শী গবেষক আলেমগণ রসূল স.-এর স্পষ্ট বাণী থেকে অথবা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের ইঙ্গিত থেকে এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারেন যা অন্য কোন আয়াত বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। ইমাম তিরমিযী রহ. ২৯৫২ নম্বর হাদীসের আলোচনায় বলেন, সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্যদের মধ্যে যারা পারদর্শী আলেম তাদের থেকে বর্ণিত আছে যে, গভীর জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করার বিষয়ে তারা খুব কঠোরতা অবলম্বন করতেন। আর হযরত মুজাহিদ, হযরত কতাদা এবং অন্যান্যদের থেকে তাফসীর করার যে বিষয় বর্ণিত রয়েছে সে সম্পর্কে এ ধারণা করা যায় না যে, তাঁরা কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করেছেন বা কুরআন সম্পর্কে কিছু বলেছেন। বরং তাদের থেকে যা বর্ণিত আছে তা এটাই প্রমাণ করে যে, কুরআন-হাদীসের সুগভীর জ্ঞান ব্যতীত তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছুই বলেননি।

উল্লেখ্য, কুরআন অবতরণের মূল উদ্দেশ্য মানুষের হিদায়াত। (ছূরা বাকারা: ১৮৫) আর কুরআন থেকে হিদায়াত পাওয়ার নিরাপদ পদ্ধতিও

এটাই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত নেক মানুষের অনুকরণে কুরআন থেকে হিদায়াত আহরণ করা। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের বুদ্ধি খাটানোর চেষ্টা না করা। কুরআনী ইল্‌ম শিক্ষার এ পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ছূরা 'ফাতিহা'র মধ্যে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদের পথে যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন; যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট নয়"।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সীরাতে মুস্তাকীম পাওয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করে বলেন, এদের অনুসৃত পথই সীরাতে মুস্তাকীম। যার অর্থ হলো সীরাতে মুস্তাকীম পেতে হলে পুরস্কারপ্রাপ্ত পথিকদের শরণাপন্ন হও। তাদের চলার পথই সীরাতে মুস্তাকীম। এদের পথ অনুসরণ না করে কুরআনে কারীম বুঝার চেষ্টা করা ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুকরণ না করে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। অন্য আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণ হলেন পুরস্কারপ্রাপ্ত পথিক। (ছূরা নিসা: ৬৯)

সারকথা: সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। আর কুরআন অনুযায়ী চলার জন্য নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল না হয়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত কোন পথিকের অনুসরণ করা যিনি কুরআন অনুযায়ী চলার পদ্ধতি শিখিয়ে বা দেখিয়ে দিবেন।

হাদীস থেকে আহকামের দলীল গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি

عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ-١/١٧٦)

অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: আমার প্রতি মিথ্যারোপ তোমাদের অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপের মতো নয়। যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (বুখারী: ১২১৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৮২০৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স.-এর নামে মিথ্যারোপ করাকে জাহান্নামে ঠিকানা বানিয়ে নেয়ার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসের মুখ্য বিষয় যেহেতু শব্দের অন্তরালে লুকায়িত বিষয়বস্তু তাই মুহাদ্দিসীনে কিরাম কোন এক পর্যায়ে গিয়ে হাদীসের মূল অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনের অনুমতি দিলেও অর্থ পরিবর্তনের অনুমতি কখনই দেননি। বরং রসূলুল্লাহ স.-এর নামে ভিন্ন অর্থের সম্বন্ধ করাকেই তাঁরা মিথ্যারোপ বলে আখ্যা দিয়েছেন। (মুসনাদে রুইয়ানী-১১৪৪)

অতএব, ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন যতটা গুরুতর তার চেয়ে বহুগুণ গুরুতর হলো হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করা। এ কারণে হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করতে হলে উত্তম যুগের আমলের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীসের ব্যাখ্যা করা জরুরী। হাদীসের শব্দ থেকে সেই অর্থ গ্রহণ করাই নিরাপদ যা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে সাহাবায়ে কিরাম বুঝেছেন। সাহাবাদের নিকট থেকে তাবিঈগণ বুঝেছেন এবং তাবিঈদের নিকট থেকে তাবে তাবিঈগণ বুঝেছেন। কেননা কারো সংশ্রবে থেকে যা বুঝা যায় দূরে থেকে শুধু শব্দ শুনে কোনো দিনও তা বুঝা যায় না। এ কারণে ইমাম বুখারী রহ.অধিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাবীর চেয়ে ملازمة الشيخ তথা উস্তাদের সংশ্রবে দীর্ঘ দিন থাকা রাবীকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এ কারণেই মুহাদ্দিসীনে কিরাম শব্দের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণের চেয়ে ঐ শব্দ থেকে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈগণ যা বুঝেছেন সেটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। উক্ত নিরাপদ পদ্ধতি উপেক্ষা করে শুধু হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ দেখে কোন ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা এবং তা রসূলুল্লাহ স.-এর নামে চালিয়ে দেয়া কোনক্রমেই রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি মিথ্যারোপের শঙ্কামুক্ত নয়। অতএব, হাদীস থেকে আহকামের দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে জাহান্নামের ভয়ে ভীত মুত্তাকীগণের উচিত হলো সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈগণের মন্তব্য ও মতামতকে সামনে রেখে হাদীসের শব্দের অন্তরালে লুকায়িত মূল উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করা।

উস্তাদের সংশ্রবে থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা বুঝে নেয়া

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অনুবাদ : সমস্ত মুমিন যেন অভিযানে বেরিয়ে না পড়ে। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ দ্বীন শিক্ষার জন্য কেন বের হলো না? যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ শেষে ফিরে এসে স্বজাতিকে সতর্ক করবে যেন তারা বাঁচতে পারে। (ছূরা তাওবা: ১২২)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইল্ম অর্জনের জন্য উস্তাদের নিকট ছুটে যেতে হয় এবং তাঁর সংশ্রবে থেকে ইল্ম শিখতে হয়। ইল্ম শিক্ষা যদি শুধু কুরআন-কিতাব দিয়ে সম্পন্ন হতো তাহলে সমাজ থেকে কিছু মানুষকে বের হয়ে গিয়ে ইল্ম শিক্ষার নির্দেশ অনর্থক হয়ে যেত। ফুকাহায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিসগণের শিক্ষাজীবন ইল্ম শিক্ষার তাগিদে দারে দারে ছুটে যাওয়ার একটি বাস্তব উদাহরণ। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহ. (মৃত্যু-৬০৬ হি.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ যখন সফর করা প্রমাণ করে তখন অবশ্যই কল্যাণ-কর এ মুবারক ইল্ম সফর ছাড়া হাসিল হয় না। (তাফসীরে কাবীর)

হাল যামানার তাকলীদ বিরোধী কিছু মানুষ যারা কোন উস্তাদ থেকে ইল্ম শেখেনি, বরং কুরআন-হাদীসের অনুবাদই যাদের একমাত্র পুঁজি। তারা এ বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে বলতে শুরু করেছে যে, সবকিছুই কুরআ-ান-কিতাবে লিখিত রয়েছে তো উস্তাদের প্রয়োজন কী? তাদের মন্তব্যের ভ্রান্তি উক্ত আয়াতটির সঠিক মর্ম না বুঝার কারণেই ঘটেছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يسمع مِنْكُمْ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ–٢/٥١٥)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা শুনবে এবং তোমাদের থেকে শোনা হবে। এরপর তোমাদের থেকে যারা শুনেছে তাদের থেকে শোনা হবে। (আবূ দাউদ: ৩৬১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ: ২৯৪৫ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীছে একজন থেকে আরেকজনের শোনার কথা তথা উস্তাদ থেকে শোনার কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসের যেহেতু হাদী-

ছর শব্দ মুখ্য নয় বরং মুখ্য হলো অর্থ। তাই হাদীস শোনার আওতায় হাদীসের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই শামিল রয়েছে। এ হিসেবে উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস গ্রহণ করার মাধ্যম যেহেতু উস্তাদ, সেহেতু উস্তাদের মাধ্যম ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করা যেমন অগ্রহণযোগ্য তেমনিভাবে উস্তাদের থেকে না বুঝে নিজে বুঝতে যাওয়াও অগ্রহণযোগ্য। তবে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসে পারদর্শী গবেষক আলেম-গণ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের ইঙ্গিত থেকে এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারেন যা অন্য কোন আয়াত বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخذُونَ دِينَكُمْ (رَوَاه مسْلِمٌ فى مقدمة كتابه فِىْ بَابِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ–١/١١)

অনুবাদ : হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন রহ. বলেন, নিশ্চয় এ ইল্‌ম হলো দ্বীন। অতএব, খুব ভালো করে লক্ষ্য করো তোমরা কার থেকে দ্বীন গ্রহণ করছো। (মুসলিম, অধ্যায়: সনদ দ্বীনের অংশ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ:الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ (رَوَاه مُسْلِمٌ فى مقدمة كتابه فِىْ بَابِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ–١/١٢)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, সনদ দ্বীনের অংশ। যদি সনদ বা সূত্রপরম্পরা না থাকতো তাহলে যার মন যা চাইতো সে তা-ই বলে দিতো। (মুসলিম, অধ্যায়: সনদ দ্বীনের অংশ)

সারসংক্ষেপ : প্রসিদ্ধ তাবিঈ এবং অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন এবং প্রসিদ্ধ তাবে তাবিঈ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর আছার থেকে প্রমাণিত হয় যে, নির্ভরযোগ্য উস্তাদ ব্যতীত ইল্‌মে দ্বীন গ্রহণ করা যায় না। হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের ধারাবাহিকতাই হলো সনদ। অথবা বলা যায় যে, হাদীস বর্ণনার সূত্র হলো সনদ। আর হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য সনদ হলো প্রত্যেক মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীসটি উস্তাদ থেকে শোনা এবং এ ধারাবাহিকতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকা। যদিও মাঝে-মধ্যে সংক্ষেপ করার জন্য পূর্ণ সনদ বর্ণনা করা হয় না ।

হাদীসের শব্দ বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন সনদের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হাদীসের কোন মর্মার্থ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরতে গেলেও সনদের প্রয়োজন। কারণ এটাও দ্বীন। তবে মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন-হাদীসের

আলোকে গবেষণা করে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু মুজতাহিদ ব্যতীত কুরআন-হাদীসে অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষ নিজের পক্ষ থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা দ্বীন ধ্বংসের নামান্তর। অনভিজ্ঞ বা শুকনো পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা থেকে এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে দ্বীনের সঠিক রূপ উদ্ধার করতে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে সংস্কারক হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন। (আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী: ২০৯১১, মিশকাত: ২৪৮) যোগ্য উস্তাদ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে নিজে হাদীসের ব্যাখ্যা করা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তার একটি উদাহরণ বুখারী শরীফের হাদীস থেকে পেশ করছি :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ (زَيْنَبُ) وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ–١/ ١٩٤)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কোন স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: আমাদের মধ্যে কে আপনার সাথে সত্বর মিলিত হবে? রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: তোমাদের মধ্যে যে অধিকতর লম্বা হাতবিশিষ্ট হবে। তাঁরা একটি বাঁশের টুকরা নিয়ে হাত মাপতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সাওদাহ রা. লম্বা হাতবিশিষ্ট প্রমাণিত হলেন। হযরত আয়েশা বলেন, আমরা আরো পরে গিয়ে ঠিক পেলাম যে, লম্বা হাত দ্বারা উদ্দেশ্য অধিক সদকা করা। এ ব্যাখ্যা অনুসারে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আমাদের মধ্যে সত্বর মিলিত হলেন হযরত যাইনাব রা.। তিনি সদকা করতে ভালোবাসতেন। (মিশকাত: ১৮৭৫, বুখারী: ১৩৩৭)

শিক্ষণীয়: এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ প্রথমে লম্বা হাতের অর্থ বুঝেছিলেন হাতের দৈর্ঘ্য বেশি হওয়া। পরে বুঝেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দান করায় অগ্রগামী হওয়া। রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে ব্যাখ্যা না জেনে নেয়ায় তাঁর সাথে এক ঘরে এক বিছানায় থেকেও যখন হাতের দৈর্ঘ্যের মর্মার্থ বুঝতে ভুল করলেন। তখন আমরা উস্তাদের সংশ্রব ব্যতীত কোন ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছি যে, এটা ভুল ব্যাখ্যা নয় এবং এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স.-এর

নামে মিথ্যা সম্বন্ধ করা হচ্ছে না?

অতএব, হাদীসের শব্দ বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন সনদ তথা উস্তাদের মাধ্যম প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হাদীসের মর্মার্থ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরতে গেলেও তার সনদ তথা উস্তাদের মাধ্যম প্রয়োজন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শরহে নুখবা কিতাবে হাদীস শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **ولا يُحدِّثُ ببلدٍ فيهِ مَن هُو أَولى منهُ، بل يُرْشِدُ إِليهِ.** "যে অঞ্চলে তার চেয়ে বড় আলেম বিদ্যমান রয়েছে সেখানে সে আলেম হাদীস শিক্ষা দেয়ার কাজ করবে না বরং লোকদেরকে উক্ত বড় আলেমের নিকট যাওয়ার পরামর্শ দিবে"। ইবনে হাজার রহ.-এর কথা থেকে দুটি বিষয় বেরিয়ে আসে। **এক.** কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেউ যেন শিক্ষকের আসনে বসার চিন্তা না করে। **দুই.** দ্বীনী ইল্‌ম অর্জনকারী ছাত্রদের জন্য আবশ্যক হলো তারা যেন এমন কারো নিকট থেকে দ্বীনী ইল্‌ম শিখতে না যায় যে নিজেই কুরআন-হাদীসে পারদর্শী নয়। বরং যোগ্য শিক্ষকের নিকট থেকে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করবে। কারণ উস্তাদবিহীন বা অযোগ্য উস্তাদ থেকে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা কোনক্রমেই নিরাপদ নয়।

জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষকের নিকট ক্লাস করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতীত মানুষ কারো থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে না। কোন প্রকৌশলীর প্লান ও ডিজাইন গ্রহণ করে না এবং ডাক্তারের চিকিৎসা সেবাও গ্রহণ করে না। বরং ডাক্তারদের ক্ষেত্রে মানুষ আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে যে, শিক্ষা শেষে কমপক্ষে এক বছর কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে থেকে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ব্যতীত তাকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুমতিই দেয়া হয় না। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া বিল্ডিং-এর ডিজাইন করা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতারণা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাহলে যেখানে মানুষের জান্নাত/জাহান্নামের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত সেখানে কেন উস্তাদের শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া যে কারো নিকট থেকে দ্বীনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করবো। ভালো চিকিৎসা সেবার জন্য যেমন একজন ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন। বিল্ডিং-এর উপযুক্ত ডিজাইনের জন্য যেমন একজন ভালো প্রকৌশলী প্রয়োজন। ঠিক তেমনই দ্বীন গ্রহণের জন্য একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রয়োজন যার সংশ্রবে থেকে দ্বীন শিখতে পারি। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা কমপক্ষে স্বীকৃত আলেম থেকে

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় দ্বীনের শিক্ষা কোনক্রমে সহীহ এবং নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়।

হাদীসের বর্ণনা সহীহ হওয়ার পদ্ধতিসমূহ

হাদীসের বর্ণনা সহীহ হওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। **এক.** নির্ভরযে-াগ্য রাবীদের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া। **দুই.** খাইরুল কুরুন তথা উত্তম যুগে কোন হাদীসের আমল ব্যাপকভাবে চালু থাকা। **তিন.** হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআন বা গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত হওয়া। এর ধারাবাহিক ব্যাখ্যা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

এক. নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ–١/١١)

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন রহ. থেকে বর্ণিতঃ নিশ্চয় ইল্‌ম হলো দ্বীন। অতএব, খুব ভালো করে লক্ষ্য করো তোমরা কার থেকে দ্বীন গ্রহণ করছো। (মুসলিম, অধ্যায়ঃ সনদ দ্বীনের অংশ)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনী ইল্‌ম তথা ইল্‌মে হাদীস শিখতে গেলে অবশ্যই দেখে নেয়া দরকার যে, স্বয়ং শিক্ষকের মধ্যে দ্বীনদারী আছে কি না। যার নিজের মধ্যে দ্বীনদারী নেই তার থেকে দ্বীনী ইল্‌ম শেখা নিরাপদ নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ, ফাসেক যদি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে সেটা ভালো করে যাচাই করো। যেন অজ্ঞতাবশত কোন কওমের উপর হামলা করে নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত না হও। (ছূরা হুজুরাত: ৬)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন সংক্রান্ত কোন সংবাদ বিশ্বাস করতে গেলে সংবাদদাতাকে অবশ্যই **عادل** বা ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। আর দ্বীনের বিধি-বিধান অমান্যকারী ফাসেক কোন সংবাদ নিয়ে আসলে তা ভালো করে যাচাই করা ব্যতীত বিশ্বাস করা যাবে না। যেন কোন ফাসেকের সংবাদ দ্বীনের ভিত্তি হয়ে না যায়। **عدالت** তথা

ন্যায়নিষ্ঠতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ করা থেকে এবং সগীরা গুনাহ'র উপর স্থায়ী হওয়া থেকে বিরত থাকা এককথায়, সঠিক জীবনাচারারের অধিকারী হওয়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامِعٍ (رواه أحمد، ورواه الترمذى فى باب مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ-٢/٩٤)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে সমুজ্জ্বল করুন, যে আমার থেকে কোন হাদীস শুনলো এবং সংরক্ষণ করে অন্যের নিকট পৌঁছে দিলো। এমনও হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার থেকে শুনবে, তার চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী হবে ঐ ব্যক্তি যার নিকট পৌঁছানো হবে। (মুসনাদে আহমদ: ৪১৫৭, তিরমিযী: ২৬৫৮, ইবনে মাযা: ২৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। আর শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **حديث صحيح** হাদীসটি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ: ৪১৫৭ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর দুআপ্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীর গুণ হতে হবে হাদীস শুনে তা মুখস্থ করে বা লিখে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। আর এ দায়িত্ব পালন করতে হলে রাবীকে ضَابِطْ তথা সংরক্ষণে পারদর্শী হতে হবে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يسمع مِنْكُمْ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ-٢/٥١٥)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা শুনবে এবং তোমাদের থেকে শোনা হবে। এরপর তোমাদের থেকে যারা শুনেছে তাদের থেকে শোনা হবে। (আবূ দাউদ: ৩৬১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده

صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (মুসনাদে আহমদ: ২৯৪৫ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস গ্রহণের শর্ত হলো বর্ণনাকারীগণ সকলেই বর্ণিত হাদীসটি নিজ উস্তাদ থেকে শুনতে হবে। সনদের এ ধারাবাহিকতা কোথাও গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় না। অবশ্য উস্তাদের মাধ্যমে হাদীস শোনার পরও অনেক ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ পূর্ণ সনদ উল্লেখ না করে বরং সনদ সংক্ষেপ করে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। সেটাকে প্রকৃত অর্থে সনদ বিচ্ছিন্ন বলা হবে না।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস সহীহ হতে গেলে ১.বর্ণনাকারীকে عادل বা ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে, ২. ضَابِطٌ তথা সংরক্ষণে পারদর্শী হতে হবে এবং ৩. নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হতে হবে। আর উপরিউক্ত গুণাবলি দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হতে হবে যেন বিরোধের ক্ষেত্রে شَاذٌ তথা অপ্রবল না হয় এবং عِلَّة তথা গোপনীয় দোষ-ত্রুটি না থাকে।

দুই. উত্তম যুগে কোন হাদীসের আমল ব্যাপকভাবে চালু থাকা

হাদীস সহীহ হওয়ার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো خير القرون বা উত্তম যুগ তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈগণ কর্তৃক কোন হাদীসকে আমলের জন্য গ্রহণ করা। অর্থাৎ উত্তম যুগের লোকেরা যদি কোন হাদীসকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সে হাদীসটি সহীহ বলে পরিগণিত হবে। যদিও উক্ত হাদীসের পক্ষে কোন সহীহ সনদ খুঁজে না পাওয়া যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ স.-এর আমল সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি যেমন বিশুদ্ধ সনদের বর্ণনা, ঠিক অনুরূপ আরেকটি পদ্ধতি হলো দ্বীনদার ব্যক্তিদের আমলের ধারাবাহিকতা। অতএব, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য সর্বক্ষেত্রে সনদ সহীহ হওয়া জরুরী নয়; বরং উক্ত হাদীসটি উম্মতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আমলে গ্রহণ করলে সেটাও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। যেমন তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত বিচারের পদ্ধতি সংক্রান্ত হযরত মুআয রা.-এর প্রসিদ্ধ হাদীস যাতে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বললেন, তোমার সামনে কোন বিচার এলে তুমি কীভাবে তার সমাধান করবে? উক্ত হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে খতীবে বাগদাদী রহ. বলেন,

أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ تَقَبَّلُوهُ وَاحْتَجُّوا بِهِ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمْ كَمَا وَقَفْنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَقَوْلِهِ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَقَوْلِهِ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ وَقَوْلِهِ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهَا الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ غَنَوْا بِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ لَهَا.

অনুবাদ : উলামায়ে কিরাম হযরত মুআযের এ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন এবং দলীল প্রদান করেছেন। এ থেকে আমরা অবগত হয়েছি যে, হাদীসটি তাঁদের নিকট সহীহ। এরপর তিনি বেশ কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করেন-

(১) রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ অর্থাৎ ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়াত কার্যকর নয়।

(২) هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ অর্থাৎ সাগরের পানি পবিত্র এবং সেখানের মৃত জন্তু হালাল।

(৩) إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে আর মাল উপস্থিত থাকে তাহলে উভয়ে কসম করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিবে।

অতঃপর খতীবে বাগদাদী রহ. বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবালের হাদীসের বিশুদ্ধতা এভাবে জেনেছি যেভাবে জেনেছি পূর্বোক্ত হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতা। সনদের বিবেচনায় যদিও এ হাদীসগুলো প্রমাণিত নয়, তবুও সমগ্র উম্মত যখন ক্রমান্বয়ে তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে এবং তারা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে গ্রহণ করে নিয়েছে তখন এগুলোর বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য আর সনদের প্রয়োজন থাকেনি। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: সহীহ কিয়াস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ অধ্যায়) মোটকথা, বহু সংখ্যক ইমাম হযরত মুআয রা.-এর এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং গবেষক ইমামগণ এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

খতীবে বাগদাদী রহ.-এর এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস সহীহ হওয়ার একটি মাধ্যম যেমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া, ঠিক তেমনই আরেকটি মাধ্যম হলো কোন হাদীসের আমলকে উম্মত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নেয়া।

সুতরাং জঈফ সনদে বর্ণিত কোন হাদীসের উপর خير القرون তথা সাহাবা, তাবিঈ এবং তাবে তাবিঈগণের উত্তম যুগে কোন আমল ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকলে সেটাও উক্ত হাদীস সহীহ এবং দলীলযোগ্য হওয়ার একটি বড় প্রমাণ। উম্মত এ রকম বহু হাদীসকে আমলে নিয়েছে যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে তিরমিযী শরীফ থেকে একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: يَا بِلَالُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ،

অনুবাদঃ "হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. হযরত বিলাল রা.কে বলেন, "হে বিলাল! তুমি যখন আযান দিবে তখন ধীরে ধীরে দিবে আর যখন ইকামাত দিবে তখন দ্রুত দিবে"। (তিরমিযীঃ ১৯৫)

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসের সনদকে মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন এবং অন্যান্য ইমামগণ এটাকে জঈফ বলেছেন। অথচ আযান ধীরগতিতে দেয়া এবং ইকামাত দ্রুতগতিতে দেয়ার আমল সমগ্র উম্মতের মধ্যে দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। সুতরাং সনদ জঈফ হলেও এর আমল উম্মতের মধ্যে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করায় হাদীসটি সহীহ এবং দলীলযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

এর বিপরীতে خيرالقرون বা উত্তম যুগে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভকারী আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসও আমলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম মালেক রহ.-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বিরোধপূর্ণ মাসআলার মধ্যে যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে মদীনাবাসীর আমলকে খুব গুরুত্ব দিতেন। তিনি 'মুয়াত্তা' কিতাবে ثقة তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে হযরত ওমর রা.-এর আমল বর্ণনা করেছেন ৮ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে। অথচ উত্তম যুগের আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তিনি নিজেও সে মত গ্রহণ করেননি। কেননা, মদীনায় ৮ রাকাত তারাবীহ'র আমল চালু ছিলো না; (আজও নেই) বরং মদীনাবাসীর আমল ছিলো বিতিরসহ ৪১ রাকাত তারাবীহ পড়া। (তিরমিযীঃ ৮০৪) এ কারণে চার ইমামসহ তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কোন ফকীহ বা মুহাদ্দিসের এমন কোন মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি আট রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে মত দিয়েছেন। এমনকি বর্তমান যুগে যারা নতুন করে আট রাকাত তারাবীহ'র প্রবক্তা হয়েছেন তারাও উম্মতের শুরু

যুগের আমলের প্রতি খেয়াল না করে শুধু আপত্তিকর বর্ণনা বা হাদীসের শব্দ থেকে দলীল গ্রহণের চেষ্টা করেছেন।

উত্তম যুগের লোকেরা কোন হাদীসকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নিলে সেটা সহীহ হওয়ার বিষয়টি ইমাম তিরমিযী রহ.-এর বর্ণনা থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে আশা করছি। তিনি তিরমিযী শরীফের অসংখ্য জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে, **وبه أخذ أكثر أهل العلم** "অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এটা গ্রহণ করেছেন", **عليه عمل الناس**"এ অনুযায়ী মানুষের আমল রয়েছে" ইত্যাদি। অথচ যেসব হাদীসের আওতায় তিনি এ ধরনের মন্তব্যগুলো করেছেন তন্মধ্যে অনেক হাদীসকে তিনি নিজে জঈফ বলেছেন। নমুনা হিসেবে দেখুন তিরমিযী শরীফের হাদীস নম্বর- **৫৪, ৮৮, ৯৭, ১৩১, ১৮৮, ১৯৯, ২৬১ ও ২৮২**। হাদীস আমলযোগ্য হওয়ার জন্য সনদ সহীহ হওয়া আবশ্যক হলে কোন জঈফ হাদীসকে উলামায়ে উম্মত আমলের জন্য গ্রহণ করতেন না।

নির্দিষ্ট সনদের ভিত্তিতে কোন হাদীস সহীহ হওয়ার তুলনায় উম্মতের ব্যাপক গ্রহণের ভিত্তিতে সহীহ হওয়া আরো বেশি শক্তিশালী।

এ বিষয়ে কিছু সহজবোধ্য প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে

এক. ইমাম বুখারী রহ.-এর যে কিতাব নিয়ে উম্মত গর্ব করে থাকে সে কিতাবটি যে ইমাম বুখারীই লিখেছেন এর পক্ষে কোন সনদ খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অথচ সনদ না থাকার দোহাই দিয়ে কেউ এটাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে মানুষ তাকে পাগল বলবে।

দুই. জুমুআর নামায শুক্রবারে পড়তে হয় এটা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আজই শুক্রবার এটার পক্ষে কুরআনের আয়াত বা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস না থাকার অজুহাত দাঁড় করাতে চাইলে মানুষ তাকে কাফের/ফাসেক বলবে। রমাযান মাসে রোযা রাখা ফরয। কিন্তু এ মাসটিই যে রমাযান মাস এটার পক্ষে কুরআনের আয়াত বা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস পাওয়া যাবে কি? অথচ এ অজুহাত দাঁড় করিয়ে কেউ রমাযান মাসকে অস্বীকার করতে চাইলে মানুষ তাকে কাফের/ফাসেক বলবে। এমন অগণিত উদাহরণ রয়েছে যার উপর ইসলামের ভিত্তি নির্ভরশীল। অথচ সেগুলোর প্রমাণে কোন নির্দিষ্ট সনদ নেই। বরং প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষের মাঝে এ সব আমল-আকীদার ব্যাপক বিস্তৃতিই এর প্রমাণ যা প্রত্যাখ্যান করার কোন উপায় নেই।

মোটকথা, কোন হাদীসের আমল যদি উত্তম যুগের উম্মত ব্যাপকভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে এটা উক্ত হাদীস সহীহ হওয়ার একটি দলীল; যদিও উক্ত হাদীসের সনদ জঈফ হয়।

তিন. হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআন বা গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত হওয়া

শরীআতের দলীলসমূহের মধ্যে প্রথম অবস্থান কুরআনের। এমনকি খোদ রসূল স.কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন মেনে চলার। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ "আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনি সেভাবে অটর থাকুন"। (ছূরা হুদঃ ১১২) আর রসূলুল্লাহ স. আল্লাহর নির্দেশ মেনে কুরআন অনুযায়ী তাঁর জীবন পরিচালনা করেছেন। হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ "তাঁর চরিত্র ছিলো কুরআন"। (মুসনাদে আহমদঃ ২৪৬০১) অতএব, রসূলুল্লাহ স.-এর প্রত্যেকটি কথা, কাজ এবং অনুমোদন অবশ্যই কুরআন অনুযায়ী; কুরআন বিরোধী নয়। এখন যদি কোন হাদীসে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনার পরিপন্থী অথবা রসূলুল্লাহ স. তা করতে পারেন না, তাহলে বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হলেও সে হাদীসটি সহীহ নয়। বরং তা শায বলে পরিগণিত। এ ধরনের বর্ণনা খোদ বর্ণনাকারীকে কলঙ্কিত করে। তাই হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআন অথবা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা বা মর্মাথের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া।

পক্ষান্তরে যদি এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় যার বিষয়বস্তু কুরআন বা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত। তাহলে বিষয়বস্তুর দিক থেকে উক্ত হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হবে। যদিও তার পক্ষে কোন সহীহ সনদ খুঁজে না পাওয়া যায়। এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম অনেক হাদীসের সনদ জঈফ বলে মন্তব্য করা সত্ত্বেও তার অর্থ বা বিষয়বস্তুকে সহীহ বলেছেন। উদাহরণ হিসেবে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.কে ইয়ামান প্রেরণের সময় বিচারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটির কথা বলা যেতে পারে। আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. সনদের বিবেচনায় এ হাদীসকে জঈফ বলা সত্ত্বেও মন্তব্য করেন যে, ولعمري إن كان معناه صحيحًا "আমার জীবনের শপথ এ হাদীসের অর্থ অবশ্যই সহীহ"। (আল ইলালুল মুতানাহিয়াঃ বিচার-ফায়সালা অধ্যায়) অনুরূপভাবে ইমাম সাখাবী রহ. হযরত আলী রা.

থেকে বর্ণিত হাদীস وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ -এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ إِلا أَنَّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى "হাদীসটির সনদ জঈফ তবে অর্থ সহীহ"। (আল্ মাকাসিদুল হাসানাহঃ হাদীস নম্বর- ২) এ হাদীসের ব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন আল্লামা যাইনুদ্দীন আব্দুর রহীম ইবনে হুসাইন আল্ ইরাকী (মৃত্যু-৮০৬ হি.)। তাখরীজু আহাদীসি ইহইয়ায়ি উলূমিদ্দীনঃ ৩২১৭ ও ৩২৯৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়। তিরমিযী শরীফের বরাত দিয়ে জামেউল উসূলে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস كَبَّرَ على جنازة، فرفع يديه مع أول تكبيرة-এর তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদির আরনাউত রহ. বলেন, وإسناده ضعيف، ولكن صحيح المعنى "হাদীসটির সনদ জঈফ; তবে অর্থ সহীহ"। (জামেউল উসূলঃ ৪৩০৬ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়) মুহাদ্দিসীনে কিরামের উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে এ নীতিমালা বের হয়ে আসে যে, কোন হাদীসের বিষয়বস্তু যদি কুরআন বা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে উক্ত হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হবে, যদিও তার পক্ষে কোন সহীহ সনদ খুঁজে না পাওয়া যায়। কারণ শব্দের অন্তরালে লুকায়িত অর্থই হলো হাদীসের মূল বিষয়। যখন কুরআন বা অন্যান্য সহীহ হাদীসের বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন ঐ হাদীসের বক্তব্য যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। আর হাদীস সহীহ-জঈফ নির্ণয়ের মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, হাদীসে বর্ণিত বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ স.-এর কি না? সুতরাং সে বিষয়টি যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো তখন নতুন করে আর সহীহ সনদের আবশ্যকতা থাকে না।

মোটকথা : হাদীস সহীহ হওয়ার মাধ্যম কেবল সনদ সহীহ হওয়াই নয়। বরং خير القرون বা উত্তম যুগ তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈগণ কোন হাদীসকে আমলে গ্রহণ করে থাকলে সেটাও সহীহ। আবার কোন হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআন অথবা হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হলে সেটাও সহীহ। যদিও তার পক্ষে কোন বিশুদ্ধ সনদ খুঁজে পাওয়া না যায়।

ন্যায়নিষ্ঠ জঈফ রাবীর বর্ণিত হাদীস আমলযোগ্য

কোন মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, সে সবকিছু ভুলে যাবে। তাহলে দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানুষের ধার-কর্য, লেন-দেন এবং সাক্ষ্য গ্রহণসহ মনে রাখার মতো কোন কিছুই শরীআতে গৃহীত হতো

না। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য শরীআতে সাক্ষীর عدالت বা দ্বীনদারীকে শর্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়ার শর্ত করা হয়নি। অথচ কোন বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গেলে তা স্মরণে রাখতে হয় এবং তাতে স্মৃতিশক্তির প্রখরতার প্রয়োজন পড়ে। আবার মুহাদ্দিসগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, বর্ণনাকারীর তালিকায় সাহাবার নাম এলেই সেটা গ্রহণযোগ্য। অথচ সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও স্মৃতিশক্তির ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি। এমনকি সব সাহাবার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হিসেবে মুহাদ্দিসগণের নীতি হলো: الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ। সাহাবাগণ সকলেই ন্যায়নিষ্ঠ, দ্বীনদার। (তাদরীবুর রাবী) এখানে কেবল সাহাবায়ে কিরামের ন্যায়নিষ্ঠতাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে তাঁদের পারস্পরিক ব্যবধানের বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস আমলযোগ্য হওয়ার জন্য মুহাদ্দিসগণ عدالت বা দ্বীনদারীকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। হাদীসের সনদ যাচাইয়ের দলীল হিসেবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম যে আয়াত পেশ করে থাকেন সে আয়াতেও কেবল ফাসেকের খবর যাচাইয়ের কথা বলা হয়েছে; দ্বীনদারদের সংবাদ যাচাই-য়র কথা বলা হয়নি। (ছূরা হুজুরাত: ৬) উপরন্তু ভুলে যাওয়া এমন একটি মানবীয় স্বভাব, খোদ নবী কারীম স.ও যার উর্ধ্বে নন। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

অনুবাদ: “আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, তোমাদের মতো আমিও ভুলে যাই। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও”। (বুখারী: ৩৯২)

ন্যায়নিষ্ঠ জঈফ রাবীর হাদীস আমলের অযোগ্য না হওয়ার কারণ হিসেবে আরো বলা যেতে পারে যে, হাদীস সহীহ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে মূলত রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতার উপর। আর এটা একটা ইজতিহাদী বা গবেষণা নির্ভর বিষয়। হাদীস নিরীক্ষণকারী ১০জন ইমাম কোন একজন রাবীর জীবনী পর্যালোচনা করলে তাঁদের সকলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এটা আবশ্যক নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। তাহলে কোন রাবীকে কোন ইমাম জঈফ বললে তার বিপরীত হতে পারবে না অথবা কোন ইমাম কোন রাবীকে ثقةٌ তথা নির্ভরযোগ্য বললে তার বিপরীত হতে পারবে না বিষয়টি এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক নয়। বরং

হাদীস নিরীক্ষণকারী ইমামগণের মতবিরোধ এ ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে থাকে এবং অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে বা নির্দিষ্ট দলীলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং কোন একটি হাদীসকে এক বা একাধিক ইমাম কর্তৃক জঈফ বলার অর্থ এটা নয় যে, হাদীসটি ভিত্তিহীন। এ কারণে হাদীসের বড় বড় ইমাম নিজ নিজ কিতাবে প্রয়োজন অনুসারে জঈফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে যে হাদীসের সনদ সহীহ অথবা যে হাদীস অনুযায়ী سلف صالحین -এর আমলও বিদ্যমান রয়েছে সে হাদীস অন্যান্য হাদীসের চেয়ে প্রাধান্য পাওয়ার জোর দাবি রাখে। সুতরাং হাদীসের সনদ সহীহ হলেই কেবল আমলের যোগ্য হবে আর জঈফ হলে আমলের অযোগ্য হবে তা সঠিক নয়।

হাদীস সংকলনকারী ইমামগণের কাজের প্রতি লক্ষ্য করলেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা জঈফ হাদীসকে আমলের অযোগ্য মনে করতেন না। কারণ বুখারী-মুসলিম ব্যতীত প্রায় সকল কিতাবেই জঈফ হাদীস কমবেশি স্থান পেয়েছে। তারা যদি এটাকে আমলের অযোগ্য মনে করতেন তাহলে জঈফ হাদীস সংরক্ষণ করা, সংকলন করা, জঈফ হাদীসের ভিত্তিতে শিরোনাম নির্ধারণ করাসহ সব কিছুই বেকার হয়ে যেত। এর পেছনে তাঁরা তাঁদের মহামূল্যবান সময় ব্যয় করতেন না। অতএব, সহীহ হাদীস বা উম্মতের ব্যাপক আমলের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে ন্যায়নিষ্ঠ জঈফ রাবীর হাদীস আমলের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য রাবী মিথ্যাবাদী, ফাসেক বা এ জাতীয় কোন অপরাধের সাথে জড়িত থাকলে তার বর্ণনা বিশ্বাস করা বা তদনুযায়ী আমল করা যায় না।

বিরোধপূর্ণ হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেয়ার সঠিক পদ্ধতি: সর্বত্র বোখারী মুসলিমকেই প্রাধান্য দিতে হবে কি?

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা ও রসূলুল্লাহ স.-এর কথা পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। তবে উম্মতের সুবিধার্থে বা ভিন্ন কোন কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হুকুমের রদবদল হয়েছে যা প্রকাশের তারিখ না জানার কারণে কোন্‌টি আগের আর কোন্‌টি পরের তা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। অথবা ব্যবহারের ক্ষেত্র ভিন্ন হওয়ায় কোন্ ক্ষেত্রের জন্য কোন্ বিধান প্রযোজ্য তা স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারার কারণে অনেক সময় কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধি-বিধান একটি আরেকটির বিপরীত বলে মনে হয়। এ জাতীয় কোন সমস্যা দেখা দিলে গবেষক ইমামগণ আপন আপন

যোগ্যতা অনুসারে তা নিরসনের চেষ্টা করে থাকেন। কখনো সমন্বয় সাধন করেন আবার কখনো বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কিরাম প্রথমে লক্ষ্য করেন উলামায়ে উম্মত এটাকে ব্যাপকভাবে আমলে গ্রহণ করেছেন কি না? পূর্ববর্তী কোন এক বা একাধিক গবেষক এটা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন কি না? সেটা কোন ফকীহ বা প্রসিদ্ধ সাহাবার বর্ণনা কি না? অথবা হাফেজে হাদীস বা আইম্মায়ে হাদীসের মাধ্যমে বর্ণিত কি না? এরপরে লক্ষ্য করুন : হাদীসটি أصح الأسانيد অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট সনদ বা তার কাছাকাছি কোন সনদে বর্ণিত কি না? কিংবা বিবাদমান হাদীসগুলোর মধ্যে কোন একটির আমল গ্রহণ করলে তা কুরআনের আয়াত বা অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ক হয় কি না?

এর বিপরীতে বুখারী-মুসলিম বা নির্ভরযোগ্য অন্য কিতাবে কোন হাদীস বর্ণিত হলে সেটাকে প্রাধান্য দিতে হবে এমনটা অনেক মুহাদ্দিস এবং গবেষক মনে করেন না। আর যে ইমামগণ বুখারী-মুসলিমের হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তাঁরাও এটাকে প্রাধান্যদানের সর্বশেষ কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন। ইমাম আবু বকর আলহাযেমী রহ. (৫৮৪ হি.) তাঁর আলইতিবার ফিন নাসিখি ওয়াল মানসূখি মিনাল আছার' কিতাবে (১/১৩২-১৬০) বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য নির্ধারণে সহযোগিতা নেওয়া হয় এমন পঞ্চাশটি অগ্রগণ্যতার কারণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর ভিতরে তিনি বুখারী মুসলিমে থাকলে তা প্রাধান্য লাভ করবে এরূপ কোন কথা বলেননি। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাঁর কিতাব 'তাদরীবুর রাবী'তে প্রাধান্য দেয়ার একশত আটটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এ কারণগুলোকে তিনি মৌলিকভাবে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে সপ্তম ভাগের শিরোনাম দিয়েছেন : الْقِسْمُ السَّابِعُ التَّرْجِيحُ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ "সপ্তম প্রকার : বাইরের কোন বিষয়ের দ্বারা প্রাধান্য দেয়া"। এ শিরোনামের অধীনে তিনি এগারোটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বশেষ নম্বরে বলেছেন, اتِّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِ الشَّيْخَانِ অর্থাৎ বুখারী-মুসলিম একযোগে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাদরীবুর রাবী: হাদীসের প্রকার নম্বর- ৩৬)

আল্লামা সুয়ূতী রহ.-এর বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় বুঝে আসে। **এক.** বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হওয়ার কারণে কোন হাদীসকে প্রাধান্য দেয়া হাদীসের মৌলিক কোন গুণ নয়। **দুই.** বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হওয়ার

কারণে কোন হাদীসকে প্রাধান্য দেয়াটা প্রাধান্যদানের সর্বশেষ কারণ যা দ্বারা সধারণত কোন বিবাদমান হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেয়া হয় না।

উপরন্তু এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সার্বিক বিবেচনায় কোন একটি কিতাব প্রাধান্য পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, এ কিতাবের প্রত্যেকটি হাদীস অন্য যে কোন কিতাবের সব হাদীসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের দৃঢ়তা প্রমাণের ক্ষেত্রে এ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, উক্ত হাদীসের উপর হাদীস নিরীক্ষক ইমামগণের কোন আপত্তি না থাকতে হবে এবং বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের সাথে উক্ত কিতাবে বর্ণিত অন্য কোন হাদীসের অনিরসনযোগ্য দ্বন্দ্বও না থাকতে হবে। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বুখারী-মুসলিমের কোন হাদীসের উপর যদি হাদীস নিরীক্ষক ইমামগণের কোন আপত্তি থাকে অথবা হাদীসের বিষয়বস্তুর মাঝে অনিরসনযোগ্য দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে সে হাদীসগুলো বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কাঙ্খিত শ্রেষ্ঠত্বের মান পাবে না। অতএব, বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত যে কোন হাদীস অন্যান্য কিতাবের যে কোন হাদীসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে বিষয়টি এমন নয়।

বুখারী-মুসলিমের সব হাদীস সহীহ বলে উম্মতের স্বীকৃতি বিদ্যমান রয়েছে। এসত্ত্বেও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর অনুসন্ধানে নিরীক্ষক ইমামগণের আপত্তি রয়েছে এমন হাদীসের সংখ্যা বুখারী-মুসলিমে ২১০টি। তন্মধ্যে 'মুত্তাফাক আলাইহি' অর্থাৎ উভয় কিতাবে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২টি, শুধু বুখারীতে ৭৮টি এবং শুধু মুসলিমে ১১০টি। (হাদীউস সারী: ৮ম অধ্যায়) আর শায়খ আবু সুফিয়ান মুস্তাফা বাহু লিখিত الأحاديث المنتقدة فى الصحيحين কিতাবের বিবরণ মোতাবেক বুখারী-মুসলিমে এ রকম হাদীসের সংখ্যা ৩৯৫টি। যার মধ্যে 'মুত্তাফাক আলাইহি' ৫২টি, শুধু বুখারীতে ১০৪টি এবং শুধু মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ২৩৯টি। এ ছাড়া উভয় কিতাবে স্বতন্ত্রভাবে বিতর্কিত রাবীর সংখ্যা বুখারীতে ৮০জন এবং মুসলিমে ১৬০জন। তাহলে নিরীক্ষক ইমামগণের আপত্তি রয়েছে বা বিতর্কিত রাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বুখারী-মুসলিমের এমন হাদীসের বিপরীতে যদি অন্য কিতাবে নির্ভরযোগ্য রাবীগণের মাধ্যমে কোন হাদীস বর্ণিত হয় তাহলে সেগুলোর মান বুখারী-মুসলিমের হাদীসের তুলনায় কোনক্রমে কম নয় বরং অনেক বেশি।

উদাহরণ হিসেবে ধরে নেয়া যাক, বুখারীতে চার হাজার হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে দু'হাজার হাদীস উঁচু স্তরের সহীহ। এক হাজার মধ্যম

স্তরের সহীহ। অবশিষ্ট এক হাজার সাধারণ স্তরের সহীহ। আর তিরমিযী-তেও চার হাজার হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে এক হাজার হাদীস উঁচু স্তরের সহীহ। এক হাজার মধ্যম স্তরের সহীহ। এক হাজার সাধারণ স্তরের সহীহ। আর অবশিষ্ট এক হাজার হাদীস জঈফ। সার্বিক বিবেচনায় বুখারীর মান অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু তিরমিযী শরীফের উঁচু স্তরের সহীহ এক হাজার হাদীসকে যদি বুখারীর নিম্ন স্তরের এক হাজার হাদীসের বিপরীতে রাখা হয় তাহলে অবশ্যই তিরমিযীর হাদীসগুলো বুখারীর ঐ হাদীসগুলোর চেয়ে প্রাধান্য পাবে; যদিও সার্বিক বিবেচনায় বুখারীর মান ঊর্ধ্বে। সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় বুখারীর মান ঊর্ধ্বে হওয়ার দোহাই দিয়ে বুখারীর যে কোন হাদীসকে অন্যান্য কিতাবের সব হাদীসের উপর প্রাধান্য দেয়া বাস্তবসম্মতও নয়, যৌক্তিকও নয়।

এর চেয়েও বেশি বাস্তব এই যে, চার ইমামসহ হাদীস নিরীক্ষক ও নীতিনির্ধারক ইমামগণ যথা- ইবরাহীম নাখাঈ, (মৃত্যু-৯৬ হি.) মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আয্যুহরী, (মৃত্যু-১২৫ হি.) আবু আব্দুর রহমান আল্ আওযাঈ, (মৃত্যু-১৫৭ হি.) শু'বা ইবনে হাজ্জাজ, (মৃত্যু-১৬০ হি.) সুফিয়ান সাওরী, (মৃত্যু-১৬১ হি.) আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, (মৃত্যু-১৮১ হি.) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কত্তান, (মৃত্যু-১৯৮ হি.) আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, (মৃত্যু-১৯৮ হি.) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, (মৃত্যু-২৩৩ হি.) আলী ইবনে মাদীনী, (মৃত্যু-২৩৪ হি.) ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রাহওয়াইহ (মৃত্যু-২৩৮ হি.)সহ অধিকাংশ ইমামগণই ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের পূর্বে গত হয়ে গেছেন। সঙ্গত কারণেই হাদীস থেকে জীবন চলার বিধি-বিধান বের করা, সহীহ-জঈফ নির্ণয় করা, বিবাদমান হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন বা প্রাধান্য দেয়াসহ প্রায় সবকিছুই সম্পন্ন হয়ে গেছে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের জন্মের পূর্বে। আর বুখারী-মুসলিমের সম্মানিত ইমামদ্বয় তাঁদের পূর্বের ইমামদের বাছাইকৃত রাবীদের থেকে সহীহ হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন মাত্র। হ্যাঁ, কোন কোন ক্ষেত্রে সহীহ-জঈফ নির্ণয়, হাদীস থেকে মাসআলা বের করা এবং বিবাদমান হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন বা প্রাধান্য দেয়াসহ প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে তাঁরাও গবেষণা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের গবেষণাও অনেক মূল্যবান। তবে তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের লিখিত বুখারী ও মুসলিম শরীফের যে কোন হাদীসকেই অন্যান্য কিতাবের সকল হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী এবং আবু বকর হাযেমী রহ.সহ অন্যান্য নীতিনির্ধারক ইমাম-

গণের ভাষ্য মোতাবেক বিবাদমান হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি বুখারী-মুসলিমের বর্ণনার উপর তেমন একটা নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় প্রশ্ন আসে যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের জন্মের পূর্বে সোয়া দুইশত বছরেরও বেশি সময় যাবৎ মুসলিম উম্মাহ কিসের ভিত্তিতে আমল করেছেন? সুতরাং যে কোন মাসআলার ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে বুখারী- মুসলিমের হাদীসকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট স্বীকৃত নয়। বরং এটা বিরোধপূর্ণ হাদীসের মাঝে প্রাধান্য দেয়ার এমন একটি ভুল পদ্ধতি যা উসূলে হাদীসে অজ্ঞ বা অপরিপক্ক ব্যক্তিদের আবিষ্কৃত।

একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি শরীআত-বিরোধী নয়

এ ব্যাপারে কুরআন হাদীছের বক্তব্য দেখুন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

অনুবাদ : যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা করো তাহলে সেটা কতই না সুন্দর। আর যদি গোপনে সদকা করো এবং তা ফকীরকে দিয়ে দাও তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত। (ছূরা বাকারা : ২৭১)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সদকা দানের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। **এক.** প্রকাশ্যে সদকা দান এবং **দুই.** গোপনে সদকা দান। সাথে সাথে তিনি উভয় পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি শরীআতসম্মত। সুনির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় যে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে। সবাইকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা জরুরি নয়।

হাদীছে এসেছে–

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ آخِرَهُ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ يُسِرُّ أَوْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ

يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ " قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ وَنَامَ قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (رواه أحمد، ورواه ابو داود فى بَابِ الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম : রসূলুল্লাহ স. বিতির নামায কি প্রথম রাতে পড়তেন, না শেষ রাতে? জবাবে তিনি বললেন, উভয় প্রকারই করতেন। কখনো রাতের শুরুতে আবার কখনো রাতের শেষাংশে আদায় করতেন। আমি বললাম, সব প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেছেন। আমি আবার বললাম, তাঁর কিরাত কেমন ছিলো? তিনি কি নীরবে কিরাত পড়তেন, নাকি উচ্চ আওয়াজে? জবাবে তিনি বললেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনো নীরবে পড়তেন, আবার কখনো উচ্চ আওয়াজে পড়তেন। আমি বললাম, সব প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেছেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, জানাবাতের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ গোসল ফরয হলে) তিনি কী করতেন? ঘুমানোর আগে গোসল করতেন, নাকি গোসলের পূর্বে ঘুমিয়ে যেতেন? উত্তরে তিনি বললেন, উভয়টিই করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন, আবার কখনো অযু করে ঘুমাতেন। (ঘুম থেকে উঠে গোসল করতেন) আমি বললাম, সব প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেছেন। (মুসনাদে আহমদ: ২৪৪৫৩, আবূ দাউদ: ১৪৩৭, তিরমিযী: ৪৪৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বিতির নামায এবং জানাবাতের গোসলের সময় আর তাহাজ্জুদ নামাযের কিরাতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল একাধিক রকম ছিলো। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একই আমলের একাধিক পদ্ধতি হতে পারে। সবাইকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হবে তা জরুরি নয়। বরং একাধিক পদ্ধতি থাকা দ্বীনের প্রশস্ততার আলামত।

এ ছাড়া অযু করার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত আছে। প্রত্যেক অঙ্গ একবার করে ধোয়া, (বুখারী : ১৫৯) দু'বার করে ধোয়া, (বুখারী : ১৬০) এবং প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া। (বুখারী : ১৬১) নামায আদায়ের ক্ষেত্রে একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমনঃ বারবার হাত উঠানো আর একবার হাত উঠানো। আমীন উচ্চস্বরে বলা আর নীরবে বলা। এরকম আরো বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে যে ব্যাপারে সহীহ হাদীসে একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত আছে। কিছু সংখ্যক মানুষ সহীহ হাদীসের আমল যিন্দা করার নামে শরীআতের এ প্রশস্ততার সুযোগ গ্রহণ না করে যে কোন একটি পদ্ধতিকে হক বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর মূর্খতাবশত অন্য পদ্ধতির অনুসারীদেরকে বাতিল বা গোমরাহ মনে করছে। অথচ সহীহ হাদীসে বর্ণিত এ সব পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক কোন্‌টি উত্তম তা নিয়ে চার ইমামসহ خير القرون বা উত্তম যুগের মুজতাহিদগণের মাঝে মতবিরোধ থাকলেও কেউ কাউকে বাতিল মনে করেননি। বরং পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান ছিলো অনুসরণীয়। অতএব, পৃথিবীর সব মানুষকে একই পদ্ধতিতে একত্রিত করার চিন্তার পেছনে না পড়ে কুরআন-হাদীস মেনে চলা, সবার প্রতি সুধারণা রাখা এবং পরমতসহিষ্ণু হওয়াই বরং উম্মতের ঐক্য দৃঢ় করার বেশি কার্যকর পন্থা হবে।

বুখারী-মুসলিমের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে

সহীহ হাদীস শুধু বুখারী-মুসলিম বা সিহাহ সিত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বুখারী মুসলিমের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে। এ ব্যাপারে ইবরাহীম ইবনে মা'কিল বর্ণিত স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ.-এর মন্তব্য হলো :
مَا أَدخلتُ فِي هَذَا الكِتَابِ إِلاَّ مَا صَحَّ وَتركتُ مِنَ الصِّحَاحِ كِي لاَ يطولَ الكِتَابُ
"সহীহ ব্যতীত আমি এ কিতাবে কিছুই আনিনি। তবে অনেক সহীহ হাদীস আমি ছেড়ে দিয়েছি যেন কিতাব দীর্ঘ না হয়ে যায়"। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালাঃ তবকা- ১৪, রাবী নম্বর-৭১) আর ইমাম মুসলিম রহ.-এর বক্তব্য হলো : **إِنَّمَا قُلْتُ: صِحَاح، وَلَمْ أَقُلْ: مَا لَمْ أُخَرِّجْه ضَعِيْف** "আমি বলি, এ কিতাবটি সহীহ। তবে এটা বলি না যে, আমি যেটা আনিনি তা জঈফ"। (সিয়ারু অ'লামিন নুবালাঃ ১৪ রাবী নম্বর- ২১৭) ইমাম মুসলিম রহ. ৭৯০ নম্বর

হাদীসের আলোচনায় হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا হাদীসটিকে সহীহ বলা সত্ত্বেও তা এ কিতাবে না আনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, لَيْسَ كُلّ شَيْءٍ عِنْدِي، صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هٰهُنَا "আমার নিকট যা সহীহ হবে তা-ই এ কিতাবে আনবো এমনটি নয়"। বুখারী-মুসলিম-এর সম্মানিত লেখকদ্বয়ের বক্তব্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সহীহ হাদীস শুধু এ দুই কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

বুখারী-মুসলিম-এর সম্মানিত লেখকদ্বয়ের বক্তব্যের দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা সহীহ হাদীস বেছে বেছে তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী-মুসলিম শরীফে বর্ণিত হওয়ার কারণে কোন হাদীস সহীহ হয়নি। বরং হাদীস সহীহ-জঈফ হওয়া নির্ধারিত হয়েছে আরো অনেক আগে। বুখারী-মুসলিমের হাদীসের মধ্যেই যদি শরীআতের আমল ও দলীল সীমাবদ্ধ হয় তাহলে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.-এর উস্তাদগণসহ এ কিতাব দুটি লেখার পূর্বের মহামনীষীগণ কোন্ কিতাবের হাদীস মেনে চলতেন?

এর আরো একটি প্রমাণ

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, أَحفَظُ مائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ، وَأَحفَظُ مِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيْثٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ "আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস এবং সহীহ নয় এমন দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছি"। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : তবকা- ১৪, রাবী নম্বর-৭১) অথচ তাকরার ব্যতীত বুখারী শরীফের মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা মাত্র দুই হাজার ছয়শত দুইটি। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীর মুকাদ্দামায় বলেন, فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان "সহীহ বুখারীতে তাকরার (বারংবার উল্লিখিত) ব্যতীত মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার ছয়শত দুইটি। (মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী : ১/৪৭৭) আর বারংবার উল্লিখিতসহ মোট মারফু' হাদীসের সংখ্যা নয় হাজার বিরাশিটি। তাহলে বুঝা গেলো ইমাম বুখারী রহ.-এর নিকট সহীহ এমন ৯০ হাজারেরও বেশি হাদীস বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়নি। বরং তা বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে ইমাম বুখারী রহ.-এর নিজের লিখিত কিতাব জুযউ রফইল ইয়াদাইন-এর প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি হাত উত্তোলন সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদীস বর্ণনার পরে ৯১ নম্বর হাদীস শেষে

এ মন্তব্য করেন যে, هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يخالف بعضها بعضا ، وليس فيها تضاد لأنها في مواطن مختلفة "রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত এ হাদীসগুলো সবই সহীহ। এগুলোর মাঝে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। কেননা এগুলোর ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন"। (জুযউ রফইল ইয়াদাইন: ৯১)

ইমাম বুখারী রহ.-এর এ বক্তব্য লক্ষ্য করুন! তিনি নামাযে হাত উত্তোলনের ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সেগুলো তিনি বুখারী শরীফের মধ্যে আনেননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, বুখারী শরীফের বাইরেও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

সিহাহ সিত্তার পূর্বে লিখিত হাদীসের কিছু কিতাবের হাদীসের মান

সিহাহ সিত্তার বাইরে এমন অনেক হাদীসের কিতাব রয়েছে যা লিখেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম বা যে কোন একজনের সরাসরি উস্তাদ। অথবা আরো উপরের উস্তাদ, কিংবা তাঁদের উস্তাদের তালিকার বাইরের কোন উঁচুমানের মুহাদ্দিস। সেসব হাদীসের রাবীগণ যদি বুখারী-মুসলিমের রাবী বা তাঁদের শর্ত মোতাবেক নির্ভরযোগ্য রাবী হন তাহলে সে হাদীসের মান কিছুতেই বুখারী-মুসলিমের হাদীসের চেয়ে কম নয়। যেমন-

কিতাবুল আছার ও তার হাদীসের মান

পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গরূপে ফিকহী অনুচ্ছেদে ডবন্যস্ত সর্ব প্রথম হাদীসের কিতাব হলো কিতাবুল আছার। চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে ইমাম আযম ইমাম আবু হানিফা রহ. (মৃত্যু-১৫০ হি.) এ কালজয়ী কিতাব সংকলন করেছেন। পরবর্তীতে ইমাম মালেক রহ. 'কিতাবুল আছার' কে সামনে রেখেই তাঁর মুয়াত্তা কিতাবকে সুডবন্যস্ত করেন। এ কিতাবের বিস্তারিত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি জানার জন্য আগ্রহী পাঠকগণ আল্লামা আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. লিখিত তাজদীদী কিতাব ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইল্‌মে হাদীস-এর কিতাবুল আছারের উপর সারগর্ভ আলোচনাটি দেখতে পারেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও তার হাদীসের মান

এ কিতাবের লেখক ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. (মৃত্যু-১৭৯ হি.)। তিনি হাদীস ও ফিকহ-এর প্রখ্যাত ইমাম। তিনি ইমাম বুখারীরও একশ' বছর পূর্বে ৯৪ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। বুখারী-মুসলিমসহ

সিহাহ সিত্তার সব ইমাম নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান সিহাহ সিত্তার তুলনায় নিম্নমানের নয়। বরং লেখক থেকে রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত রাবীদের মাধ্যম কম হওয়ায় এটাকে আ'লা বা উঁচুস্তরের সনদ বলা হবে।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ও তার হাদীসের মান

এ কিতাবের লেখক ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ইমাম আব্দুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম আস-সনআনী রহ. (মৃত্যু-২১১ হি.)। তিনিও বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব ইমামের উস্তাদের উস্তাদ এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান সিহাহ সিত্তার তুলনায় নিম্নমানের নয়। বরং লেখক থেকে রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত রাবীদের মাধ্যম কম হওয়ায় এটাকে আ'লা বা উঁচুস্তরের সনদ বলা হবে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও তার হাদীসের মান

এ কিতাবের লেখক আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবা রহ. (মৃত্যু-২৩৫ হি.)। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর শাগরিদের শাগরিদ এবং বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব ইমামের উস্তাদ এবং তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান সিহাহ সিত্তার তুলনায় নিম্নমানের নয়। বরং লেখক থেকে রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত রাবীদের মাধ্যম কম হওয়ায় এটাকে আ'লা বা উঁচুস্তরের সনদ বলা হবে।

মুসনাদে আহমদ ও তার হাদীসের মান

এ কিতাবের লেখক আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বাল রহ. (মৃত্যু-২৪১ হি.)। তিনি বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার অনেক ইমামের উস্তাদ এবং হাদীস ও ফিকহ-এর জগদ্বিখ্যাত ইমাম। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিতাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, নির্ভরযে-াগ্য রাবীদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান সিহাহ সিত্তার তুলনায় নিম্নমানের নয়। বরং লেখক থেকে রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত রাবীদের

মাধ্যম কম হওয়ায় এটাকে আ'লা বা উঁচুস্তরের সনদ বলা হবে। তেমনি-ভাবে সিহাহ সিত্তার ইমামগণের পরে জন্মগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস ও ইমামগণ যেমন ত্বহাবী, বায়হাকী, দারাকুতনী, হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী, ইবনে হিব্বান, দারিমী ও তবারানী প্রমুখ ইমামগণের লিখিত হাদীসের কিতাব রয়েছে। রাবীদের জীবনী পর্যালোচনাকারী ইমামগণ এসব মুহাদ্দিসের উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁদের কিতাবে নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসসমূহকে সহীহ বলেছেন। নমুনা হিসেবে এখানে কিছু কিতাবের নাম আনা হয়েছে। এরকম নির্ভরযোগ্য আরো অনেক কিতাব রয়েছে।

এ আলোচনা দ্বারা আমি এ কথা বুঝাতে চাচ্ছি যে, সহীহ হাদীস শুধু সিহাহ সিত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং হাদীসের আরও অনেক কিতাবে অনেক উঁচুমানের বহু সহীহ হাদীস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শরীআতের দলীল চারটি

কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত শরীআতের দলীল চারটি। প্রত্যেকটি দলীলের ভিত্তি একে একে পেশ করা হলো :

প্রথম দলীল : কুরআন এবং দ্বিতীয় দলীল : ছুন্নাহ

কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল আয়াত যা রহিত হয়ে যায়নি। আর ছুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য রসূল স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন এবং সাহাবায়ে কিরামের ঐ সকল কথা, কাজ বা অনুমোদন যা তারা গবেষণা করে বলেননি বা পূর্ববর্তী কোন কিতাবের থেকেও গ্রহণ করেননি। সাহাবায়ে কিরামের এ জাতীয় কথা, কাজ বা অনুমোদনকে পরোক্ষভাবে রসূল স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন ধরে নেয়া হয়ে থাকে। আর সাহাবায়ে কিরামের গবেষণালব্ধ কথা বা কাজও শরীআতের দলীল; তবে তার স্তর আরো নিচে।

কুরআন-ছুন্নাহ শরীআতের দলীল– এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ

কুরআন-ছুন্নাহ যে শরীআতের দলীল তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এরপরও এ বিষয়ে কুরআন থেকে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রথম প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

অনুবাদ : হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করো। কেননা, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না। (ছূরা আলে ইমরান: ৩২)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম যা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো ছুন্নাহ যা রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূল এবং তোমাদের দায়িত্বশীলগণের আনুগত্য করো। যদি কোন বিষয়ে মতদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ো তাহলে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে তোমরা তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরাও (অর্থাৎ সে ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু কর)। এটা কল্যাণকর এবং পরিণামের দিক থেকে উত্তম। (ছূরা নিসা : ৫৯)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম যা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো ছুন্নাহ যা রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

তৃতীয় প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং শুনার পরে তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (ছূরা আনফাল : ২০)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম যা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো সুন্নাহ যা রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

চতুর্থ প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো। আর তোমাদের আমলসমূহ বাতিল করো না। (ছূরা মুহাম্মাদ : ৩৩)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম যা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলীল হলো ছুন্নাহ যা রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

তৃতীয় দলীল : ইজমা (উম্মতের ঐকমত্য)

ইজমার সংজ্ঞা : ইজমার সংজ্ঞা পেশ করতে গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রহ. বলেন, ইজমা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঐকমত্য। আর উলামায়ে কিরামের পরিভাষায় ইজমা বলা হয় শরঈ বিধান সম্পর্কে উম্মতে মুহাম্মাদীর অভিজ্ঞ গবেষকগণের (যে কোন যুগে) কোন বিষয়ে কথা, কাজ বা বিশ্বাসের মাধ্যমে ঐকমত্য পোষণ করা। (আল্ মাহছূল : ইজমা বিষয়ক আলোচনা)

কাদের ইজমা বা ঐকমত্য গ্রহণযোগ্য?

ইজমা তথা ঐকমত্য বলতে কি সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য উদ্দেশ্য নাকি বিশেষ শ্রেণীর ঐকমত্য উদ্দেশ্য? এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, উলামায়ে কিরামের নিকট জামাতের ব্যাখ্যা হলো: ফিকহ, ইল্ম ও হাদীস বিশারদগণ। (তিরমিযী: ২১৭০) ইমাম তিরমিযী রহ.এর ভাষ্য মোতাবেক ইজমা দ্বারা ফিকহ, ইল্ম ও হাদীস বিশারদগণের ঐকমত্য উদ্দেশ্য। আর ছূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন যে, উম্মতের ইজমা বলতে সমগ্র উম্মতের ইজমা উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত কোন ইজমা সংঘটিত হবে না। বরং উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্য বলতে উদ্দেশ্য যে কোন যুগের উপস্থিত ন্যায়নিষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐকমত্য। অর্থাৎ কোন যুগের উলামায়ে কিরাম যদি কোন বিষয়ের উপর একমত হন তাহলে সেটা শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং সাধারণ মানুষের জন্য তার অনুসরণ করা জরুরী হবে।

ইজমার বিধান : কুরআন-ছুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হলে এটা শরীঅ-াতের দলীল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

প্রথম প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অনুবাদ : হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরে যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সে দিকেই ফিরিয়ে দিবো, যে দিকে সে ফিরেছে। আর তাকে জাহান্নামে ঢোকাবো, তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা। (ছূরা নিসা: ১১৫)

শিক্ষণীয় : এ আয়াতের বিবরণ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়া এবং মুমিনদের (সম্মিলিত) পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ এবং হারাম। অতএব, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য অতঃপর মুমিনদের সম্মিলিত পথের অনুসরণ আবশ্যক। আর এরই নাম ইজমা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

আল্লামা কাজী বাইযাবী রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজমার বিরোধিতা করা হারাম। কেননা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ধমক দিয়েছেন দুটো কারণে। এক. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি করা, দুই. মুমিনদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করা। (তাফসীরে বাইযাবী)

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন,

ইজমা শরীআতের দলীল হওয়া কুরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তিনশ বার কুরআন পাঠ করে এ আয়াতটি খুঁজে পেলেন। তার বর্ণনা মোতাবেক এ আয়াত দ্বারা তা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুমিনদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে চলা যখন হারাম তখন মুমিনদের পথ গ্রহণ করা ওয়াজিব। (তাফসীরে কাবীর) ইমাম বায়হাকী রহ. সহীহ সনদে এ বিষয়টি ইমাম শাফেঈ রহ. থেকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। (আহকামুল কুরআন লিশ শাফেঈ)

দ্বিতীয় প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

অনুবাদ : তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণে তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে। (ছূরা আলে ইমরান: ১১০)

শিক্ষণীয় : এ আয়াতে সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এরই ফলে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মাদী সৎকর্মশীল না হলে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশদাতা বানানো যেতো না। তেমনিভাবে সমষ্টিগতভাবে তারা অন্যায় কাজ থেকে মুক্ত না হলে তাদেরকে অসৎ কাজে নিষেধকারীর দায়িত্ব দেয়া হতো না। অতএব, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব প্রদানই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর সমষ্টিগত কাজ শরীআতের দলীল।

একটি বিশেষ ফায়দা : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ বাক্য দ্বারা মুখ্য উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কিরাম অতঃপর সমগ্র উম্মতে মুহাম্মাদী। (তাফসীরে মাযহারী)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

আল্লামা কাজী বাইযাবী রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় যে, ইজমা শরীআতের দলীল। الْمَعْرُوفِ এবং الْمُنْكَرِ শব্দদ্বয়ের শুরুতে ব্যবহৃত আলিফ-লাম সব কিছুকে বুঝানোর জন্য এসেছে। অতএব, এ আয়াতের চাহিদা হলো তারা সব সৎ কাজে নির্দেশদাতা এবং সব অসৎ কাজে নিষেধকারী হবে। যদি তারা কোন বাতিলের উপর একমত হতো তাহলে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি এর বিপরীত হতো। (তাফসীরে বাইযাবী)

আল্লামা আবু বকর আল জাস্‌সাস রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উম্মত যা থেকে নিষেধ করে তা নিষিদ্ধ। আর যা নির্দেশ দেয় সেটা আদিষ্ট এবং এটা আল্লাহ তাআলার বিধান। আরো প্রমাণিত হয় যে, এ উম্মত কোন ভ্রষ্টতার উপর একমত হতে পারে না। এ আয়াত থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, যে বিষয়ের ওপরে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস)

তৃতীয় প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

অনুবাদ : অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা মানবজাতির জন্যে সাক্ষী হতে পারো। আর রসূলুল্লাহ স. হতে পারেন তোমাদের সাক্ষী। (ছূরা বাকারা: ১৪৩)

শিক্ষণীয় : এ আয়াতে সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীকে মধ্যমপন্থী উম্মত তথা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ কথার মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এ স্বীকৃতি প্রমাণিত হয় যে, এ উম্মতের সমষ্টিগত কাজ আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় সামগ্রিকভাবে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর সমষ্টিগত কাজ শরীআতের দলীল। আর এরই নাম ইজমা।

সাথে সাথে এ উম্মতকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সাক্ষী বানানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর সাক্ষী যেহেতু শরীআতের দলীল, তাই এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর সামগ্রিক কাজ শরীঅ-াতে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। আর এরই নাম ইজমা। অতএব, এ আয়াতের দুটি অংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইজমা তথা উম্মতের ঐকমত্য শরীআতের দলীল হিসেবে আল্লাহ তাআলার নিকট স্বীকৃত।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

আল্লামা কাজী বাইযাবী রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজমা শরীআতের দলীল। কেননা, যে বিষয়ের উপর উম্মত একমত হয় তা বাতিল বিষয় হলে মানবজাতির বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ন্যায়নিষ্ঠতা কলঙ্কিত হবে। (তাফসীরে বাইযাবী)

আল্লামা আবু বকর আল জাস্‌সাস রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা দুইভাবে ইজমার প্রমাণ মেলে। এক. তাদেরকে ন্যায়নিষ্ঠতার গুণসম্পন্ন বলে আখ্যা দেয়া– আর এটা উত্তম গুণ। আল্লাহ তাআলার এ কথার চাহিদাই হলো উম্মতে মুহাম্মাদীকে সত্যায়ন করা, তাদের কথা বিশুদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত দেয়া এবং ভ্রষ্টতার উপর তাদের একমত

হওয়াকে অস্বীকার করা। **দুই.** لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো)-এর অর্থ মানবজাতির বিরুদ্ধে উম্মতে মুহাম্মাদীকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো। আল্লাহ তাআলা যখন উম্মতে মুহাম্মাদীকে অন্যান্য উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী বানালেন তখন তাদের ন্যায়নিষ্ঠতা এবং কথার গ্রহণযোগ্যতার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন। কেননা আল্লাহ তাআলার সাক্ষী কখনো কাফের হতে পারে না এবং পথভ্রষ্টও হতে পারে না। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস)

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন,

এ আয়াতের মধ্যে প্রমাণ রয়েছে ইজমা সহীহ হওয়া এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক হওয়ার। কেননা তারা ন্যায়নিষ্ঠ হলেই কেবল মানবজাতির জন্য সাক্ষী দিবে। সুতরাং প্রত্যেক যুগ পরবর্তী যুগের জন্য সাক্ষী। অতএব, সাহাবায়ে কিরামের কথা তাবিঈগণের জন্য প্রমাণ এবং সাক্ষী। তাবিঈগণের কথা তাদের পরবর্তীদের জন্য প্রমাণ এবং সাক্ষী। আর উম্মতকে যখন সাক্ষী বানানো হয়েছে তখন তাদের কথা গ্রহণ করা আবশ্যক। (তাফসীরে কুরতুবী)

আল্লামা ছানাউল্লা পানিপথী রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা ইজমা শরীআতের দলীল হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা তাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়া তাদের ন্যায়নিষ্ঠতার পরিপন্থী। (তাফসীরে মাযহারী)

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত খ্যাতনামা মুফাসিসরগণের তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, ছূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজমা শরীআতের দলীল। ইজমা শরীআতের দলীল হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এখানে হাদীস থেকে কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো :

চতুর্থ প্রমাণ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَرْزُوقٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ»

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আমার উম্মত কখনোই ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। সুতরাং

তোমরা জামাতকে আঁকড়ে রাখো। কারণ আল্লাহর সাহায্য জামাতের উপর। (আল মু'জামুল কাবীর লিত্ তবারানী-১৩৬২৩, তিরমিযী: ২১৭০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা হাইসামী রহ. এ হাদীসের রাবীগণকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (মাযমাউজ যাওয়ায়েদ-৯১০০) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ জামেয়ে ছগীর-১৮৪৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদী কোন ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদীর ঐকমত্য ভ্রষ্টতামুক্ত হক। আর রসূলুল্লাহ স.-এর এ স্বীকৃতির চাহিদা হলো ইজমা শরীআতের দলীল।

কোন ভ্রান্তির উপর উম্মতে মুহাম্মাদীর ঐকমত্য হতে পারে না– এ মর্মে আরও বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা থেকে ইজমার দলীল মেলে। নমুনা হিসেবে আরো দু-একটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে-

হযরত আবু বাসরাহ গিফারী রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট চারটি জিনিস চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে তিনটি জিনিস দান করেছেন। আর একটি দিতে অস্বীকার করেছেন। আমি চেয়েছিলাম: যেন আমার উম্মত কোন ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ না হয়। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। (মুসনাদে আহমদ : ২৭২২৪) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (মুসনাদে আহমদ: ২৭২২৪ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদী কোন ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদীর ঐকমত্য ভ্রষ্টতামুক্ত হক। রসূলুল্লাহ স.-এর এ স্বীকৃতির চাহিদা হলো ইজমা শরীআতের দলীল।

হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তোমাদের জন্য জরুরী হলো ঐক্যবদ্ধ দলের সাথে থাকা। কেননা আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে কোন ভ্রষ্টতার উপর একত্র করবেন না। (আস্‌সুন্নাহ লিইবনে আবী আসেম : ৮৫) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এটাকে উত্তম সনদ বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ-২৭২২৪ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদী কোন ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদীর ঐকমত্য

ভ্রষ্টতামুক্ত হক। রসূলুল্লাহ স.-এর এ স্বীকৃতির চাহিদা হলো ইজমা শরীঅ-াতের দলীল।

চতুর্থ দলীল : ইজতিহাদ বা কিয়াস (গবেষণা)

কিয়াসের সংজ্ঞা : কিয়াসের আভিধানিক অর্থ হলো তুলনা করা। আর গবেষক আলেমগণের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয়- কুরআন-ছুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধানের কারণ নির্ধারণ করত তার সাথে তুলনা করে যে সকল বিষয়ের শরঈ বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে উক্ত কারণ পাওয়া গেলে ঐ বিধান জারী করা। যেমন : হাদীসে ছয়টি জিনিসে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রথমে গবেষণা করে ঐ ছয়টি জিনিসে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নির্ধারণ করা। অতঃপর উক্ত ছয়টি জিনিসের উপর তুলনা করে যত জিনিসে সুদের বিধান স্পষ্টভাবে কুরঅ-ান-ছুন্নাহ বা ইজমায় বর্ণিত হয়নি ঐ কারণ বিদ্যমান থাকলে সে সকল জিনিসের মধ্যে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান জারী করা।

কিয়াসের বিধান : কুরআন-ছুন্নাহর বা ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক না হলে কিয়াস শরীআতের দলীল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

প্রথম প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

অনুবাদ : যখন তাদের কাছে শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ পৌঁছে তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। যদি সেগুলো রসূলুল্লাহ স. কিংবা তাদের দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছে দিতো তাহলে তাদের মধ্যে অনুসন্ধানকারীগণ (সংবাদের যথার্থতা) জেনে নিতে পারতো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা বিদ্যমান না থাকলে তোমাদের অল্প কিছু লোক ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুসরণ করতে। (ছূরা নিসা: ৮৩)

শিক্ষণীয় : কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য রসূলুল্লাহ স. কিংবা অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট পেশ করার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বিদ্যমান থাকতে কোন অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং রসূলুল্লাহ স. বিদ্যমান থাকলে তাঁর নিকট

থেকে আর তাঁর অবর্তমানে অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে যে কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করতে হবে। রসূলুল্লাহ স.-এর অবর্তমানে অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিবর্গের গবেষণালব্ধ জ্ঞানও শরীআতের দলীল। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট যাওয়ার কথা বলতেন না। গবেষকদের পরিভাষায় উক্ত গবেষণাকেই কিয়াস বলা হয়ে থাকে। অতএব, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

আল্লামা আবু বকর আল জাস্‌সাস রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা নবসৃষ্ট কোন বিষয়ের বিধান নির্ধারণে ইজতিহাদ ও কিয়াসের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। আর তা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. যখন জীবিত ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের সামনে থাকতেন তখন নবসৃষ্ট যে কোন বিষয় রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট পেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। আর রসূলুল্লাহ স.-এর মৃত্যুর পরে বা জীবিত থেকেও তাঁর অনুপস্থিতিতে উলামায়ে কিরামের নিকট পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা অবশ্যই সে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে কুরআন-হাদীসের কোন স্পষ্ট নির্দেশ বর্ণিত নেই। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস)

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহ. বলেন,

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল। কেননা আল্লাহ তাআলার বাণী الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (দায়িত্বশীলদের মধ্যে যারা গবেষক) এটা দায়িত্বশীলদের গুণাবলির বিবরণ। আর ভয় বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন বিষয় যাদের সামনে উপস্থিত হয় তাদের কাজ হলো এর প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করতে গবেষকদের নিকট যাওয়া। এটার দুই অবস্থা হতে পারে। এক. কুরআন-হাদীসের বিধান থাকতেও গবেষকদের নিকট যাওয়া। দুই. কুরআন-হাদীসের বিধান না থাকার কারণে গবেষকদের নিকট যাওয়া। প্রথম অবস্থা অগ্রহণযোগ্য। যদি গবেষণা শরীআতের দলীল না হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ববান তথা গবেষকদের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, (শাস্ত্রজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তির সমর্থিত) গবেষণা শরীআতের দলীল। আর

কিয়াস হয়তো গবেষণা অথবা গবেষণার অংশ। সুতরাং সেটা শরীআতের দলীল হওয়া আবশ্যক। (তাফসীরে কাবীর)

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন,

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ বাক্যের মধ্যে الِاسْتِنْبَاطُ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে اسْتَنْبَطْتُ الْمَاءَ শব্দ থেকে। আর এর ক্রিয়ামূল النَّبَطُ এর অর্থ হলো কূপ খননের পর কূপ থেকে বের হওয়া প্রথম পানি। আর জমিন থেকে ফসল বের করে আনার কারণে কৃষককে النَّبَطُ বলা হয়। الِاسْتِنْبَاطُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ বের করে আনা। এ আয়াত থেকে কুরআন-হাদীস এবং ইজমার সিদ্ধান্ত না পাওয়া গেলে গবেষণা করা প্রমাণিত হয়। (তাফসীরে কুরতুবী)

শিক্ষণীয় : খ্যাতনামা মুফাসসিরগণের তাফসীরের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ছূরা নিসার ৮৩ নম্বর আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, কুরআন-হাদীস ও ইজমা দ্বারা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে ইজতিহাদ বা কিয়াসই তখন শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত।

দ্বিতীয় প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.

অনুবাদ : তিনি ঐ সত্তা যিনি আহলে কিতাবের কাফেরদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা বের হয়ে যাবে। আর তারা ভেবেছিলো তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর আজাব এমন জায়গা থেকে এসে পড়লো যা তারা কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ভীতি ঢেলে দিলেন। তারা নিজ হাতে তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করছিলো এবং মুমিনগণও কাফেরদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করছিলো। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। (ছূরা হাশর: ২)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতে ব্যবহৃত فَاعْتَبِرُوا শব্দের ভাবার্থ সহজ বাংলায় বলা হয় উপদেশ গ্রহণ করা। কিন্তু এর মূল অর্থ হলো তুলনা করা। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের অবস্থা তাদের অবস্থার সাথে তুলনা করো। যেন তাদের সে অপরাধ তোমাদের মধ্যে এসে না পড়ে এবং তোমরাও যেন তাদের মতো করুণ পরিণতির শিকার না হও।

তুলনা করার পদ্ধতি এই যে, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধানের কারণ নির্ণয় করা। অতঃপর কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট বিধান উল্লেখ নেই এমন যে কোন ক্ষেত্রে ঐ কারণ পাওয়া গেলে সেখানে উক্ত বিধান জারী করা।

যেমন এ আয়াতে ইয়াহুদীদের অপরাধ তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহর আজাবের মুকাবিলায় নিজেদের শক্তিমত্তা এবং দুর্গের প্রতিরোধের উপর ভরসা করা। আর তাদের এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখন গবেষক ইমামগণ যদি কোন জাতি বা ব্যক্তির মধ্যে ঐ কারণ খুঁজে পান যা ইহুদীদের মধ্যে ছিলো তাহলে তাদের ব্যাপারে এ বিধান বলে দিতে পারেন যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

অনুরূপভাবে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট বিধান বর্ণিত নেই এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ যে বিষয়ের বিধান কুরআন-হাদীসে বর্ণিত পাওয়া যাবে সে বিধানের কারণ উদঘাটন করা। অতঃপর সমস্যাগ্রস্ত বিষয়ের কারণ উক্ত বিধানের কারণের সাথে মিলে গেলে সে বিধান এ বিষয়ের উপর জারী করা। গবেষকদের ভাষায় এ তুলনা করাকে কিয়াস বলা হয়। উপরিউক্ত ব্যাখ্যা মোতাবেক এ আয়াতে ব্যবহৃত فَاعْتَبِرُوا শব্দের অন্তরালে আল্লাহ তাআলা অজানা সমস্যার শরঈ সমাধান উদঘাটন করতে কিয়াস করার নির্দেশ জারী করেছেন। অতএব, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। তবে এটা তখনই প্রয়োগ করা হবে যখন কোন বিষয়ের বিধান কুরআন-হাদীস বা ইজমা তথা উম্মতের ঐকমত্যের মধ্যে পাওয়া না যাবে। পূর্ববর্তী তিনটি দলীলের কোনটিতে যদি কোন বিষয়ের বিধান বর্ণিত থেকে থাকে তাহলে কিয়াসের দ্বারা নতুন কোন বিধান নির্ধারণ করা বৈধ নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর

আল্লামা কাজী বাইযাবী রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল। এ হিসেবে যে, তিনি এতে নির্দেশ দিয়েছেন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় অতিক্রম করার এবং এক অবস্থার বিধান অন্য অবস্থায় গ্রহণ করার। কেননা উভয় অবস্থার চাহিদার মিল রয়েছে। (তাফসীরে বাইযাবী)

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহ. বলেন,

কিয়াস শরীআতের দলীল। মুফাসসিরগণ বলেন, **فَاعْتَبِرُوا** শব্দের ক্রিয়ামূল **اَلْاِعْتِبَارُ** এর অর্থ হলো: কোন বস্তুর মূল উৎস এবং (তার বিধান) প্রমাণের ধরনের প্রতি লক্ষ্য করে অনুরূপ আরো বিধান আবিস্কার করা। (তাফসীরে কাবীর)

আল্লামা মাহমূদ আলূছী রহ. বলেন,

এ আয়াত দ্বারা শরঈ কিয়াসের উপর আমল করার অনুমোদনের প্রমাণ পেশ করার বিষয়টি প্রসিদ্ধ। গবেষকগণ বলেন, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে **اَلْاِعْتِبَارُ** এর নির্দেশ দিয়েছেন। এর (আভিধানিক) অর্থ হলো: এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসে পরিবর্তন হওয়া। আর তা বাস্তবায়িত হবে কিয়াসের দ্বারা। যেহেতু কিয়াসের মধ্যে মূল থেকে শাখা-প্রশাখায় বিধান পরিবর্তনের অর্থ পাওয়া যায়। এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, দাঁতের দিয়াত তথা ক্ষতিপূরণের বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আঙ্গুলের উপর কিয়াস করে বলা যায় যে, এ দুটি জিনিসের দিয়াত সমান। (তাফসীরে রূহুল মাআনী)

শিক্ষণীয় : খ্যাতনামা মুফাসসিরগণের তাফসীরের ভিত্তিতে ছূরা হাশরের ২ নম্বর আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-হাদীস ও ইজমা দ্বারা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে ইজতিহাদ বা কিয়াসই তখন শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত।

তৃতীয় প্রমাণ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لَا آلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ. (رواه أحمد ورواه ابو داود فى باب اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ)

অনুবাদ : হযরত মুআয রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন বললেন, তোমার সামনে কোন বিচার এলে তুমি কিভাবে তার সমাধান করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবে যা আছে আমি সে অনুযায়ী ফায়সালা করবো। রসূলুল্লাহ স. পুনরায় বললেন, যদি তুমি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও? হযরত মুআয রা. বললেন, তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করবো। তিনি আবার বললেন, যদি তুমি রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাতেও না পাও? হযরত মুআয রা. বললেন, তাহলে আমি আমার বিবেচনা দ্বারা গবেষণা করবো। আর এ ব্যাপারে আমি চেষ্টায় কোন ত্রুটি করবো না। হযরত মুআয রা. বলেন, এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ স. আমার সিনা চাপড়ে ইরশাদ করলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর রসূলের প্রেরিত দূতকে এমন (বিচারিক যোগ্যতার) তাওফীক দিয়েছেন, যে ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট। (মুসনাদে আহমদ: ২২০০৭, আবূ দাউদ: ৩৫৫৩ ও ৩৫৫৪, তিরমিযী : ১৩৩১ ও ১৩৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهلِ العلم، منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية. অনেক মুহাক্কিক ইমাম এ হাদীসের বিশুদ্ধতার মত পোষণ করেছেন। তন্মধ্যে আবু বকর রাযী, আবু বকর ইবনুল আরাবী, খতীবে বাগদাদী এবং ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া প্রমুখ রয়েছেন। (মুসনাদে আহমদ ২২০০৭ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, ولعمري إن كان معناه صحيحًا আমার জীবনের শপথ এর অর্থ অবশ্যই সহীহ। (আল ইলালুল মুতানাহিয়া: বিচার-ফায়সালা অধ্যায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে শরীআতের মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে। মূলনীতি এই যে, কোন বিষয়ে শরীআতের সমাধান বের করার জন্য প্রথমে

কুরআনে কারীমের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে এবং সেখানে স্পষ্ট সমাধান পাওয়া গেলে সেটাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। যদি কুরআনে এ বিষয়ের সমাধান বর্ণিত না থাকে অথবা অতি সংক্ষিপ্ত হয় কিংবা একাধিক সমাধান বর্ণিত থাকায় কোন্‌টি চূড়ান্ত তা নির্ধারণ করা না যায়, তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাত থেকে সমাধান বের করার চেষ্টা করতে হবে। কুরআনের ক্ষেত্রে বর্ণিত উপরিউক্ত কারণে যদি ছুন্নাহ থেকে স্পষ্ট সমাধান পাওয়া না যায় তাহলে কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে নিজের গবেষণা দ্বারা শরীআতের বিধান বের করতে হবে। গবেষকগণের পরিভাষায় এটাকে কিয়াস বলা হয়। হযরত মুআয রা.কে সাবাশি জানিয়ে এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করে রসূলুল্লাহ স. এ নীতিমালার স্বীকৃতি দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে পরিগণিত।

উল্লেখ্য. রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় ইজমার প্রয়োজন বা অস্তিত্ব না থাকায় এ হাদীসে তার বিবরণ আসেনি। তবে ইজমাও যে শরীআতের দলীল তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ প্রমাণ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسل أَهْلِك فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَالَ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ–١/٤٨)

অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আছ রা. বলেন, জাতুস সালাসিল যুদ্ধে শীতের রাতে আমার সপ্নদোষ হয়ে গেলো। আমি আশঙ্কা করলাম যে, গোসল করলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। তাই তায়াম্মুম করলাম এবং সাথীদের ফজরের নামায পড়ালাম। সাথীগণ এ ঘটনা রসূলুল্লাহ স.কে জানিয়ে দিলে তিনি আমাকে বললেন,: হে আম্‌র! তুমি জুনুবী অবস্থায়

সাথীদের নামায পড়িয়েছো? আমি তাঁকে গোসল না করার কারণ বর্ণনা করলাম এবং আরো বললাম যে, আমি আল্লাহর বাণী শুনেছি : তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান। (ছূরা নিসা : ২৯) রসূলুল্লাহ স. এ কথা শুনে হাসলেন এবং তাঁকে কিছুই বললেন, না। (আবূ দাউদ : ৩৩৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ "হাদীসটির সনদ শক্তিশালী"। (ফাতহুল বারী, অধ্যায়: 'জুনুবী ব্যক্তি অসুস্থতার আশঙ্কা করলে') শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **حديث صحيح**، "হাদীসটি সহীহ"। (আবূ দাউদ শরীফ: ৩৩৪ নং হাদীসের আলোচনায়)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আমর ইবনুল আছ রা. ফরয গোসলের স্থলে তায়াম্মুমের আমল কুরআন-হাদীসের কোন দলীলের ভিত্তিতে করেননি এবং এ মর্মে কোন দলীলও তিনি পেশ করেননি। বরং কুরআনের আয়াতের আলোকে তিনি নিজে গবেষণা করে এ আমল করেছিলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁর এ গবেষণালব্ধ দলীল শুনে হাসলেন। আর এটা রসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে গবেষণা নামক দলীলের স্বীকৃতির বহি.প্রকাশ। গবেষকগণের পরিভাষায় এটাকে কিয়াস বলা হয়। যদি এটা শরীআতের দলীল হিসেবে গৃহীত না হতো তাহলে ফরয গোসল বাকী রেখে এত মানুষের ইমামতি করার কারণে অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. তাঁকে কঠোরভাবে ধমক দিতেন এবং সবার নামায পুনরায় পড়ারও নির্দেশ দিতেন। কিন্তু তার কিছুই না করে শুধু হেসে শেষ করে দেয়া এরই প্রমাণ বহন করে যে, আম্‌র ইবনুল আছ রা. গবেষণার ভিত্তিতে যা করেছেন তা ঠিক আছে।

পঞ্চম প্রমাণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً–١/١٢٩)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বললেন, সবাই আছরের নামায পড়বে বনী কুরাইয-

য় গিয়ে। পথিমধ্যে কারো কারো আছরের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। কেউ কেউ বললো, আমরা বনী কুরাইযায় না গিয়ে নামায পড়বো না। আবার অন্যরা বললো, আমরা বরং নামায পড়বো। আমাদের দ্বারা ওটা উদ্দেশ্য নয় (যে আমরা নামায ছেড়ে দিবো)। অতঃপর এ মতবিরোধের ঘটনা নবী কারীম স.-এর নিকট বলা হলে তিনি তাদের কাউকে তিরস্কার করলেন না। (বুখারীঃ ৮৯৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূলঃ ৬০৯৬)

শিক্ষণীয়

● এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যারা পথে আছরের নামায পড়েছে তারা প্রকাশ্যভাবে রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করেছে। যেহেতু রসূলুল্লাহ স. আছর পড়তে বলেছিলেন বনী কুরাইযায় এসে। এসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক তাদেরকে তিরস্কার না করা বা কিছুই না বলা এটাই প্রমাণ করে যে, ইজতিহাদ বা গবেষণাও শরীআতের দলীল। অন্যথায় রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ না মানার কোন অজুহাত তাদের সামনে ছিলো না। গবেষকগণের পরিভাষায় এটাকে কিয়াস বলা হয়। অতএব, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে প্রমাণিত।

● এ হাদীস থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া দোষণীয় বা অগ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কুরআন-হাদীস যখন একই, তখন তা মানতে গিয়ে উম্মত কেন বিভক্ত হবে– এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

● এ হাদীস থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, মতবিরোধপূর্ণ প্রত্যেকটি দলের দালীলিক ভিত্তি সঠিক হলে একই বিষয়ে মতবিরোধকারী সকলেই হকের উপর আছে বলে সাব্যস্ত হবে। একটি হক হলে অপরটি বাতিল হওয়া আবশ্যক নয়। যেহেতু রসূলুল্লাহ স. মতবিরোধকারী দু'দলের কাউকেই তিরস্কার করেননি।

● এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, ইজতিহাদ বা গবেষণা দ্বারা নির্ধারণকৃত আমলে যদি কুরআন-হাদীসের অনেক মৌলিক বিষয় সুরক্ষা হয় তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন একটি হাদীসের বিপরীত দেখা গেলেও ইজতিহাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া রহ. তার 'ই'লামুল মুআক্কিঈন' নামক কিতাবে হযরত আমর ইবনুল আছ এবং ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীস দুটি দ্বারা কিয়াসের দলীল পেশ করেছেন।

ষষ্ঠ প্রমাণ

أخبرنا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَانْظُرْ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَا قَضَى بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَأَئِمَّةُ الْعَدْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِيَ فَآمِرْنِي وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ

অনুবাদ : ইমাম শা'বী রহ. বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর রা. কাজী শুরাইহকে পত্র লেখেন যে, কোন জরুরী বিষয় তোমার সামনে হাজির হলে প্রথমে কিতাবুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি সে বিষয়টি কুরআনে না থাকে তাহলে রসূলুল্লাহ স. যে ফায়সালা করেছেন তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালায় সেটা না থাকে তাহলে সৎ মানুষ ও ন্যায়নিষ্ঠ ইমামগণ যে ফায়সালা করেছেন তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি তা-ও না থাকে তাহলে তুমি স্বাধীন। চাইলে নিজে গবেষণা করতে পারো। আর চাইলে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারো। আমি মনে করি আমার সঙ্গে পরামর্শ করা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। (আল্ ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম। আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. হাফেজ ইবনে ত্বহের আল্ মাকদেসীর বরাতে এ বিষয়ে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের তুলনায় এটাকে সর্বাধিক উত্তম হাদীস বলেছেন। (আল-বদরুল মুনীর, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৪০)

শিক্ষণীয় : হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের ধারাবাহিকতায় এ হাদীসেও হযরত ওমর রা. কর্তৃক শরীআতের মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কাজী শুরাইহকে এ মূলনীতি লিখে পাঠান। এ মূলনীতিতেও শরীআতের দলীলের ধারাবাহিকতা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে কুরআনে কারীমের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে এবং সেখানে স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাত থেকে সমাধান বের করার চেষ্টা করতে হবে। ছুন্নাত থেকেও স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত তথা ইজমার ভিত্তিতে

ফায়সালা করতে হবে। আর পূর্ববর্তী কোন দলীল দ্বারা ফায়সালা করা না গেলে কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে গবেষণা দ্বারা শরীআতের বিধান বের করতে হবে। গবেষকগণের পরিভাষায় এটাকে কিয়াস বলা হয়। হযরত ওমর রা.এর এ নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে পরিগণিত।

সপ্তম প্রমাণ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ–٢/٢٦٠)

অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট অনেকে একত্রিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে থাকলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমাদের সামনে এখন এমন সময় এসেছে যে, আমরা বিচার-ফায়সালা করতে পারি না। আর সে সক্ষমতাও নেই। তোমরা যা দেখছো এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াই আল্লাহ তাআলা তাকদীরে রেখেছিলেন। তোমাদের কারো সামনে যদি বিচারকার্য এসে পড়ে তাহলে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করবে। যদি আল্লাহর কিতাবে স্পষ্ট না থাকে তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালার ভিত্তিতে বিচার করবে। যদি আল্লাহর কিতাব এবং রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালায় স্পষ্ট না থাকে তাহলে সৎ লোকেরা যে ফায়সালা করেছেন সে মোতাবেক বিচার করবে। আর যদি আল্লাহর কিতাব, রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালা

এবং সৎ লোকদের সিদ্ধান্তের মধ্যে স্পষ্ট না থাকে তাহলে তোমার রায় অনুযায়ী গবেষণা করো। তোমাদের কেউ যেন না বলে যে, আমি আশঙ্কা করি বা আমি ভয় পাই। কেননা, হালাল ও হারাম স্পষ্ট। আর এর মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক কিছু বিষয়। অতএব, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহের বিষয় বর্জন করবে, যে পর্যন্ত তোমার সন্দেহ না কাটে। (নাসাঈ: ৫৩৯৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম নাসাঈ রহ. নিজে এ হাদীসটিকে অতি উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এটাকে সহীহ বলেছেন। (ফাতহুল বারী-৭৩০৭ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের ধারাবাহিকতায় হযরত ওমর রা. কর্তৃক কাজী শুরাইহকে শরীআতের যে মূলনীতি লিখে পাঠান, এ হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সেই একই কথার প্রতিধ্বনি করলেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-ছুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা যদি কোন সমস্যার সমাধান করা না যায় তাহলে কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে গবেষণা দ্বারা শরীআতের বিধান বের করতে হবে। গবেষকগণের পরিভাষায় এ গবেষণাকে কিয়াস বলা হয়। হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ উপদেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস শরীআতের দলীল হিসেবে পরিগণিত। খতীবে বাগদাদী রহ. তাঁর লিখিত 'আল্ ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' নামক কিতাবে হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীস দুটি দ্বারা কিয়াসের দলীল পেশ করেছেন।

সারকথা

সারকথা, কিয়াস শরীআতের দলীল এবং তা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার্য। এ বিষয়টিকে আমরা একটু বাস্তবতার নিরীখে লক্ষ্য করতে পারি যে, কুরআন-হাদীস কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মানুষেরই জীবন বিধান। যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজে তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন : **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ** "আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে"। (ছূরা নাহল : ৮৯) সাথে সাথে তিনি রসূলুল্লাহ স.কেও নির্দেশ দিয়েছেন কুরআনের বাণী মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে। ইরশাদ হচ্ছে : **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** "আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষের জন্যে যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তাদেরকে তা বুঝিয়ে দেন।" (ছূরা নাহ্ল: ৪৪) এ আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক রসূলুল্লাহ স. তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের

মাধ্যমে উম্মতকে কুরআন বুঝিয়েছেন। অতএব, এ কথা সকলকেই বিশ্বাস করতে হবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের ধর্মীয় সমাধান দিতে কুরআ-ান-হাদীসই যথেষ্ট। এমনকি আমরা ইজমা-কিয়াসকে যে দলীল হিসেবে বিশ্বাস করি তা-ও কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে। ইবাদাত-বন্দেগীতে যেহেতু নতুন কোন বৃদ্ধির সুযোগ নেই, তাই সে বিষয়টির আলোচনা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু মুআমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন যেসব বিষয় আমাদের সামনে আসছে সেগুলোর স্পষ্ট সমাধান কুরআন-হাদীসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কুরআন-হাদীসে এর সমাধান নেই তা নয়। বরং কুরআন-হাদীসে সব সমস্যার সমাধানই বিদ্যমান রয়েছে। তবে কোন কোন সমস্যার সমাধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন সমস্যার সমাধান নীতিমালা আকারে পেশ করা হয়েছে। কারণ প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান যদি কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে দেয়া থাকতো তাহলে কুরআন-হাদীসের কলেবর আরো অনেক বৃদ্ধি পেতো। আবার রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় বহু বিষয়ের সমাধান মানুষকে বুঝানোও দুঃসাধ্য হয়ে যেতো। যেহেতু সেসব সমস্যার অস্তিত্ব তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। সেহেতু সঙ্গত কারণেই অনেক সমস্যার সমাধান নীতিমালা আকারে পেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ কর্তৃক রসূলুল্লাহ স.কে جَوَامِعُ الكَلِم-এর বৈশিষ্ট্য প্রদানও এর আরেকটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ "আমাকে বিশদ-অর্থবহ-সংক্ষিপ্ত-কথা বলার বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে”। ইমাম বুখারী রহ. এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন, وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الكَلِمِ: أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الكَثِيرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الكُتُبِ قَبْلَهُ، فِي الأَمْرِ الوَاحِدِ، وَالأَمْرَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ " “আমার নিকট পৌঁছেছে যে, جَوَامِعَ الكَلِمِ এর ব্যাখ্যা হলো: আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ স.-এর এক/দুই কথার মধ্যে এত কিছু একত্র করে দিয়েছেন, ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করতে কিতাবে লিখতে হতো বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা নিতে হতো”। (বুখারীঃ ৬৫৪১) যদি রসূলুল্লাহ স.-এর একটি কথা মন্থন করে দশটি বিধান বের করা না যায় তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর এ বৈশিষ্ট্যের সার্থকতা কোথায়? অতএব, এ কথা অনস্বীকার্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের সব সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদীসে রয়েছে। তবে কোনোটি সুস্পষ্ট আকারে, আবার কোনটি নীতিমালা আকারে সংক্ষেপে দেয়া রয়েছে যা উদঘাটন করতে অবশ্যই

গবেষণার প্রয়োজন। আর এ গবেষণার নামই কিয়াস। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহ.-এর ভাষ্য অনুযায়ী এটা সাহাবাদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তিনি তাফসীরে কাবীরে ছূরা নাহ্‌ল-এর ৪৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় কিয়াস অস্বীকারকারীদের জবাবে বলেন, ثَبَتَ جَوَازُ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ "কিয়াসের উপর আমল করা প্রমাণিত হয়েছে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা বা ঐকমত্য দ্বারা"।

তাকলীদের সংজ্ঞা

আভিধানিক সংজ্ঞা : তাকলীদের আভিধানিক অর্থ হলো হার বা মালা পরিয়ে দেয়া। এ অর্থে শব্দটি সহীহ্ বুখারীতে ব্যবহৃত হয়েছে قَلَّدْتُ هَدْيِي আমি কুরবানীর জানোয়ারের গলায় মালা পরিয়েছি। (বুখারী-১৪৭২)। আরো ব্যবহৃত হয়েছে যে, هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ আসমার হারটি হারিয়ে গেছে। (বুখারী-৪২২৮)

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীআতের পরিভাষায় তাকলীদ বলা হয় সরাসরি কুরআন-হাদীসে বিধৃত হয়নি কিংবা কুরআন-হাদীসের দলীল অকাট্য বা সুস্পষ্ট নয়, কিংবা দলীলগুলো পরস্পর বিরোধী বলে অনুমিত হয়– এমন মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য না করে এমন কোন মুজতাহিদ ইমামকে হক বিশ্বাস করে তার অনুকরণ করা যার মুজতাহিদ হওয়া শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সাথে সাথে মৌলিক ও শাখাগতভাবে তাঁর মাযহাবও সংকলিত। কেমন যেন তাকে গ্রহণের মাধ্যমে তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়া হলো।

ব্যাখ্যা : কুরআন-হাদীসের জটিল আহকাম যা জনসাধারণের জন্য বুঝা মুশকিল, তা কোন বিজ্ঞ ও শাস্ত্রীয় পারদর্শী আলেম থেকে বুঝে নিয়ে আমল করা এবং দ্বীনের পথে চলতে গেলে যেসব নতুন সমস্যা মানুষের সামনে আসে যার স্পষ্ট সমাধান কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই, এ জাতীয় সমস্যার সমাধানেও তার গবেষণার অনুকরণ করা।

তাকলীদের প্রয়োজন

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কুরআন-হাদীসের সকল বিধি-বিধান বুঝার ক্ষেত্রে এক রকম নয়। বরং কোন কোন বিধি-বিধান এত সহজ ও স্পষ্ট যা যেকোন ধরনের মামুলী শিক্ষিত মানুষও বুঝতে সক্ষম। পক্ষান্তরে কোন কোন বিধি-বিধান এত সংক্ষিপ্ত, সুক্ষ্ম ও কঠিন যা অনুধাবন করা জনসাধারণের জন্য তো বটেই, আলেমদের জন্যও

কষ্টকর। আবার এ কথাও সর্বজন স্বীকৃত যে, কুরআন-হাদীসের বিধি-বিধান বুঝার ক্ষেত্রে সকল মানুষও এক রকম নয়। বরং কোন কোন মানুষ বড় আলেম এবং কুরআন-হাদীসের পাণ্ডিত্য অর্জনে এতটা অগ্রসর যে, তাঁরা যেকোন ধরনের সুক্ষ্ণ ও কঠিন বিধি-বিধান বুঝতে সক্ষম। পক্ষান্তরে অনেক মানুষ এমনও রয়েছে যারা আলেম নয়। কুরআন-হাদী-সের বিধি-বিধান বুঝা তো দূরের কথা অনেকে কুরআন-হাদীস পড়তেও জানে না।

মানুষের মধ্যকার এ ব্যবধানের কথা আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআ-নের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যারা গবেষক তারা বুঝতো। (ছূরা নিছা-৮৩) এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সকল মানুষ এক রকম নয়; বরং তাদের মধ্যে কেউ গবেষক আবার কেউ গবেষক নয়। আর গবেষকরা এমন জিনিস বুঝে যা অন্যরা বুঝে না। সুতরাং এ আয়াতের ভাষ্যমতে মানুষের মধ্যে বুঝের ব্যবধান রয়েছে। অনুরূপ আয়াত কুরআনে আরো অনেক জায়গায় রয়েছে যার কোনটা থেকে স্পষ্ট আবার কোনটা থেকে ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, কুরআন-হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান নয়; বরং তাদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ আপনি বলুন- যারা আলেম, আর যারা আলেম নয়, তারা কি সমান হতে পারে? (ছূরা ঝুমার-৯) এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, যারা আলেম, আর যারা আলেম নয় তারা সমান নয়; বরং তাদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। মর্যাদারও ব্যবধান রয়েছে, দায়িত্বেরও ব্যবধান রয়েছে, বুঝ-এরও ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং সকলের জন্য কুরআন-হাদীসের উপর আমল করার পদ্ধতি হলো- গবেষক ইমাম ও আলেমগণ কুরআন-হাদীসের অতি সংক্ষিপ্ত, সুক্ষ্ণ ও কঠিন বিধি-বিধানগুলো গবেষণার মাধ্যমে বের করবেন আর সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ আলেমগণ ঐ সকল গবেষণালব্ধ বিধি-বিধানের উপর আমল করবে। এরই নাম তাকলীদ করা বা মাযহাব মানা। মুজতাহিদ তথা গবেষক ইমাম ব্যতীত সব ধরনের মানুষের জন্যই এটা অনুসরণ করা আবশ্যক। এটা বর্জন করলে সাধারণ মানুষ কুরআন-হাদীসের সংক্ষিপ্ত, সুক্ষ্ণ ও কঠিন বিধি-বিধানগুলোর উপর আমল করতে সক্ষম হবে না। অথবা নিজের বুঝ অনুযায়ী এমন আমল করবে যা কুরআন-ছুন্নাহসম্মত

হবে না। এ কারণেই গবেষণাকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং গবেষণালব্ধ বিধি-বিধানগুলোকে শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. হযরত মুআয রা.কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তোমার সামনে কোন বিচার এলে তুমি কীভাবে তার সমাধান করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবে যা আছে আমি সে অনুযায়ী ফায়সালা করবো। রসূলুল্লাহ স. পুনরায় বললেন, যদি তুমি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও? হযরত মুআয রা. বললেন, তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করবো। তিনি আবার বললেন, যদি তুমি রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাতেও না পাও? হযরত মুআয রা. বললেন, তাহলে আমি আমার বিবেচনা দ্বারা গবেষণা করবো। আর এ ব্যাপারে আমি চেষ্টায় কোন ত্রুটি করবো না। হযরত মুআয রা. বলেন, এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ স. আমার সিনা চাপড়ে ইরশাদ করলেনঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর রসূলের প্রেরিত দূতকে এমন তাওফীক দিয়েছেন, যে ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট। (মুসনাদে আহমদঃ ২২০০৭, আবূ দাউদঃ ৩৫৫৩ ও ৩৫৫৪, তিরমিযীঃ ১৩৩১ ও ১৩৩২)

এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল স. গবেষণাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং গবেষণালব্ধ বিধি-বিধানগুলোকে দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখুন "শরীআতের দলীল চারটি" নামক মূল শিরোনামের অধিনে বর্ণিত "চতুর্থ দলীলঃ ইজতিহাদ" নামক উপ-শিরোনামে।

আর কুরআন-হাদীসের বিধি-বিধানগুলো বুঝার ক্ষেত্রে সহজ ও স্পষ্ট হওয়া বা সংক্ষিপ্ত, সুক্ষ্ম ও কঠিন হওয়ার বিষয়টি নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে। যেসকল বিধি-বিধানগুলো সহজ ও স্পষ্ট যা যেকোন ধরনের মামুলী শিক্ষিত মানুষও বুঝতে সক্ষম তার উদাহরণ হিসেবে আগত আয়াতটি পেশ করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক সম্মানী সেই ব্যক্তি যে সর্বাধিক পরহেজগার"। (ছূরা হুজুরাতঃ ১৩) উল্লিখিত আয়াতে কোন ধরনের অস্পষ্টতাও নেই। আর অন্য কোন আয়াতের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে এর কোন বৈপরীত্যও দেখা যায় না। তাই এটা বুঝতে কারো কোন গবেষণার প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ স. এর বাণী صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো তোমরা সেভাবে নামায

পড়ো। (বুখারী: ৬০৩) এ হাদীস দ্বারা প্রত্যেকেই এ কথা বুঝতে সক্ষম যে, নামাযের পদ্ধতির ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স.ই একমাত্র অনুকরণীয়। তিনি যেভাবে নামায পড়তেন সেভাবে নামায পড়াই আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়।

এর বিপরীতে কুরআন-হাদীসের অনেক বিধি-বিধান এমনও রয়েছে যা অনুধাবন করা জনসাধারণের জন্য তো বটেই বরং বড় আলেমদের জন্যও কষ্টকর। অবশ্য এই জটিলতার কারণ বিভিন্ন হতে পারে।

এক. কুরআন-হাদীসে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা পরস্পরবিরোধী একাধিক অর্থসম্বলিত। যেমন- মহিলাদের ইদ্দত পালনের হিসাব রক্ষা করা ঋতুস্রাব দ্বারা হবে, নাকি দুই ঋতুস্রাবের মাঝের পবিত্রতা দ্বারা হবে? এ বিষয়ে অবতীর্ণ ছূরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা قروء শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা উপরিউক্ত দুটি অর্থকেই সমান-ভাবে বুঝায়। এখন এই আয়াতে কোন্‌টি উদ্দেশ্য হবে তা নির্ধারণ করা জনসাধারণ তো দূরের কথা, বিজ্ঞ আলেম ও কুরআন-হাদীসের গবেষকদের জন্যও কষ্টসাধ্য।

দুই. কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কিছু আহকাম এত সংক্ষিপ্ত যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতীত তার স্বরূপ উদঘাটন করা কষ্টকর। অথচ আমলের জন্য অত্যাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যাখ্যা কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই। যেমন হাদীসের বাণী- نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ، قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ রসূলুল্লাহ স. মুখাবারা তথা জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশের বিনিময়ে জমি বর্গা থেকে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ : ৩৩৭২) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ হাদীসে বর্গা দেয়াকে অতি সংক্ষেপে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ রসূলুল্লাহ স. নিজে খায়বারের জমি ইয়াহুদীদের নিকট বর্গা দিয়েছিলেন। (বুখারী: ২১৮০) এখন কোন্ প্রকার বর্গা অবৈধ, আর কোন্ প্রকার বর্গা বৈধ তার কিছুই এখানে উল্লেখ নেই। যে কারণে সাধারণ মানুষের জন্য এটা বুঝা বেশ কষ্টকর। অথচ এটা অনেকের জন্যই জরুরী।

তিন. আল্লাহ তাআলা ও তার প্রেরিত রসূলের কথা প্রকৃতপক্ষে

পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। কেননা প্রকৃত অর্থে পরস্পর বিরোধী হওয়া অজ্ঞতার নিদর্শন, আর আল্লাহ তাআলা এ থেকে একেবারেই পবিত্র। আর রসূলুল্লাহ স. আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় তাঁর থেকেও এটা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু নাসেখ-মানছূখ সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান না থাকা বা কোন্ হাদীস পূর্বের আর কোন্‌টি পরের তার তারিখ উল্লেখ না থাকা অথবা কোন্ ক্ষেত্রে এ বিধান আর কোন্ ক্ষেত্রে অন্য বিধান প্রযোজ্য হবে তা উল্লেখ না থাকা ইত্যাদি কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা দেখতে পাই। সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচুর গবেষণার ফলে তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হতে পারে যে, কোন বিধানটি গ্রহণীয় আর কোন বিধানটি বর্জনীয় অথবা উভয় বিধানের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হলে সমন্বয় করে আমল করা। এ জাতীয় সুক্ষ্ম বিষয়ের মূল রহস্য উদঘাটন করা যেকোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ আমল করতে হবে সকলকেই। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যেতে পারে। যেমন নামাযের শুরুতে একবার হাত উত্তোলন করা আর বারবার হাত উত্তোলন করা সম্পর্কিত দুই ধরনের সহীহ হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা। নিঃসন্দেহে রসূল স. দুটি আমল এক সাথে করেননি; আর তা সম্ভবও নয়। বরং একটি এক সময়ে করেছেন আর অপরটি অন্য সময়ে করেছেন। কিন্তু সময় ও তারিখ বর্ণিত না হওয়ার কারণে আমাদের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, উল্লিখিত দুই ধরনের সহীহ হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা রয়েছে। এখন এ দুই ধরনের সহীহ হাদীসের কোন্‌টিকে আমলের জন্য প্রাধান্য দেয়া হবে তা নির্ধারণ করা মুজতাহিদ ও পারদর্শী আলেমগণ মুসলিম জনসাধণের দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

চার. দলীলের সূক্ষ্মতা সকলের নিকট বোধগম্য না হওয়া। যেমন হযরত উম্মে ইয়া'কূব রা.-এর নিকট যখন সংবাদ পৌঁছালো যে, ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে লা'নত করেছেন যারা শরীরে উল্কি আঁকে, যার শরীরে উল্কি আঁকা হয়, যে মুখের পশম উপড়ে ফেলে, যে সৌন্দর্যের জন্যে দাঁত কেটে ফাঁকা করে এবং ঐ ব্যক্তিকে লা'নত করেছেন যে আল্লাহ প্রদত্ত আকৃতিকে বিকৃত করে। এ বিষয়ে হযরত উম্মে ইয়া'কূব রা. ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট জানতে

চাইলে তিনি বলেন, রসূল স. যাদেরকে লা'নত করেছেন এবং যাদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কিতাবে উল্লেখ আছে আমি কেন তাদেরকে লা'নত করবো না? এ কথার প্রেক্ষিতে হযরত উম্মে ইয়া'কূব রা. বলেন, কুরআনের দুই মলাটের মাঝে যা আছে আমি সব পড়েছি তাতে আপনার এ বিষয় বর্ণিত নেই। এর জবাবে হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তুমি যদি সত্যিই পড়তে তাহলে অবশ্যই পেতে। তুমি কি পড়োনি? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ؟ قَالَتْ: بَلَى রসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসছেন সেটাকে আঁকড়ে ধরো। আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো? উম্মে ইয়া'কূব রা. বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বললেন, রসূল স.ই এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ রসূল স.-এর নিষেধই আল্লাহর নিষেধ। আর তাঁর লা'নতই আল্লাহর না'নত। (বুখারী-৪৫২১) এ হাদীসের বর্ণনার প্রতি লক্ষ করুন! ইবনে মাসউদ রা.-এর দৃষ্টিতে উপরিউক্ত অন্যায়ের কথা কুরআনে আছে। অথচ উম্মে ইয়া'কূব তা খুঁজে পাননি। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ যখন তাঁ খোঁজার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন তখন তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, হ্যাঁ এ বিষয়টি কুরআনে আছে। তাহলে বুঝা গেলো কুরআনে থাকলেই তা সকলের বোধগম্য হবে এটা আবশ্যক নয়। অথচ আমল তো সকলকেই করতে হবে।

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আশা করি এ কথা সবার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআন-হাদীসের কিছু আহকাম এত সহজ ও স্পষ্ট যা মামুলী শিক্ষিত মানুষও বুঝতে সক্ষম। আবার কিছু আহকাম এমন সুক্ষ্ম যা বিজ্ঞ গবেষক আলেম ছাড়া জনসাধারণের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত বিধি-বিধানের এ সকল প্রকারভেদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা খতীবে বাগদাদী রহ. বলেন, শরঈ বিধি-বিধান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো ঐ শ্রেণীর বিধি-বিধান যার দ্বীনে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভূক্ত হওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রমাযান মাসের রোযা ও হজ্জ ফরয হওয়া এবং ব্যাভিচার ও মদ পান করা হারাম হওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের সুস্পষ্ট বিধি-বিধানের মধ্যে তাকলীদ করা জায়েয নেই। কেননা এগুলো সকলেই সমানভাবে বুঝে এবং জানে। তাই এখানে তাকলীদ করার কোন অর্থ হয় না। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো ঐ শ্রেণীর বিধি-বিধান যার রসূলুল্লাহ স. থেকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা

স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় না বরং দলীল ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে হয়। যেমনঃ ইবাদাত, মুআমালাত (লেনদেন) এবং বিবাহ-শাদী ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ اِسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "তোমাদের জানা না থাকলে বিজ্ঞজনদের থেকে জেনে নাও" (ছূরা নাহলঃ ৪৩)-এর ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় যে, তাকলীদের অবকাশ রয়েছে এমন ক্ষেত্র এটাই। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

পূর্বোক্ত আলোচনা এবং আল্লামা খতীবে বাগদাদী রহ.-এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হলো যে, যেসব বিধান এত কঠিন যা প্রত্যেকে বুঝতে সক্ষম নয় সেসব বিধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম নিজেরা অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে তার পদ্ধতি বুঝে আমল করবে। কিন্তু সাধারণ জনতা হয়তো নিজেরা যা বুঝবে তাই মানবে। অথবা উম্মতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত চারটি মাযহাবের যে কোন এক মাযহাবের ইমামের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করবে। উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতির মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতির উপর আমল করাই পূর্ণ সতর্কতা আর এর নামই তাকলীদ। অর্থাৎ কুরআন-ছুন্নাহর কোন বিধান নিজে বুঝতে অক্ষম হলে এমন ব্যক্তির সমাধানকৃত সিদ্ধান্ত দলীল চাওয়া ছাড়া মেনে নেয়া এবং তদনুযায়ী চলা যার মুজতাহিদ হওয়া শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অজ্ঞ ও মূর্খদের মনগড়া ব্যাখ্যা এবং মনগড়া আমল থেকে দ্বীনকে রক্ষা করার এটাই নিরাপদ পদ্ধতি।

সুতরাং জনসাধারণের জন্য কুরআন-ছুন্নাহ'র যাবতীয় বিধি-বিধান পূর্ণভাবে এবং নিরাপদে পালন করার একমাত্র মাধ্যম হলো তাকলীদ। ধর্মীয় দৃষ্টিতে এর প্রয়োজন অপরিসীম।

উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সহজ কথা নয়; বরং শুধু কুরআনের তাফসীরে পারদর্শী হওয়ার জন্য পনেরোটি বিষয়ের শাস্ত্রীয় ইল্‌মের প্রয়েজনীয়তার কথা বিজ্ঞ আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। (আল ইতকান ৪৬৪/২, দারুল হাদীস কায়রো হতে প্রকাশিত)

তাকলীদ করা ভ্রান্তি নয় বরং ভ্রান্তি থেকে রক্ষার উপায়

পূর্বের আলোচনা থেকে আশা করি এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআন-হাদীসের সকল বিধি-বিধান এক রকম নয়। বরং কিছু বিধি-বিধান অতি সহজ যা সকল শ্রেণীর মানুষ বুঝতে সক্ষম। আবার কিছু বিধি-বিধান এত সুক্ষ্ম যা কুরআন-ছুন্নায় পারদর্শী গবেষক ইমাম ব্যতীত সাধারণ মানুষ

এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ আলেমরাও বুঝতে সক্ষম হন না। এ জাতীয় সুক্ষ্ম বিধি-বিধান বুঝা এবং আমল করার ক্ষেত্রে কোন একজন গবেষক ইমামের তাকলীদ এ কারণে করা হয় যাতে কুরআন-ছুন্নাহর বিধি-বিধান বুঝা ও আমল করার ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ভ্রান্তি বা পদস্খলন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অতএব তাকলীদ বা মাযহাব মানা ভ্রান্তি নয় বরং ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হলো-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ1/20–)

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তর থেকে ইল্‌ম ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে দ্বীনী ইলম উঠিয়ে নিবেন না। বরং ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন উলামায়ে কিরামকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। এক পর্যায়ে যখন তিনি আর কোন আলেমকে অবশিষ্ট রাখবেন না তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নেতা বানিয়ে নিবে এবং তাদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে। তারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হবে অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করবে। (বুখারী: ১০১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষণীয়:

এক. উম্মত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত (ক) সাধারণ মানুষ যারা অন্যদের থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে আমল করে। (খ) ঐ সকল মানুষ যারা অন্যদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দেয়। এ দুই শ্রেণির লোকের মধ্যে সাধারণ জনতার প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ রয়েছে অযোগ্য লোকের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস না করে বরং বিজ্ঞ আলেমের থেকে মাসআলা জেনে নিবে। যেন অযোগ্য লোকের ভুল মাসআলা তাকে গোমরাহ (বিভ্রান্ত) করতে না পারে। আর ফতওয়া প্রদানকারীগণের প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ হলো: কুরআন-হাদীসের সম্যক জ্ঞান অর্জন ব্যতীত যেন

কাউকে ফতওয়া প্রদান না করে। এ নিয়ম মেনে চললে উভয় শ্রেণি গোমরাহী থেকে বেঁচে যাবে। আর এটা অমান্য করলে উভয় শ্রেণিই গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

দুই. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোমরাহীর মূল কারণ হলো কুরআন-হাদীসের সম্যক জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কাউকে ফতওয়া প্রদান করা। আর এ জাতীয় অজ্ঞদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা তাদের গোমরাহীকে আরো উৎসাহিত করে।

তিন. জনসাধারণ যে সকল নেতাদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করে গোমরাহীর পথ ধরে, তারা জনসাধারণের চেয়ে কিছু বেশি জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে মূর্খ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশুদ্ধ মাসআলা বলার মতো সম্যক জ্ঞান না থাকলে তারা মৌলিকভাবে মূর্খদের দলভুক্ত। সুতরাং শুধু কুরআন-হাদীসের অনুবাদ পাঠ বা কিছু আয়াত-হাদীস মুখস্থ করাই যাদের চূড়ান্ত পুঁজি তারা যেন নিজেদেরকে ফতওয়া প্রদানের আসনে সমাসীন মনে না করে। তাহলে এটা হবে চরম মূর্খতা।

চার. অজ্ঞতার কারণে অপরের মাসআলার ভুল জবাব দেয়া যেমন গোমরাহী তেমনি অজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজের মাসআলার সমাধান নিজে করা বা করতে যাওয়া অনুরূপ গোমরাহী। উল্লিখিত গোমরাহীর দুটি কারণ থেকে বাঁচার উপায় হলো বিজ্ঞ উলামাদের সোহবতে থেকে পর্যাপ্ত ইল্‌ম শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদ হয়ে যাওয়া। তাহলে তার ইজতিহাদ বা গবেষণা গোমরাহীর কারণ হবে না বরং তা হিদায়াতের কারণ হবে। আর একান্ত যদি কেউ বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদ হতে না পারে তাহলে গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট থেকে ফতওয়া নিয়ে সে অনুযায়ী চলা।

হাদীসের ব্যাখ্যা ও শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণনা শেষে এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। রসূলুল্লাহ স. যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মানুষের নবী। তাঁর বাণীও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মানুষের পথনির্দেশক। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের মধ্যে বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদগণের জন্য গোমরাহী থেকে বাঁচার পন্থা হলো- সরাসরি কুরআন-হাদীস বুঝে তদনুযায়ী আমল করা। আর যারা সেই পর্যায়ের নয় তাদের জন্য গোমরাহী থেকে বাঁচার পন্থা হলো- বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদগণের নিকট থেকে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা জেনে তদনুযায়ী

আমল করা। কেউ যদি গোমরাহী থেকে বাঁচার উল্লিখিত পন্থা দু'টির কোনটিই অবলম্বন না করে মুজতাহিদ সেজে গবেষণার মতো দুঃসাহসী কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে নিশ্চয় সে হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক গোমরাহদের দলভুক্ত হবে। সুতরাং হিদায়াতের উপর থাকার জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদ হওয়া। অন্যথায় মুজতাহিদের থেকে জেনে নিয়ে পথ চলা। এই শেষোক্ত পদ্ধতির নামই তাকলীদ যার প্রয়োজন হাদীসের ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট। এক কথায় বলতে গেলে তাকলীদ হলো- জনসাধারণের জন্য গোমরাহী থেকে বেঁচে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং গোমরাহী থেকে নিজেকে ও জাতিকে রক্ষা করার একমাত্র মাধ্যম।

উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সহজ কথা নয়; বরং শুধু কুরআনের তাফসীরে পারদর্শী হওয়ার জন্য পনেরটি শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের কথা বিজ্ঞ আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। (আল ইতকান ৪৬৪/২, দারুল হাদীস কায়রো হতে প্রকাশিত)

তাকলীদের দলীল

প্রিয় পাঠক! তাকলীদের প্রকৃত স্বরূপ ইতিপূর্বেই আপনাদের খেদমতে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের জটিল আহকাম যা জনসাধারণের জন্য বুঝা মুশকিল তা কোন বিজ্ঞ আলেমের থেকে বুঝে নিয়ে আমল করা এবং দ্বীনের পথে চলতে গেলে যে সব নতুন সমস্যা মানুষের সামনে আসে যে গুলোর স্পষ্ট সমাধান কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই এমন সমস্যার সমাধানের জন্য কোন মুজতাহিদ আলেমের ইজতিহাদকে মেনে নেয়া। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় কোথাও সরাসরি আবার কোথাও ইঙ্গিতে এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। আপনাদের সামনে সে সকল প্রমাণাদি থেকে কিঞ্চিত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথম দলীল

তাকলীদের প্রথম দলীল হল কুরআনের একটি আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূল এবং তোমাদের দায়িত্বশীলগণের আনুগত্য কর। যদি কোন বিষয়ে মতদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ো তাহলে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে তোমরা তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পরিণামের দিক থেকে উত্তম। (ছূরা নিসা: ৫৯)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীআতের প্রথম দলীল হলো কুরআনে কারীম যেটা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দ্বারা, আর দ্বিতীয় দলীল হলো ছুন্নাহ যেটা রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর কুরআন-ছুন্নায় যদি স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া যায় তখন ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম এমন বিজ্ঞ মুজতাহিদ পর্যায়ের ফুকাহায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী। আর এরই নাম তাকলীদ।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.সহ খ্যাতনামা কিছু মুফাস্সির থেকে أُولِي الْأَمْرِ শব্দের অনুরূপ তাফসীরই হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

قَوْلُهُ : وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ يَعْنِي: أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَانِيَ دِينِهِمْ ويأمرونهم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَوْجَبَ اللهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ.

উলুল আম্‌র শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীহ, দ্বীনদার এবং আল্লাহ তাআলার সেসব অনুগত বান্দা যারা মানুষকে দ্বীনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেন। সৎ কাজের আদেশ করেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য সেসব দ্বীনদার ফকীহগণের অনুসরণ করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম: হাদীস নম্বর- ৫৫৩৪, তাফসীরে ইবনুল মুনযির: হাদীস নম্বর-১৯২৯, তাফসীরে তাবারী: হাদীস নম্বর-৯৮৬৭) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা রাগেব আসফাহানী এটাকে সহীহ বলেছেন। (তাফসীরে রাগেব)

সারকথা, আয়াতে আল্লাহ তাআলা أُولُو الْأَمْرِ তথা দায়িত্বশীলদের অনুসরণের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য কারা সে ব্যাপারে অনেক মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম থেকে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর মতামত বর্ণনা করা হয়েছে যে, أُولُو الْأَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে এমন উলামায়ে কিরাম। أُولِي الْأَمْرِ শব্দের অনুরূপ অর্থ বা এর কাছাকাছি অর্থ আরো বর্ণিত হয়েছে

হযরত হাসান বসরী ও আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. থেকে সহীহ সনদে তাফসীরে সাঈদ ইবনে মানসূর ৬৫৪ ও ৬৫৫ নম্বর হাদীসে, হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে সহীহ সনদে তাফসীরে আব্দুর রাযযাক-৬১০ নম্বর হাদীস, হযরত জাবের রা. থেকে হাসান সনদে ইবনে আবী শাইবা-৩৩২০০ নং হাদীসে এবং হযরত আবুল আলিয়া রহ. থেকে হাসান সনদে ইবনে আবী শাইবা-৩৩২০২ নং হাদীসে। এ সকল তাফসীর অনুযায়ী এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সূক্ষ্ম বিধি-বিধানগুলোর ক্ষেত্রে মুজতাহিদ উলামায়ে কিরামের নিকট থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমল করতে হবে। আর এরই নাম তাকলীদ। তাকলীদ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বাদ দিয়ে ভিন্ন কারো কথা মানা নয়; বরং দ্বীনের উপর সঠিকভাবে চলার জন্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেমদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা মাত্র। কুরআন-হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত ধর্মীয় বিষয়ে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গোমরাহীর কারণ হবে যা 'তাকলীদের প্রয়োজন' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দলীল

তাকলীদের দ্বিতীয় দলীল হল কুরআনের একটি আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অনুবাদ : সমস্ত মুমিন যেন অভিযানে বেরিয়ে না পড়ে। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ দ্বীন শিক্ষার জন্য কেন বের হলো না? যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ শেষে ফিরে এসে স্বজাতিকে সতর্ক করবে যেন তারা বাঁচতে পারে। (ছূরা তাওবা: ১২২)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা দু'শ্রেণীর মানুষের কথা আলোচনা করেছেন। এক. সেসব মানুষ যারা ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করে ইল্‌ম শিক্ষার কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হবে। দুই. সেসব মানুষ যারা নিজ এলাকায় থেকে দ্বীনের অন্যান্য কাজ করবে। প্রথম শ্রেণির মানুষের দায়িত্ব দু'টি। (ক) ধর্মীয় জ্ঞানে এরূপ পাণ্ডিত্য অর্জন ও গভীরে পৌঁছানো যাতে প্রয়োজনে কুরআন-হাদীসের উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান করে সূক্ষ্ম ও সুপ্ত বিধি-বিধান বের করা যায়;

আর এটাই تَفَقُّه শব্দের মূল অর্থ। (খ) দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো ইল্ম শিক্ষা শেষ করে এলাকায় ফিরে এসে এলাকাবাসীকে দ্বীনী ইল্ম অনুযায়ী চলার ব্যাপারে সতর্ক করা। আর দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের দায়িত্ব একটি। তা হলো উক্ত ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিগণ কুরআন-ছুন্নাহর আলোকে যা বলেন তা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে গুনাহ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখা।

তাকলীদ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বাদ দিয়ে ভিন্ন কারো কথা মানা নয়

অনেকে ভুল ধারণার শিকার যে, তাকলীদ বুঝি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বাদ দিয়ে ভিন্ন কারো কথা মানার নাম। অথচ বিষয়টি তা নয়। পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী উলামায়ে কিরামের কথা মেনে চলার যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এরই নাম তাকলীদ। তাকলীদ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বাদ দিয়ে ভিন্ন কারো কথা মানা নয়; বরং দ্বীনের উপর সঠিকভাবে চলার জন্য কুরআন-হাদীসের অস্পষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেমদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা মাত্র। কুরআন-হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত ধর্মীয় বিষয়ে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গোমরাহীর কারণ হবে যা 'তাকলীদের প্রয়োজন' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা এলাকাবাসীদেরকে ইল্ম অর্জনকারী সেই দলের কথা মেনে নেয়া আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর এ অর্থেই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষের তা'লীম দ্বারা অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। (তাফসীরে কাবীর)

প্রত্যেকেই কি সরাসরি কুরআন হাদীছ থেকে সমাধান বের করার দায়িত্বশীল?

ইমাম বাগাবী রহ. বলেন, ইল্মে ফিকহ হলো দ্বীনের বিধি-বিধান জানার নাম। এটা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ফরযে আইন আর ফরযে কিফায়া। ফরযে আইন যেমন পবিত্রতা, নামায, রোযা ইত্যাদি। প্রত্যেক দায়িত্বশীলের জন্য জরুরী এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। আর ফরযে কিফায়া হলো এ পরিমাণ ইল্ম শিক্ষা করা যে, ইজতিহাদের অবস্থানে পৌঁছে যায় এবং প্রত্যেক মানুষের চাহিদা মোতাবেক ফতওয়া প্রদানে

সক্ষম হয়। কোন শহরবাসী যদি এ শিক্ষা বর্জন করে তাহলে সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আর প্রত্যেক শহর থেকে যদি কমপক্ষে একজন এ দায়িত্ব পালন করে তাহলে সবার থেকে ফরযের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আর সকলের দায়িত্ব হবে নতুন যে কোন সমস্যায় তাদের তাকলীদ করা। (তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল) অনুরূপ মন্তব্য তাফসীরে মাযহারীতেও বর্ণিত হয়েছে।

তাকলীদ বিরোধীদের কথা মোতাবেক প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদীস থেকে বের করার দায়িত্বশীল হলে তা যেমন হতো অসম্ভব তেমন সমাজ থেকে কিছু মানুষকে ইল্‌ম শিখতে বলার নির্দেশটি হতো লক্ষ্যভ্রষ্ট। কারণ, কুরআন-হাদীস অনুযায়ী সঠিকভাবে চলা জন্য ইল্‌ম শিখতে হবে তো সবাইকেই।

তৃতীয় দলীল

তাকলীদের তৃতীয় দলীল হল কুরআনের আরেকটি আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : আমি আপনার পূর্বেও অহীসহ পুরুষদেরকে প্রেরণ করেছি-লাম। তোমাদের জানা না থাকলে বিজ্ঞজনদের থেকে জেনে নাও। (ছূরা নাহ্‌ল : ৪৩)

আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : কুরআনে উল্লিখিত এ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, তবুও জিজ্ঞেসের নির্দেশ সম্বলিত **فَاسْأَلُوا** শব্দটির ভাষা ব্যাপক হওয়ায় ধর্মীয় সব বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা বিজ্ঞজনদের নিকট থেকে জেনে নিবে। আর অজ্ঞদের জন্য বিজ্ঞদের কথা মান্য করা আবশ্যক হবে। এরই নাম তাকলীদ। আর এ মান্য করার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ খুবই স্পষ্ট। অতএব, কুরআন-হাদীসের আহকামের ব্যাপারে যাদের পরিপূর্ণ ও অগাধ পাণ্ডিত্য আছে তারা হলেন **أَهْلَ الذِّكْرِ** বা বিজ্ঞজন। তাই অন্যকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই। কিন্তু যদি কেউ কুরআন-হাদীসের আহকাম বুঝার ব্যাপারে এরূপ পারদর্শী না হয় তাহলে সে **لَا تَعْلَمُونَ** তথা অজ্ঞদের শ্রেণিভুক্ত। আল্লাহ তাআলার

নির্দেশ মোতাবেক তাদের দায়িত্ব হলো জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করা। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাজী বাইযাবী রহ. বলেন, "এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অজানা বিষয়ে উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী"। (তাফসীরে বাইযাবী) আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. বলেন, "এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মূর্খ লোকদের জন্য অজানা বিষয়ে উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। (তাফসীরে মাযহারী) উল্লিখিত আয়াতের এ ব্যাখ্যা আল্লামা খতীবে বাগদাদী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল্লামা মাহমুদ আলূসীসহ অনেক প্রখ্যাত আলেম ও মুফাসসির থেকে বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াতের অর্থ এবং খ্যাতনামা মুফাসসিরগণের তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় যেসব বিষয়ে যাদের জানা নেই তাদের জানার পদ্ধতি হলো- ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী অভিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নেয়া; আর এরই নাম তাকলীদ। এটা দ্বীনের উপর সঠিক-ভাবে চলার মাধ্যম। নিজের অজ্ঞতা সত্ত্বেও অভিজ্ঞ আলেমদের থেকে জানা ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গোমরাহীর কারণ যা 'তাকলীদের প্রয়োজন' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ দলীল

তাকলীদের চতুর্থ দলীল হল নিম্নের হাদীছ।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً، أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلاَمٌ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ (رَوَاه إِبْنُ مَاجَه فِيْ بَابِ الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ...-١/٤٣)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স.-এর যামানায় এক ব্যক্তির মাথায় আঘাত লাগলো। অতঃপর তাঁর স্বপ্নদোষ হলো। (সাথীদের তরফ থেকে) তাঁকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হলো এবং তিনি গোসল করলেন। অতঃপর সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা

করেছে অর্থাৎ গোসলের নির্দেশ দানকারী সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। অজ্ঞতার চিকিৎসা কি জিজ্ঞেস করা নয়? (ইবনে মাযা: ৫৭২, আবূ দাউদ: ৩৩৬) আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁদের জন্য বদ দুআ করে বললেন, তারা যখন জানে না, তখন কেন জিজ্ঞেস করলো না? অজ্ঞতাজনিত অক্ষমতার আরোগ্য তো জিজ্ঞেস করায়।

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসটি মুসতাদরাকে হাকেমেও বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসের তাহকীকে ইমাম ঐাহাবী রহ. বলেন, **على شرطهما** "হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ"। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৬৩০) আর ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এটাকে হাসান বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ এবং দারেমীতে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৫২৯৫)

হাদীছের শিক্ষা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তত্ত্ব তালাশ না করে শরীআতের মাসআলার সমাধান দেয়া চরম অপরাধ। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমনকি সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ স.-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও এহেন কাজের জন্য তাদেরকে কঠিন বদ দোয়া দিয়েছেন। এরপর যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইরশাদ করেছেন তা এই যে, অজ্ঞতার চিকিৎসা কি জিজ্ঞেস করা নয়? আর এটাই তাকলীদের হাকীকত। জনসাধারণ শরীআতের যে সব বিষয় জানে না সে ব্যাপারে নিজে মুজতাহিদ না সেজে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে আমল করবে। "আমি যা বুঝেছি তাই করেছি" এ জাতীয় কোন ওযর শরীআতে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যথায় রসূলুল্লাহ স. সাহবায়ে কিরামকে এভাবে ভর্ৎসনা করতেন না।

যদি কেউ বলে যে, যেহেতু উল্লিখিত হাদীসের ঘটনা রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের ঘটনা তাই সেখানে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট জিজ্ঞেস করার কথা বলা হয়েছে। আর রসূলুল্লাহ স. নিজে ছিলেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে শরীয়াতের বিধান প্রণেতা। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করা আর আপনাদের তাকলীদ করা তো আর এক কথা নয়।

জবাবে বলা যায় যে, ঘটনাটি রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের হলেও তা ঘটেছিলো সফররত অবস্থায়। আর সেখান থেকে মদীনায় ফিরে এসে মাসআলা জিজ্ঞেস করার মতো অবস্থাও ছিলো না। বরং নামাযের সময় শেষ হওয়ার আগে আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, গোসল করে নামায পড়বে নাকি তায়াম্মুম করবে? সুতরাং উল্লিখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ স. যাদের কাছে জিজ্ঞেস করার কথা বলেছেন তারা অবশ্যই উক্ত লোকটির সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে বিজ্ঞজন হবেন। তাহলে বুঝা গেলো শরীআতের অজানা বিষয়ে নবী-রসূলগণের অবর্তমানে অন্য বিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করার প্রতিই ছিলো রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ। আর এটাই সরাসরি তাকলীদ।

পঞ্চম দলীল

তাকলীদের পঞ্চম দলীল হল নিম্নের হাদীছ।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الكَافِرُ أَوِ المُنَافِقُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ "

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. ইরশাদ করেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছে ফেলে রেখে তার সাথীগণ এতটুকু দূরে যায় যে, এখনও সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। ইত্যবসরে দুজন ফেরেশতা হাজির হয় এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে- এই ব্যক্তি তথা মুহাম্মাদ স.-এর ব্যাপারে তুমি কী বলো? জবাবে সে বলে, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তখন তাকে বলা হয় তুমি তোমার জাহান্নামের ঠিকানা দেখো। আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে তোমাকে জান্নাতের ঠিকানা দান করেছেন। রসূল স. বলেন, তখন মৃত ব্যক্তি তার উভয় ঠিকানাই দেখবে। আর কাফের বা মুনাফিক

ব্যক্তি ফেরেশতাদের জবাবে বলবে, আমি জানি না; লোকে যা বলতো আমি তাই বলতাম। এ কথার পরে তাকে বলা হবে- তুমি না নিজে জেনেছো আর না অন্যের অনুকরণ করেছো। (বুখারী-১২৫৭)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যবহৃত لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন, (لَا دَرَيْتَ) ، أَيْ: لَا عَلِمْتَ مَا هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ (وَلَا تَلَيْتَ) أَيْ: لَا تَبِعْتَ النَّاجِينَ يَعْنِي مَا وَقَعَ مِنْكَ التَّحْقِيقُ وَالتَّسْدِيدُ وَلَا صَدَرَ مِنْكَ الْمُتَابَعَةُ وَالتَّقْلِيدُ তুমি সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ বিষয়টি জানোনি এবং নাজাত প্রাপ্তদেরকেও অনুসরণ করোনি। অর্থাৎ তুমি নিজে যাচাই-বাছাই করোনি আর অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুসরণ এবং তাকলীদও করোনি। (মেরকাত : অধ্যায়- কবর আজাব প্রমাণ করা)

মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্নের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদ্বয়ের মন্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায় যে, নাজাত পাওয়ার জন্য কুরআন-হাদীস নিজে বুঝে তদনুযায়ী আমল করতে হয়। অথবা বুঝমান ব্যক্তিদের অনুসরণ ও তাকলীদ করতে হয়। উল্লিখিত পদ্ধতি দুটির মধ্যে প্রথম পদ্ধতি কেবল কুরআন-ছুন্নায় অভিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেমই গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অসংখ্য ও অগণিত জনসাধারণের মুক্তির পথ কেবল দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই হতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এরই নাম তাকলীদ।

তাকলীদ বিষয়ক একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা

রসূলুল্লাহ স.-এর তেইশ বছর নবুওয়াতী জীবনে ইসলামের বিধি-বিধানে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিধানের ব্যাখ্যা এসেছে, বিধান পালনের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আবার খাছ বা বিশেষ বিধান ব্যাপক হয়েছে। কোন বিধান স্পষ্টভাবে আবার কোন বিধান ইঙ্গিতে রহিত হয়েছে, কোন কোনটির একাধিকবারও পরিবর্তন হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রহিত ও রহিতকারী উভয় শ্রেণীর বিধানই কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন মদের নিষেধাজ্ঞার বিধান, কিবলা পরিবর্তনের বিধান, আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে অযু করার বিধান, নামাযে কথা বলা এবং সালাম দেয়ার বিধান ইত্যাদি। কুরআনের আয়াত থেকে এ জাতীয় বিধি-বিধান খুঁজে পাওয়া তুলনামূলক কিছুটা সহজ হলেও হাদীসের কিতাব থেকে তা খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন। গবেষক ইমামগণও মাঝে মধ্যে এ কাজে হিমশিম খেয়ে যান। তাহলে কুরআন-হাদীসের ব্যাপারে যার পাণ্ডিত্য নেই, সে নিজে হাদীস-কুরআনের অনুবাদ দেখে আমল করতে

চাইলে এ নিশ্চয়তা কোথা থেকে পাবে যে, তার আমলটি কোন রহিত আয়াত বা হাদীসের উপর হচ্ছে না? কিংবা এমন আয়াত বা হাদীসের উপর হচ্ছে না যার উপর আমল করার বৈধতা এখন আর নেই? বা এমন বিধান পরিত্যাগ করা হচ্ছে না যা ইতিমধ্যে আবশ্যক সাব্যস্ত হয়েছে। তাহলে জান্নাত/জাহান্নামের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে দ্বীনের ব্যাপারে এত বড় অসতর্ক পন্থা গ্রহণ কীভাবে অনুমোদিত হতে পারে? হযরত আলী রা. থেকে একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈক কাজী বা বিচারপতিকে লক্ষ্য করে বলেন. হে কাজী! তুমি নাছেখ-মানছূখ (রহিত এবং রহিতকারী বিধান) সম্পর্কে জ্ঞান রাখো? তিনি বললেন, না; আমি তা বুঝি না। হযরত আলী রা. তাকে বললেন, তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছো এবং অন্যদেরকেও ধ্বংস করেছো। (আল্ মাদখাল লিলবায়হাকী-১৮৪)

সুতরাং কুরআন-হাদীসের উপর আমল করার নিরাপদ পন্থা এটাই যে, কুরআন-হাদীসে পারদর্শী গবেষক ইমামগণের কারো থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা এবং নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। এরই নাম তাকলীদ।

তাকলীদে শখছী তথা একই মাযহাবের অনুকরণের প্রয়োজন

তাকলীদের প্রয়োজন শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান এবং গবেষণার যোগ্যতা দান করেছেন তারা সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে জীবন চলার পথের সব সমস্যার সমাধান বের করবেন। আর যারা সেই পর্যায়ের জ্ঞান রাখে না তাদেরকে ভ্রান্তিমুক্ত থাকতে এবং সঠিকভাবে কুরআন-হাদীসের বিধান পালন করতে কোন গবেষক ইমামের অধীনে চলতে হবে এবং তাঁর দেয়া ব্যাখ্যা মানতে হবে। নির্দিষ্ট কোন একটি মাযহাবের তাকলীদ না করে বিভিন্ন মাসআলায় বিভিন্ন মাযহাবের তাকলীদ করতে চাইলে তা اِتِّبَاع هَوٰى বা মন চাহি অনুকরণের কারণে অবৈধ সাব্যস্ত হবে। দ্বীনের ফায়দা সামনে রেখে দলীলের দৃঢ়তা অনুধাবন করা এবং বিভিন্ন মুজতাহিদের দলীলের মধ্যে তুলনামূলক প্রাধান্য বিবেচনা করা কেবল মুজতাহিদ বা গবেষকের বৈশিষ্ট্য। মুকাল্লিদগণের মাঝে সাধারণত এটা পাওয়া যায় না। একান্ত কারো মধ্যে এ যোগ্যতা মোটামুটি বিদ্যমান থাকলে তিনি কোন মুজতাহিদের মৌলিক নীতিমালার অনুসরণ করে শাখাগত মাসআলার প্রাধান্য নিরূপণে প্রসংশনীয় ভূমিকা পালন করতে

পারেন। দলীলের সুক্ষ্মতা বিশ্লেষণ করে কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে পারেন। যেমন করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম নববী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনু আব্দিল বার ও ইবনে কুদামা মাকদেসী রহ.সহ গবেষক মুকাল্লিদগণ। তাঁদের মতো সর্বশাস্ত্রে অথৈ সমুদ্র না হয়ে একেক মাসআলায় একেক ইমামের অনুসরণকে اِتِّبَاعِ هَوَى বা মন চাহি অনুকরণ ব্যতীত আর কী-ই বা বলা যেতে পারে। কেননা প্রত্যেক ইমামের গবেষণার নীতিমালায় স্বাতন্ত্র রয়েছে। যেমন শরীআতে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নীতিমালা হলো احتياط। তথা সতর্কতা অবলম্বন করা। এ কারণে তিনি উরু ঢেকে রাখা আবশ্যক হওয়া ও না হওয়া দু'ধরনের হাদীসের মধ্যে ঢেকে রাখা আবশ্যক হওয়ার আমলকে প্রাধান্য দিয়ে উরুকে সতরের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও আহমদ রহ. উরু সতরের অন্তর্ভূক্ত না হওয়ার হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত অবকাশকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এ কারণে তিনি সফরে কসর করা আবশ্যক ঘোষণা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ রহ. সফরে কসর করা বৈধ বললেও নামায পূর্ণ করা উত্তম বলেছেন। মোটকথা প্রত্যেক ইমামের গবেষণার নীতিমালা বিভিন্ন হওয়ায় মাসআলার সমাধানেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এখন কোন ব্যক্তি হানাফী মাযহাবের অনুকরণে সফরে নামায কসর করলে এবং ইমাম আহম-াদের মাযহাব মেনে উরু খোলা রাখার সুযোগ গ্রহণ করলে দ্বীন মান্য করার নামে প্রবৃত্তির অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই হবে না। হ্যাঁ, যদি কোন ক্ষেত্রে এমন ঘটে যে, আমি যে ইমামকে অনুসরণ করে চলছি তাঁর বর্ণিত মাসআ-লার পক্ষে কোন দলীল নেই বরং এর বিপরীতে প্রকাশ্য আয়াত বা হাদীস বিদ্যমান রয়েছে সেক্ষেত্রে ঐ মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে যে সকল বিখ্যাত উলামায়ে কিরাম দলীলের সুক্ষ্মতা বুঝেন এবং কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান রাখেন তাদের দায়িত্ব হলো ইমামের মতামত ছেড়ে দিয়ে কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বিধানের দিকে ফিরে আসা। কারণ জগদ্বিখ্যাত চার ইমাম থেকেই প্রসিদ্ধ আছে যে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي "হাদীস সহীহ হলে সেটা আমার মাযহাব"। (রদ্দুল মুহতার: ১/৬৮, দারুল ফিকর-বৈরুত থেকে প্রকাশিত) যদিও চার ইমামের গবেষণায় এমন মাসআলার অস্তিত্ব তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশ্য এ কথা দ্বারা ইমামগণ যে কোন মানুষের হাতে হাদীসের গবেষণার দায়িত্ব অর্পন করছেন এবং সহীহ হাদীস পেলেই যে কাউকে মাযহাব বর্জনের অনুমতি দিচ্ছেন তা নয়। বরং এ বক্তব্যের মর্মার্থ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ أَهْلًا لِلنَّظَرِ فِي النُّصُوصِ وَمَعْرِفَةِ مُحْكَمِهَا مِنْ مَنْسُوخِهَا "এটা অস্পষ্ট নয় যে, এ বক্তব্যের সম্বোধিত ব্যক্তি হলেন এমন ব্যক্তি যিনি নুসূস তথা কুরআন হাদীসের বিষয়ে গভীর দৃষ্টিদানের ক্ষমতা রাখেন এবং এসবের মুহকাম ও মানসুখ তথা বহাল ও রহিত বিধি-বিধান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখেন অর্থাৎ মুজতাহিদ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ।"

সুতরাং অজ্ঞ বা স্বল্প জ্ঞানী কোন লোক ইমামের দলীলের বিপরীতে সহীহ হাদীস আছে বলে মাযহাবের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না। বরং এ বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামকে অবহিত করে তাঁদের থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কেননা হতে পারে মাযহাবের বিপরীতে পাওয়া ঐ হাদীসের আমল রহিত হয়ে গেছে বা অন্যান্য দলীলের কারণে হাদীসটি অপ্রবল সাব্যস্ত হয়েছে।

তাকলীদে শখ্ছী কথাটি দ্বারা কী শুধু একজনেরই অনুসরণ বুঝায়?

তাকলীদে শখছী কথাটি দ্বারা শুধু নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির অনুসরণ বুঝায় না; বরং একটি বৃহত্তর বলয়ে আবর্তিত হয়ে বিশেষ একটি ঘরানার বড় এক জামাতের অনুসরণকে তাকলীদে শখসী বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক অনুসরণ বলা হয়। আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী রহ.-এর ভাষায় **ان مذهب أبي حنيفة فقه جماعة عن جماعة**– অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফার মাযহাব কথাটির অর্থ হল (কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর ও) তাঁর ঘরানার বড় এক জামাতের বুঝ ও ব্যাখ্যা। ('হুসনুত তাকাযী ফী সীরাতিল ইমাম আবী ইউসুফ আল কাযী' পৃ. ৬০)।

অতএব, কোন একজন ইমামের গবেষণার নীতিমালা অনুকরণ করে উক্ত মাযহাবের অনুসারী বিজ্ঞ আলেম ও গবেষকগণ নিজস্ব গবেষণা দ্বারা যে সমাধান বের করেন তার অনুকরণও উক্ত মাযহাবের অনুকরণ হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং হানাফী মাযহাবের নীতিমালা অনুকরণ করে ইমাম আবু ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং তাঁদের পরবর্তী ইমামগণ গবেষণার মাধ্যমে যে সকল সমাধান দিয়েছেন তা হানাফী মাযহাব হিসেবে পরিগণিত। অনুরূপভাবে ইমাম মুঝানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম বায়হাকী এবং

তাঁদের পরবর্তী ইমামগণ শাফেঈ মাযহাবের নীতিমালা অনুকরণ করে গবেষণার মাধ্যমে যে সকল সমাধান দিয়েছেন তা শাফেঈ মাযহাব হিসেবে পরিগণিত।

তাকলীদে শখ্ছীর প্রমাণাদি

প্রিয় পাঠক! পূর্বের শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোন একজন ইমামের তাকলীদ না করে বিভিন্ন মাসআলায় বিভিন্ন ইমামের তাকলীদ করতে চাইলে তা □□□□□ □□□□□□□□□□□ বা মন চাহি অনুকরণের কারণে অবৈধ সাব্যস্ত হবে। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা বা ইঙ্গিত এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মন্তব্যে এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রমাণাদি থেকে কিছু নিম্নে পেশ করা হলো–

প্রথম প্রমাণ

বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ (وفي معجم الإسماعيلي : زيد بن ثابت يقول : لا تنفر) قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ– ٢٣٧/١)

অনুবাদ : হযরত ইকরিমা রহ. থেকে বর্ণিত, মদীনাবাসীরা হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে ঐ মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে তওয়াফে যিয়ারাতের পরে ঋতুমতী হয়ে গেছে। (এ কারণে সে বিদায়ী তওয়াফ করতে পারেনি) হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাদেরকে বললেন, সে (সে বিদায়ী তওয়াফ না করে) চলে যাবে। এর জবাবে মদীনাবাসীরা বললো, আমরা আপনার কথা শুনে যায়েদ ইবনে সাবিতের কথা পরিত্যাগ করতে পারবো না। (মু'জামে ইসমাঈলীতে আছে– তারা বলল, যায়েদ ইবনে সাবিত বলেন, সে তাওয়াফ না করে রওনা দিবে না) হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তোমরা মদীনায় গিয়ে জিজ্ঞেস করো। তারা মদীনায় এসে জিজ্ঞেস করলো। তারা যাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলো তাদের মধ্যে একজন

ছিলেন হযরত উম্মে সুলাইম রা.। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত ছফিয়ার হাদীস শুনিয়ে দিলেন অর্থাৎ ঋতুমতি মহিলার বিদায়ী তওয়াফ করা লাগবে না। (বুখারীঃ ১৬৪৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূলঃ ১৪৮৭)

হাদীছের শিক্ষা : এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে মদীনাবাসীরা যে মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলো হযরত ইবনে আব্বাস রা. তার সঠিক জবাব দেয়া সত্ত্বেও মদীনার মুফতী যায়েদ ইবনে সাবিতের মতের সাথে অমিল হওয়ায় মদীনাবাসীরা সে মাসআলা গ্রহণ করতে চাইলো না। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস রা.ও তাদেরকে নিজের মাসআলা মানার জন্য জোর দিলেন না। বরং বললেন, তোমরা মদীনায় গিয়ে জিজ্ঞেস করো। এ হাদীসটি মদীনাবাসী কর্তৃক হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের একক সিদ্ধান্ত পালনের প্রমাণ। আর এরই নাম তাকলীদে শখ্ছী যার প্রতি হযরত ইবনে আব্বাস রা.ও মৌনসম্মতি জানা-লেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ

عَنْ هُزَيْل بْنِ شُرَحْبِيل قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ–٢/٩٩٧)

অনুবাদ : হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহবীল রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং এক বোনের প্রাপ্য সম্পর্কে ফারায়েজ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কন্যা অর্ধেক এবং বোন অর্ধেক পাবে। তুমি ইবনে মাসউদের নিকট যাও, তিনিও আমার মতো বলবেন। অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আবু মুসা আশআরীর মন্তব্যও তাঁকে শুনানো হলো। হযরত ইবনে মাসঊদ রা. বললেন, তাহলে তো আমি ভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং

হিদায়াতপ্রাপ্তদের দলভুক্ত থাকবো না। এ ব্যাপারে আমি এমন সিদ্ধান্ত করবো যা রসূলুল্লাহ স. করেছেন। কন্যা পাবে অর্ধেক। (কন্যাদের জন্য বরাদ্দকৃত) দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করতে পৌত্রী পাবে এক ষষ্ঠমাংশ। অতঃপর যা বাকী থাকে তা বোনের জন্য। এরপরে আমরা হযরত আবু মুসা রা.-এর নিকট এসে ইবনে মাসউদ রা.-এর মাসআলা শুনালাম। অতঃপর তিনি বললেন, এ জ্ঞান সমুদ্র যতদিন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে ততদিন তোমরা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করো না। (বুখারী: ৬২৮০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীছের শিক্ষা : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. কর্তৃক মাসআলা বলার পর হযরত ইবনে মাসউদের নিকট যাচাইয়ের জন্য পাঠানো, আবার ফিরে আসার পরে এ কথা বলা যে, এ জ্ঞান সমুদ্র যতদিন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে ততদিন তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না– এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে তাঁদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধানদাতা ইমাম হিসেবে বিশ্বাস করতেন। আর এরই নাম তাকলীদে শখছী যা সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও প্রচলিত ছিলো।

তৃতীয় প্রমাণ

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ: " إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ: أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ " فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ».

অনুবাদ : ইমাম শা'বী রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.কে কালালার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব মত বলছি। যদি সঠিক হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর ভুল হলে আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আমি মনে করি, কালালা হলো ঐ ব্যক্তি যার সন্তানও নেই পিতা-মাতাও নেই। অতঃপর যখন হযরত ওমর রা. খলিফা হলেন তখন বললেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর কথা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আমি আল্লাহকে লজ্জা করি। (আল্ ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: ১/৪৯০, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-১২২৬৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইমাম শা'বী রহ. হযরত ওমর রা. থেকে সরাসরি না শুনার কারণে হাদীসটি মুরসাল। অবশ্য রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ ইমাম শা'বী রহ.-এর মুরসালকে সহীহ বলেছেন। (তাহজীবুল কামাল: রাবী নম্বর- ৩০৯২) আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (তাজকিরাতুল মুহতাজ, পৃষ্ঠা-৮৯ আল্ মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমর রা. কালালার বিষয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর একক সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন এবং এ মন্তব্যও করলেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর কথা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আল্লাহকে লজ্জা করি। এটা তাকলীদে শখছী বা দ্বীনের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন একজন আলেমের মতামত গ্রহণের স্পষ্ট প্রমাণ। সাথে সাথে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. থেকে প্রমাণিত হওয়ায় এটা বিশেষভাবে দ্বীনের দলীল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং ওমর রা.-এর অনুসরণের বিষয়ে খোদ রসূলুল্লাহ স. অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। (তিরমিযী: ৩৬৬৩)

চতুর্থ প্রমাণ

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ فَإِذَا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَهْلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِمْ شَابٌّ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، بَرَّاقُ الثَّنَايَا سَاكِتٌ، فَإِذَا امْتَرَى الْقَوْمُ فِي شَيْءٍ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ. فَقُلْتُ: لِجَلِيسٍ لِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ...

অনুবাদ : হযরত আবু মুসলিম খওলানী রহ. বলেন, আমি হিম্সের মাসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রায় ত্রিশজন বয়োবৃদ্ধ সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে সুরমালো চোখ এবং উজ্জ্বল দাঁতের অধিকারী এক নীরব যুবক ছিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কোন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে ঐ যুবককে জিজ্ঞেস করতেন। আমি আমার এক সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম : ঐ যুবক কে? তিনি বললেন, ঐ যুবক হলেন হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.। (মুসনাদে আহমদ-২২০৮০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ-২২০৮০ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনামতে সাহাবায়ে কিরামের ত্রিশ সদস্যের একটি বড় দল কোন বিষয়ে সংশয় বা বিতর্কের পর্যায়ে গেলে হযরত মুআয রা.-এর দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। এটা সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক তাকলীদে শখছীর প্রমাণ।

পঞ্চম প্রমাণ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسولُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا، قَالَ: فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ، قَالَ: فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ،... (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ إِذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ–١/٦٢)

অনুবাদ : হযরত মাইমূন আল্ আওদী রহ. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর প্রেরিত দূত হিসেবে হযরত মুআয রা. আমাদের নিকট ইয়ামানে আসলেন। আমি ফজরের নামাযে তাঁর তাকবীর শুনলাম। তিনি ছিলেন সুললিত দারাজ কণ্ঠের অধিকারী। এরূপ দারাজ কণ্ঠের তাকবীর ধ্বনি শুনে তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। তাঁকে সিরিয়ায় মৃত দাফন করা পর্যন্ত আমি তাঁর থেকে পৃথক হইনি। অতঃপর মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় ফকীহ অনুসন্ধান করে হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে আঁকড়ে ধরলাম এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথেই থাকলাম। (আবূ দাউদ: ৪৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ-৪৩২ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৩২)

শিক্ষণীয় : রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় হযরত মুআয রা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী হযরত আম্র ইবনে মাইমূন রহ.-এর জীবনী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দ্বীন শিক্ষার জন্য প্রথমে হযরত মুআয রা.কে এককভাবে এবং পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে এককভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এটা সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে তাবিঈ কর্তৃক তাকলীদে শখছী গ্রহণের প্রমাণ।

ষষ্ঠ প্রমাণ

لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم من لَهُ صُحْبَة يَذْهَبُونَ مَذْهَبَهُ وَيُفْتُونَ بِفَتْوَاهُ وَيَسْلُكُونَ طَرِيقَتَهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ (العِلَلْ ومعرفة الرجال لِإبْنِ الْمَدِيْنِيْ)

অনুবাদ : রসূল স.-এর সংশ্রবপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনজন সাহাবা এমন ছিলেন মানুষ যাদের মাযহাব মেনে চলতো, তাঁদের ফতওয়া মোতাবেক ফতওয়া প্রদান করতো এবং তাদের মতাদর্শ মেনে চলতো। তাঁরা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবেত এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। (আল্-ইলাল ওয়া মা'রেফাতুর রিজাল পৃ. ৪২ মাকতাবুল ইসলামী-বৈরুত)

শিক্ষণীয় : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. মৃত্যুবরণ করেন ৩২ হিজরী সনে হযরত উসমান রা.-এর খিলাফত আমলে। তাহলে মানুষ হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে মাযহাব গ্রহণ করেছেন আরো পূর্বে তথা হযরত আবু বকর ও ওমর রা.-এর খিলাফত আমল থেকেই। এ বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাকলীদ খুলাফায়ে রাশেদার যুগের ছুন্নাত।

উক্ত বক্তব্যের পরে ইমাম ইবনুল মাদিনী রহ. ঐ সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের নামের তালিকা পেশ করেছেন যারা ক্রমান্বয়ে মাযহাব সংরক্ষণ ও অনুসরণ করে চলেছেন। অবশ্য চার ইমামের মাযহাব ব্যতীত অন্য কারো মাযহাবে সকল বিষয়ক মাসআলার সমাধান বিদ্যমান না থাকা এবং তাঁদের মাযহাব যথাযথভাবে সংরক্ষিত না থাকার কারণে কেবল চার ইমামের মাযহাবের অনুকরণ করা হয়ে থাকে। সহীহ সনদে বর্ণিত তাকলী-দে শখছীর অনুরূপ বহু প্রমাণ হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। শুধু নমুনা হিসেবে এখানে কিছু পেশ করা হলো।

তাকলীদে শখছী অনুসরণকারী কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি

১। ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ রহ. (মৃত্যু- ১৯৭ হি.)। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং রিজাল শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রাহ হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন, مَا رَأَيْت أفضل من وَكِيع ... ويفتي بقول أبي حنيفة وَكَانَ قد سمع مِنْهُ شَيْئا كثيرا "আমি ওয়াকী'র চেয়ে উত্তম মানুষ কাউকে দেখিনি....। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতানুসারে ফতওয়া দিতেন। তিনি তাঁর

থেকে অনেক কিছু শুনেছেন”। (তাহজীবুল কামাল: হযরত ওয়াকী’ রহ.-এর জীবনী আলোচনায়)

২। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কত্তান রহ. (মৃত্যু- ১৯৮ হি.)। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং রিজাল শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন, **وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان يُفْتِي بقوله** “হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কত্তান রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতানুসারে ফতওয়া দিতেন”। (তাহজীবুল কামাল: হযরত ওয়াকী’ রহ.-এর জীবনী আলোচনায়) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন আরো বলেন, □□□□ **يحيى بن سعيد القطان يقول لا تكذب الله ما سمعنا أحسن من رأى أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر اقواله** “আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কত্তান থেকে শুনেছি: আল্লাহকে অস্বীকার করো না। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর থেকে উত্তম মত আমি আর কারো থেকে শুনিনি। তাঁর অধিকাংশ মতামত আমরা গ্রহণ করেছি”। (তাহজীবুল কামাল: হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জীবনী আলোচনায়) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহ. বলেন, **كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين** “ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. কুফাবাসীদের (হানাফী মাযহাব অনুসারীদের) প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন”। (তাহজীবুল কামাল: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ.-এর জীবনী আলোচনায়)

৩। আব্দুর রহমান ইবনে মাহ্দী রহ. (মৃত্যু- ১৯৮ হি.)। তিনি রিজাল শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম এবং শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর অনুরোধে ইমাম শাফেঈ রহ. ‘উসূলুল ফিক্হ’ নামক প্রসিদ্ধ কিতাব লিখে পাঠিয়ে দেন। (তাহজীবুল কামাল: ইমাম শাফেঈ রহ.-এর জীবনী আলোচনায়) তবে ইমাম আহমদ রহ.-এর মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মদীনাবাসীদের মাযহাব তথা মালেকী মাযহাবের দিকে আকৃষ্ট ছিলেন। (তাহজীবুল কামাল)

৪। ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস আসসিজিস্তানী রহ. (মৃত্যু- ২৭৫ হি.)। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ইমাম আবূ দাউদ রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করে চলতেন। ইমাম ঐাহাবী বলেন, **كَانَ أَبُو دَاوُدَ مَعَ إِمَامَتِهِ فِي الحَدِيْثِ وَفُنُوْنِهِ مِنْ كِبَارِ الفُقَهَاءِ، فَكِتَابُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ نُجَبَاءِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ** □ “ইমাম আবূ দাউদ রহ. হাদীস এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের ইমাম এবং বড় মাপের ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কিতাব থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে

হাম্বল রহ.-এর অনুসারীদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন"। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালাঃ তবকা- ১৫, রাবী নম্বর- ১১৭, তবাকাতুল হানাবিলা : সুনানে আবী দাউদ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত, পৃষ্ঠা : ৩৪)

৫। ইমাম ত্বহাবী আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. (মৃত্যু- ৩২১ হি.)। ইমাম ত্বহাবী রহ. ছিলেন হাদীস ও ফিক্হের বড় ইমাম। হাদীস, আহকামে কুরআন, আকাইদ এবং ফিক্হ বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা। সাথে সাথে তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অনুসারী এবং হানাফী মাযহাবের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, **وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب الصلة كان ثقة جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف وكان يذهب مذهب أبي حنيفة وكان شديد العصبية فيه** "মাসলামা ইবনে কাসেম উন্দুলুসী 'কিতাবুছ ছিলা'-এ বর্ণনা করেনঃ ইমাম ত্বহাবী ছিলেন নির্ভরযোগ্য, উঁচু মর্যাদার অধিকারী, আপাদমস্তক ফিক্হবিদ, উলামায়ে কেরামের মতানৈক্যের ব্যাপারে পারদর্শী এবং রচনা-সংকলনে অভিজ্ঞ। তিনি আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করে চলতেন এবং এ ব্যাপারে খুবই কট্টর ছিলেন"। (লিসানুল মীযানঃ ইমাম ত্বহাবীর জীবনী আলোচনায়)

৬। ইমাম দারাকুতনী আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর রহ. (মৃত্যু- ৩৮৫ হি.)। ইমাম দারাকুতনী রহ. ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী এবং উক্ত মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। আল্লামা খতীবে বাগদাদী রহ. বলেন, **درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري** "ইমাম দারাকুতনী রহ. শাফেঈ মাযহাবের ইল্মে ফিক্হ শিক্ষা করেছেন আবু সাঈদ আল ইসতাখরী থেকে। (তারীখে বাগদাদঃ রাবী নম্বর- ৬৩৫৭)

৭। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিসাপুরী রহ. (মৃত্যু- ৪০৫ হি.)। তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী এবং উক্ত মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। (আল্লামা সুবকী লিখিত তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, তবকা-৪ ক্রমিক ৩২৯)

৮। ইমাম বায়হাকী আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী রহ. (মৃত্যু-৪৫৮হি.)। ইমাম বায়হাকী রহ. শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী এবং উক্ত মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। (আল্লামা ইবনে কাসীর লিখিত তবাকাতুশ শাফিয়্যীন, তবকা- ৬)

৯। ইমাম গাজালী আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ রহ. (মৃত্যু-৫০৫ হি.)। ইমাম গাজালী রহ. তাঁর যুগে শাফেঈ মাযহাবের বড় আলেম হিসেবে খ্যাত ছিলেন। (ওফায়াতুল আ'ইয়ান)

১০। আব্দুল কাদের জিলানী ইবনে মুসা ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. (মৃত্যু-৫৬১ হি.)। প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক কাদেরিয়া তরীকার স্থপতি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহ. হাম্বলী মাযহাবের বড় আলেম এবং মুফতি ছিলেন। (আত্ তাজুল মুকাল্লাল-১৫৯)

১১। ইমাম নববী আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ রহ. (মৃত্যু- ৬৭৬ হি.)। ইমাম নববী রহ. মুসলিম শরীফে সর্ববৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল মিন্হাজ'-এর লেখক। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস এবং রিজাল ও ফিক্হ শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম। এসত্ত্বেও তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

১২। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী রহ. (মৃত্যু- ৮৫২ হি.)। তিনি বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র লেখক এবং হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হওয়া সত্ত্বেও শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

১৩। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ ইবনে আহমদ রহ. (মৃত্যু- ৮৫৫ হি.)। তিনি বুখারী শরীফের অপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল কারী'র লেখক এবং হাদীস ও রিজালের বিশিষ্ট ইমাম হওয়া সত্ত্বেও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

এখানে নমুনা হিসেবে মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করা হলো যাদের অধিকাংশই শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। বিশিষ্ট ফকীহদের তালিকা পেশ করা হলে তাঁদের অধিকাংশকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী পাওয়া যেতো। এ সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করার দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু সেসব মানুষদের কথা তুলে ধরা যারা কুরআন-হাদীস, ফিক্হ, তাছাওউফ এবং রিজাল শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য থাকার পরও ইমাম মানার প্রয়োজন অনুভব করতেন।

বুখারী শরীফের রাবীদের মধ্য থেকেও যদি কেবল এমন রাবীদের পৃথক করা হয় যারা হানাফী ছিলেন তাহলে বিরাট ভলিয়মের কিতাব দাঁড়িয়ে যাবে। বিস্তারিত দেখুন রিজাল শাস্ত্রের কিতাবসমূহে। এমনকি বুখারী শরীফের কপি ইমাম বুখারী রহ. থেকে যে চার জন শাগরেদের মাধ্যমে পৃথিবীময় ছড়িয়েছে তন্মধ্যে ইবরাহীম ইবনে মা'কিল আন-নাস-াফী এবং হাম্মাদ ইবনে শাকের আন-নাসাফীও ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। (শুরুতুল আইম্মাতিল খম্সাহ, পৃষ্ঠা-৬০-এর টীকায়)।

এর বিপরীতে কিছু মানুষ যারা সহীহ-শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারে না। আবার কেউ আরবীতে লিখিত হাদীস পড়তে জানে না; বরং অনুবাদই তাদের পুঁজি, কারো আবার অনুবাদ জানা থাকলেও ইল্‌মের গভীরতা নিতান্তই সীমিত, তারা ইমাম মানার প্রয়োজন অনুভব করছে না; বরং নিজেরাই সব কিছুর সমাধান করতে পারার দাবীদার। জানি না এটা কি নিজেকে অতি পণ্ডিত ভাবার ধোঁকা, নাকি মূর্খতার কারণে নিজেকেও না চেনার পরিণাম।

তাকলীদে শখছী বিষয়ক একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা

কুরআন-হাদীসের মধ্যে যেসব বিষয়ের আলোচনা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তার বিপরীতে কোন আয়াত বা হাদীস বর্ণিত হয়নি এমন বিষয় নিয়ে উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায় না; বরং মতানৈক্য সেসব বিষয় নিয়ে ঘটে থাকে যেসব বিষয়ে বাহ্যত পরস্পরবিরোধী আয়াত বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিংবা কুরআন-হাদীসের বর্ণনা অস্পষ্ট বা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ব্যাখ্যা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আর তাকলীদের প্রয়োজন মূলত এসব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এখন ব্যাখ্যাদাতা চারজন হলে আমলের পদ্ধতি নিয়ে মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে সর্বোচ্চ চারটি শাখা দল সৃষ্টি হতে পারে। আর ব্যাখ্যাদাতা দশজন হলে দশটি দল সৃষ্টি হতে পারে। আর ব্যাখ্যাদাতা অগণিত হলে অগণিত দল সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই হয়তো পূর্বোক্ত মুজতাহিদ আলেমগণ জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা নিজেরা না দিয়ে চার ইমামের ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন। উম্মতের ঐক্য অটুট রাখতে এটাই উত্তম পন্থা নয় কি? অতএব, আমলের পদ্ধতি নিয়ে মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে বহু দল সৃষ্টি না করে হাজার বছরেরও বেশি সময় যাবৎ চলতে থাকা মুসলিম উম্মাহ'র বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ সমাজ যার উপর ঐক্যবদ্ধ সেই চার মাযহাবের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ থাকা আবশ্যক।

আরব উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে তাকলীদ

বর্তমান সময়ের কিছু মানুষ যারা তাকলীদের বিরোধিতা করে থাকে তারা এ কথা বলে মানুষদেরকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে যে, আরব দেশের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম তাকলীদ করা বৈধ মনে করেন না বা পছন্দ করেন না। নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব নজদী, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, শায়খ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায-এর নাম সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে থাকে। পাঠকদের খেদমতে আমি তাকলীদের ব্যাপারে ঐ সকল উলামায়ে কিরামের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করছি যা থেকে মুসলিম জনসাধারণের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আরব উলামায়ে কিরাম সত্যিই কি তাকলীদ বিরোধী? নাকি নিজেদের মিশন শক্তিশালী করতে তাদের নামে অপবাদ দেয়া হচ্ছে।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব নজদী রহ.

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব নজদী রহ. (মৃত্যু : ১২০৬ হি.) আহলুছ ছুন্নাহ ওয়াল জামাত থেকে অনেক মাসআলায় বিচ্যুত মতাবলম্বী সত্বেও তিনি ছিলেন আরব উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে শিরক-বিদআতের বিপক্ষে তাওহীদি আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী আলোড়ন সৃষ্টি করা আলেম। তাঁর চিন্তাধারার অনুকরণে আজ পর্যন্ত সৌদি সরকার মক্কা-মদীনাসহ সারা দেশকে শিরক ও বিদআত থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর লিখিত কিতাবুত তাওহীদের বরাত দিয়ে তাকলীদ বিরোধীরা বেশ কিছু দলীল পেশ করে থাকে। তাকলীদ সম্পর্কে তিনি বলেন,

ونحن أيضا في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير، الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. (الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعلماء نجد الأعلام– ٢٢٧/١)

'শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে আমরাও ইমাম আহমদ রহ.-এর তাকলীদ করে থাকি। যারা চার ইমামের কোন একজনের তাকলীদ করে আমরা তাদেরকে বাধা দেই না। তবে চার ইমামের মাযহাব ব্যতীত ভিন্ন কারো মাযহাব যেমন রাফেজিয়া, যাইদিয়া, ইমামিয়া ইত্যাদি মাযহাবকে স্বীকার করি না। কেননা সেগুলো সুসংরক্ষিত না। এমনকি আমরা জনসাধারণকে কোন ফাসেদ মাযহাবের উপর থাকতেও দেই না। বরং তাদেরকে বাধ্য করি চার ইমামের কোন এক ইমামের মাযহাব মেনে চলতে।' (আদ্দুরারুস সানিয়্যাহ: ১/২২৭) তিনি অন্য এক লেখায় বলেন,

لا يخفى عليكم، أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم؛ والله يعلم أن الرجل افترى عليَّ أموراً لم أقلها، ولم يأت أكثرها على بالي. فمنها: قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول: إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة،....جوابي عن هذه المسائل، أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! (الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد الوهاب النجدي:صفحة–٦)

'আল্লাহ তাআলা জানেন যে, সুলাইমান ইবনে সুহাইম নামের এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে এমন কিছু অপবাদ দিয়েছে যা আমি বলিনি। এমনকি এর অনেকটা আমার মনেও জাগ্রত হয়নি। তম্মধ্যে একটি এই যে, আমি নাকি চার মাযহাবের কিতাব বাতিল করে দিয়েছি। আমি নাকি বলি যে, ছয়শ বছর যাবৎ মানুষ কোন মাযহাবের উপর ছিলো না। আমি নাকি মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করি। আমি নাকি তাকলীদের বাইরে। আমি নাকি বলি যে, উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ ঘৃণিত ইত্যাদি। এ সকল মাসআলার ক্ষেত্রে আমার জবাব এই যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এটা আমার প্রতি মারাত্মক অপবাদ।' (আর রিসালাতুশ শাখছিয়াহ, পৃষ্ঠা-২)

সারসংক্ষেপ : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব নজদী রহ. জনসাধারণকে চার ইমামের কোন এক ইমামের মাযহাব মেনে চলতে বাধ্য করতেন এবং তিনি নিজে হাম্বলী মাযহাব মেনে চলতেন। এমনকি যারা তাকে মাযহাব বিরোধী বলেছে তিনি সেটাকে তার বিরুদ্ধে অপবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু-৭২৮ হি.) আরব বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত আলেম। আরব উলামায়ে কিরাম তাঁর লিখিত কিতাব দ্বারা ব্যাপক-ভাবে দলীল পেশ করে থাকেন। তাকলীদ বিরোধীরাও তাঁর কথা দ্বারা বেশ কিছু দলীল পেশ করে থাকে এবং মনে করে যে, তিনি গায়রে মুকাল্লিদ ছিলেন। অথচ বাস্তবতা ছিলো ভিন্ন। তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আরবের বিশিষ্ট আলেম ছালেহ আল ফাওঝান বলেন,

وها هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كانا شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفياً، والإمام ابن عبد البرّ كان مالكياً. (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان–١/١٠)

বড় বড় মুহাদ্দিস এবং ইমামগণও মাযহাবপন্থী ছিলেন, শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কয়্যিম রহ. হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম নববী এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম ত্বহাবী রহ. হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. ছিলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। (ইআনাতুল মুস্তাফীদ: ১/১০)

শায়খ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায রহ.

শায়খ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায রহ. (মৃত্যু-১৪২০ হি.) আরবের আরেকজন বিখ্যাত আলেম। সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনি প্রধান মুফতির দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর লিখিত বহু কিতাব বাংলা ভাষায় তরজমা হয়েছে এবং আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর লিখিত কিতাব পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের তাকলীদ বিরোধী ভাইরা তা আমদানী করে থাকেন। উক্ত প্রখ্যাত শায়খ ইবনে বায রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলো: আপনার কি কোন নির্দিষ্ট ফিকহী মাযহাব আছে? ফতওয়া এবং দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে আপনার পন্থা কি? জবাবে তিনি বলেন,

مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليها.(مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله–٤/١٦٦)

ফিকহের ক্ষেত্রে আমার মাযহাব ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব। তবে (শাখাগত ও খুটিনাটি সকল মাসআলায়) আমি তাঁর তাকলীদ করি এমন নয় বরং তিনি যে সকল মৌলিক বিষয় অনুসরণ করে চলতেন আমি সেগুলোর অনুসরণ করি। (মাজমূউ ফতওয়া ইবনে বায: ৪/১৬৬) আফগান মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে দেয়া তাঁর এক ভাষণে তিনি বলেন,

فَلَجَأ أعداءُ الدين إلى وسيلة أخرى لإيقاع الفرقة بين المسلمين عن طريق الخلافات المذهبية الموجودة بين الأمة منذ قديم الزمان، فأشعلوا الفتنة وأثاروا العامة، وأرادوا بذلك إيقاع الفساد بين المجاهدين الأفغان وبين إخوانهم المسلمين، وليس لهذه الفتنة من يدرؤها ويحبطها بعد الله إلا أنتم أيها الإخوة العلماء. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الخلاف المذهبي في أمور الفروع واقع منذ قديم الزمان، ولم يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق؛ لأن الأمة الإسلامية متفقة في الأصول والقواعد. (مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله–١٤٩/٥)

দ্বীন ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মধ্যে চলে আসা মাযহাবী মতবিরোধকে আরেকটা নতুন পন্থা হিসেবে অবলম্বন করেছে। তারা ফিতনার আগুন জ্বালাচ্ছে এবং জনসাধারণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছে। আর এর মাধ্যমে তারা আফগান মুজাহিদ এবং তাদের মুসলিম ভাইদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। হে উলামায়ে কিরাম! এ ফিৎনার প্রতিরোধ ও মূলোৎপাটন কে করবে? আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদেরকেই করতে হবে। আল্লাহ তোমাদেরকে হিফাজত করুন। তোমরা জানো যে, শাখাগত বিষয়ে মাযহাবী মতবিরোধ পুরাতন। তবে এটা আজ পর্যন্ত কোন শত্রুতা, হিংসা বা দলাদলির কারণ ঘটেনি। যেহেতু মুসলিম উম্মাহ মৌলিক বিষয় নিয়ে চিরকালই একমত। (মাজমুউ ফতওয়া ইবনে বায: ৫/১৮৯)

শায়খ ছালেহ আল উসাইমীন রহ.

শায়খ ছালেহ আল উসাইমীন রহ. (মৃত্যু-১৪২১ হি.) প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন এবং সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ ‘হাইআতু কিবারিল উলামা’-এর সদস্য ছিলেন। তাঁর লিখিত কিতাব ‘ফতওয়া আরকানিল ইসলাম’-এর বঙ্গানুবাদ করে আমাদের দেশের তাকলীদ বিরোধী বন্ধুরা বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। তারা তাঁর লিখিত উক্ত ফতওয়ার কিতাবসহ তাঁর অন্যান্য কিতাবেরও যথেষ্ট মূল্যায়ন করে থাকে। তাকলীদের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। শায়খ উসাইমীন রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলো: চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাবের অনুসরণের বিধান কি? তিনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেন,

ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لالتزام المذاهب....القسم الثالث: مَنْ ليس عنده علم وهو عامي محض فيتبع مذهبًا معينًا؛ لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه، وليس من أهل الاجتهاد أصلاً، فهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-٢٦/٢٨٥)

মাযহাবের আবশ্যকীয়তার ক্ষেত্রে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। তৃতীয় প্রকার হলো ঐ সকল সাধারণ মানুষ যাদের ইল্‌ম নেই তারা নির্দিষ্ট একটা মাযহাব অনুসরণ করবে। যেহেতু তারা নিজেরা হক চিনতে পারে না আর তারা মুজতাহিদ বা গবেষকও নয়। তারা ঐ দলের আওতাভুক্ত আল্লাহ তাআলা যাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, "তোমরা নিজেরা না জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো"। (মাজমূউ ফতওয়া ওয়া রসায়েল: ২৬/২৮৫)

অন্য এক আলোচনায় তিনি বলেন,

فالعامة مذهبهم مذهب علمائهم، ولهذا لو قال لنا قائل: إنني أشرب الدخان؛ لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول: إنه جائز، وأنا لي حرية التقليد، قلنا: لا يسوغ لك هذا؛ لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماؤك، ولو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي. (لقاء الباب المفتوح لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين-٣٢/٢٠)

জনসাধারণের মাযহাব হবে তাদের উলামায়ে কেরামের যে মাযহাব সেটাই। যদি কেউ বলে যে, আমি ধুমপান করবো। যেহেতু অমুক ইসলামী শহরের লোকেরা বলে, এটা বৈধ। আর যে কারো তাকলীদ করার স্বাধীন-তা তো আমার রয়েছে। আমি বলবো, তোমার জন্য এ অধিকার নেই। যেহেতু তোমার জন্য ফরয হলো তাকলীদ। আর তুমি যাদের তাকলীদ করবে তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার রাখে তোমার অঞ্চলের উলামায়ে কিরাম। যদি তুমি তোমার অঞ্চলের উলামায়ে কিরাম বাদে ভিন্ন অঞ্চলের কারো তাকলীদ করো তাহলে এটা এমন একটা বিষয় নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে যার কোন শরঈ দলীল নেই। (লিকাউল বাবিল মাফতুহ: ৩২/২০)

সারসংক্ষেপ : শায়খ উসাইমীনের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, জনসাধারণের জন্য তাকলীদ করা ফরয এবং সে তাকলীদ হতে হবে ঐ

শহরের উলামায়ে কিরাম যে মাযহাবের অনুসরণ করেন সে মাযহাবের তাকলীদ।

শায়খ ছালেহ আল্ ফাওঝান

শায়খ ছালেহ আল ফাওঝান মক্কা-মদীনাসহ গোটা আরব বিশ্বের একজন খ্যাতনামা আলেম এবং সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ফতওয়া বোর্ড 'আল্ লাযনাতুদ দায়েমা লিলবুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা'-এর অন্যতম সদস্য। তাঁর লিখিত 'ইয়ানাতুল মুস্তাফীদ' কিতাবটি আরব বিশ্বে অনেক সমাদৃত। উক্ত কিতাবে শায়খ ছালেহ আল ফাওঝান বলেন,

ليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالاً حتى يعاب به صاحبه، ولا نقصاً في العلم. بل إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالاً وشاذاً. (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان– ١/١٠)

চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব অনুসরণ করা এমন কোন ভ্রষ্টতা বা ইল্মের দুর্বলতা নয় যে কারণে মাযহাবপন্থীকে দোষারোপ করা হবে। বরং সর্ব বিষয়ে গবেষণার পূর্ণ যোগ্যতা ছাড়া নির্ভরযোগ্য ফকীহদের মান্য করা থেকে সরে দাঁড়ানোই দল ত্যাগ ও গোমরাহী। (ইয়ানাতুল মুস্তাফীদ: ১/১০)

সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ফতওয়া বোর্ড

সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ফতওয়া বোর্ড "আল্ লাযনাতুদ দায়েমা লিলবুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা" কর্তৃক প্রকাশিত এক ফতওয়ায় বলা হয় যে,

ليس من علماء الحرمين مكة والمدينة ولا من سائر علماء المملكة السعودية من يذم أئمة الفقهاء مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ونحوهم من علماء الفقه الإسلامي ولا من يزدريهم، بل المعروف عنهم أنهم يوقرونهم ويعرفون لهم فضلهم وأن لهم قدم صدق في خدمة الإسلام وحفظه وفهم نصوصه وقواعده وبيان ذلك وإبلاغه والجهاد في نصره والذود عنه، وفي رفع الشبهة عنه وإبطال ما انتحله المنتحلون وابتدعه المفترون فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يدل على موقف علماء الحرمين وسائر علماء

المملكة السعودية من الأئمة الأربعة موقف تكريم وتقدير عنايتهم بتدريس مذاهبهم ومؤلفاتهم في المسجد الحرام بمكة المشرفة والمدينة المنورة وسائر مساجد المملكة السعودية وفي جامعاتها وعنايتهم بطبع الكثير من كتبهم وتوزيعها ونشرها بين المسلمين في جميع الدول التي بها مسلمون. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : عبد الله بن غديان (عضو). عبد الرزاق عفيفي (عضو). عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس). (الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش)

হারামাইন তথা মক্কা-মদীনার কোন আলেম এমনকি সৌদি আরবের কোন আলেম এমন নেই যারা ফকীহ ইমাম তথা মালেক, আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ এবং অনুরূপ ফিকহে ইসলামীর কোন কর্ণধার আলেমের কুৎসা রটায় বা তাঁদেরকে অবজ্ঞা করে। বরং সৌদি উলামায়ে কিরামের মাঝে এটাই পরিচিত যে, তাঁরা ঐ সকল ইমামকে সম্মান করেন, তাঁদের অবদানের কথা স্বীকার করেন এবং ইসলামের খেদমত, দ্বীনের হিফাজত, কুরআন-হাদীসের ভাষা ও নিয়ম-নীতি বুঝা, সেগুলো প্রকাশ ও প্রচার করা, দ্বীনের সাহায্য ও সংরক্ষণে জিহাদ করা, দ্বীনের প্রতি আনীত অভিযে-াগের জবাব দেয়া, দ্বীন বিকৃতকারীদের বিকৃতি এবং অপবাদদাতাদের নবসৃষ্টি থেকে দ্বীনকে রক্ষা করার মহান সুখ্যাতি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করুন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, চার ইমামের ব্যাপারে মক্কা-মদীনাসহ সৌদি আরবের উলামায়ে কিরামের অবস্থান হলো তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার অবস্থান। তাঁদের মাযহাব ও লিখিত কিতাবাদি মক্কা-মদীনার সম্মানিত মাসজিদ দু'টিতে এবং সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান করা, তাঁদের লিখিত কিতাবসমূহ ছেপে বিশ্বের যে সকল অঞ্চলে মুসলমানদের বসবাস রয়েছে সেখানে বিতরণ করার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি মনোযোগী হওয়া। (ফতওয়াল্ লাযনাতুদ দায়েমা, প্রথম সংকলন) এ ফতওয়ায় স্বাক্ষর করেন, শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে গদইয়ান (সদস্য), আব্দুর রায্যাক আফিফী (সদস্য) এবং আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায (প্রধান)।

সারকথা– এ ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হলো যে, মক্কা-মদীনাসহ সৌদি আরবের উলামায়ে কিরাম চার ইমামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তাঁদের দ্বীনি খেদমত স্বীকার করেন, তাঁদের মাযহাব ও লিখিত কিতাবসমূহ মক্কা-মদীনার সম্মানিত মাসজিদদ্বয় ও সৌদির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ান এবং তা ছাপিয়ে মুসলিম বিশ্বে বিতরণ করেন।

আরব উলামায়ে কিরাম তাকলীদ ও মাযহাবের বিরোধী বলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যা প্রচার করা হয়ে থাকে তা নিছক বানোয়াট কথা। বরং তারা মাযহাবের অনুসারী এবং মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এমনকি সর্ব বিষয়ে গবেষণার পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতীত তাকলীদ থেকে সরে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে তারা গোমরাহ মনে করেন। নিজেদের এ গোমরাহীকে আড়াল করতেই হয়তো আরব উলামায়ে কিরামের উপর মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঐ সকল মিথ্যুকদের মিথ্যাচার থেকে হিফাজত করুন।

রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী

সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা আলেমদের দ্বারা গঠিত সংগঠন 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী'-এর সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত দশম বৈঠক যা ২৪ ছফর-১৪০৮ হিজরী মোতাবেক ১৭ অক্টোবর-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার থেকে শুরু হয়ে ২৮ ছফর-১৪০৮ হিজরী, মোতাবেক-২১ অক্টোবর-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার পর্যন্ত চলমান থাকে। তাতে সমগ্র মুসলিম জাতির সামনে দিকনির্দেশনামূলক যে সকল সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হয় তার একটি অংশ ছিলো এরূপ–

وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة وفي أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام.

"আর ঐ ফিরকা যারা মানুষদেরকে মাযহাব প্রত্যাখ্যানের দিকে আহবান করে এবং তাদেরকে নতুন গবেষণার উপর উঠাতে চায়, প্রতিষ্ঠিত

ফিকহী মাযহাব ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং মাযহাবের ইমামগণ বা তাঁদের কারো কারো সমালোচনা কওে, আমাদের পূর্ববর্ণিত আলোচনা থেকে তাদের দায়িত্ব হবে এহেন ঘৃণিত পন্থা থেকে ফিরে আসা যা দ্বারা তারা মানুষদেরকে গোমরাহ করছে এবং এমন মুহূর্তে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করছে যখন ইসলামের শত্রুদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের ঐক্য অত্যন্ত জরুরী ছিলো"। (আস সাহওতুল ইসলামিয়া বাইনাল ইখতিলাফিল মাশরু' ওয়াত তাফর্রুকিল মাযমূম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫)

তাকলীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কিছু আপত্তির জবাব

তাকলীদ বিরোধীরা নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের পন্থা হিসেবে তাকলী-দের বিরুদ্ধে কিছু অবান্তর আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। তাদের উত্থাপিত মৌলিক আপত্তি এবং তার দলীল-নির্ভর জবাব পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যা থেকে তাদের আপত্তির অসারতা স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে আশা করছি।

প্রথম আপত্তি : তাকলীদ হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত ভিন্ন কারো অনুকরণ করা। আর ধর্মীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত ভিন্ন কারো অনুকরণ করা বৈধ নয়। তারা তাদের আপত্তিকে শক্তিশালী করতে কুরআনের আয়াতের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, **وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ** নিশ্চয় এটা আমার সঠিক পথ, তোমরা এর অনুকরণ করো। এটা ব্যতীত বিভিন্ন পথ অবলম্বন করো না। তা তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। (ছূরা আনআম-১৫৩)

জবাব-১ : এ আয়াতে উল্লিখিত বিভিন্ন পথ দ্বারা তারা চার ইমামের তাকলীদ এবং তাঁদের মাযহাবের অনুসরণকে বুঝানোর চেষ্টা করে থাকে। অথচ এটা এ আয়াতের অপব্যাখ্যা। বরং এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণ বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন কোন মতাদর্শ গ্রহণ করা, হিদায়াত পরিত্যাগ করে গোমরাহীকে গ্রহণ করা এবং বিদআতের আবিষ্কার করা ইত্যাদি। এ আয়া-তের ব্যাখ্যায় কিছু খ্যাতনামা মুফাসসিরগণের তাফসীর তুলে ধরা হচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, বিভিন্ন পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ইয়াহুদী মতবাদ, খ্রিষ্টীয় মতবাদ এবং পৌত্তলিক মতবাদের অনুসরণ করা। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস) অপর এক বর্ণনায় তিনি আরো বলেন,

বিভিন্ন পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : বিদআত এবং গোমরাহীর অনুকরণ করা। (তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, হাদীস নং-৮১০৪)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, বিভিন্ন পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন কোন ধর্মের অনুকরণ করা। (তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, হাদীস নং-৮১০৫)

জবাব-২ : ধর্মীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত ভিন্ন কারো অনুকরণ করা বৈধ নয় বলে তারা যে মন্তব্য করেছে এটাও সঠিক নয়। কারণ ধর্মীয় কাজে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে বরং বিজ্ঞজনদের থেকে জেনে নেয়া এবং তাঁদের অনুকরণের নির্দেশ খোদ আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রসূল স. দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ'র আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং উলুল আম্‌র-এর আনুগত্য করো। (ছূরা নিসা-১৫৯) উলুল আম্‌র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: উলামায়ে কিরাম, রাষ্ট্রের ইনতেজামী বা শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলগণ অথবা যুদ্ধের আমীরগণ যারা সকলেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বাইরে। উলুল আম্‌র-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন 'তাকলীদের দলীল' শিরোনামে।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, শুরুর দিকের প্রবীণ মুহাজির এবং আনসার আর যারা ন্যায়-নীতি অনুযায়ী তাদের অনুকরণ করে আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। (ছূরা তওবা-১০০) এ আয়াতে উল্লিখিত শুরুর দিকের প্রবীণ মুহাজির এবং আনসারগণ যাদের আনুগত্যে আল্লাহ তাআলা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তারা সকলেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বাইরে।

অনুরূপভাবে রসূল স.ও তাঁর উম্মতকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমাদের দায়িত্ব হলো আমার ছুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার ছুন্নাতের অনুকরণ করবে। সেটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। (সহীহ সনদে: আবূ দাউদ-৪৫৫২, মুসনাদে আহমদ-১৭১৪৪ তিরমিযী-২৬৭৬ এবং ইবনে মাযা-৪২) অন্য এক বর্ণনায় রসূল স. ইরশাদ করেন, আমি জানি না তোমাদের মাঝে আমি কতদিন বেঁচে থাকবো। তোমরা আমার পরে এ দু'জনের অনুকরণ করো। এ কথা বলে তিনি আবু বকর এবং ওমর রা.-এর দিকে ইশারা করলেন। অতঃপর বললেন, আম্মারের চরিত্রে চরিত্রবান হও। আর ইবনে মাসউদ তোমাদেরকে যে হাদীস শোনায় তা সত্য বলে মেনে নাও। (সহীহ সনদে:

মুসনাদে হুমাইদী-৪৫৪, ইবনে আবি শাইবা-৩৮২০৪, তিরমিযী-৩৭৯৯, সহীহ ইবনে হিব্বান-৬৯০২)

অপর এক বর্ণনায় রসূল স. ইরশাদ করেন, দুটি গুণ যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাকে ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ব্যাপারে তার চেয়ে নিম্ন অবস্থানে থাকা ব্যক্তির প্রতি লক্ষ করে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যে নিআমত বেশি দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করে। আর দ্বীনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে, যে তার চেয়ে উঁচু অবস্থানে আছে অতঃপর তার অনুকরণ করে। (হাসান সনদে : ফাতহুল বারী, ইরশাদুস সারী, তিরমিযী-২৫১২)

মোটকথা : নমুনা হিসেবে পেশকৃত উপরিউক্ত দুটি আয়াত এবং তিনটি হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত ভিন্ন কারো অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রসূল স.। সুতরাং তাকলীদ বিরোধীরা কুরআনের বরাত দিয়ে জনসাধারণকে যা বলে থাকে তা অসত্য এবং কুরআন বিকৃতির শামিল।

দ্বিতীয় আপত্তি : রসূল স. কুরআন এবং ছুন্নাহ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাতে হিদায়াতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আমরা রসূল স.-এর কথার বাইরে গিয়ে তৃতীয় আরেকটা জিনিস তথা মাযহাবকে কেন আঁকড়ে ধরছি?

জবাব : মুজতাহিদে মুতলাক তথা সর্ব বিষয়ে গবেষণায় দক্ষ পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ ব্যতীত যে কোন মানুষের জন্য সঠিকভাবে কুরআন-ছুন্নাহ'র অনুকরণের পদ্ধতির নাম মাযহাব। সঠিকভাবে দ্বীনের উপর চলার জন্য মুজতাহিদ ব্যক্তিবর্গের অনুকরণ করার নির্দেশ এবং অনুমতি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল স. দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন 'তাকলীদের দলীল' শিরোনামের অধীনের আলোচনায়। সুতরাং মাযহাবের অনুকরণ কুরআন-ছুন্নাহ'র বাইরে তৃতীয় কোন জিনিস নয়। বরং এটা কুরআন-ছুন্নাহর সঠিক অনুকরণের পন্থা।

তৃতীয় আপত্তি : মাযহাব হলো চতুর্থ শতাব্দীর পরে সৃষ্ট একটি বিদআত যা রসূল স. এবং তাঁর পরের উত্তম যুগ তথা সাহাবা, তাবিঈ এবং তাবে তাবিঈগণের যুগে ছিলো না। অতএব, এত পরে এসে সৃষ্ট একটি পদ্ধতিকে আমরা দ্বীন হিসেবে কেন মানবো?

জবাব : মাযহাব চতুর্থ শতাব্দীর পরে সৃষ্টি হয়েছে কথাটি একটি

ভিত্তিহীন কথা এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী রহ.-এর তুলে ধরা ইতিহ-াসের বিকৃত রূপ। 'তাকলীদে শখছীর প্রমাণ' শিরোনামের অধীনে পেশকৃত ষষ্ঠ প্রমাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ আলী ইবনে মাদিনী রহ. হযরত মাসরূক রহ.-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم من لَهُ صُحْبَة يَذْهَبُونَ مَذْهَبَهُ وَيُفْتُونَ بِفَتْوَاهُ وَيَسْلُكُونَ طَرِيقَتَهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ রসূল স.-এর সংশ্রবপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনজন সাহাবা এমন ছিলেন মানুষ যাদের মাযহাব মেনে চলতো, তাঁদের ফতওয়া মোতাবেক ফতওয়া প্রদান করতো এবং তাদের তরীকা মেনে চলতো। তাঁরা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবেত এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। (আল্ ইলাল ওয়া মা'রেফাতুর রিজাল) এরপরে আল্লামা ইবনুল মাদিনী রহ. ঐ সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের নামের তালিকা পেশ করেন যারা ক্রমান্বয়ে মাযহাবের অনুকরণ ও সংরক্ষণ করেছেন। অবশ্য চার ইমামের মাযহাব ব্যতীত অন্য কারো মাযহাবে সকল বিষয়ক মাসআলার গবেষণা বিদ্যমান না থাকায় এবং মাযহাব সংরক্ষিত না থাকায় কেবল চার ইমামের মাযহাবের অনুকরণ করা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. মৃত্যুবরণ করেন ৩২ হিজরী সনে হযরত উসমান রা.-এর খিলাফত আমলে। তাহলে মানুষ তাঁর থেকে মাযহাব গ্রহণ করেছেন আরো পূর্ব থেকে তথা হযরত আবু বকর ও ওমর রা.-এর খিলাফতকাল থেকে। এ বর্ণনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাকলীদ চতুর্থ শতাব্দির পরে সৃষ্ট বিদআত নয়, বরং খুলাফায়ে রাশেদার যুগের ছুন্নাত।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. তাঁর লিখিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা নামক কিতাবে চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, চারশ বছর পর্যন্ত কেউ সুনির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুকরণ করতো না। বরং আঞ্চলিকতা বা ঘনিষ্ঠতা কিংবা সম্পর্কের ভিত্তিতে যে কোন ইমামের নিকট জিজ্ঞেস করে আমল করা হতো। কিন্তু চার মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাব যথাযথভাবে সংরক্ষিত না থাকাসহ আরো অন্যান্য কারণে চতুর্থ শতাব্দীর পরে গিয়ে মানুষ চার মাযহাবের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ১/২৬০)

হযরতের এ বক্তব্যকে বিকৃত করে তাকলীদ বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে যে, তাকলীদ হলো চতুর্থ শতাব্দীর পরে সৃষ্ট বিদআত। অথচ এ বক্তব্যে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাকলীদ পূর্ব থেকে ছিলো। কিন্তু চার ইমামের মাযহাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়াটা চতুর্থ শতাব্দীর পরের ঘটনা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. তাঁর উক্ত কিতাবের অপর এক পরিচ্ছেদে তাকলীদ করার প্রয়োজন এবং তাকলীদ বর্জনের ক্ষতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাঃ ১/২৬৩) কিন্তু তাকলীদ বিরোধীরা হযরতের ঐ আলোচনা বিকৃত করার সময় হয়তো খেয়াল করেনি যে, তিনি তাকলীদের প্রয়োজন সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ আপত্তি : চার মাযহাবের ইমামগণ কেউই অন্যদেরকে আপন মাযহাবের দিকে ডাকেননি। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন যে, হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব। তাহলে আমাদেরকে আহবান না করা সত্ত্বেও আমরা কেন তাঁদের মাযহাবের অনুসরণ করছি?

জবাব-১ : এ আপত্তি নিতান্তই অজ্ঞতামূলক। ফিক্হ সংকলন করার অর্থই তো আরেকজনকে তা আমলের দাওয়াত দেওয়া। অন্যথায় তাঁদের ফিক্হ সংকলনের কোন হেতু থাকে না। যেমন মনে করুন কেউ কোন গ্রন্থ রচনা করলো। এর উদ্দেশ্যই তো হলো যাতে পাঠক তা পাঠ করে তার জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। এ বই থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য কী স্বতন্ত্রভাবে লেখকের কোন মৌখিক আহবান কিংবা সম্মতিও থাকতে হবে? তাছাড়া ইমাম আযম রহ. তাঁর শাগরিদবৃন্দকে তাঁর মতামত লেখার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করলেও মূলত তার মতামত স্থির হওয়ার পর তা লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেননি। যা মূলত দাওয়াতেরই নামান্তর।

আর যদি কোন ব্যক্তি ইমামগণের এ কর্মপন্থা বুঝতে না পেরে তার আপত্তি বহাল রাখতে চায় তাহলে তাকে বলা যেতে পারে যে, আমরা তাঁদের অনুকরণ করবো তাঁরা এর মুখাপেক্ষী নয়। বরং কুরআন-হাদীসের পূর্ণ অনুকরণ করা আমাদের দায়িত্ব। অথচ সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত ইল্ম এবং গবেষণার যোগ্যতা না থাকার কারণে আমাদের জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আমরাই তাঁদের গবেষণার মুখাপেক্ষী। আমাদের মতো মানুষকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকে জেনে নিতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমাদের জানা না থাকলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। (ছূরা নাহ্‌ল-৪৩, ছূরা আম্বিয়া-৭)" কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা কোন নির্দেশ দেননি যে, জনসাধারণকে তোমাদের গবেষণা মানার জন্য আহবান করো। তবে দ্বীন সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে কেউ তাঁদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সঠিক মাসআলা জানিয়ে দেয়া তাঁদের দায়িত্ব। আর তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান লিখিতভাবে জনসাধারণের সামনে রেখে যাওয়া এবং অসংখ্য যোগ্য ছাত্র তৈরির মাধ্যমে তাঁরা সেটা যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। অতএব, তাঁরা আমাদেরকে আপন মাযহাবের দিকে না ডাকলেও আমরা আমাদের প্রয়োজনে তাঁদের অনুসরণ করবো; এটাই স্বাভাবিক কথা। মাযহাব মানার বিরোধিতা করে যারা অন্যকে তাদের নব্য মতাদর্শের দিকে আহবান করছেন নবীজী কী তাদের অনুকরণের কথা উম্মতকে বলে গেছেন?

জবাব-২ : 'হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব' কথার অর্থ এই যে, ইমামগণের গবেষণার পক্ষে কোন হাদীস না থাকতে হবে। আর এর বিপরীতে হাদীস থাকতে হবে এবং তা সহীহ হতে হবে। যদি গবেষণালব্ধ বিষয়ে এবং তার বিপরীতে কোন হাদীস-কুরআন না পাওয়া যায় অথবা গবেষণার পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় দিকে আয়াত বা হাদীস বিদ্যমান থাকে সে ক্ষেত্রে জনসাধারণকে ইমামের গবেষণার উপরই আমল করতে হবে। এমনকি ইমামের গবেষণার পক্ষের হাদীস যদি দৃশ্যত জঈফও হয় আর এর বিপরীতে সহীহ হাদীস থাকে তাহলেও জনসাধারণের জন্য ইমামের গবেষণাই মানতে হবে। কারণ কোন হাদীস সহীহ বা জঈফ সাব্যস্ত হওয়া স্বতন্ত্র একটি গবেষণার ফলাফল। এ ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের কোন সিদ্ধান্ত থাকা সম্ভব নয়। কোন ইমাম কোন একটি হাদীস অনুযায়ী তাঁর মাযহাব স্থির করার অর্থ এটাই যে, উক্ত ইমামের দৃষ্টিতে হাদীসটি সহীহ। অতএব, ভিন্ন আরেকজন গবেষক ইমামের সিদ্ধান্ত দ্বারা ঐ ইমামের মাযহাব ছেড়ে দেয়ার অর্থ হলো কারণ ছাড়া প্রাধান্য দেয়া যা বৈধ নয়। হ্যাঁ, বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম যদি একমত হন যে, ঐ হাদীসটির পক্ষে আর কোন সমর্থক দলীল নেই যা দ্বারা জঈফ হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহলে তারা ইমামের মাযহাব ছেড়ে সহীহ হাদীস মেনে নিবেন। যেহেতু গবেষক ইমামগণ ভুলের উর্ধ্বে নন। স্মরণে রাখতে হবে যে, 'হাদীস সহীহ হলে সেটা আমার মাযহাব' বাণী দ্বারা ইমামের মাযহাব ছেড়ে হাদীস মানার

নির্দেশ কেবল তার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে যিনি মুজতাহিদ পর্যায়ের ইমাম। যারা বাংলা অনুবাদ ছাড়া কিছুই বুঝে না তাদের কাজ হবে এ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া। মূর্খতা সত্ত্বেও গবেষণার ধোঁকায় পড়ে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয়া।

উল্লেখ্য, ইমামগণ ঐ সকল বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন যে সকল বিষয়ে তাঁদের জানামতে কুরআন-হাদীসের কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। যেহেতু মানুষ সবজান্তা নয়, এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়ে থাকে যে, কোন গবেষক ইমাম কোন মাসআলা কুরআন-হাদীসে নেই বিশ্বাস করে গবেষণা করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর নিজের কাছে বা অন্য কারো কাছে হাদীস প্রকাশ পেলো যে, এ ব্যাপারে নবী কারীম স. এ কথা বলেছেন। তখন গবেষক ও তাঁর অনুসারী প্রত্যেকের দায়িত্ব হবে নিজেদের মাযহাব ও মতামত ছেড়ে দিয়ে হাদীসে ফিরে আসা। এর ব্যতিক্রম করা কারো জন্য বৈধ নয়। এমন ঘটনা সাহাবায়ে কিরামের যুগেও ঘটেছে। হযরত ওমর রা. তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে শামে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খবর পেলেন যে, সেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে। হযরত ওমর রা. সকলের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা ফিরে যাবো। পরবর্তীতে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. জানালেন যে, এ ব্যাপারে আমার হাদীস জানা আছে। রসূল স. বলেছেন যে, কোন অঞ্চলে মহামারী দেখা দিয়েছে শুনলে সেখানে যেও না। আর তোমরা যেখানে আছো সেখানে মহামারী শুরু হলে পলায়ন করবে না। হযরত ওমর রা. এ কথা শুনে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন এবং ফিরে আসলেন। (বুখারী-৫৩১৮) সুতরাং 'হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব' বলে ইমামগণ কুরআন-ছুন্নাহ'র প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বহি.প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

পঞ্চম আপত্তি : চার মাযহাবের ইমামগণ নিজেরা কারো তাকলীদ করতেন না। তাহলে আমরা কেন তাঁদের তাকলীদ করছি। যদি তাকলীদ জরুরী হয়ে থাকে তাহলে তাঁরা কেন করলেন না?

জবাব : ছূরা তওবা-১২২, ছূরা নাহ্‌ল-৪৩ এবং ছূরা আম্বিয়া-৭ নম্বর আয়াতসহ বেশ কিছু আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে মানুষ দুই প্রকার। এক. ঐ শ্রেণির মানুষ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কুরআন-হাদীসের পর্যাপ্ত ইল্‌ম দান করেছেন। এমনকি তাঁরা মুজতাহিদে

মুতলাক তথা সর্ব বিষয়ে গবেষণার পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব হলো কুরআন-হাদীসের উপর আমল করা এবং প্রয়োজনে গবেষণা করা। কুরআন-হাদীস বুঝার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কারো তাকলীদ করা বৈধ নয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। (ছূরা তাগাবুন-১৬) সুতরাং যাদের দ্বারা কুরআন-হাদীস সরাসরি বুঝা সম্ভব তাদের জন্য ওটাই জরুরী। আর যারা ঐ স্তরের জ্ঞানী নয় তাদের জন্য আবশ্যক হলো সঠিকভাবে কুরআন-ছুন্নাহ'র অনুকরণ করতে হলে ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা প্রমাণিত স্বীকৃত কোন মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব মান্য করা। অতএব, মাযহাব মানার প্রয়োজন মুজতাহিদে মুতলাক তথা সর্ব বিষয়ে গবেষণার পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারীদের জন্য নয়। বরং যারা ঐ স্তরে পৌঁছাতে পারেনি সে সকল উলামায়ে কিরাম এবং জনসাধারণের জন্য। মনে রাখতে হবে ইমাম ত্বহাবী, ইমাম নববী এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.ও নিজেদেরকে ঐ স্তরের মনে করতেন না। এ কারণেই তাঁরা চার ইমামের যে কোন একজনের তাকলীদ করেছেন। সুতরাং অনুবাদই যাদের কুরআন-হাদীস বুঝার সর্বসাকুল্য পুঁজি তারা যেন আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়ে নিজেদেরকে গবেষক ভেবে মাযহাব পরিত্যাগ না করেন। কারণ এর পরিণামে ইসলাম ছুটে যেতে পারে!! এ ক্ষেত্রে বরেণ্য মনীষী ইমামদের পথে চলাই নিরাপদ পন্থা।

আমরা যে কারণে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করি

ফিক্‌হে হানাফীর যে বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি, যে সৌন্দর্য ও অন্তর্সৌন্দর্য রয়েছে তা বিপুল ও বিশাল। কাজী ইমাম আবু বকর আতীক ইবনে দাউদ আল-ইমানী রহ. ফিক্‌হে হানাফীর যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন তা মুগ্ধ হওয়ার মতই। ছিবতু ইবনিল জাওঝী রহ. (মৃত্যু-৬৫৪ হি.) এ বিষয়ে আল-ইন্তিছার ওয়াত তারযীহ নামে স্বতন্ত্র কিতাবই লিখে ফেলেছেন।

মনে রাখা দরকার যে, কোন মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে সেই মাযহাবের ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা দরকার। বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বিবেচনায় ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর গবেষণা অন্য তিন ইমাম ও তাঁদের গবেষণার তুলনায় বহু দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। উক্ত স্বাতন্ত্র্যের কিছু কারণ পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

১। এ মাযহাবের সংকলক হলেন হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.; যিনি ছিলেন গৌরবময় তাবিঈগণের এক অনন্য সদস্য। অথচ অন্য তিন মাযহাবের ইমামগণ গৌরবময় তাবিঈগণের উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সঙ্গত কারণেই হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. ছিলেন রসূল স.-এর যুগের বেশি নিকটবর্তী। ফলে তাঁর সংগৃহীত হাদীস ও আছার অন্য তিন ইমামের সংগৃহীত হাদীস ও আছারের তুলনায় বেশি বিশুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ রসূল স.-এর যুগ থেকে সময়ের দুরত্ব যতটা বেড়েছে; হাদীস ও আছারের বিকৃতি এবং সনদের দুর্বলতা ততটাই বেড়েছে। তাই কুরআন-ছুন্নাহ'র বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও দৃঢ় বর্ণনা গ্রহণের জন্য আমরা এ মাযহাবের অনুকরণ করে থাকি।

২। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহ. এ মহা কৃতিত্বের দাবি রাখেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম ইল্‌মে শরীআতকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচ্ছেদভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন। আর তা এত সুন্দর ও সুচারুরূপে করেছেন যে, আজ পর্যন্ত সুনান ও আহকামের সমস্ত কিতাব তাঁর ফিকহী বিন্যাস অনুযায়ী সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়ে আসছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ফিক্‌হী দক্ষতায় তাঁর অবস্থান ছিলো অন্য তিন ইমামের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে। ফিক্‌হী দক্ষতায় তাঁর উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ। যেমনঃ ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه অর্থাৎ, ইল্‌মে ফিক্‌হ-এর ক্ষেত্রে মানুষ ইমাম আবু হানিফার প্রতি মুখাপেক্ষী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, أَبُو حَنِيْفَةَ أَفْقَهُ النَّاسِ অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা রহ. হলেন শ্রেষ্ঠ ফকীহ। ইমাম শামছুদ্দীন ঐাহাবী রহ. বলেন, الإِمَامَةُ فِي الفِقْهِ وَدَقَائِقِه مُسَلَّمَةٌ إِلَى هَذَا الإِمَامِ অর্থাৎ, ফিক্‌হ এবং তার সূক্ষ্ণতার নেতৃত্ব এ মহান ব্যক্তিত্বের জন্য স্বীকৃত। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত হাফস ইবনে গিয়াছ রহ. বলেন, كَلاَمُ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي الفِقْهِ، أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، لاَ يَعِيبُه إِلاَّ جَاهِلٌ অর্থাৎ, ফিক্‌হের বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কথা চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম। ফলে অজ্ঞ মানুষ ব্যতীত কেউ তাঁর দোষচর্চা করে না। (এ সকল মন্তব্যের উদ্ধৃতি হিসেবে দেখুন- সিয়ারু আলামিন নুবালা, তবকা-৫, রাবী নং-১৬৩।)

এ ছাড়াও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ফিকহী দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছেন জগদ্বিখ্যাত আরো অনেক মহামনিষী। অনেকে তাঁর জীবনীর উপর স্বতন্ত্র কিতাবও রচনা করেছেন। ফিকহী দক্ষতায় তাঁর উচ্চ মর্যাদার মূলে রয়েছে রসূল স.-এর ইল্‌মের ধারক জগদ্বিখ্যাত দুই ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবা হযরত আলী এবং ইবনে মাসউদ রা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে ইল্‌ম হাছিলের সুবর্ণ সুযোগ যা অন্য তিন ইমামের ছিলো না। বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত মাসরূক রহ. বলেন, অর্থাৎ, মুহাম্মাদ স.-এর সাহাবায়ে কিরামের (ইল্‌মী) ঘ্রাণ গ্রহণ করে আমি পেয়েছি যে, তাঁদের ইল্‌ম একত্রিত হয়েছে ছয়জন সাহাবার মাঝে। তাঁরা হলেন- হযরত ওমর, আলী, আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) আবুদ্দারদা, উবাই ইবনে কাআব এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত রা.। পুনরায় উক্ত ছয়জনের ঘ্রাণ গ্রহণ করে আমি পেয়েছি যে, তাঁদের ইল্‌ম একত্রিত হয়েছে দু'জনের মধ্যে। তাঁরা হলেন- হযরত আলী রা. এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। (আল-ইলাল লিইবনিল মদীনী) হযরত মাসরূক রহ. সকল সাহাবায়ে কিরামের ইল্‌মের ধারক হিসেবে যে দুজন বিশিষ্ট সাহাবাকে চিহ্নিত করেছেন তাঁরা উভয়ই শেষ জীবন কাটিয়েছেন ঐ কুফা নগরীতে; যেখানে জন্ম নিয়েছেন, বড় হয়েছেন এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে উক্ত সাহাবাদ্বয় থেকে ইল্‌ম শিখেছেন ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু হানিফা রহ.। সুতরাং তিনি ইল্‌মে ফিক্‌হের সুগভীর সাগরে অনায়াসে সন্তরণ করবেন এটাই স্বাভাবিক।

কুরআন-ছুন্নাহ থেকে প্রয়োজনীয় মাসআলা উদঘাটন করা যেহেতু ফুকাহাদের কাজ। তাই শ্রেষ্ঠ ফকীহ'র সংকলিত মাযহাব নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ মাযহাব। অতএব শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় আমরা এর অনুসরণ করে থাকি।

৩। ফিক্‌হে হানাফীর আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তা কুরআন-ছুন্নাহ ও আছারে সাহাবা থেকে সংগৃহীত। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতাদর্শের কথা আল্লামা ইবনে হাঝাম জাহেরী রহ. বর্ণনা করেন যে, **ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعينين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم** অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আসে তা মাথা ও চক্ষুদ্বয়ের উপর। অর্থাৎ বিনা বাক্যে আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করি। রসূল স.-এর তরফ থেকে যা আসে তা মনোযোগ সহকারে শুনি ও মানি। আর সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে যা আসে সে কথা গ্রহণ করি; তা থেকে বেরিয়ে যাই

না।" (আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম : ৪/১৮৮) অনুরূপ মন্তব্য কাজী ইয়াহইয়া ইবনে যুরাইসের বরাতে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.ও তাঁর 'তারীখ' নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফার এ নীতি-আদর্শের সাথে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আরো সংযোজন করেছেন যে, الْفِقْه أَرْبَعَة مَا فِي الْقُرْآن وَمَا أشبهه وَمَا جَاءَت بِهِ السّنة وَمَا أشبههَا وَمَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة وَمَا أشبهه وَمَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا وَمَا أشبهه অর্থাৎ, ফিক্হ (এর উৎস) হলো চারটি। ১. যা কুরআনে স্পষ্ট বিদ্যমান আছে আর যা তার অনুরূপ। ২. যা ছুন্নাহ'য় স্পষ্ট বিদ্যমান আছে আর যা তার অনুরূপ। ৩. যা সাহাবায়ে কিরাম থেকে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে আর যা তার অনুরূপ। ৪. মুসলিম উম্মাহ যেটাকে উত্তম মনে করে আর যা তার অনুরূপ। (উসূলুস সারাখসী : ১/৩১৮) ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর এ কথার বিশ্লেষণ করে আল্লামা সারাখ্সী রহ. বলেন, فَفِي هَذَا بَيَان أَن مَا أجمع عَلَيْهِ الصَّحَابَة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الثَّابِت بِالْكتاب وَالسّنة فِي كَونه مَقْطُوعًا بِهِ অর্থাৎ, ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কথায় এটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সেটা অকাট্য হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন-ছুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া বিধি-বিধানের মতই দৃঢ়।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর উসূল তথা গবেষণা-র নীতিমালা থেকে বুঝা গেলো যে, কুরআন-ছুন্নাহর পরে আছারে সাহাবা এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝে ব্যাপক সমাদৃত আমলকেও ফিক্হে হানাফীর উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতি-আদর্শের মাধ্যমে যেমনিভাবে ফিকহে হানাফীতে কুরআন-ছুন্নাহ'র বাণীর মূল্যায়ন করা হয়েছে, তেমনি-ভাবে মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রজন্ম পরম্পরায় রসূল স.-এর আখলাক ও আমালের যে আমলী সংরক্ষণ চলে আসছে তারও মূল্যায়ন করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন-ছুন্না'র কোন আমল এ মাযহাব থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কুরআন-ছুন্নাহ'র কোন বিধি-বিধান যেন আমাদের আমল থেকে ছুটে না যায় এ চিন্তা-চেতনার কারণে আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করে থাকি।

৪। বলা যায় যে, ফিকহে হানাফী শুরাভিত্তিক সংকলিত ফিক্হ। কারণ এ মাযহাবের উৎসমূলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সাথে কাজ করেছেন আব্বাসী খিলাফাতের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম ঐাহাবীর ভাষ্যমতে بحور العلم তথা বিদ্যাসাগর বলে খ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ

রহ.সহ মুহাদ্দিস ও ফকীহদের এক বড় জামাআত। এর বিপরীতে অন্য তিন মাযহাবের ফিক্‌হ সংকলিত হয়েছে একক ব্যক্তির ইল্‌মী দক্ষতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং ফিক্‌হে হানাফীতে ভুলের সম্ভাবনা তুলনামূলক খুবই ক্ষীণ। তাই কুরআন-ছুন্নাহ হতে আহরিত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল মাসআলা মেনে চলার তাকিদে আমরা হানাফী মাযহাব গ্রহণ করে থাকি।

৫। ফিক্‌হী বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ইল্‌মের সুক্ষ্মতা অনেক বেশি থাকায় তাঁর গবেষণালব্ধ মাসআলার শাখা-প্রশাখা এত বেশি যে, মাযহাবের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত সহস্রাধিক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও এমন সমস্যা খুব কমই দেখা দেয় যার শুরাহা হানাফী মাযহাবে পাওয়া যায় না। মানুষের ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচারকার্যে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের সমাধানও এ মাযহাবে রয়েছে। শাসক ও বিচারকগণ এটাকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে রাষ্ট্র ও বিচারকার্য পরিচালনা করা তাঁদের জন্য অধিক সহজ, কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হবে। এ কারণেই আব্বাসী খিলাফত আমল থেকে শুরু করে সালতানাতে উসমানিয়া পর্যন্ত এবং পাক-ভারত উপ-মহাদেশে হাজার বছরব্যাপী এ ফিক্‌হ অনুযায়ী বিচার ও আদালত পরিচালিত হয়েছে। আবার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ মাযহাবেরই অনুসরণ করেছেন। তাই এক কথায় বলা যায় যে, 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান'– কেউ এর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে চাইলে তাকে ইমাম আবু হানিফার গবেষণা দেখা উচিত। অতএব সর্বক্ষেত্রে ইসলামী রীতি-নীতির অনুসরণের জন্যই আমরা হানাফী মাযহাব মেনে চলি।

৬। ফিক্‌হে হানাফীর আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে একেবারে নিরুপায় অবস্থায়। অর্থাৎ কুরআন-ছুন্না'য় এবং সাহাবীদের বক্তব্যে মীমাংসা পাওয়া না গেলে কেবল তখনই কিয়াস করা হয়েছে। কিয়াসের প্রতি তাঁর অনাগ্রহের একটি প্রমাণ এই যে, ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত ওয়াকী' রহ. বলেন, **سَمعتُ أَبَا حنيفة يقُول البول فِي المسجد أحسن من بعض القياس.** অর্থাৎ, আমি ইমাম আবু হানিফা রহ.কে বলতে শুনেছি যে, কিছু কিছু কিয়াস আমার দৃষ্টিতে মসজিদে পেশাব করার চেয়েও নিকৃষ্ট। (আল-কামেল লিইবনে আদী: ৮/২৪১, আল-কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

৭। জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা রসূল স.কে উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। (ছূরা আহযাব-২১) সুতরাং রসূল স.-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন যদি রহিত না হয়ে থাকে, রসূল স.-এর বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত না হয়ে থাকে এবং অন্য বর্ণনার তুলনায় অপ্রবল কিংবা বাহ্যিকভাবে কুরআন-ছুন্নাহর ব্যাপক বিধি-বিধানের বিপরীত না হয়ে থাকে তাহলে সবটাই উম্মতের জন্য গ্রহণীয় ও কল্যাণ-কর। মানব জীবনের সফলতাও তাঁর ছুন্নাতের অনুসরণের উপর নির্ভরশী-ল। যার আমলী জেন্দেগীতে রসূল স.-এর ছুন্নাত যতটা বেশি পালিত হবে সে ততটা সফল বলে প্রমাণিত হবে।

উপরিউক্ত নিয়মের আলোকে ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর গবেষণার জন্য এ অনন্য নীতি-আদর্শ গ্রহণ করেছেন যে, একই আমলের বিষয়ে রসূল স. থেকে একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত হয়ে থাকলে তিনি তাঁর গবেষণা দ্বারা এমন একটি পন্থা অবলম্বন করেছেন যাতে আমলযোগ্য কোন হাদীসই বাদ না পড়ে। কোন না কোন পন্থায় যেন সেটা আমলে এসে যায়। এর বহু উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য করে মাত্র একটি উদাহরণ পেশ করছি। তাকবীরে তাহরীমার জন্য হস্তদ্বয় কতটুকু উঠাতে হবে এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ কাঁধ পর্যন্ত। মালেক ইবনে হুআইরিস রা. থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে أُذُنَيْهِ কান পর্যন্ত। তাঁর অপর বর্ণনায় রয়েছে فُرُوعَ أُذُنَيْهِ কানের উপরিভাগ পর্যন্ত। হযরত বারা ইবনে আঝেব রা. থেকে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে إِبْهَامُهُ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতির কাছাকাছি পর্যন্ত। তাঁর থেকে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতি বরাবর। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا রসূল স. উঁচু করে হাত উঠিয়েছেন। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে إِلَى صُدُورِهِمْ সিনা পর্যন্ত। এ বিবাদমান পরিস্থিতিতে তিন ইমামের প্রত্যেকে আপন আপন গবেষণার ভিত্তিতে যে কোন একটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. সবগুলো হাদীসের প্রতি গভীর চিন্তা করে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যাতে একযোগে সব হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়। তিনি বলেন, এমনভাবে হাত উঠাতে হবে যে, বৃদ্ধাঙ্গুল থাকবে

কানের লতি বরাবর। অন্য আঙ্গুলগুলোর মাথা থাকবে কানের উপরে। হাতের পাঞ্জা থাকবে কান বরাবর। বাহু থাকবে কাঁধ বরাবর। আর কনুই থাকবে সিনা বরাবর। এ আমলের অনুকরণ করা হলে রসূল স.-এর কোন ছুন্নাতই আমাদের আমল থেকে বাদ পড়বে না। রসূল স.-এর সকল ছুন্নাত মানার মাধ্যমে আমরা সফলতার শীর্ষে থাকবো বলে আশা করতে পারি। সুতরাং আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করি রসূল স.-এর সকল ছুন্নাতের অনুকরণের মাধ্যমে আখেরাতে সফল হওয়ার জন্য।

মোটকথা–

১. হানাফী মাযহাব রসূল স.-এর যুগের বেশি নিকটবর্তী।

২. এ মাযহাবের সংকলক বিশিষ্ট্য তাবিঈ এবং শীর্ষ ফকীহ।

৩. এ মাযহাবের মাসআলাগুলো এক জামাআত ফকীহ ও মুহাদ্দিস কর্তৃক সংকলিত।

৪. এ মাযহাবে গবেষণালব্ধ মাসআলার শাখা-প্রশাখা অনেক বেশি।

৫. এ মাযহাবে রসূল স.-এর সকল ছুন্নাতকে আমলে নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে।

৬. দলীল-প্রমাণাদি বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হলে ফিকহে হানাফীতে কুরআনে কারীমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৭. এ মাযহাবে সব হাদীসের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৮. দলীলের পর্যায় ও স্তরের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

৯. শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ দলীল-প্রমাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

১০. ইজতিহাদ বা গবেষণার নীতিমালা প্রণয়নে যেমনিভাবে সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় দেয়া হয়েছে।

ফিকহে হানাফীর এসব বৈশিষ্ট্য কেবল আমরা হানাফী হিসেবে উল্লেখ করছি তা নয়; বরং ভিন্ন মাযহাবের অনুসারীরাও অকপটে স্বীকার করেছেন।

ছুন্নাতের অনুসরণে রয়েছে হিদায়াতের নিশ্চয়তা

عن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رواه مالك فى باب النهى عن القول فى القدر–٣٦٣)

অনুবাদ : ইমাম মালেক রহ. বলেন, তাঁর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এটাকে আঁকড়ে ধরবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তাঁর নবী স.-এর ছুন্নাত। (মুয়াত্তা মালেক, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬১৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ঝুরকানী রহ. বলেন, **أن بلاغه صحيح كما قال ابن عيينة** অর্থাৎ, আমার নিকট পৌঁছেছে বলে ইমাম মালেক রহ. যা বর্ণনা করে থাকেন তা সহীহ। যেমনটি বলেছেন ইবনে উইয়াইনা। (শরহুল মুয়াত্তা লিঝ ঝুরকানী) এ ছাড়া পূর্ববর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস দ্বারাও এটা সমর্থিত। সহীহ লিগাইরিহী সনদে অনুরূপ বর্ণনা মুসতাদরাকে হাকেম-৩১৮ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

হাদীছ থেকে যা প্রমাণিত : উপরিউক্ত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, হিদায়াতের উপর অটল থাকার জন্য রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে কিতাবু-ল্লাহ এবং ছুন্নাত মেনে চলার তাকিদ দিয়েছেন। সাথে সাথে এ নিশ্চয়তাও দিয়েছেন যে, তোমরা এটা আঁকড়ে ধরে থাকলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

বর্তমান কালের কিছু মানুষ নিজেদেরকে ছুন্নাত থেকে সরিয়ে নিয়ে উম্মতকে হাদীস মানার আহবান করছে। অথচ হিদায়াতের নিশ্চয়তা রয়েছে ছুন্নাতে। আবার অন্যদিকে রসূল স. কর্তৃক ছুন্নাত মানার আহবানকে সংকীর্ণ করে ছুন্নাতের সাথে সহীহ হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়ে মানুষকে সহীহ ছুন্নাহ'র দিকে আহবান করছে। অথচ সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে তাঈগণ এমন বহু ছুন্নাতের উপর আমল করেছেন যা সহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। তাঁরা এটাকে হিদায়াতের মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাহলে উত্তম যুগের আমলের পথকে সংকীর্ণ করে ছুন্নাতের সাথে শর্ত যুক্ত করায় কোন্ হাদীসের অনুকরণ হচ্ছে তা স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, হাদীস এবং ছুন্নাতের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ।

এক. রসূল স.-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের নাম হাদীস। আর উম্মতের করণীয় বা দ্বীনের অনুসরণীয় পন্থার নাম ছুন্নাত।

দুই. ছুন্নাত হলো আমল আর হাদীস হলো আমলের দলীল। সব দলীলই বিশ্বাস করতে হবে, তবে সবটাই পালনযোগ্য নয়।

তিন. হাদীসের মধ্যে মানছূখ (রহিত) আছে কিন্তু ছুন্নাতের মধ্যে কোন

মানছুখ নেই। মানছুখ কয়েক প্রকার হতে পারে। ক. মানছূখ তবে আমল করা জায়েয। যেমন, আগুনে পাকানো কোন কিছু খেয়ে অযু করা। (আবূ দাউদ-১৯১) খ. এমন মানছূখ যার উপর আমল করাও জায়েয নয়। যেমন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করা। (বুখারী-৪১৩৪)

চার. হাদীসের মধ্যে রসূল স.-এর এমন বৈশিষ্ট্যের বিবরণ রয়েছে যা অন্যদের জন্য পালন করা জায়েয নয়। যেমন নবী কারীম স. কর্তৃক বহু বিবাহ করা। (বুখারী-৪৬৯৭) নবী কারীম স. ঘুমালেও অযু ভঙ্গ হতো না। (বুখারী-১৪০) এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও উম্মতের জন্য পালনীয় নয়। অতএব, এ থেকে বলা যায় যে, সব ছুন্নাতই হাদীস তবে সব হাদীস ছুন্নাত নয়।

পাঁচ. হাদীসের মধ্যে অনেক জায়েয কাজের বিবরণ আছে যেটা স্বাভাবিক অবস্থায় মাকরূহ। যেমন, রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক দাঁড়িয়ে পেশাব করা (বুখারী-২৩০৯)। আবার অনেক জায়েয কাজের বিবরণ আছে যা স্বাভাবিক অবস্থায় অনুত্তম। যেমন মাগরিবের পূর্বে নফল পড়া। (বুখারী-১১১২) এ দুটি বিষয় সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও উম্মতকে এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়নি। অথচ ছুন্নাতের প্রতি রসূলুল্লাহ স. মানুষকে ঢালাওভাবে আহবান জানিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. হযরত আনাস রা.কে বলেন, **يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ** অর্থাৎ, হে বৎস! এটা আমার ছুন্নাত। আর যে আমার ছুন্নাত জিন্দা করলো সে আমাকে ভালোবাসলো। আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (তিরমিযী-২৬৭৮) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ ছাড়াও সহীহ হাদীসের বর্ণনায় রসূল স. উম্মতকে তাঁর নিজের ছুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফ-াগণের ছুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযী-২৬৭৬, আবূ দাউদ-৪৫৫২, ইবনে মাযা-৪২, মুসনাদে আহমদ-১৭১৪২)

অতএব, হিদায়াতের উপর অটল থাকতে সকলকেই ছুন্নাতের অনুসারী হতে হবে। আর এতেই রয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা।

যে অঞ্চলে যে ছুন্নাত চালু আছে সেখানে তা চলতে দেয়া

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. কর্তৃক খলিফা আবু জাফর মানছূরকে দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ পেশ করছি। খলিফা আবু জাফর মানছূর

যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তিনি হযরত ইমাম মালেক রহ.কে একদিন বললেন, বিভিন্ন ইল্‌মকে আমি এক ইল্‌ম বানিয়ে দিতে চাই। অর্থাৎ বিভিন্ন শহরে মাসআ-লাগত যে সকল মতবিরোধ রয়েছে সেগুলোকে আমি একটি মতের উপর আনতে চাই। বিভিন্ন শহরে অবস্থিত সেনা প্রধান এবং বিচারকদের নিকট আপনার মুয়াত্তা কিতাবটি লিখে পাঠিয়ে দিবো তারা সকলে এর উপর আমল করবে। যদি কেউ এর বিরোধিতা করে তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। এ কথার জবাবে ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমি বরং ভিন্ন একটি পদ্ধতির কথা আপনাকে বলি, রসূলুল্লাহ স. এ উম্মতের মধ্যে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন এবং নিজেও যুদ্ধে বেরিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেন তখনও পর্যন্ত বেশি অঞ্চল বিজিত হয়নি। অতঃপর হযরত আবু বকর রা. খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তখনও বেশি অঞ্চল বিজিত হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়নি। অতঃপর হযরত ওমর রা. খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তাঁর হাতে বহু অঞ্চল বিজয় হলো। তাদের দ্বীন শিক্ষার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণের বিকল্প কোন ব্যবস্থা তিনি পেলেন না। আজ পর্যন্ত প্রজন্ম পরম্পরায় সে সকল সাহাবায়ে কিরাম থেকে গৃহীত ইল্‌ম তাদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। এখন যদি আপনি তাদের পরিচিত ইল্‌ম থেকে সরিয়ে নিয়ে অপরিচিত কোন ইল্‌ম শিখাতে চান তারা এটাকে কুফরী মনে করবে। এর চেয়ে বরং প্রত্যেক শহরে যে ইল্‌ম চালু আছে আপনি তাদেরকে সে ইল্‌মের উপর বহাল থাকতে দিন। তবে আপনি এ ইল্‌ম অর্থাৎ মুয়াত্তা কিতাবটি নিজের জন্য গ্রহণ করুন। খলিফা আবু জাফর মানছূর বললেন, আপনি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন। (তাকদিমাতুল মা'রিফা লিকিতাবিল যর্‌হি ওয়াত্ তা'দীল, পৃষ্ঠা-২৯)

সারসংক্ষেপ : ইমাম মালেক রহ.-এর এ গুরুত্বপূর্ণ নছিহত থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উম্মতের মধ্যে প্রচলিত দ্বীনের যে সকল ছুন্নাত চালু রয়েছে তার প্রত্যেকটি ছুন্নতের মূলে রয়েছে সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষা। সুতরাং এর কোনটাকে বিলুপ্ত করে সকল উম্মতকে এক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ছুন্নাত পরিপন্থী এবং উম্মতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির কারণ হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

মুসলিম উম্মাহ'র প্রতি উদাত্ত আহ্বান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অনুবাদ : যারা প্রথম ও অগ্রজ মুহাজির-আনসার এবং যারা সঠিক-ভাবে তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তাঁরা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই হলো মহা সফলতা। (ছূরা তাওবা: ১০০)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের সফলতা সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে। পরকালীন সফলতার জন্য আমাদের উচিত হবে সর্বক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

কুরআন-হাদীসের মাসআলা বুঝার ক্ষেত্রে যেভাবে বর্তমান সময় উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, এভাবে মুজতাহিদ ইমামগণ, তাবিঈ, তাবে তাবিঈ এমনকি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও সৃষ্টি হতো। উদাহরণ হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي،لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَاة زلَمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً– ١/١٢٩)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.আমাদেরকে খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বললেন, সকলেই আছর পড়বে বনী কুরাই-যায় গিয়ে। পথিমধ্যে আছরের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। কেউ কেউ বললেন, আমরা বনী কুরায়যায় না গিয়ে নামায পড়বো না। আবার অন্যরা বললেন, আমরা বরং এখানেই নামায পড়বো। (আমরা নামায ছেড়ে দিবো) এটা আমাদের থেকে কামনা করা হয়নি। অতঃপর এ মতবিরোধের ঘটনা নবী কারীম স.-এর নিকট বলা হলে তিনি তাদের কাউকে তিরস্কার করলেন

না। (বুখারী : ৮৯৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৬০৯৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও মতবিরোধ সৃষ্টি হতো যার বহু উদাহরণ রয়েছে। নমুনা হিসেবে একটি মাত্র উদাহরণ পেশ করা হলো। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো- মাসআলা বা আমলগত মতবিরোধ তাঁদের পারস্পারিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্কে কোন ফাটল সৃষ্টি করত না। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এ কথা বলে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ "তাঁরা কাফিরদের ব্যাপারে ছিলেন বজ্রকঠিন, তবে নিজেদের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত দয়াপরবশ"। (ছূরা ফাতাহ : ২৯) কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে মনের দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব এমনকি মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেও বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোন একজন ইমামের অনুসরণে ছুন্নাতের উপর ঐক্যবদ্ধ সমাজকে সহীহ হাদীসের দিকে আহবানের নাম ব্যবহার করে নতুন করে দ্বিধাবিভক্ত করা হচ্ছে। তাকলীদের কুৎসা রটিয়ে প্রত্যেকের হাতে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার মত স্পর্শকাতর ও গুরুদায়িত্ব তুলে দেয়া হচ্ছে। এটা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে অসংখ্য দলে বিভক্ত করার চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়া নয় কি? সুতরাং উম্মতের কোন অংশ নিশ্চিত বিদআতের ফাঁদে আটকে না পড়া পর্যন্ত তাদের আমলী ঐক্য নষ্ট করার যে কোন আহ্বান থেকে বিরত থাকার বিনীত অনুরোধ করছি।

হাদীস ও তার কিছু পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা

যেনে রাখা দরকার যে, হাদীসের পারিভাষিক বিষয় নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কিরামের অনেক ব্যবহারিক বৈচিত্র রয়েছে। সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যথাযথ ক্ষেত্র এটা নয়। এখানে শুধু ঐ বিষয়ক কিছু প্রাথমিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

হাদীস (حديث) : মুসলিম সমাজের ব্যাপক প্রসিদ্ধি অনুযায়ী হাদীস বলা হয় রসূলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে। তবে মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষায় তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে হাদীস শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। (ক) রসূলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন যা হাদীসে মারফু' নামে পরিচিত। (খ) সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ ও অনুমোদন

যা হাদীসে মাউকূফ নামে পরিচিত। (গ) তাবিঈন বা তাঁদের পরবর্তীদের কথা, কাজ ও সমর্থন যা হাদীসে মাকতু' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, উক্ত কথা, কাজ ও অনুমোদন স্পষ্ট হলে তাকে 'ছরীহ' আর অস্পষ্ট হলে তাকে 'হুক্‌মী' বলে।

মারফু' ছরীহ (مرفوع صريح): রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি স্পষ্টভাবে সম্বন্ধকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে মারফু' ছরীহ হাদীস বলা হয়। যেমন বর্ণনাকারীর কথা 'রসূলুল্লাহ স. বলেছেন বা করেছেন বা রসূলুল্লাহ স.-এর উপস্থিতিতে কোন কিছু করা বা বলা হয়েছে আর তিনি তার প্রতিবাদ করেননি'।

বিধান : সনদ গ্রহণযোগ্য হলে শরীয়াতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত হবে।

মারফু' হুক্‌মী (مرفوع حكمى): রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি অস্পষ্টভাবে সম্বন্ধকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে মারফু' হুক্‌মী হাদীস বলা হয়। যেমন: দ্বীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের কথা বা কাজ যদি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব থেকে বর্ণিত না হয় এবং সে ব্যাপারে ইজতিহাদ বা গবেষণারও কোন সুযোগ না থাকে তাহলে এ ধরনের হাদীসকে মারফু' হুক্‌মী বলা হয়। অর্থাৎ ধরে নেয়া হয় যে, ঐ সাহাবা উক্ত কাজটি রসূলুল্লাহ স.কে করতে দেখে নিজে করেছেন বা উক্ত কথাটি রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে নিজে বলেছেন। তবে স্পষ্টভাবে রসূল স.-এর উদ্ধৃতি দেননি।

বিধান : সনদ গ্রহণযোগ্য হলে শরীয়াতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত হবে। তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এর অবস্থান মারফু' ছরীহ-এর পরে।

মাওকুফ (موقوف): সাহাবায়ে কিরামের প্রতি স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে সম্বন্ধকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে মাউকুফ হাদীস বলা হয়।

বিধান : কুরআন ও মারফু' হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে এটা শরীআতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। মারফু' হাদীসের বিবরণে ভিন্নতা দেখা দিলে মাউকুফ হাদীস যার অনুকূলে হবে তা অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হবে। আবার সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ ও অনুমোদনের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দিলে গবেষক ইমামগণ সার্বিক বিবেচনায় যে কোন একটি প্রাধান্য দিবেন।

মাকতু' (مقطوع): তাবিঈন বা তাঁদের পরবর্তী কারো প্রতি স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে সম্বন্ধকৃত কথা, কাজ বা অনুমোদনকে মাকতু' হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার। তবে মারফু' এবং মাওকুফ হাদীসকেও কখনো কখনো আছার বলা হয়।

বিধান : কুরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে মুজতাহিদ (গবেষক) ইমামগণের নিকট আছার শরীআ-তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ছূরা নিসা : ৫৯ নম্বর আয়াত-এর ব্যাখ্যায় গবেষক ইমামগণ এটা বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী-মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় সকল কিতাবে প্রয়োজন অনুসারে শরীআতের দলীল হিসেবে মাকতু' হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

সনদ/ইসনাদ (سند/اسناد): হাদীস বর্ণনার সূত্রকে সনদ/ইসনাদ বলে। অর্থাৎ যে সকল মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করা হয় তারাই ঐ হাদীসের সনদ/ইসনাদ।

মতন (متن): সনদের শেষে উল্লিখিত হাদীসের মূল পাঠ বা বক্তব্যকে মতন বলে।

মুত্তাসিল (متصل): নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে মুত্তাসিল বলে। অর্থাৎ যে হাদীসের রাবীগণ সকলেই নিজ উস্তাদ থেকে হাদীসটি সরাসরি গ্রহণ করেছেন।

মুনকাতি' (منقطع): বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত ঐ হাদীসকে মুনকাতি' বলে যে হাদীসের সনদে সাহাবার পূর্বে একজন রাবী বা অধারাবাহিকভাবে একাধিক রাবীর নাম অনুল্লিখিত থাকে।

বিধান : নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে ভিন্ন কোন ধারাবাহিক সনদে যদি এটা বর্ণিত না হয়ে থাকে তাহলে সনদ সহীহ না হওয়ার কারণে মুনকাতি' হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হলে এবং সনদ থেকে নাম বাদ পড়া রাবী তাবিঈদের যুগের হলে অনেকে এটাকে গ্রহণ করে থাকেন। যেহেতু ঐ যুগে জঈফ রাবীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য।

মুসনাদ (مسند): সাহাবীর বর্ণিত ঐ মারফু' হাদীসকে মুসনাদ বলে যার সনদের মাঝে কোন ইনকেতা তথা বিচ্ছিন্নতা নেই। কারো কারো মতে সনদসহ বর্ণনাকৃত হাদীসকে মুসনাদ বলে। আবার কারো কারো মতে মারফু' হাদীসকে মুসনাদ বলে চাই তা মুত্তাসিল হোক কিংবা মুনকাতি হোক।

বিধান : নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হলে উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য।

মুআল্লাক (معلق): ঐ সকল হাদীসকে বলা হয় যা লেখক কর্তৃক তাঁর নিজ উস্তাদ বা উস্তাদসহ উপর থেকে একাধারে অনেক রাবীদের নাম উল্লেখ করা ব্যতীত আবার কখনো সম্পূর্ণ সনদ উহ্য রেখে বর্ণনা করা হয়।

বিধানঃ মুআল্লাক হাদীসের সনদে অনুল্লিখিত রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

মুআনআন (معنعن): ঐ সকল হাদীসকে বলা হয় যা বর্ণনাকারী তার উস্তাদ থেকে عَنْ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে থাকে। অর্থাৎ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছে বা আমি শুনেছি– এ জাতীয় স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার না করে عَنْ فُلاَنٍ (অমুক থেকে বর্ণিত) এ জাতীয় অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে।

বিধান : বর্ণনাকারী যদি এমন মুদাল্লিস হন যিনি কোন দুর্বল বা অপরিচিত রাবীর থেকে হাদীস শুনে তার নাম উল্লেখ করতে অনাগ্রহী হয়ে তাদেরকে বাদ দিয়ে এক বা একাধিক উপরের উস্তাদের নাম ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হন, আর মিথ্যা বর্জনের জন্য অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে উক্ত রাবীর বর্ণিত মুআনআন হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বর্ণনাকারী এমন না হলে তার সমসাময়িক উস্তাদ থেকে عن বা এ জাতীয় শব্দে বর্ণনা করলে তা গ্রহণ করা হবে।

মুরসাল (مرسل): ঐ সকল হাদীসকে বলা হয় যা কোন তাবিঈ তাঁর পূর্বের সনদ উল্লেখ ব্যতীত রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন। যেমনঃ কোন তাবিঈ বললেন, যে, রসূল স. এরূপ করেছেন বা বলেছেন। আবার সনদের যে কোন জায়গায় বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলেও আভিধানিক অর্থে কেউ কেউ সেটাকে মুরসাল বলে থাকেন।

বিধান : মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে হিজরী দুই'শ শতকের পূর্বেকার আলেম ও দুই'শ শতকের পরের আলেমদের কর্মপন্থার মাঝে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হিজরী দুই'শ শতকের পূর্বেকার আলেমদের কর্ম পন্থা এই ছিল যে, মুরসাল হাদীস বর্ণনাকারী রাবী যদি নিজে নির্ভরযোগ্য জ্যেষ্ঠ তাবিঈ হন, তাঁর পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ থাকে এবং তিনি জঈফ বা অপরিচিত রাবীদের থেকে বর্ণনা করায় অভ্যস্ত না হন তাহলে মুরসাল হাদীস দলীলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে মুরসাল হাদীস প্রত্যাখ্যান করার কোন করীনা (ইঙ্গিত) পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে দুই'শ শতকের পরের আলেমদের কর্মপন্থা হলো মুরসাল হাদীসকে গ্রহণ না করে এ বিষয়ে স্থগিত থাকা। তবে গ্রহণ করার কোন করীনা বা হেতু পাওয়া গেলে গ্রহণ করা। এ কর্মপন্থাগত পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك بن أنس وَالْأَوْزَاعِيّ

حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهَا وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره رضوَان الله عَلَيْهِم হযরত সুফিয়ান ছাওরী, মালেক ইবনে আনাস এবং আওঝাঈ রহ.সহ অতীতের উলামায়ে কিরাম মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করতেন। ইমাম শাফেঈ রহ. এসে এ ব্যাপারে প্রথম আপত্তি তুললেন। আর ইমাম আহমদ এবং অন্যান্যরা তাঁর অনুকরণে আপত্তি তুললেন। (রিসালাতু আবি দাউদ)

শায (شاذ): অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কিরামের নিকট শায ঐ হাদীসকে বলা হয় যেটা হাদীসের ইমাম ব্যতীত যে কোন গ্রহণযোগ্য রাবী একক সনদে বর্ণনা করেন এবং ভিন্ন কোন সনদে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে ইমাম শাফেঈ এবং তাঁর অনুসারীগণ শাযের সংজ্ঞা এভাবে দিয়ে থাকেন যে, নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত ঐ হাদীসকে শায বলে যার তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য অথবা বেশি সংখ্যক নির্ভরযোগ্য রাবী তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

বিধান : এমন হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এর বিপরীত মাহফুয হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে।

মাহফুয (محفوظ): ইমাম শাফেঈ রহ. কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক শায-এর বিপরীতে যে হাদীসকে প্রাধান্য দেয়া হয় সেটাকে মাহফুয বলে।

বিধান : মাহফুয হাদীস গ্রহণযোগ্য।

গরীব (غريب): যে হাদীসের সনদের সর্বস্তরে বা যে কোন স্তরে রাবীর সংখ্যা একজন হয় তাকে গরীব বলে। গরীব হাদীসকে ইমাম আহমদ রহ. মুনকারও বলে থাকেন।

বিধান : গরীব হাদীসের বর্ণনাকারীগণ হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম হলে এবং হাদীসটির সনদে অন্য কোন ক্রুটি না থাকলে তা সহীহ হিসেবে গণ্য হবে।

সহীহ লিজাতিহী (صحيح لذاته): ক. ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাবীগণের নিরবচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত এবং শায ও বর্ণনাজনিত ক্রুটি থেকে মুক্ত হাদীসকে সহীহ বলে।

বিধান : এটা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এ হাদীসের মূল কথা, কাজ বা অনুমোদন যাঁর, এটা তার অবস্থান হিসেবে মূল্যায়িত হবে। বিবাদমান হাদীসের মধ্যে প্রধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে এটা মুতাওয়াতির ব্যতীত অন্যান্য সনদের তুলনায় বেশি অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ. কুরআনের আয়াত বা অন্য কোন সহীহ হাদীসের সমর্থন কিংবা উম্মতের ব্যাপক গ্রহণ অথবা অন্য কোন কারণে কোন হাদীসকে যদি উলাম-ায়ে কিরাম ব্যাপকভাবে কবুল করেন তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম সেটাকেও অর্থের বিবেচনায় সহীহ বলেন। যদিও সে হাদীসটির সনদে পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসের শর্তাবলি না পাওয়া যায়।

বিধান : এটা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে এটাকে এমন বিশুদ্ধ একক সনদে বর্ণিত হাদীসের উপরও প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে যে হাদীসের পক্ষে উম্মতের ব্যাপক আমল না পাওয়া যায়।

গ. কখনো কখনো একই হাদীসের বিভিন্ন সনদের মধ্যে তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য সনদটি চিহ্নিত করার জন্যও সহীহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তখন এর দ্বারা পারিভাষিক সহীহ উদ্দেশ্য হয় না।

বিধান : তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য ঐ সনদটির মধ্যে 'ক' বা 'খ' নং সহীহ হাদীসের শর্তাবলি পাওয়া গেলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় নয়।

ঘ. আবার সনদের নির্দিষ্ট একটি অংশকে উদ্দেশ্য করে সহীহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যদিও পারিভাষিক সংজ্ঞা অনুযায়ী এর কোনটিই সহীহ নয়।

বিধান : পূর্ণ সনদের মধ্যে 'ক' বা 'খ' নং সহীহ হাদীসের শর্তাবলি পাওয়া গেলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় নয়।

সহীহ লিগাইরিহী (صحيح لغيره): ন্যায়নিষ্ঠ ও সাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাবীর নিরবচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত এমন হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলা হয় যা শায ও বর্ণনাজনিত ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং একাধিক সূত্রের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত।

বিধান : এটা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এ হাদীসের মূল কথা, কাজ বা সমর্থন যার, এটা তার অবস্থান হিসেবে মূল্যায়িত হবে। বিবাদমান হাদীসের মধ্যে প্রধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে এর অবস্থান সহীহ লিজাতিহী হাদীসের পরে।

হাসান লিজাতিহী (حسن لذاته): ন্যায়নিষ্ঠ ও সাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন রাবীর নিরবচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত এমন হাদীসকে হাসান বলা হয় যা শায ও বর্ণনাজনিত ত্রুটি থেকে মুক্ত। পূর্ব যুগের মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীসকেও হাসান বলতেন। আবার আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে সহীহ থেকে জাল

পর্যন্ত যে কোন ধরনের হাদীসের মধ্যে কোন ভালো গুণ পাওয়া গেলে সেটাকেও হাসান বলা হয়ে থাকে।

বিধান : এটা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এ হাদীসের মূল কথা, কাজ বা অনুমোদন যার, এটা তার অবস্থান হিসেবে মূল্যায়িত হবে। বিবাদমান হাদীসের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে এর অবস্থান সহীহ লিগাই-রিহী হাদীসের পরে।

হাসান লিগাইরিহী (حسن لغيره): মিথ্যার অভিযোগ থেকে মুক্ত, সাধারণ পর্যায়ের দুর্বল রাবীর বর্ণিত এমন হাদীসকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয় যা তার তুলনায় উঁচুস্তরের কোন হাদীসের বিপরীত হবে না এবং বর্ণনাজনিত কোন ত্রুটিও তাতে থাকবে না। সাথে সাথে অনুরূপ অনেক সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সমর্থিত হবে।

বিধান : এটা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এ হাদীসের মূল কথা, কাজ বা সমর্থন যার, এটা তার অবস্থান হিসেবে মূল্যায়িত হবে।

উল্লেখ্য, সালাফদের পরিভাষায় প্রত্যেক আমলযোগ্য হাদীসকে সহীহ বলা হতো। যদিও বিশুদ্ধতার বিবেচনায় এর বিভিন্ন স্তর হতো। পরবর্তীতে মুতাআখখিরগণ মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য হাদীসকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র নাম নির্ধারণ করেছেন। ১. সহীহ লিযাতিহী ২. সহীহ লিগায়রিহী ৩. হাসান লিযাতিহী ৪. হাসান লিগায়রিহী। (তাবসিরা বর মাদখাল পৃ. ৪৮)। কথাটিকে এভাবেও বলা যায় যে, সহীহ হাদীস বলতে ঐ খবরে ওয়াহেদকে বুঝানো হতো যাতে হাদীস গ্রহণের শর্তাবলি বিদ্যমান এবং হাদীস প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ থেকে মুক্ত।

জঈফ (ضعيف): সহীহ ও হাসান হাদীসের গুণাবলিসম্পন্ন নয় আবার রাবীগণের কেউ মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্তও নয় এমন দুর্বল রাবীর একক সনদে বর্ণিত হাদীসকে জঈফ বলে।

বিধান : জঈফ হাদীস শরীআতের বিধি-বিধানের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে অন্য দলীলের সহযোগী হতে পারে। অবশ্য অন্য কোন সমর্থক বর্ণনার সাপোর্ট পাওয়া গেলে তা প্রামাণিক ভিত্তি বলে গণ্য হবে। আর ফযীলত সম্পর্কিত বিষয়ে এটা গ্রহণযোগ্য।

মা'রুফ (معروف): দুর্বল রাবীর বর্ণিত এমন হাদীসকে মা'রুফ বলে যা তার চেয়ে তুলনামূলক বেশি দুর্বল রাবীর বর্ণনার বিপরীতে প্রাধান্য পায়।

মুনকার (منكر): অধিক দুর্বল রাবীর ঐ হাদীসকে মুনকার বলা হয় যা অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় অপ্রবল সাব্যস্ত হয়। আবার ঐ রাবীর বর্ণনাকেও মুনকার বলা হয় যে রাবীর ভুলের পরিমাণ অনেক বেশি বা হাদীস সংরক্ষণে উদাসীন অথবা মিথ্যা ও বিদআ'ত ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের কারণে ফাসিক বলে সাব্যস্ত। অনেক সময় মুনকার শব্দটির ব্যবহার হাল্কা ধরনের জঈফ, মাঝারি পর্যায়ের জঈফ এবং মারাত্নক পর্যায়ের জঈফ-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো মাউযু'-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। মুনকার শব্দটি কোন্ জায়গায় কী অর্থে এসেছে তা নির্ণয় করতে হবে প্রয়োগকারীর কর্মপন্থা ও আগ-পিছের আলোচনা থেকে।

বিধান : এ হাদীস শরীআতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

মাউযু' (موضوع): যে হাদীসের মতন বা মূল পাঠ ইসলামের স্বত:সিদ্ধ মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয় বা যে রাবী নবীর নামে মিথ্যা কথা গড়ে এরূপ হাদীসকে মাউযু' হাদীস বলে।

উল্লেখ্য, হাদীস কখনো মউযু' হয় না। বরং এটাকে মাউযু' বলা হয় এ অর্থে যে, নবীজীর দিকে এটার নিসবাত বা সম্পৃক্তি মাউযু' বা ভিত্তিহী-ন।

বিধান : এ হাদীস প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়। এমনকি এটা মাউযু' এ কথা উল্লেখ না করে তা বর্ণনা করাও জায়েয নয়।

মাত্রূক (متروك): মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক বলে।

বিধান : এ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা অন্য দলীলের সহযোগীও হতে পারে না।

মুতাবে' (متابع): কোন রাবীর বর্ণিত হাদীসটি যদি তাঁর সরাসরি উস্তাদ বা উপরের অন্য কোন উস্তাদ থেকে আরো কোন রাবী বর্ণনা করে তাহলে এই শেষ বর্ণনাটিকে মুতাবে' বলে চাই সেটা পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ শব্দে হোক বা ভিন্ন শব্দে হোক। আবার অন্য সাহাবা থেকে হুবহু শব্দে অনুরূপ বর্ণনা খুঁজে পাওয়া গেলে সেটাকেও মুতাবে' বলে।

শাহেদ (شاهد): কোন রাবীর বর্ণিত হাদীসের মৌলিক বিষয় যদি অন্য কোন সাহাবার বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে এই সমার্থক বর্ণনাটিকে শাহেদ বলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কিরাম মুতাবে'কে শাহেদ আর শাহেদকে মুতাবে' বলে থাকেন।

মানছুখ (منسوخ): কোন হাদীসে বর্ণিত বিধানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সে হাদীসকে মানছুখ (রহিত) বলে।

বিধান : মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সেটা আর দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে এর উপর আমল করাও বৈধ নয়।

নাছেখ (ناسخ): যে হাদীস দ্বারা অন্য কোন হাদীসের বিধান রহিত হওয়ার ঘোষণা বর্ণিত হয় সে হাদীসকে নাছেখ বলে।

বিধান : সনদ গ্রহণযোগ্য হলে এটা শরীআতের দলীল হিসেবে গৃহীত হবে।

মুযতারাব (مضطرب): যে হাদীসের সনদে বা মতনে এমন বৈপরীত্য রয়েছে যা দূরীকরণের কোন উপায় নেই তাকে মুযতারাব বলে। আর এরকম বৈপরীত্যকে ইযতিরাব বলে। তবে হাদীসের মতন তথা মূল বক্তব্যের বৈপরীত্যকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম সাধারণত মুযতারাব বলেন না বরং স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।

বিধান : যতক্ষণ পর্যন্ত কোন একটি সনদ বা মতনকে প্রাধান্য দেয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ স্থগিত থাকবে। আর প্রাধান্য দেয়া গেলে সেটা দলীলযোগ্য বিবেচিত হবে।

ঈমানের কালিমা

عَنْ يُوْسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ إِنْطَلَقَ أَبُوْ ذَرٍّ وَنُعَيْمُ بْنُ عَمِّ أَبِيْ ذَرٍّ وَأَنَا مَعَهُمْ يَطْلُبُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِالْجَبَلِ فَقَالَ بِه أَبُوْ ذَرٍّ يَا مُحَمَّدُ أَتَيْنَاكَ لِنَسْمَعَ مَا تَقُوْلُ قَالَ أَقُوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللهِ فَآمَنَ بِه أَبُوْ ذَرٍّ وَصَاحِبُه. (ذكره الحافظ إبن حجر العسقلانى فى الاصابة فى ترجمة نُعَيْم بْنِ عَمِّ أَبِيْ ذَرٍّ من زِيَادَاتِ الْمَغَازِيْ لِيُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ)

অনুবাদ : হযরত বুরাইদা ইবনে হুসাইব রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু যর রা. ও তার চাচাতো ভাই নুআইম রা. নবী কারীম স.কে তালাশ করছি-লন আর আমি তাদের সাথে ছিলাম। নবী কারীম স. তখন পাহাড়ে লুকিয়েছিলেন। হযরত আবু যর রা. বললেন,: হে মুহাম্মাদ! স. আমরা আপনার কাছে আপনার কথা শুনতে এসেছি। তখন নবী কারীম স. ইরশাদ করলেন : আমি তোমাদেরকে لااله الا الله محمد رسول الله বলি। অর্থাৎ

আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। মুহাম্মাদ স. আল্লাহ তাআলার রসূল। অতঃপর আবু যর রা. ও তার সাথী এ কথার উপর ঈমান আনলেন। (আল্ ইসাবা ফী তামঈযিস সাহাবা: আবু যর গিফারীর চাচাত ভাই নুআইম রা.-এর জীবনী আলোচনায়, সাহাবী নম্বর-৮৭৯২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইউসুফ ইবনে সুহাইব ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ইউসুফ ইবনে সুহাইব ثقة নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব: ৮৮৭৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসতাদরাকে হাকেমেও বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং-৪৫৮৬) হাকেম এবং ইমাম যাহাবী রহ. উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِي عارِضَتِي الجَنَّةِ مَكْتُوباً ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ بالذَّهَبِ السَّطْرُ الأَوَّل لاَإِلهَ إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله والسَّطرُ الثَّانِي ماقَدَّمْنا وَجَدْنا وما أَكَلْنا رَبِحْنا وما خَلَّفْنا خَسِرْنا والسَّطْرُ الثَّالِثُ أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. (رواه ابن النجار في تاريخ بغداد والرافعي في تاريخ قزوين)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে জান্নাতের উভয় পাশে ৩টি লাইন লেখা দেখলাম। ১ম লাইন হলো : **لاإله الا الله محمد رسول الله** অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। মুহাম্মাদ স. আল্লাহ তাআলার রসূল। ২য় লাইন হলো : **ما قدمنا وجدنا، وما أكلنا ربحنا، وما خلفنا خسرنا** আমরা যে আমল আগে পাঠিয়েছি তার প্রতিদান পেয়েছি, যা দুনিয়াতে পানাহার করেছি তা দ্বারা লাভবান হয়েছি, আর যা দুনিয়াতে ছেড়ে এসেছি তাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আর ৩য় লাইন হলো : **أمة مذنبة ورب غفور** উম্মত গুনাহগার এবং পালনকর্তা ক্ষমাশীল। (জামে' সগীর: হাদীস নম্বর-৪১৮৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বেশ কিছু সনদে বর্ণিত হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি সনদে কিছু ত্রুটি থাকলেও সবমিলে এর একটি শক্তি সৃষ্টি হয় যা হাসান লিগাইরিহীর স্তরের নিচে নয়। এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত সহীহ হাদীস ছাড়াও এ কালিমা বর্ণিত হয়েছে হযরত হারেস ইবনে খঝরায রা. থেকে মু'জামে কাবীর লিততবারানী : ৪১৮৮, মু'জামে আওসাত লিত তবারানী: ২১৯, মু'জামে ছগীর লিত তবারানী: ৯৪৮ ও ৯৯২ নম্বর হাদীসে। হযরত ওমর রা. থেকে

আল মু'জামে আওসাত লিত তবারানী: ৫৯৯৬ ও ৬৫০২ নম্বর হাদীসে। হযরত আবু যর রা. থেকে মুসনাদে বায্যার: ৪০৬৫ নম্বর হাদীসে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে মু'জামে কাবীর: ১১০৯৩ এবং হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে জামে' সগীর: ৪১৮৬ নম্বর হাদীসে।

শিক্ষা : আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ এবং রসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশের একটি বাক্য হলো **لاإله الا الله محمد رسول الله** উক্ত বিশ্বাস প্রকাশের আরো অনেক বাক্য রয়েছে। তন্মধ্যে এ বাক্যটি শরীয়াতের অন্যতম শক্তিশালী দলীল তাওয়াতুরে তবকা তথা উম্মতের মধ্যে প্রজন্ম থেকে প্রজান্মন্তরে চলে আসা আমল-এর মাধ্যমে প্রমাণিত। সাথে বিশুদ্ধ সনদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। তাই আমরা এটাকে ঈমানের কালিমা হিসেবে পড়ে থাকি।
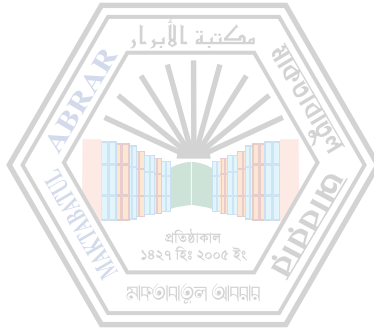
অধ্যায় ১ : ইস্তিঞ্জা

নামাযের পূর্বে ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন থাকলে সেরে নেয়া

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

অনুবাদ : হযরত ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নেই। কেউ যদি দৃষ্টিপাত করে বসে, তবে তো সে প্রবেশই করে ফেললো। ইমামতি করে দুআর বেলায় মুসল্লিদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করা জায়েয নেই। এরূপ করলে তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে। আর পেশাব-পায়খানার বেগরুদ্ধ করে কেউ নামাযে দাঁড়াবে না। (তিরমিযী: ৩৫৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল- ৩৮৪৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন না মিটিয়ে বেগরুদ্ধ অবস্থায় কেউ নামাযে দাঁড়াবে না। পেশাব পায়খার চাপ মুসল্লির একাগ্রতা নষ্ট করে দিলে নামায মাকরূহ হবে। (আল-বাহরুর রায়েক : ২/৩৫)

ইস্তিঞ্জা আড়ালে করা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ .(رواه ابو داود فى بَابِ التَّخَلِّي

عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ– ١/٢)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. শৌচকর্ম সম্পাদনে এত দূরে যেতেন যেন কেউ তাঁকে দেখতে না পায় (আবূ দাউদ-২, ইবনে মাযা-৩৩৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিঞ্জা আড়ালে করতে হবে। অনুরূপ হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। (মু'জামে তবারানী আওছাত-৯১৮৯) এ ছাড়াও আবূ দাউদ শরীফ-২২ নং হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. একটি ঢাল দ্বারা আড়াল করে পেশাব করেছেন।

আয়াত বা আল্লাহর নাম লিখিত বস্তু নিয়ে ইস্তিঞ্জায় না যাওয়া

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي نقش الخَاتَمِ– ١/٣٠٥)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশ করতেন তখন আংটি খুলে রাখতেন। (তিরমিযী: ১৭৫২)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীস-টি হাসান, সহীহ, গরীব। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২৮৪২)

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْخَلاَءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ الْخَاتَمَ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ

অনুবাদ : ইবনে আবী রওয়াদ থেকে বর্ণিত, হযরত ইকরিমা রহ. বলেন, কেউ যখন আল্লাহর নাম অঙ্কিত আংটি পরিহিত অবস্থায় ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশ করে সে যেন আংটির পাথরটি হাতের ভেতর নিয়ে মুঠো করে নেয়। (ইবনে আবী শাইবা: ১২১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আব্দুল আজীজ ইবনে আবি রওয়াদ

ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল আজীজ ইবনে আবি রওয়াদ নির্ভরযোগ্য (আল কাশেফ-৩৩৮৭)।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম অঙ্কিত আংটি বা অনুরূপ কিছু নিয়ে ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশ করা মাকরূহ; আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরীঃ ১/৫০) অতএব তাবীজ-কবজ ইত্যাদি অনাবৃত থাকলে ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশের সময় তা খুলে নিবে অথবা ঢেকে রাখবে। খোলা ময়দানে ইস্তিঞ্জা করার ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে।

বসে পেশাব করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِدًا. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَبُرَيْدَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ (رواه الترمذى فى بَابِ النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا– ١/٩)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, যদি কেউ তোমাদেরকে বর্ণনা করে যে, রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন তবে তা বিশ্বাস করো না। তিনি সব সময় বসেই পেশাব করতেন। (তিরমিযী : ১২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এ অধ্যায়ের সর্বোত্তম ও সর্বাধিক সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীস-টি মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১০৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. সর্বদা বসে পেশাব করতেন। সুতরাং এটাই হওয়া উচিত উম্মতের অনুকরণীয় আমল। তবে তিনি কখনো 'দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন না' কথাটা হযরত আয়েশা রা. তাঁর জানামতে বলেছেন। অন্যথায় কমপক্ষে একবার তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তা হযরত হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত আছে। (বুখারী:-২২৪) সুতরাং শরীয়াতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ব্যতীত দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ; আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৪৪, আলমগিরী : ১/৫০)

কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে কোথাও ইস্তিঞ্জা না করা

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى. (رواه البخارى فى بَابِ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالْمَشْرِقِ–١/٥٧)

অনুবাদ : হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, যখন তোমরা ইস্তিঞ্জাখানায় যাবে তখন কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসবে না, বরং পূর্ব/পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। হযরত আবু আইয়ূব রা. বলেন, আমরা সিরিয়া গিয়ে সেখানকার ইস্তিঞ্জাখানাগুলো কিবলামুখী করে নির্মিত পেলাম। আমরা তা ব্যবহারের সময় শরীর ঘুরিয়ে বসতাম, তার পরেও আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। (বুখারী : ৩৮৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী এবং মুয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫০৯৮)

উল্লেখ্য, মদীনা থেকে কিবলার অবস্থান দক্ষিণে হওয়ায় পূর্ব/পশ্চিম দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জা করতে বলা হয়েছে।

শিক্ষণীয় : হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন যে, সিরিয়ার ইস্তিঞ্জাখানাগুলো কিবলার দিকে ফিরিয়ে নির্মিত ছিল। তাঁরা তা ব্যবহারের সময় শরীর ঘুরিয়ে বসতেন, তার পরও আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, খোলা ময়দানের মত ইস্তিঞ্জাখানার ভেতরেও কিবলার প্রতি সম্মান দেখানো জরুরী এবং ওযর ব্যতীত কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী: ১/৫০)

এর বিপরীতে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত হাফসার ঘরের ছাদে উঠে রসূল স.কে ইস্তিঞ্জাখানার মধ্যে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে দেখেছেন। (বুখারী-১৪৭) এ হাদীসের তুলনায় আমরা পূর্ববর্ণিত হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা.-এর হাদীসকে এ কারণে প্রাধান্য দিয়ে থাকি যে, কা'বার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে ইস্তিঞ্জা করার নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সকলের জন্য ব্যাপক। আর হযরত ইবনে ওমর রা. কর্তৃক বর্ণিত রসূল স.-এর উক্ত কাজটি তাঁর ব্যক্তিগত। সুতরাং হতে

পারে এটা রসূল স.-এর বৈশিষ্ট্য যা অন্যদের জন্য বৈধ নয়। অথবা এটা তিনি কোন ওযরের কারণে করেছেন। উপরন্তু হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা.-এর হাদীস অনুসরণ করলে কা'বার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

মাথা ঢেকে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ اليَهُودِيِّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً.

অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. কয়েকজন আনসারী ব্যক্তিকে আবু রাফে' ইহুদীর উদ্দেশ্যে পাঠালেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা.কে তাদের আমীর বানিয়ে দিলেন। আবু রাফে' রসূল স.কে খুব বেশি কষ্ট দিতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য করতো। সে বসবাস করতো হেজাযে অবস্থিত তার দুর্গে। সাহাবায়ে কিরামের দলটি যখন দুর্গের নিকটবর্তী হলেন। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন সন্ধ্যায় তাদের গবাদী পশু নিয়ে (বাড়ীতে) রওয়ানা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা. তাঁর সাথীদেরকে বললেন, তোমরা এখানে অবস্থান করো। আমি যাই এবং দুর্গে প্রবেশের জন্য দারোয়ানের সাথে কোন কৌশল গ্রহণ করি। আশা করি আমি দুর্গে প্রবেশ করতে পারবো। অতঃপর তিনি দরওয়াজার নিকটে আসলেন এবং এমনভাবে মাথা ঢাকলেন কেমন যেন তিনি ইস্তিঞ্জা করছেন। (বুখারী-৩৭৪৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً (এমনভাবে মাথা ঢাকলেন কেমন যেন তিনি ইস্তিঞ্জা করছেন) থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাথা ঢেকে ইস্তিঞ্জা করার নিয়ম রসূল স.-এর

জীবদ্দশাতে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো। সুতরাং এটা ছুন্নাত হিসেবে স্বীকৃত।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، قَالَ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَظَلُّ حِينَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُغَطِّيًا رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي.

অনুবাদ : হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন, হে মুসলিমগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে লজ্জাশীল হও। ঐ আল্লাহর কসম, যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, আমি যখন পেশাব-পায়খানার জন্য খোলা জায়গায় যাই তখন আমার রব থেকে লজ্জার কারণে মাথা ঢেকে রাখি। (ইবনে আবী শাইবা: ১১৩৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। ইমাম বায়হাকী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং রসূল স. থেকে এ বিষয়ে মুরসাল সনদে হাদীস বর্ণিত আছে বলেও মন্তব্য করেছেন। (সুনানুল কুবরা লিল্‌বায়হাকী-৪৫৫ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রা. এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিঞ্জার সময় মাথা ঢেকে নিতে হয়। ইস্তিঞ্জার সময় মাথা ঢেকে যাওয়ার আমল হযরত আবু মূসা আশআরী রা. থেকেও বর্ণিত আছে । (ইবনে আবী শাইবা-২৫৩৫৬) অনুরূপ আমল হযরত আনাস রা. থেকেও বর্ণিত আছে। (আব্দুর রাজ্জাক-৭৪৫) সুতরাং ইস্তিঞ্জার সময় মাথা ঢেকে যাওয়া মুস্তাহাব; আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৫০) হযরত হাবীব ইবনে ছালেহ-এর বর্ণনায় মাথা ঢাকার সাথে জুতো পারে ইস্তিঞ্জায় যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। (সুনানুল কুবরা লিল্‌বায়হাকী-৪৫৬)

ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশের পূর্বে দুআ পড়া

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (رواه البخارى فى بَابِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ-١/٢٦)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন : **اللهمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ**

وَالْخَبَائِثِ "হে আল্লাহ, আমি মন্দকাজ ও শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (বুখারী: ১৪৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২৩১৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশের পূর্বে উপর্যুক্ত দুআ পড়া মুস্তাহাব। অবশ্য হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. উক্ত দুআর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা-৫) সুতরাং বিসমিল্লাহসহ দুআটি পড়া উত্তম হবে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৪৫) উল্লেখ্য খোলা ময়দানে কেউ ইস্তিঞ্জা করতে চাইলে সতর খোলার পূর্বে উক্ত দুআ পাঠ করবে। কেউ দুআ পড়তে ভুলে গিয়ে ইস্তিঞ্জাখানায় ঢুকে পড়লে ইস্তিঞ্জাখানার ভেতর পরিচ্ছন্ন হলে দুআ পড়বে। আর অপরিচ্ছন্ন হলে শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে দুআ পড়বে। কারণ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে আল্লাহর জিকির করা উচিত নয়।

বর্তমানে টয়লেট ও গোসলখানা একই কক্ষে বা রুমে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গোসলখানা যদি বড় হয় এবং টয়লেটের প্যান বা কমোড অযুর বেসিন বা ট্যাপ থেকে কিছুটা দূরত্বে থাকে তাহলে সেখানে অযু-গোসলের সময় দুআ পড়া যাবে। আর যদি একই জায়গায় হয় তবে মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে দুআ পড়ার অবকাশ রয়েছে। (মাআরিফুস সুনান ১/৭৭, রদ্দুল মুহতার ১/৩৪৪)

জমিনের নিকটবর্তী হয়ে সতর খোলা

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ (رواه البو داود فى بَابِ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ)

অনুবাদ : হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন পেশাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তখন জমিনের নিকটবর্তী না হয়ে কাপড় উঠাতেন না। (আবু দাউদ: ১৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীস-টিকে হাসান বলেছেন। (আবু দাউদ-১৪ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী-১৪)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিঞ্জার সময় জমিনের নিকটবর্তী না হয়ে সতর খুলবে না। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী: ১/৫০)

ঢেলা-কুলুখ দ্বারা পেশাব থেকে পবিত্র হওয়া

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَوْلَى عُمَرَ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا بَالَ قَالَ: نَاوِلْنِي شَيْئًا أَسْتَنْجِي بِهِ قَالَ فَأُنَاوِلُهُ الْعُودَ اوَالْحَجَرَ أَوْ يَأْتِي حَائِطًا يَتَمَسَّحُ بِهِ أَوْ يُمِسُّهُ الأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَغْسِلُهُ. وَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِىَ فِى هَذَا الْبَابِ وَأَعْلاَهُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى الْسُنَنِ الْكُبْرى فِىْ بَابِ مَا وَرَدَ فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَابِ)

অনুবাদ : ইয়াসার ইবনে নুমাইর রহ. বলেন, হযরত ওমর রা. পেশাব করতে গিয়ে বলতেন: আমাকে এমন কিছু দাও যা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে পারি। ইয়াসার বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে এক টুকরো কাঠ বা পাথর দিতাম অথবা তিনি দেয়ালের নিকট এসে তাতে মুছে ফেলতেন কিংবা মাটিতে স্পর্শ করাতেন, এরপরে আর ধুতেন না। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৫৪০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, هَذَا أَصَحُّ مَا رُوِىَ فِى هَذَا الْبَابِ وَأَعْلاَهُ. হাদীসটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে সহীহ ও শ্রেষ্ঠ।

শিক্ষণীয় : হযরত ওমর রা.-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পেশাবের পরে কুলুখ ব্যবহার জরুরী এবং কুলুখ ঠিকমতো ব্যবহার করার পরে পানি ব্যবহার আবশ্যক নয়। তবে অন্যান্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিচ্ছন্নতার জন্য পানি ব্যবহার করা উত্তম। পেশাবের পরে কুলুখ ব্যবহারের সময় হাঁটা-চলা বা ওঠা-বসা করা বা কাশি দেয়া ভালো। হাঁটা-চলা করার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই যে, এত কদম হাঁটতে হবে। তবে এতটুকু সময় হাঁটা-চলা করা উচিত যাতে নতুন করে পেশাবের ফোঁটা বের হওয়ার সম্ভাবনা আর না থাকে। কেননা পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে কবরে শাস্তি হওয়ার বিষয় সহীহ হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত। (বুখারী : ২১৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৮৬৯৩)

পেশাবের পরে কুলুখ ব্যবহারের নির্দেশ মারফু' হাদীসে সরাসরি না পাওয়া গেলেও কবর আজাব থেকে বাঁচার জন্য পেশাব থেকে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. নিজ আমলের মাধ্যমে আমাদেরকে পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বনের পদ্ধতি দেখিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কুলুখ ব্যবহারের সময় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। জনসম্মুখে নির্লজ্জের মতো চলাফেরা না করা এবং সতরের প্রতি খুব খেয়াল রাখা যেন কুলুখ ব্যবহারের সময় মানুষের সামনে তা প্রকাশ না পায়। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে পেশাব থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়ার আমল হানাফী মাযহাবে গ্রহণ করা হয়েছে। (আলমগিরী: ১/৪৯)

বড় ইস্তিঞ্জার পরে কুলুখ ব্যবহার করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ. (رواه البخارى فى بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ–١/٢٧)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, একবার রসূলুল্লাহ স. ইস্তিঞ্জার জন্য বের হলে আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। এ সময় তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবো। (বর্ণনাকারী বলেন) অথবা তিনি এ ধরনের কিছু বললেন, । তারপরে বললেন, হাড় বা গোবর আনবে না। আমি কয়েকটি পাথর কাপড়ের কোণায় করে এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং সেখান থেকে সরে গেলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে সেগুলো ব্যবহার করলেন। (বুখারী: ১৫৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. বড় ইস্তিঞ্জার পরে কুলুখ ব্যবহার করতেন। সুতরাং আমাদের জন্য তা অনুকরণ করা আবশ্যক। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী: ১/৪৮)

উল্লেখ্য, যে সকল সেনিটারী টয়লেটে ব্যবহৃত কুলুখ রাখার কোন পাত্র

নেই সেখানে ঢেলা কুলুখের কাজে টয়লেট পেপার ব্যবহার করাই উচিত হবে। অন্যথায় টয়লেট জ্যাম হওয়াসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কুলুখ বেজোড় ব্যবহার করা উত্তম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. (رواه البخارى فى بَابِ الِاسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوءِ–١/٢٨)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযু করবে সে যেন পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইস্তিঞ্জা করবে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার করে। (বুখারী : ১৬২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, ইবনে মাযা, নাসাঈ এবং মুয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৮৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. কুলুখ বেজোড় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন যা মান্য করা উচিত। অবশ্য অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, বেজোড় ব্যবহার করতে পারলে ভালো, তবে না পারলেও কোন অসুবিধা নেই। (মুসতাদরাকে হাকেম-৭১৯৯)। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম যাহাবী উভয়ই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ হাদীস আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (আবূ দাউদ-৩৫) সুতরাং কুলুখ বেজোড় ব্যবহার করা উত্তম, তবে জরুরী নয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী: ১/৫০)

কুলুখ ব্যবহারের পরে পানি ব্যবহার করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ قَالَ بَهْزٌ مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ

অনুবাদ : মুআযা রহ. থেকে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা. বলেন, তোমরা নিজেদের স্বামীদেরকে বলো: তারা যেন পেশাব-পায়খানার চিহ্নসমূহ ধুয়ে ফেলে। রসূলুল্লাহ স. এমনই করতেন। আর আমি তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ করি। বর্ণনাকারী বাহঝ রহ. এ হাদীসে مُرُوا শব্দের পরিবর্তে مُرْنَ শব্দ ব্যবহার করেছেন (মুসনাদে আহমদ-২৫৩৭৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح، "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ-২৫৩৭৮ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : পায়খানা ও পেশাবের চিহ্ন ধুয়ে ফেলা শব্দ থেকে বুঝে আসে যে, হযরত আয়েশা রা. পানি ব্যবহারের কথা বলেছেন পাথর ব্যবহারের পরে। কারণ পায়খানা এবং পেশাব করার পরে পাথর ব্যবহার না করলে পায়খানা ও পেশাবের স্থানে যা লেগে থাকে সেটা শুধু চিহ্ন নয় বরং সরাসরি পায়খানা ও পেশাব। এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীস বর্ণনা শেষে ইমাম তিরমিযী রহ. এ মন্তব্য করেন যে, وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَخْتَارُونَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ، وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ উলামায়ে কিরামের আমল এটাই যে, পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে পছন্দ করতেন এবং তাঁরা এটাকে উত্তম মনে করতেন। এ মতই পোষণ করেছেন সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমদ এবং ইসহাক রহ.। (তিরমিযী-১৯)

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قَالَ: فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ قُبَاءٍ عَنْ طَهُورِهِمْ، وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يُحَدِّثُوهُ، فَقَالُوا: طَهُورُنَا طَهُورُ النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ طَهُورًا، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا خَبَرًا، إِنَّا نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ بَعْدَ الْحِجَارَةِ، أَوْ بَعْدَ الدَّرَارِي قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ رَضِيَ طَهُورَكُمْ يَا أَهْلَ قُبَاء. (تاريخ المدينة لابن شبة فِىْ بَابِ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِيهِ يَعْنِىْ فِى الْمَسْجِدِ)

অনুবাদ : জনৈক আনসারী সাহাবা থেকে বর্ণিত, 'কুবার মাসজিদে কিছু মানুষ আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসেন' (ছূরা তওবা-১০৮) এ আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, রসূল স. কুবা মাসজিদে অবস্থানরত ব্যক্তিদেরকে তাদের পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতির বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারা কেমন যেন তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলো। অতঃপর তারা বললো, আমাদের

পবিত্রতা অন্যান্য মানুষের ন্যায়। রসূল স. বললেন, অবশ্যই তোমাদের ভিন্ন কোন পবিত্রতা আছে। অবশেষে তারা বললো যে, আমরা পাথরের কুলুখ ব্যবহারের পরে আবার পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করি। অথবা বললো, আমরা নাপাকী দূর করার পরে আবার পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করি। এ কথা শুনে রসূল স. ইরশাদ করলেন, হে কুবাবাসী! আল্লাহ তাআলা তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। (তারীখে মদীনা লিওমর ইবনে শাব্বাহ, অধ্যায় : মাসজিদে ঘুমানোর অবকাশ)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসটি আল্লামা হাইসামী রহ. কাশফুল আসতার কিতাবে মুসনাদে বায্যার-২৪৭ নম্বর হাদীসের বরাতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, " **وذكره الحافظ في " التلخيص من رواية البزار، وفي سنده ضعف، وذكر له شواهد، فالحديث حسن بشواهده.** হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তালখীছুল হাবীর কিতাবে এ হাদীসটিকে মুসনাদে বায্যারের বরাতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের কিছু সমার্থক হাদীসও উল্লেখ করেছেন যার সমর্থনে হাদীসটি হাসান। (জামেউল উসূল-৫১৩২)

শিক্ষণীয় : এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স., সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈন ও তাবে তাবিঈন ইস্তিঞ্জায় ঢেলা কুলুখ ব্যবহারের পরেও পানি ব্যবহারকে পছন্দ করতেন। আর আল্লাহ তাআলাও এ পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করেছেন। সুতরাং আমাদেরও এ আমলের অনুসরণ করা দরকার। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী: ১/৪৮)

ডান হাতে পানি ব্যবহার এবং লজ্জাস্থান স্পর্শ না করা

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ. (رواه مسلم فى بَابِ الاستطابة– ١/ ١٣١)

অনুবাদ : হযরত আবু কতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে এবং ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম: ৫০৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১১৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মারাত্মক কোন ওযর ব্যতীত ডান হাত দিয়ে পানি ব্যবহার করবে না। আর মারাত্মক কোন ওযর ব্যতীত ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শও করবে না। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (হিদায়া: ১/৩৯, আলমগিরী: ১/৪৯, ৫০)

গোবর, কয়লা, হাড্ডি বা নাপাক জিনিস দ্বারা কুলুখ না করা

عَنْ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ. (رواه البخارى فى بَابِ: لاَ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ– ١/٢٧)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার ইস্তিঞ্জায় যাওয়ার সময় আমাকে তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে বললেন,। আমি তখন দুটি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টি না পেয়ে এক টুকরো শুকনো গোবর নিয়ে এলাম। তিনি পাথর দুটি নিয়ে গোবর খণ্ডটি ফেলে দিলেন এবং বললেন, এটা নাপাক। (বুখারী : ১৫৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৩৬)

শিক্ষণীয় : রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক গোবর খণ্ডটি নাপাক বলে ফেলে দেয়ায় প্রমাণিত হয় যে, কোন নাপাক বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয নেই। (হিদায়া : ১/৩৯)

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا. قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. (رواه ابو داود فى بَابِ مَا يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ– ١/٦)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, জ্বীনদের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! স.

আপনি আপনার উম্মতকে হাড্ডি, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করুন। কেননা আল্লাহ তাআলা এগুলোর মধ্যে আমাদের রিযিক রেখেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ স. ঐ সকল জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করে দিলেন। (আবূ দাউদ : ৩৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত বলেন, وهو حديث صحيح এ হাদীসটি সহীহ। (জামেউল উসূল-৫১৩৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৩৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাড্ডি, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ। সুতরাং আমাদেরকে সেটা অনুসরণ করা দরকার। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (হিদায়াঃ ১/৩৯)

ইস্তিঞ্জা শেষে মাটি বা সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়া

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ (رواه ابن ماجة في بَابِ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইস্তিঞ্জা করার পর বদনার পানি দিয়ে শৌচ করতেন। অতঃপর মাটিতে হাত ঘসতেন। (ইবনে মাযা : ৩৫৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১২৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও দুর্গন্ধ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইস্তিঞ্জার পরে মাটিতে হাত ঘসতে হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৪৯) বর্তমান সময় উক্ত উদ্দেশ্য আরো পরিপূর্ণরূপে হাসিল করতে মাটির পরিবর্তে সাবান বা লিক্যুইড হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইস্তিঞ্জা শেষে দুআ পড়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حميد بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ.
(رواه الترمذى فى بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ–٧/١)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইস্তিঞ্জাখানা থেকে বের হয়ে غُفْرَانَكَ বলতেন। (তিরমিযী : ৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং মুসনাদে আহমাদেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২৩১৭)

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي.

অনুবাদ : হযরত আবু আলী রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু যর রা. ইস্তিঞ্জাখানা থেকে বের হয়ে বলতেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي "সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে স্বস্তি দিয়েছেন"। (ইবনে আবী শাইবা : ১০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম দারাকুতনী রহ. এ হাদীসটিকে বেশি সহীহ বলেছেন। (ইলালুল হাদীস-১০৯৬ নং হাদীসের আলোচনায়) আর রওজাতুল মুহাদ্দিসীন কিতাবের-৫০৩৪ নং হাদীসের আলোচনায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর বরাতে হাদীসটিকে হাসান বলা হয়েছে। (নাতাইজুল আফকার, ১/২৮৮)

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত হাদীস দু'টির মধ্যে প্রথম হাদীসে শুধু غفرانك আর দ্বিতীয় হাদীসে الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي বর্ণিত হয়েছে। উভয় হাদীসের উপর একত্রে আমল করতে দুআটি এভাবে পড়তে হয়- غفرانك الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৪৫)

ইস্তিঞ্জার সময় সালাম-কালাম থেকে বিরত থাকা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي عُبَيْدُ بْنُ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَا يَخْرُجُ إِثْنَانِ إِلَى الْغَائِطِ يَجْلِسَانِ يَتَحَدَّثَانِ كَاشِفَانِ عَن عَوْرَتِهِمَا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

অনুবাদ : আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, দু'জন ব্যক্তি ইস্তিঞ্জার জন্য বেরিয়ে সতর খুলে বসে যেন একে অপরের সাথে কথা না বলে। কেননা এতে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। (তবারানী আওসাত : ১২৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **صحيح لغيره** হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (মুসনাদে আহমদ-১১৩১০) ইবনে দকীকুল ঈদ বলেন, **صَححهُ الْحَافِظ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان** আবুল হাসান ইবনুল কত্তান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আল ইল্মাম-৯৩)

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. পেশাব করছিলেন এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলো। উক্ত ব্যক্তি রসূল স.কে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দেননি। (মুসলিম-৭০৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জমেউল উসূল-৪৮৭২)

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত দুটি হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে এ মত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ইস্তিঞ্জার সময় কথা বলা এবং সালাম বিনিময় করা মাকরূহ। (শামী : ১/৩৪৪, ৩৪৫)

চলাচলের পথে বা বিশ্রামের ছায়ায় ইস্তিঞ্জা না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ" قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ. (رواه مسلم فی بَابِ الاستطابة–۱/۱۳۲)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমরা দুটি অভিশাপের কাজ থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম রা. আরয করলেন : ইয়া রসূলাল্লাহ! কাজ দুটি কী? তিনি ইরশাদ করলেন, মানুষের চলাচলের পথে অথবা তাদের বিশ্রামের ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা। (মুসলিম : ৫০১১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫০৯১)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে এ মত গ্রহণ করা হয়েছে যে, চলাচলের পথে বা মানুষের বিশ্রামের ছায়ায় ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ। (আলমগিরী : ১/৫০) এখানে উদাহরণ হিসেবে দুটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে মানুষের প্রয়োজনে সচরাচার ব্যবহৃত হয় এমন যে কোন জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। কেননা এটা মানুষের কষ্টের কারণ হয়।

ব্যবহার্য আবদ্ধ পানিতে পেশাব না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَيبولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ

الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " (رواه مسلم فى بَابِ النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ–١٣٨/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে পেশাব করে তাতে গোসল না করে। (মুসলিম: ৫৪৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫০৩০)

শিক্ষণীয় : পান করা, কাপড় ধোয়া এবং অযু-গোসল করাসহ পানি মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আবদ্ধ পানিতে পেশাব করে নাপাক বা ময়লা বানানো এবং পানির উপকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। তাই হানাফী মাযহাবে আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা মাকরূহ। (আলমগিরী : ১/৫০) এমনকি প্রবাহমান পানিতেও প্রয়োজন ব্যতীত পেশাব করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

গোসলখানায় পেশাব না করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، مَرْدَوَيْهِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ وَقَالَ: إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

(رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ–١٢/١)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, (মানু-ষের মনে) ওয়াছওয়াছা সাধারণতঃ তা থেকেই সৃষ্টি হয়। (তিরমিযী : ২১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীস-টি সহীহ লিগাইরিহী। তিনি আরো বলেন, আর إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ বাক্যটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা.-এর নিজের মন্তব্য। (মুসনাদে আহমদ-২০৫৬৩ নং হাদীসের আলোচনায়)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫০৯৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোসলখানায় পেশাব করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী

: ১/৩৪৪) যেসকল গোসলখানায় ব্যবহৃত পানি জমে থাকে সেখানে পেশাব করলে পানির সঙ্গে পেশাব মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ পানি নাপাক হয়ে যায়। ঐ পানির ছিটা শরীরে লাগা এবং তাতে শরীর নাপাক হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এটাই ওয়াছওয়াছার মূল কারণ। তবে পানি জমে থাকে না এমন পাকা গোসলখানার বিধান ভিন্ন হবে।

ইস্তিঞ্জায় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা ও ডান পা দিয়ে বের হওয়া

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. (رواه مسلم فى بَابِ الاستطابة–١/١٣٢)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. পবিত্রতা অর্জন অর্থাৎ অযু-গোসল করা, চুল আঁচড়ানো এবং জুতো পরার বেলায় ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালোবাসতেন। (মুসলিম : ৫০৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৮২৭৩) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন, এটা শরীআতের একটি চলমান নীতি। আর এটা ডানকে মর্যাদা দেয়া এবং সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। এ নিয়মের আওতায় বাম পা দ্বারা ইস্তিঞ্জায় প্রবেশ করা এবং ডান পা দ্বারা বের হওয়া। (মুসলিম : ৫০৯ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়)

শিক্ষণীয় : পূর্বোক্ত হাদীস এবং ইমাম নববী রহ.-এর ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাম পা দিয়ে ইস্তিঞ্জায় প্রবেশ করা এবং ডান পা দিয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৫০)

ইস্তিঞ্জার আরো কিছু আদব

ইস্তিঞ্জার আদবের ব্যাপারে পূর্বে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা ছাড়াও ইস্তিঞ্জার আরো কিছু আদব রয়েছে। যেমন, জুতা পরিহিত অবস্থায় ইস্তিঞ্জায় যাওয়া, বাম পায়ের উপর ভর রাখা, (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৪৫৭) প্রয়োজনাতিরিক্ত কাপড় না খোলা, ভেতরের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন না করা যা অন্যের জন্য বিরক্তির কারণ হয়, শরীর আবৃত রাখা ইত্যাদি।

অধ্যায় ২ : পবিত্রতা অর্জন

অযু বা গোসল করে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ـ

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা কর তখন তোমাদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর। আর তোমরা যদি জুনুবী হও তাহলে খুব ভালো করে পবিত্রতা অর্জন কর (ছূরা মায়েদা : ৬)। জুনুবী বলা হয় ঐ অপবিত্রতাকে যা থেকে পবিত্র হতে গোসলের প্রয়োজন হয়।

সারসংক্ষেপ : হাদাস বা হুকমী অপবিত্রতা বলা হয় ঐ জাতীয় নাপাকী-কে যার কোন অবয়ব নেই এবং দেখা যায় না। তবে শরীআত এটাকে নাপাকী বলে সাব্যস্ত করেছে। তাই না বুঝা সত্ত্বেও শরীআতের হুকুমের কারণে আমরা এটাকে নাপাকী হিসেবে মেনে নেই। যেমন পেশাব-পায়খানা বা বায়ু নির্গত হওয়ার দ্বারা অযু চলে গিয়ে শরীর নাপাক হয়। অথচ শরীরের কোথাও এ নাপাকীর কোন চিহ্ন নেই। তেমনিভাবে শরীরে বাহ্যিক কোন নাপাকী না থাকা অবস্থায় বীর্যপাত বা অন্য কোন কারণে শরীর বড় নাপাক হলে গোসল করার আগ পর্যন্ত শরীআত শরীরকে নাপাক বলে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (رواه البخارى فى بَابِ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ–٢٥/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির হাদাস হবে অযু না করলে তার

নামায কবুল হবে না। হাযরামাউতের এক ব্যক্তি বললেন, হে আবু হুরায়রা! হাদাস কী? তিনি উত্তরে বললেন, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া। (বুখারী : ১৩৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম-৪৩০, আবূ দাউদ-৬০, তিরমিযী-৭৬ এবং জামেউল উসূল-৫২১৮ বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পেশাব-পায়খানা বা এ জাতীয় কোন কারণে শরীর সাধারণ নাপাক হলে অযুর মাধ্যমে পবিত্র হতে হবে। আর গোসল ফরয হওয়ার দ্বারা শরীর বড় নাপাক হলে গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হতে হবে। আর অযু বা গোসলের মাধ্যমে নামাযের জন্য পবিত্রতা করা শর্ত। (শামী : ১৪০২)

শরীর কাপড় এবং নামাযের জায়গা পবিত্র হওয়া

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلاَ تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ . قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ. (رواه مسلم فى بَابِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ –١/١١٩)

অনুবাদ : হযরত মুসআব ইবনে সাআ'দ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ইবনে আমেরের নিকট প্রবেশ করলেন তার সেবা করার জন্য যখন তিনি অসুস্থ। তিনি ইবনে ওমর রা.কে বললেন, হে ইবনে ওমর আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ' করবেন না? আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি রসূল স. থেকে শুনেছি যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না এবং খিয়ানত (এর সম্পদ) দ্বারা সদকা কবুল হয় না। আর আপনি ছিলেন বাসরার দায়িত্বশীল। অর্থাৎ খিয়ানত থেকে আপনি নিরাপদ নন। (মুসলিম-৪২৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফ- ১, ইবনে মাযা-২৭২, মুসনাদে আহমদ-৪৭০০, ৪৯৬৯ ও ৫১২৩ এবং জামেউল উসূল-৩৫৯৯ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ তাআলা নামায কবুল করেন না। এ হাদীসটি শরীর পাক, কাপড় পাক এবং নামাযের জায়গা পাকসহ সব ধরনের পবিত্রতারই প্রমাণ বহন করে। নামায সহীহ হওয়ার জন্য এ সকল জিনিস পবিত্র হওয়া শর্ত। (শামী

: ১৪০২) শরীর বা কাপড়ে মজী লেগে থাকলে রসূল স. তা ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাউদ-২১০, তিরমিযী-১১৫) হযরত আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলার পরে তিনি কাপড়ে ভেজা চিহ্ন নিয়ে নামায আদায় করতেন। (বুখারী : ২২৯) কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে থাকলে রসূলুল্লাহ স. সেটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপর সেই কাপড়ে নামায আদায় করতে বলেছেন। (বুখারী : ২২৭) এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মজী, বীর্য এবং হায়েযের রক্ত নাপাক।

মা'জুরের জন্য প্রতি ওয়াক্তে নতুন অযু করা জরুরী

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَحَضْتُ فَقَالَ: دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ.

অনুবাদ : হযরত আয়শা রা. বলেন, ফাতেমা ডবনতে আবি হুবায়েশ রা. রসূল স.-এর নিকট এসে বললেন, আমি ইস্তিহাযাগ্রস্থ হয়েছি। রসূল স. বললেন, তোমার হায়েযের দিনগুলোতে নামায ত্যাগ করো। অতঃপর গোসল করো এবং প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করো যদিও নামাযের পাটিতে রক্ত পড়ে। (মুসনাদে আহমদ-২৪১৪৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **حديث صحيح** হাদীসটি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-২৪১৪৫)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৪১০)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : হায়েয বা নিফাস ব্যতীত কোন রোগের কারণে মহিলাদের যে রক্ত দেখা যায় তাকে ইস্তিহাযা বলে। এ হাদীসে ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত মহিলার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অযু করবে। এ বিধানটি শুধু ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত মহিলার জন্যই নয়। বরং শরীর হতে সার্বক্ষণিক নাপাক বের হতে থাকা যে কোন মা'জুর তথা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্যই এটা প্রযোজ্য হবে। (শামী : ১/৩০৬)

পবিত্রতা অর্জনের জন্য পবিত্র পানি জরুরী

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, স্বীয় রহমতের অর্থাৎ বৃষ্টির প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে তিনিই প্রেরণ করেন। আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। (ছূরা ফুরকান : ৪৮)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বৃষ্টির পানি পবিত্র।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন তিনি তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা আরোপ করেন নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য। আর তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে তোমাদের কদম সুদৃঢ় করে দিতে পারেন। (ছূরা আনফাল : ১১)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বৃষ্টির পানি দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে চান। উভয় আয়াত মিলে এ বিধান প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি পবিত্র হওয়া জরুরী।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، نا أَبِي، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: ضَعْ لِي طَهُورًا فَوَضَعْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» .

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রসূল স.-এর সঙ্গে আমার খালা হযরত মাইমুনা রা.-এর ঘরে রাত্রযাপন করলাম। রসূল স. রাতে উঠে আমাকে বললেন, আমার জন্য পবিত্র পানি রাখো। আমি তা-ই রাখলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। (ফাযায়েলুস সাহাবা লিআহমদ ইবনে হাম্বল-১৮৮৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। মূল হাদীসটি বুখারী-মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আবু ইসহাক হুআইনী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আল-মুনিহা বিসিলসিলাতিল আহাদীসিস সহীহা-৮৮৬)

শিক্ষণীয় : রসূল স. কর্তৃক হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে পবিত্র পানি রাখার নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি পবিত্র হতে হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/১৭)

পবিত্রতা নষ্ট হলে নামায ভেঙ্গে যাবে

ছূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত ৬ নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে নামাযে দাঁড়ানো-র পূর্বে ছোট এবং বড় উভয় প্রকার হুকমী নাপাকী থেকে অযু/গোসলের মাধ্যমে পবিত্র হওয়া জরুরী। তেমনিভাবে হাদীসের বিবরণ দ্বারা হাকীকী নাপাক থেকেও পবিত্র হওয়া জরুরী। সুতরাং হুকমী বা হাকীকীভাবে অপবিত্র অবস্থায় কেউ নামাযে দাঁড়ালে যেমন তার নামায সহীহ হয় না। তেমনিভাবে নামাযরত অবস্থায় কারো অযু-গোসল ছুটে গেলে বা শরীর অথবা কাপড়ে কোন নাপাক লেগে গেলেও তার নামায হবে না; বরং ভেঙ্গে যাবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (হিদায়াহ : ১/৫৯) অবশ্য হাকীকী নাপাক লাগার সাথে সাথে যদি তা ফেলে দেয়া হয় তাহলে নামায নষ্ট হবে না। কারণ এ সামান্য বিষয় থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। আর সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি। (ছূরা বাকারা, আয়াত-২৮৬, ছূরা হজ্ব-৭৮)

অযু থাকলেও প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন অযু করা উত্তম

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. (رواه البخارى فى بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ–١/٣٤)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করতেন। আমি বললাম, আপনারা কেমন করতেন? তিনি বললেন, অযু না ভাঙ্গা পর্যন্ত আমাদের পূর্বের অযুই যথেষ্ট হতো। (বুখারী : ২১৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৬০৩)

শিক্ষণীয় : রসূল স.-এর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক এক অযু দ্বারা একাধিক নামায আদায় থেকে প্রমাণিত হয় যে, অযু থাকলে প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন অযু জরুরী নয়। রসূলুল্লাহ স. নিজেও মক্কা বিজয়ের দিন এক অযু দ্বারা বেশ কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়েছেন মর্মে সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। (মুসলিম : ৫৩৫) আর এ হাদীসের বর্ণনামতে রসূল স. স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযু করতেন– এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ওয়াক্তে নতুন অযু করা জরুরী না হলেও তা উত্তম। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (নুরুল ঈযাহ : পৃষ্ঠা- ৩৭)

গোসলের পরে অযু না করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ. (رواه ابو داود تحت بَابٍ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ–١/٣٣)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. গোসলের পর দু'রাকাত নামায পড়ে তারপর ফজরের নামায আদায় করতেন। আমি তাঁকে গোসলের পর নতুন করে আর অযু করতে দেখিনি। (আবূ দাউদ: ২৫০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, "হাদী-সটির সনদ সহীহ"। (আবূ দাউদ-২৫০ নং হাদীসের আলোচনায়)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৩৩২)

শিক্ষণীয় : গোসলের ছুন্নাত তরীকা হলো গোসলের পূর্বে অযু করা। কেউ এ পদ্ধতিতে গোসল করলে গোসলের পরে পুনরায় অযু করা অহেতুক ও মাকরূহ। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৫৮) তবে গোসলের পূর্বে যদি কেউ অযু না করে গোসলের মধ্যে অযুর নিয়ত করে নেয় তাহলে সে নিয়তের কারণে অযুর সওয়াবও পেয়ে যাবে।

অযুর পূর্বে মিসওয়াক করা

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক অযুর পূর্বে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (ইবনে আবী শাইবা-১৭৯৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম যাহাবী রহ. উভয়ই হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (মুসত-াদরাকে হাকেম-৫১৬) ইমাম বুখারী রহ. হাদীসটিকে তরজমাতুল বাব তথা পরিচ্ছেদের শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। (পরিচ্ছেদ নং- ১২১০, রোজাদার ব্যক্তির জন্য কাঁচা বা শুকনো মেসওয়াক ব্যবহার করা)

শিক্ষণীয় : অযুর পূর্বে মেসওয়াক করার নির্দেশ জারী করার প্রতি রসূল স.-এর ইচ্ছা প্রকাশ দ্বারা এর উত্তম হওয়া প্রমাণিত হয়। হানাফী মাযহাবমতে অযুর পূর্বে বা অযুর মধ্যে কুলি করার সময় মেসওয়াক করা ছুন্নাত। (শামী : ১/১১৩)

মিসওয়াক করার পদ্ধতি

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ (رواه مسلم فى بَابِ السِّوَاكِ–١/١٢٧)

অনুবাদ : হযরত আবু মুসা রা. বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলাম, তখন মিসওয়াক তাঁর জিহ্বার উপর ছিলো। (মুসলিম : ৪৮৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৭৭)

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَفَ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْقَ فَوَصَفَ حَمَّادٌ: كَأَنَّهُ يَرْفَعُ سِوَاكَهُ. قَالَ حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ قَالَ: كَانَ يَسْتَنُّ طُولًا.

অনুবাদ : হযরত আবু মুসা রা. বলেন, আমি রসূল স.-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তিনি মেসওয়াকের কিনারা জিহবার উপর রেখে মেসওয়াক করছিলেন। তিনি মেসওয়াক করছিলেন উপরের দিকে। হযরত হাম্মাদ বিবরণ পেশ করেন যে, কেমন যেন তিনি মেসওয়াক উপরে উঠাচ্ছিলেন। হযরত হাম্মাদ আরো বলেন, গায়লান রহ. আমাদেরকে মেসওয়াক করার বিবরণ দিয়ে বলেন যে, রসূল স. দাঁতের লম্বা দিকে (উপর-নিচে) মেসওয়াক করতেন। (মুসনাদে আহমদ-১৯৭৩৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **إسناده صحيح على شرط الشيخين** হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-১৯৭৩৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেসওয়াক করার সময় জিহ্বা পরিষ্কার করতে হয় এবং মেসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজার সময় দাঁতের দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ উপর-নিচে করে ডলতে হয়। সাথে সাথে দাঁতের প্রস্থে অর্থাৎ আড়াআড়িভাবে মেসওয়াক করার কথাও

বায়হাকী-১৭৪ এবং মুজামুল কাবীর-১২৪২ নং হাদীসসহ আরো কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের সনদ জঈফ হলেও দাঁতের ময়লা দূরীকরণে উভয় দিকে মেসওয়াক করা বেশি কার্যকর হওয়ায় আমল করা যেতে পারে। মেসওয়াক করার সময় ঠোঁটের নিচে থাকা দাঁতের গোড়াও পরিষ্কার করার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা সহীহ সনদে হযরত আবু মুসা রা. থেকে ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, **فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ** আমি কেমন যেন রসূল স.-এর ঠোঁটের নিচে মেসওয়াক দেখছি, মেসওয়াকের কারণে ঠোট মুবারক উপরের দিকে উঠেছিলো। (সহীহ ইবনে হিব্বান-১০৭১)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ «يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أُعْ أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ (رواه البخارى فى بَابِ السِّوَاكِ–٣٨/١)

অনুবাদ : হযরত আবু মুসা রা. বলেন, আমি রসূল স.-এর নিকট এসে দেখলাম তিনি হাতে থাকা মেসওয়াক মুখের মধ্যে দিয়ে উঃ উঃ বলে মেসওয়াক করছেন; কেমন যেন তিনি বমি করছেন। (বুখারী-২৪৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৭৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেসওয়াক করার সময় উঃ উঃ করে হলক পরিষ্কার করা ছুন্নাত। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১৮১৭ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. মেসওয়াক করার সময় বেজোড় করতে বলেছেন। দাঁতের ময়লা পরিস্কারের প্রয়োজন ব্যতীত শুধু ছুন্নাত আদায়ের নিয়তে মেসওয়াক করলে এ নিয়ম অনুসরণ করা উত্তম হবে। বেজোড় মেসওয়াক এভাবে হতে পারে যে, মেসওয়াক দ্বারা একবার ডলা দিয়ে মেসওয়াক বের করে ধুয়ে নিবে এবং কুলি করে নিবে। এভাবে তিন, পাঁচ বা সাতবার করলে বেজোড়ের আমল হয়ে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. (رواه مسلم فى بَابِ الاستطابة–١٣٢/١)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. পবিত্রতা অর্জন অর্থাৎ অযু-গোসল করা, চুল আঁচড়ানো এবং জুতো পরার বেলায় ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালোবাসতেন। (মুসলিম : ৫০৯) শাব্দিক কিছু

তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৮২৭৩) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন, এটা শরীআতের একটি চলমান নীতি। আর এটা ডানকে মর্যাদা দেয়া এবং সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন জামা-পাজামা এবং মোজা পরিধান করা, মাসজিদে প্রবেশ করা, মিসওয়াক করা..। (মুসলিম : ৫০৯ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়)

সারসংক্ষেপ : ইমাম নববী রহ.-এর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেসওয়াক করার সময় প্রথমে ডান পাশ তারপরে বাম পাশ করতে হয়।

অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ " تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لأَنَسٍ كَمْ تُرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ (رواه النسائى فى بَابِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ-١/١١)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কোন এক সাহাবী পানি তালাশ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কারো নিকট পানি আছে কি? (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত দিয়ে বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলে অযু কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পানি বের হতে দেখলাম। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই এ পানি দিয়ে অযু করলেন। হযরত সাবেত রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস রা.কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি তাদের সংখ্যা কতজন মনে করেন? তিনি বললেন, সত্তর জনের মতো হতে পারে। (নাসাঈ : ৭৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, هَذَا أَصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ এ হাদীসটি অযুতে বিসমিল্লাহ পাঠের সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-১৯১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৮৯০২)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الزَّنْبَرِيُّ أَبُو بَكْرٍ، بِمِصْرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ؛ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ -

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স. ইরশাদ করেছেন: হে আবু হুরায়রা! তুমি যখন অযু কর তখন বিসমিল্লাহ এবং আলহামদু লিল্লাহ বলো। তাহলে অযু ভেঙ্গে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমার আমল লেখক ফেরেশতাগণ বিরামহীনভাবে নেকি লিখতে থাকবে। (আল্ মু'জামুছ ছগীর লিততবারানী-১৯৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা হাইসামী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (মাযমাউজ যাওয়ায়েদ-১১১২)

শিক্ষণীয় : প্রথম হাদীসে যদিও অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ বলা উত্তম এবং অধিক নেকি হাসিলের উপায়। বিসমিল্লাহ না বললেও অযু হয়ে যাবে।

এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে এমন বর্ণনাও রয়েছে যে, বিসমিল্লাহ না বললে অযু হবে না। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ এ সম্পর্কে সহীহ সনদ সম্বলিত কোন হাদীস আমার জানা নেই। (তিরমিযী-২৫ নং হাদীসের আলোচনায়)। বরং বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বললে তার পূর্ণ শরীর পবিত্র হবে। আর বিসমিল্লাহ না বললে শুধু অযুর অঙ্গ পবিত্র হবে। (দারাকুতনী-২৩১, ২৩২ এবং ২৩৩)। এ হাদীসগুলোর কোনটিই এককভাবে সহীহ নয়। তবে সম্মিলিতভাবে এটা হাসান লিগাইরিহীর পর্যায়ে পৌঁছে। এসব কিছু থেকে প্রমাণিত হয় যে, অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা উত্তম তবে জরুরী নয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১০৮)

অযু করার পদ্ধতি

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَنَّه دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى

الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخارى فى بَابٍ: الْوُضُوءُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا– ٢٧/١)

অনুবাদ : হুমরান রহ. হযরত উসমান রা.কে দেখলেন, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে তিনবার পানি ঢেলে উভয় হাত ধুয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন এরপর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কনুইসহ তিনবার করে ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন। এরপর উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধুলেন। অতঃপর বললেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার মতো এভাবে অযু করবে। অতঃপর মনের মধ্যে প্রতিকূল কোন খেয়াল না রেখে দু'রাকাত নামায পড়বে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী : ১৬১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৪৩)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً– ١٦/١)

অনুবাদ : রুবাই ডবনতে মুআব্বিজ ইবনে আফরা রা. রসূলুল্লাহ স.কে অযু করতে দেখলেন। তিনি মাথার সামনের দিক, পিছনের দিক অর্থাৎ পূর্ণ মাথা এবং উভয় কানের ভেতরে-বাইরে একবার মাসেহ করলেন। (তিরমিযী : ৩৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরিমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৪৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. (رواه البخارى فى بَابِ الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ– ٢٨/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ

করেন, যে ব্যক্তি অযু করবে সে যেন নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইস্তিঞ্জা করবে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ডেলা-কুলুখ ব্যবহার করে। (বুখারী : ১৬২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৮৩)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. (رواه البخارى فى بَابِ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالغَسْلِ-١/٢٨)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. জুতো পরা, চিরুনি করা এবং পবিত্রতা অর্জনসহ সব কাজেই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। (বুখারী : ১৬৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৮২৭৩)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে অযু করার এ নিয়ম প্রমাণিত হয় যে, উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার ধুয়া; কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, নাক পরিষ্কার করা, মুখ ধুয়া এবং উভয় হাত কনুইসহ তিনবার করে ধুয়া; মাথা মাসেহ করা, কান মাসেহ করা, উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধুয়া। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। হাদীসের বর্ণনা থেকে আরো একটি বিষয় বুঝে আসে যে, রসূলুল্লাহ স. একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে অযু সম্পন্ন করেছেন এবং একটি অঙ্গ ধুয়ার পরে অন্য অঙ্গ ধুতে মাঝে বিরতি দেননি। অতএব, অযুর আরো একটি উত্তম পদ্ধতি হলো অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ার ক্ষেত্রে দেরী না করা বরং এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অন্য অঙ্গ ধুয়ে নেয়া। অযু করার তরিকা সংক্রান্ত আরো কিছু বিষয় নিম্নে স্বতন্ত্র শিরোনামে বর্ণনা করা হলো।

মুখ ধুয়ার পদ্ধতি

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ...ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

(رواه البخارى فى بَابِ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ-١/٢٦)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. অযু করলেন এবং মুখমন্ডল

ধুলেন। এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা দ্বারা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন এরপরে আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে এরকম করলেন যে, উক্ত অঞ্জলি অপর হাতের সাথে মিলিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ধুলেন।....অবশেষে তিনি বললেন, এভাবেই আমি রসূল স.কে অযু করতে দেখেছি। (বুখারী-১৪২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৪৮)

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয় হাত একত্রে মিলিয়ে অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখ ধুবে। যাতে সহজেই মুখের সব জায়গায় পানি পৌঁছে যায়। উভয় হাত দিয়ে মুখ ধুয়ার এ পদ্ধতির কথা হাসান সনদে আবূ দাউদ শরীফের ১১৭ এবং ১৩৭ নং- হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (আল-মাবসূত লিস্‌সারাখসী : ১/১০)

দাঁড়ি খিলাল করা ও তার পদ্ধতি

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِى الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ عَنْ أَنَسٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فادخله تحت حنكه فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ. (رواه ابو داود فى بَابِ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ– ١/ ١٩)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. যখন অযু করতেন তখন এক কোশ পানি নিয়ে থুতনীর নিচে ঢুকিয়ে দিতেন এবং তা দ্বারা দাঁড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন এভাবেই আমার মহান রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, ইবনে যাওরান থেকে বর্ণনা করেন হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ এবং আবুল মালিহ আর্ রকি। (আবূ দাউদ-১৪৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। জামেউল উসূলের ৫১৯২ নং হাদীসের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত বলেন, **وهو حديث حسن** হাদীস-টি হাসান।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. এমনভাবে দাঁড়ি খিলাল করতেন যে, থুতনীর নিচ দিয়ে দাঁড়ির ভেতরে পানি পৌছে দিতেন এবং দাঁড়ির মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে খিলাল করতেন। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিতে দাঁড়ি খিলাল করা ছুন্নাত। আল্লামা শামী রহ. এ হাদীসের

ভিত্তিরত বলেন যে, অযুকারী দাঁড়ি খিলাল করার সময় তার হাতের তালু নিজের দিকে রেখে আঙ্গুলসমূহ দাঁড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে টানবে। (শামী : ১/১১৭) হযরত উসমান রা. থেকেও হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. দাঁড়ি খিলাল করতেন। (তিরমিযী : ৩১)

হাত-পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা ও তার পদ্ধতি

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. (رواه ابو داود فى بَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ–١/٢٠)

অনুবাদ : হযরত মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রা. বলেন, আমি রসূল স.কে অযু করার সময় কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলসমূহ ডলতে দেখেছি। (আবূ দাউদ-১৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (আবূ দাউদ-১৪৮ নং হাদীসের আলোচনায়)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী-৪০, জামেউল উসূল-৫১৯৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করতেন। আর তার পদ্ধতি হলো- বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি দ্বারা ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি পর্যন্ত প্রত্যেকটি আঙ্গুলের ফাঁকে রগড়াবে যেন কোথাও শুষ্ক থাকতে না পারে। আঙ্গুল খিলালের আরো একটি পদ্ধতি হলো- ডান হাতের সব আঙ্গুল একযোগে বাম হাতের সব আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া দিবে যেন শুষ্ক না থাকে । (শামী : ১/১১৭, মাআরিফুস্ সুনান-১/১৮৪)

মাথা মাসেহ করা ও তার পদ্ধতি

حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَكْفَأَ

عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ»

অনুবাদ : আমর ইবনে আবু হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.কে রসূলুল্লাহ স.-এর অযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন এবং তাদেরকে রসূল স.-এর অযু দেখালেন। তিনি প্রথমে পাত্র থেকে হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার উভয় হাত হাত ধুলেন। তারপর পাত্রে হাত দিয়ে পানি নিয়ে তিন অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তা ঝেঁড়ে পরিষ্ক-ার করলেন। এরপর পাত্রে হাত দিয়ে পানি নিয়ে তিনবার চেহারা ধুলেন। তারপর দু'হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুলেন। তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে মাথা মসেহ করলেন। উভয় হাত সামনে ও পিছনে একবার টানলেন। অতঃপর টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধুলেন। (বুখারী-১৮৬) বুখারী শরীফ-১৮৫ নং হাদীসে মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত টেনে নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুলেন। (বুখারী-১৮৫)

শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা, তিরমিযী, মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল-৫১৪৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি হলো : উভয় হাতের তালু মাথার সম্মুখভাগে রেখে পিছন দিকে গর্দান পর্যন্ত টেনে নিতে হবে। অতঃপর সেখান থেকে পুনরায় টেনে মাথার সম্মুখভাগে এনে শেষ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে টানার দ্বারা একবার মাথা মাসেহ করা সাব্যস্ত হবে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (মিরকাত : ১/৪০৪, তুফাতুল কারী : ১/৫১৯)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ: مَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ، وَمَا أَدْبَرَ،

وَصُدْغَيْهِ، وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

অনুবাদ : হযরত রুবাই ডবনতে মুআব্বিয রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূল স. অযু করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, রসূল স. মাথার সামনে ও পিছে, কানপট্টি এবং কান একবার মাসেহ করেছেন। (তিরমিযী: ৩৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে মাথা মাসেহ করার ছুন্নাত তরীকার আওতায় এটাকেও গণনা করা হয়েছে যে, মাথার শুরু দিকে উভয় হাতের তালু পূর্ণভাবে রেখে পিছের দিকে টানতে থাকা এবং এভাবে টেনে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। এর দ্বারা পূর্ণ মাথা মাসেহ করা এবং একবার করার আমল হয়ে যায়। (শামী : ১/১২১)

এ হাদীসে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এটা জায়েয, তবে তিনবার ধুয়া ছুন্নাত যা "অযু করার পদ্ধতি" শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী পূর্ণ মাথা মাসেহ করার আওতায় এসে যায়, আর এটাই ছুন্নাত। তবে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. মাথার সম্মুখভাগ বা কপাল সমপরিমাণও মাসেহ করেছেন। (মুসলিম : ৫২৭ ও ৫২৯) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাথার অনুরূপ অংশ যা সাধারণতঃ চার ভাগের একভাগ হয়ে থাকে তা মাসেহ করলেও মাথা মাসেহ করার ফরয আদায় হয়ে যাবে।

নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করা উত্তম

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَالأُخْرَى ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا . قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (رواه مسلم تحت بَابِ الاستطابة–١/١٣٢)

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম রা. রসূলুল্লাহ স.কে এভাবে অযু করতে দেখেছেন যে, তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তিনবার মুখ ধুলেন, ডান হাত তিনবার ও বাম

হাত তিনবার ধুলেন। এরপর হাতের অবশিষ্ট পানি ব্যতীত (নতুন) পানি দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। আর উভয় পা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুলেন। (মুসলিম : ৪৫২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাযা, তিরমিযী, মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৪৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি গ্রহণ করেছেন। তাই নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করা বেশি উত্তম হবে। অবশ্য রসূল স. হাত ধুয়ার পরে তালুতে লেগে থাকা পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেছেন বলে আবূ দাউদ শরীফের একটি হাসান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (আবূ দাউদ-১৩০) সুতরাং হাতের তালুতে লেগে থাকা পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করলেও জায়েয হবে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৯৯, দরসে তিরমিযী : ১/২৪৫)

কান একবার মাসেহ করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً–١/١٦)

অনুবাদ : রুবাই ডবনতে মুআব্বিজ ইবনে আফরা রা. রসূলুল্লাহ স.কে অযু করতে দেখলেন। তিনি মাথার সামনের দিক, পিছনের দিক অর্থাৎ পূর্ণ মাথা এবং উভয় কানের ভেতরে-বাইরে একবার মাসেহ করলেন। এ অধ্যায়ে হযরত আলী ও তালহা ইবনে মুসাররিফ-এর দাদা থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। (তিরমিযী : ৩৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরিমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৪৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কান একবার মাসেহ করা ছুন্নাত, তিনবার নয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আল মাবসূত লিসসারাখসী : ১/৭)

কান মাসেহ করার পদ্ধতি

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (رواه النسائى فى بَابِ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ...–١/١٤)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. অযু করলেন, তিনি এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। অতঃপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মুখ ধুলেন। তারপর এক অঞ্জলি নিয়ে ডান হাত, আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম হাত ধুলেন। এরপরে মাথা মাসেহ করলেন এবং কানের ভেতরের অংশ শাহাদাৎ আঙ্গুল দ্বারা এবং বাইরের অংশ বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করলেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পা এবং আরেক অঞ্জলি নিয়ে বাম পা ধুলেন। (নাসাঈ-১০২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ্। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আবূ দাউদ-১৩৩, ১৩৭ ও ১৩৮ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৪৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কানের ভেতরের অংশ শাহাদাৎ আঙ্গুলি দ্বারা এবং বাইরের অংশ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসেহ করলেন। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (হাশিয়াতুত তাহতাবী : ৭৪) এ হাদীসে কান মাসেহ করার কোন সংখ্যা বর্ণিত না হওয়ায় বুঝা যায় যে, কান একবার মসেহ করতে হয়। এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে একটি হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. উভয় কানের ভেতরে-বাইরে একবার মাসেহ করেছেন। (তিরমিযী : ৩৪)

অযুতে গর্দান মাসেহ করা

فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَانَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , قَالَ: مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (كِتَابُ الطَّهُورِ لِأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ الْخُزَاعِيِّ)

অনুবাদ : হযরত মুসা ইবনে তালহা রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মাথার সাথে তার গর্দান মাসেহ করবে সে কিয়ামতের দিন (গলায়) বেড়ী পরানো থেকে রেহাই পাবে। (কিতাবুত তুহুর লিআবী উবাইদ, ৩৬৮) হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও তালখীছুল হাবীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আত-তালখীছুল হাবীর : ৯৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

হাদীসটির স্তর : হাসান। উল্লিখিত হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। কেবল মাসউদীকে নিয়ে এতটুকু আপত্তি পাওয়া যায় যে, শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু উক্ত অভিযোগ এ কারণে ক্ষতিকর হবে না যে, আবু হাতিমের বর্ণনানুযায়ী তাঁর মৃত্যুর এক বা দুই বছর পূর্বে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। আর আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আরো পূর্বে। হযরত মাসউদীর মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে আব্দুর রহমান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু তখন তাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। (তাহজীবুত তাহজীব : ৩৯১৯) হযরত মাসউদী থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ শব্দে হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদও বর্ণনা করেছেন। (কিতাবুত তুহুর লিআবী উবাইদ, হাদীস নম্বর- ৩৬৯) এ থেকেও বর্ণনাটির দৃঢ়তা প্রমাণিত হয়। হযরত আবু উবায়েদ এ হাদীসটি আরো একটি সনদে বর্ণনা করেছেন যা এই- **قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ** (কিতাবুত তুহুর লিআবী উবাইদ, হাদীস নম্বর- ৩৬৯)

ফায়দা : ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীসটি যদিও মাওকুফ তবুও মারফু'র তথা রসূল স.-এর কথার বিধান রাখে। কারণ এটা এমন একটি বিষয় যা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বলা যায় না। তিনি শরহু নুখবাতিল ফিকারে বলেন, **ثقةٌ** "নির্ভরযোগ্য" রাবীদের মুরসাল বর্ণনার পক্ষে কোন সমার্থক বর্ণনা পাওয়া গেলে চার ইমামের নিকটেই তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। (সংক্ষেপিত শরহু নুখবাতিল ফিকার: ৫০-৫১)

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ. هَذَا مَوْقُوفٌ وَالْمُسْنَدُ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত : তিনি যখন মাথা মাসেহ করতেন তখন মাথার সাথে গর্দানও মাসেহ করতেন। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ২৭৯)

হাদীসটির স্তর : মাওকুফ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইমাম বায়হাকী রহ. এ হাদীসটিকে মুসনাদ তথা মারফু' হিসেবে জঈফ বলেছেন। তবে মাউকুফ হিসেবে কোন আপত্তি করেননি। যার অর্থ হলো মাউকুফ হিসেবে এটা অগ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকেও জঈফ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.কে মাথা, কান এবং গর্দানের উপরিভাগ তিনবার করে মাসেহ করতে দেখেছেন। (মুসনাদে বায্‌যার : ৪৪৮৮)

অনুরূপভাবে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকেও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযু করলো আর উভয় হাত দ্বারা গর্দান মাসেহ করলো তাকে কিয়ামতের দিন (গলায়) বেড়ী পরানো থেকে রেহাই দেয়া হবে। (আল্লামা রুইয়ানী বলেন, ইংশা আল্লাহ হাদীসটি সহীহ। (আত-তালখীছুল হাবির : ৯৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ স্বতন্ত্রভাবে দুর্বল হলেও একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটা হাসান লিগাইরিহী। কেননা মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন যে, সত্যবাদী-আমানতদার জঈফ রাবীর বর্ণিত হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলেও পারস্পারিক সমর্থনের কারণে সম্মিলিতভাবে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তাতে হাদীসটি হাসান লিগাইরিহীর স্তরে উন্নীত হয়। (তাদরীবুর রাবী : ১/১৯২, মুকাদ্দামায়ে মিশকাত: পৃষ্ঠা- ৫ ও ৬)

গর্দান মাসেহ করার যে পদ্ধতি আমাদের মাঝে প্রচলিত আছে সেটা হাদীসসম্মত না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লামা তাহতাবী রহ. বলেন,

وهو يقتضي أن مسح الرقبة مع مسح الرأس عند ذهاب اليدين إلى مؤخر الرأس وهو خلاف المتداول بين الناس وما في الفتح من أنه يستحب مسح الرقبة بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما فموهم لأن مفهومه إن بلة باطنهما مستعملة وليس كذلك.

অনুবাদ : গর্দান মাসেহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের দাবী হলো- মাথা মাসেহ করার সাথে হাত টেনে নিয়ে গর্দান মাসেহ করা। অথচ এটা প্রচলিত পদ্ধতির পরিপন্থী। হাতের পাতার সিক্ততা অন্য কোন অঙ্গ মাসেহ করার কাজে ব্যবহৃত হয়নি বলে তা দ্বারা গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব মর্মে ফাতহুল কাদীরে উল্লিখিত বিবরণ লেখকের উদ্ভাবিত। কেননা তাঁর কথার ফলাফল হলো: হাতের তালুর সিক্ততা ব্যবহৃত পানি হিসেবে পরিগণিত; অথচ তা সঠিক নয়। (তাহতাবী আলাল মারাকী : ৪১)

অতএব, হাদীসের বর্ণনা থেকে যেটা তুলনামূলক বেশি স্পষ্ট অর্থাৎ মাথা মাসেহ করার সময় হাত টেনে আরো নীচ পযর্ন্ত নিয়ে গিয়ে গর্দান মাসেহ করা–এটাই উত্তম হবে।

গর্দান মাসেহ করার উক্ত পদ্ধতি মেনে নেয়া হলে বুখারী-মুসলিমসহ বহু হাদীসের কিতাবে গর্দান মাসেহ করার দলীল মিলবে। তন্মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে বুখারী শরীফ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর হাদীস পেশ করা যেতে পারে।

উক্ত হাদীসে তিনি বলেন, রসূল স. অযুতে উভয় হাত মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে গর্দান পর্যন্ত টেনে নিতেন, আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানেই ফিরিয়ে আনতেন। (বুখারী : ১৮৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা, তিরমিযী, মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৫১৪৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাথা মাসেহের সময় হাত টেনে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে আনার মধ্যে গর্দানের উপরিভাগ মাসেহ করতে হয়।

এর বিপরীতে ইমাম নববী রহ. শরহুল মুহাজ্জাব কিতাবে বলেছেন যে, مَسْحُ الرَّقَبَةِ بِدْعَةٌ، وَأَنَّ حَدِيثَهُ مَوْضُوعٌ "গর্দান মাসেহ করা বিদআত এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো মাউযু' বা বানোয়াট"। দলীলবিহীন কারো কথা না মানার দাবীদারগণ অনেকেই ডবনাবাক্যে ইমাম নববী রহ.-এর এ উক্তি মনে-প্রাণে মেনে নিলেও বিশিষ্ট গায়রে মুকাল্লিদ আলেম আল্লামা শাওকানীসহ যুগশ্রেষ্ঠ বহু মুহাদ্দিস এর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন,

"গর্দান মাসেহ করার কিছু দলীল বর্ণনা করে বলেন, এ সব কিছু থেকে জানা যায় যে, "গর্দান মাসেহ করা বিদআত এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো মাউযু' বা বানোয়াট" বলে ইমাম নববী রহ. যে মন্তব্য করেছেন তা মনগড়া। 'ইমাম শাফেঈ এবং তাঁর অনুসারীগণ কেউ গর্দান মাসেহ করার কথা বলেননি' মর্মে ইমাম নববী যে মন্তব্য করেছেন তা আরো বেশি আশ্চর্যের বিষয়। কারণ হযরত ইবনুল কাআছসহ স্বল্প সংখ্যক উলামায়ে কিরাম গর্দান মাসেহ করার কথা বলেছেন। শাফেঈ মাযহাবের ইমাম রুইয়ানী 'আল বাহ্‌র' নামক কিতাবে বলেন, আমাদের সাথীগণ বলেছেন, গর্দান মাসেহ করা ছুন্নাত।

আল্লামা শাওকানী আরো বলেন, ইবনুর রফআহ রহ.ও এ বিষয়ে ইমাম নববীর মতামত খণ্ডনে বলেন, 'হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম বাগাবী রহ. গর্দান মাসেহ করার আমলকে মুস্তাহাব বলেছেন। আর এ কথার ভিত্তি হতে পারে কেবল হাদীস বা আছার। কারণ এরকম বিষয়ে বিবেক খাটিয়ে কিছু বলা যায় না'। (নাইলুল আওতার : ১/২০৭)

মুল্লা আলী কারী রহ বলেন,

"গর্দান মাসেহ করা বেড়ী থেকে নিরাপদ" হাদীসকে ইমাম নববী শরহুল মুহাজ্জাব কিতাবে মাউযু' বলেছেন। অথচ আবু উবায়েদ কাসেম সনদসহ মুসা ইবনে তল্‌হা থেকে বর্ননা করেন : যে ব্যক্তি মাথার সাথে তার গর্দান মাসেহ করবে সে কিয়ামতের দিন (গলায়) বেড়ী পরানো থেকে রেহাই পাবে। হাদীসটি যদিও মাউকুফ তবে মারফু'-এর শ্রেণিভুক্ত। কারণ এরকম বিষয়ে বিবেক খাটিয়ে কিছু বলা যায় না। এ হাদীসটিকে আরো শক্তিশালী করে মুসনাদে ফিরদাউসে ইবনে ওমর থেকে জঈফ সনদে বর্ণিত মারফু হাদীস। আর ফযীলাতের ক্ষেত্রে জঈফ হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। এ কারণে আমাদের ইমামগণ বলেন, গর্দান মাসেহ করা ছুন্নাত বা মুস্তাহাব। (আল মাউযুআতুল কুবরা : ৪৩৪)

এ বর্ণনা দ্বারা মুল্লা আলী কারী রহ. ইমাম নববী রহ.-এর কথা প্রত্যাখ্যান করে গর্দান মাসেহ করার আমলকে কমপক্ষে মুস্তাহাব প্রমাণ করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ.-এর আমল

কাজী আবু ইয়া'লা রহ.সহ অন্যান্য মনীষীগণ বলেন, গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব মর্মে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। আবার কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, বেড়ী পরানোর আশঙ্কায় তোমরা গর্দান মাসেহ করো। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ.-এর ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি অযুতে যখন তিনি মাথা এবং কান মাসেহ করতেন তখন গর্দানও মাসেহ করতেন। (আল্-মুগ-নী লিইবনি কুদামা : অযুর মুস্তাহাব অধ্যায়)

ফায়দা : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত মারফু' হাদীস (তারীখে আসফাহান, মুসনাদে ফেরদাউস), হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত মাউকুফ হাদীস (আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, ইবনুল ফারেস), বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত মুসা ইবনে তলহার আছার (কিতাবুত তুহুর লিআবী উবাইদ),

শাফেঈ মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে আল্লামা বাগাবী (রাফেঈ আল-কাবীর), রুয়ানী (রাফেঈ আল-কাবীর), ইবনে হাজার আসকালানী (আত-তালখীছুল হাবীর), হানাফী মাযহাবের ইমামগণ থেকে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (আল- ডবনায়াহ), মুল্লা আলী কারী, (আল-মাউযুআতুল কুবরা), হাম্বলী মাযহাবের ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বাল, (আল-মুগনী লিইবনি কুদামা) ও বিশিষ্ট গইরে মুকাল্লিদ আলেম আল্লামা শাওকানী (নাইলুল আওতার) প্রমুখসহ অসংখ্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম গর্দান মাসেহ করার আমল গ্রহণ করেছেন। আমার অনুসন্ধানে ইমাম নববী রহ. ব্যতীত কোন মুহাদ্দিস এটাকে ভিত্তিহীন বলেননি। এসকল দলীলের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে গর্দান মাসেহ করাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। (শামী : ১/১২৪)

ভাবতে বড়ই আশ্চর্য লাগে! কিছু মানুষ উম্মতে মুসলিমার আমল এবং হাদীস গ্রহণের নীতিমালাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নতুন কিছু বলা বা করার নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছে। সহীহ হাদীস না পাওয়ার অজুহাতে গর্দান মাসেহ-এর ফযীলতকে অস্বীকার করে বসেছে। এটাকে বিদআত বলে সমাজে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণসহ উম্মতে মুসলিম-ার বিরাট অংশ এটাকে গ্রহণ করেছে। কেবল ইমাম নববী রহ.-এর দলীলবিহীন উক্তি ব্যতীত এর বিপরীতে পেশ করার মতো তেমন কিছু নেই। অতএব, পূর্ববর্তী বিষয়ের আলোকে নিরপেক্ষ পর্যালোচনাপূর্বক সবার প্রতি সত্য গ্রহণের বিনীত অনুরোধ রাখছি।

অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালো করে ডলে ধুয়া

عَنْ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً، تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى (رواه مسلم فى بَابِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ-١٢٥/١)

অনুবাদ : হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অযু করতে গিয়ে পায়ের উপরিভাগে নখ পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিলো অর্থাৎ সেখানে পানি পৌঁছাল না। রসূলুল্লাহ স. তা দেখে বললেন, যাও আবার ভালোভাবে অযু কর। লোকটি ফিরে গিয়ে পুনরায় অযু করে নামায আদায় করলো। (মুসলিম : ৪৬৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫১৫৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, অযু করার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব ভালোভাবে ডলে ধুতে হবে যেন অযুর অঙ্গে সামান্যতম জায়গাও শুষ্ক না থাকে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১২৩)

অযুর শেষে দুআ পড়া

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»(رواه النسائى فى بابِ الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ–١/١٩ و رواه مسلم فى بَابِ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ–١/١٢٢)

অনুবাদ : হযরত ওমর রা. বলেন, রসূল স. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের যে কেউ সুন্দরভাবে অযু করে অতঃপর বলে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। (নাসাঈ-১৪৮, মুসলিম-৪৪৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭০১৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, অযু করার পরে উপরিউক্ত দুআ পড়া ছুন্নাত। মুসলিম শরীফ ৪৪৭ নং হাদীসে দুআটি এভাবে বর্ণিত আছে : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ পূর্বের তুলনায় এ দুআটি বেশি ব্যাপক হওয়ায় এটা পড়া উত্তম হবে। এ ছাড়াও হাদীসে অন্যান্য দুআ বর্ণিত আছে সেগুলোও পড়া যেতে পারে। উপরিউক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবেও অযুর আদব হলো অযুর পরে দুআ পড়া। (শামী : ১/১২৮)

চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (رواه البخارى فى بَابٍ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ–١/٣٣)

অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে ছিলাম। (অযু করার সময়) আমি

তাঁর চামড়ার মোজা দুটি খুলতে চাইলে তিনি বললেন, ছেড়ে দাও। আমি মোজা দুটি পবিত্র অবস্থায় পরেছি। অতঃপর তিনি মোজা দু'টির উপরে মাসেহ করলেন। (বুখারী, ২০৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মুয়াত্তা মালেক, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫২৬৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতা অর্জন করার পরে চামড়ার মোজা পরিধান করে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরবর্তী অযুতে মোজা না খুলে শুধু মোজার উপর মাসেহ করলে পা ধুয়ার ফরয আদায় হয়ে যাবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। শামী : ১/২৬৪) আর অযু থাকা অবস্থায় মোজার উপর মাসেহের সময়-সীমা শেষ হয়ে গেলে মোজা খুলে উভয় পা ধুয়ে নেওয়া যথেষ্ট। পুনরায় অযু করা আবশ্যক নয়। তবে এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে নতুনভাবে অযু করে নেওয়া উত্তম। (কিতাবুল আছল ১/৭৩; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৪৭; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৪১৬; আদ্দুররুল মুখ্তার ১/২৭৬)

মোটা সুতার মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالُوا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يكونا نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ (رَوَاه التِّرْمِذِىُّ فِىْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ-١/٢٩)

অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. অযু করলেন আর সুতার মোজা ও জুতোর উপর মাসেহ করলেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ.সহ বহু উলামায়ে কিরামের অভিমত এটাই যে, জুতো পায়ে না থাকলেও সুতার মোজা মোটা হলে তার উপর মাসেহ করা যাবে। (তিরমিযী : ৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৫২৭৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সিদ্ধান্ত এই যে, সুতার মোজা মোটা হলে তার উপর মাসেহ করা যাবে। মোটা মোজা বলতে ঐ মোজাকে বুঝায় যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। এক. বাঁধা ছাড়াই পায়ে আটকে থাকে, দুই. জুতোবিহীন শুধু মোজা পায়ে দিয়ে চললেও সহজে ছিড়ে যায় না এবং তিন. মোজার উপরে পানি ঢেলে দিলে সহজে ভেতরে প্রবেশ করে না। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে সুতার তৈরী উক্ত মোটা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। (হিদায়াহ : ১/৬১)

ফায়দা : সুতি মোজার ক্ষেত্রে ইমামগণ যে কঠোরতা করেছেন তার মূল কারণ হলোঃ কুরআন বলেছে পা ধুয়ার কথা; আর অন্য একটি আয়াত দ্বারাই কেবল কুরআনের উক্ত হুকুমের স্থলাভিষিক্ত বিকল্প কোন কিছুর উপর আমল করা যেতে পারে। কোন হাদীস দ্বারাও কুরআনের হুকুমের স্থলাভিষিক্ত বিকল্প কোন কিছু গ্রহণ করা যায় না; যদি সে হাদীস মুতাওয়াতির না হয়। এ শর্ত মোতাবেক خفّ অর্থাৎ চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় তা দ্বারা কুরআনে বর্ণিত পা ধুয়ার হুকুমের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু جورب অর্থাৎ মোটা সুতার মোজার উপর মাসেহ করার হাদীস যেহেতু সে মানের নয় তাই এর দ্বারা কুরআনের হুকুমের বিকল্প গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। তবে মোজা যদি পূর্বোক্ত বর্ণনা মোতাবেক খুব মোটা হয় তাহলে চামড়ার মোজার সাথে বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্যের কারণে উক্ত হুকুমের আওতায় আসতে পারে।

মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. (رواه مسلم فى بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ– ١/١٣٥)

অনুবাদ : হযরত শুরাইহ ইবনে হানী রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট এসে তাঁকে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি আলি ইবনে আবু তালেবকে জিজ্ঞেস কর। কারণ তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সফর করতেন। অতঃপর আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ স. মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন। (মুসলিম : ৫৩২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫২৮৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা, আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত অর্থাৎ ৭২ ঘন্টা। এরপরে পা ধুতে হবে মাসেহ করা চলবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/২৭১) অযু থাকাবস্থায় নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে নতুন অযুর প্রয়োজন নেই, শুধু পা ধুলেই যথেষ্ট হবে। (শামী : ১/২৭৬) আর নামায অবস্থায় মাসেহের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে নামায ভেঙ্গে যাবে এবং পা ধুয়ে পুনরায় নামায পড়তে হবে। (মাযমাউল আনহুর : ১/৭২)

জ্ঞাতব্য : মোজার উপর মাসেহ করার সময় নির্ধারণের নিয়ম হলো প্রথমে অযু করে পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করবে। (বুখারী : ২০৬) এরপর অযু ভেঙ্গে গেলে সেখান থেকে মাসেহ করার সময়সীমা শুরু হবে। (শামী : ১/২৭১)

ব্যান্ডেজ-এর উপর মাসেহ করা জায়েয

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তাঁর হাতে পট্টি বাঁধা অবস্থায় তিনি অযু করলেন এবং পট্টির উপর মাসেহ করলেন আর অবশিষ্ট

অংশ ধুলেন। ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, এটা হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে সহীহ। (আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-১০৮১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম বায়হাকী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীরের কোথাও জখম থাকার কারণে যদি ব্যান্ডেজ বাঁধা হয় তাহলে অযু-গোসলের সময় উক্ত ব্যান্ডেজ খুলে পানি দিয়ে ধুয়ার প্রয়োজন নেই। বরং পূর্ণ শরীর ধুয়ে ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করলে যথেষ্ট হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/২৭৮) অনুরূপ মন্তব্য সহীহ সনদে বর্ণিত আছে বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত আতা ইবনে আবি রবাহ রহ. থেকে (ইবনে আবি শাইবা-১৪৪৫) এবং হাসান সনদে হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে (আব্দুর রয্যাক-৬২১, কিতাবুল আছার লিআবি ইউসুফ-৭৫, কিতাবুল আছার লিমুহাম্মাদ-৩০)

অধ্যায় ৩ : অযু ভঙ্গের কারণ

বায়ু নির্গত হলে অযু ভঙ্গ হয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. (رواه البخارى فى بَابِ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ–٢٦/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির অযু ভেঙ্গে যায় অযু না করলে তার নামায কবুল হয় না। হাযরা মাউতের এক ব্যক্তি বললেন, হে আবু হুরায়রা! হাদাস কী? তিনি উত্তরে বলেন, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া। (বুখারী : ১৩৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫২১৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হলে অযু ভেঙ্গে যাবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৩৫)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ (رواه البخارى فى بَابِ مَنْ لَمْ يرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ–٢٩/١)

অনুবাদ : হযরত আলী রা. বলেন, আমি অধিক মজী নির্গত হওয়া মানুষ ছিলাম। আর এ ব্যাপারে আমি নিজে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা.কে জিজ্ঞেস করতে বললাম। তিনি রসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করলে রসূল স. বলেন, এতে শুধু অযু করতে হবে। (বুখারী : ১৭৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুয়াত্তা মালেক এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মজী নির্গত হলে অযু ভেঙ্গে যায়। যৌন উত্তেজনার সময় শরমগাহ থেকে যে পাতলা পানি বের হয় তাকে মজী বলে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৯)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. قال ابو عيسى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذى فى بَابِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالمُقِيمِ–١/٢٧)

অনুবাদ : হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল রা. বলেন, আমরা যখন সফরে থাকতাম তখন রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন আমরা যেন তিন দিন এবং তিন রাতের মধ্যে জানাবাত ব্যতীত মোজা না খুলি। অর্থাৎ জানাবাতের গোসলের সময় মোজা খুলতে হবে। তবে পেশাব-পায়খানা ও ঘুমের কারণে (অযুর সময়) মোজা খোলার প্রয়োজন নেই। (তিরমিযী-৯৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ-১২৭ এবং ইবনে মাযা-৭৪৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পেশাব, পায়খানা এবং ঘুমের কারণে অযু ভেঙ্গে যায়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৯) অবশ্য নিয়মানুযায়ী চামড়ার মোজা পরিধান করা থাকলে অযু করার সময় মোজা না খুলে তার উপর মাসেহ করলে যথেষ্ট হবে।

জ্ঞাতব্য : ঘুমানোর কারণে অযু ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয়টিকে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ শুয়ে ঘুমানোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। (মুয়াত্তা মালেক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৪) সুতরাং দাঁড়িয়ে, বসে বা নামাযরত অবস্থায় কেউ ঘুমালে তার অযু নষ্ট হবে না। তাঁরা দলীল হিসেবে বুখারী-মুসলিমের সেই প্রসিদ্ধ হাদীস পেশ করেন যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. একদিন ইশার নামায পড়তে এত বেশি দেরি করলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম বসে বসে ঘুমাচ্ছিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ স. আসলেন এবং তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন কিন্তু তাঁরা অযু করলেন না। (মুসলিম : বসে ঘুমানো ব্যক্তির অযু ভঙ্গ না হওয়ার প্রমাণ) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/১২)

শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে অযু ভঙ্গ হয়

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. (رواه مالك فى باب مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ والقيء–١٣)

অনুবাদ : নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত: হযরত ইবনে ওমর রা.-এর নাক দিয়ে রক্ত বের হলে তিনি নামায থেকে ফিরে গিয়ে অযু করে পুনরায় অবশিষ্ট নামায আদায় করতেন। আর এ সময় তিনি কথা বলতেন না। (মুয়াত্তা মালেক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (জামেউল উসূল-৩৬০৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাক দিয়ে রক্ত বের হলে অযু ভেঙ্গে যায়। মানুষের শরীর থেকে নাপাক বের হওয়ার স্বাভাবিক স্থান হলো পায়খানা এবং পেশাবের রাস্তা। এ দু'টির বাইরে নাক থেকে রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গা দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, পায়খানা এবং পেশাবের রাস্তা ব্যতীত শরীরের ভিন্ন কোন স্থান থেকে রক্ত বের হলেও অযু ভেঙ্গে যাবে। এ বিষয়ে সহীহ সনদে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নামাযের মধ্যে কারো নাক দিয়ে রক্ত বের হলে বা বমি বেরিয়ে আসলে অথবা মজী দেখলে সে ব্যক্তি নামায থেকে সরে গিয়ে অযু করবে। অতঃপর ফিরে এসে ছুটে যাওয়া নামায পুরো করবে যতক্ষণ কথা না বলে। (আব্দুর রাযযাক : ৩৬০৯) হযরত আলী রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কেউ যখন তার পেটে (বায়ুজনিত) পীড়া অথবা নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া বা বমি লক্ষ করে, সে যেন নাকে হাত দিয়ে বের হয়ে গিয়ে অযু করে নেয়। (আব্দুর রাযযাক : ৩৬০৭)

مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى. (رواه مالك فى باب مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ–١٣)

অনুবাদ : ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কুসাইত রহ. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ.-এর নাক দিয়ে নামাযরত অবস্থায় রক্ত ঝরতে দেখলেন। অতঃপর তিনি হযরত উম্মে সালামা রা.-এর হুজরার নিকট আসলেন এবং তাঁকে অযুর পানি দেয়া হলে তিনি অযু করলেন। তারপর

ফিরে গিয়ে আদায়কৃত নামাযের উপর ভিত্তি করলেন। (মুয়াত্তা মালেক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯১, অধ্যায়: নাক দিয়ে রক্ত ঝরা ও বমি সংক্রান্ত বর্ণনা)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের ☐☐☐☐ নির্ভরযোগ্য রাবী। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, **إسناده صحيح** হাদীসটির সনদ সহীহ। (জামেউল উসূল-৩৬১১ নং হাদীসের আলোচনায়)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ حَدَّثَهُمْ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ.

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: নামাযরত অবস্থায় যদি কেউ বমি করে অথবা কারো পেট থেকে খাদ্য বা পানীয় বেরিয়ে আসে তাহলে সে যেন নামায থেকে ফিরে যায়। অতঃপর অযু করে এবং আদায়কৃত নামাযের উপর ভিত্তি করে; যতক্ষণ সে এ অবস্থায় কথা না বলে। ইবনে জুরাইয বলেন, কথা বললে নতুন করে নামায পড়বে। (দারাকুতনী : ৫৬৩, আত তাহকীক লিইবনিল জাওযী : ১৯৫, ইবনে মাযা : ১২২১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম দারাকুতনী রহ. হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। তবে ইবনুল জাওঝযী রহ. এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, **قلْنَا قد قَالَ يَحْيَى بن معِين إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ثِقَة و الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة والمرسل عندنَا حجَّة** "ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ইসমাঈল রহ.কে **ثقةٌ** নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর **ثقةٌ** রাবীর বাড়তি বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। উপরন্তু মুরসাল হাদীস আমাদের নিকট দলীল হিসেবে গণ্য।

حَدَّثَنَا عَبد الله بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ مُحمد بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَان بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَال: قَال رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ.

অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন : প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু করতে হবে। (আল কামিল লিইবনিল আদী : আহমদ ইবনুল ফারাজ-এর জীবনীতে)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আহমদ ইবনুল ফারাজ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই ثقة "নির্ভরযোগ্য"। আর আহমদ ইবনুল ফারাজের ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, **هو وسط وقال ابن أبي حاتم محله الصدق... وقال مسلمة ثقة مشهور وذكره ابن حبان في الثقات** "তিনি মধ্যম পর্যায়ের রাবী, ইবনে আবী হাতেম বলেন, তিনি সত্যবাদী। হযরত মাসলামা বলেন, তিনি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। আর ইবনে হিব্বান তাঁকে 'ছিকাত' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (লিসানুল মীযান: রাবী নম্বর- ৭৬৮) আর বাকিয়্যাহ মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে তাদলীসের অভিযে-াগ রয়েছে। তবে স্পষ্টভাবে **حدّثنا** (আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলায় তাদলীসের অভিযোগ এ হাদীসে ক্ষতিকর নয়।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরীরের যে কোন স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে অযু ভেঙ্গে যায়। তবে রক্তের পরিমাণ যদি এত কম হয় যা শুধু দেখা যায় কিন্তু প্রবাহিত হয় না তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন এবং আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনেকে এ মত পোষণ করেছেন। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/১০) আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রহ. এ ব্যাপারে প্রথমে হযরত ইবনে ওমর রা.-এর মাযহাব তুলে ধরেন। অতঃপর বলেন, ইবনে উমারের মতো অনুরূপ মতামত বর্ণিত হয়েছে হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, আলকামা, আমের শা'বী, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখাঈ, হাকাম ইবনে উতায়বা, হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান থেকে। তাঁরা প্রত্যেকেই নাক দিয়ে রক্ত ঝরা এবং শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হওয়াকে নামাযের জন্য অযু ওয়াজিবকারী বলে মনে করেন। এ কারণে ইমাম আবু হানিফা, তাঁর সাথীগণ, সুফিয়ান সাওরী, হাসান ইবনে হাই, উবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান, আওঝাঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. সকলেই নাকসীর জখম, সিঙ্গা লাগান এবং শরীর থেকে যে কোন নাপাক বের হলে পবিত্রতা নষ্ট হবে বলে মনে করেন। ফলে কেউ নামায পড়তে চাইলে তার জন্য অযু আবশ্যক হবে। যদি রক্তের পরিমাণ কম হয় বা রক্ত বের হয়ে আসেনি অথবা রক্ত প্রবাহিত হয়নি তাহলে সকলের ঐক্যমতে ঐ রক্তের

কারণে অযু ভঙ্গ হবে না। আর হযরত মুজাহিদ রহ. ব্যতীত কোন ইমাম সামান্য রক্তের কারণে অযু ভঙ্গের মত পোষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। (আল্ ইস্তিজকার, ১/২২৯)

মুখ ভরে বমি হলে অযু ভঙ্গ হয়

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِيْ بَابِ الوُضُوءِ مِنَ القَيْءِ وَالرُّعَافِ–١/٢٥)

অনুবাদ : হযরত আবু দারদা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বমি করলেন এবং রোযা ভেঙ্গে দিলেন অতঃপর অযু করলেন। বর্ণনাকারী মা'দান বলেন, আমি দামেশকের মাসজিদে হযরত ছাওবান রা.-এর সাথে মুলাকাত করে এ বিষয়টি পেশ করলাম। তিনি বললেন, হযরত আবু দারদা সত্য বলেছেন। আমি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য পানি ঢেলে দিয়েছি-লাম। (তিরমিযী : ৮৭, মুসনাদে আহমদ-২১৭০১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি এ অধ্যায়ের সর্বাধিক সহীহ। (তিরমিযী : ৮৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল : ৪৪০৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বমি হলে অযু ভেঙ্গে যায়। উক্ত হাদীস বর্ণনান্তে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, **وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ مِن التَّابِعِينَ الْوُضُوءَ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ** বমি হলে এবং নাক দিয়ে রক্ত বের হলে অযু করতে হবে বলে সাহাবা এবং তাবিঈগণের মধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞ আলেম মত দিয়েছেন। তন্মধ্যে সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রাহওয়াঈ রহ. অন্যতম।

বমি দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্য মুখভরে বমি হওয়া শর্ত। কারণ বমির পরিমাণ কম হলে তা পাকস্থলির উপরিভাগ থেকে সদ্য ভক্ষণকৃত খাবার হয়ে থাকে। আর এটা নাপাক নয়। তবে বমির পরিমাণ বেশি হলে তা পাকস্থলির পরবর্তী স্তরের খাদ্য যা পায়খানায় রূপান্তরের নিকটবর্তী হয়ে নাপাকের তালিকাভূক্ত হয়েছে। এ কারণে বমির পরিমাণ বেশি হলে তা দ্বারা অযু ভেঙ্গে যায়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/১১)

নামাযে উচ্চস্বরে হাসলে অযু ভঙ্গ হয়

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَتَرَدَّى فِي حفرة كانت فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ فَضَحِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ ـ

অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. একদিন সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় চোখে ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্যক্তি এসে মাসজিদের একটি কূপে পড়ে গেলো। অধিকাংশ সাহাবা নামাযের মধ্যে হেসে ফেললেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. নির্দেশ দিলেন যে, যারা হেসেছে তারা যেন পুনরায় অযু করে নামায পড়ে নেয়। (আল মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। উপরন্তু অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা এ হাদীসের বিষয়বস্তুও সমর্থিত। এ হাদীসটি বেশ কিছু সনদে আবুল আলিয়া থেকে মুরসালভাবে বর্ণিত হওয়ায় কেউ কেউ এটাকে মারফু' মুত্তাসিল বলতে চাননি। কিন্তু বাস্তবে তা সঠিক নয়। কেননা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে কোন হাদীস মারফু'ভাবে বর্ণিত হলে তা গ্রহণযোগ্য। অন্য সনদের মুরসাল বর্ণনা মুত্তাসিল হাদীসের বিশুদ্ধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। ইমাম নববী রহ. মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল মিনহাজ' কিতাবের ভূমিকায় এ ব্যাপারে নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। (অধ্যায়: নির্ভরযোগ্য রাবীদের বাড়তি বর্ণনা গ্রহণযোগ্য)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا إِذْ فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَه ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَه

অনুবাদ : হযরত আবুল আলিয়া বলেন, রসূলুল্লাহ স. একদিন সাহাবায়ে কিরামকে নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে পানিভরা একটি কূপে পড়ে গেলো। কিছু সাহাবা এতে হেসে ফেল-লন। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করে বললেন, যে হেসেছে সে যেন পুনরায় অযু করে নামায পড়ে নেয়। (আব্দুর রাযযাক : ৩৭৬০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইমাম ঐাহাবী রহ. আবুল আলিয়া পর্যন্ত এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, আবুল আলিয়ার জীবনী আলোচনায়)

ইমাম আব্দুর রাযযাক আরো বেশ কিছু সহীহ সনদে আবুল আলিয়ার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর নির্ভরযোগ্য রাবীর মুরসাল বর্ণনার পক্ষে কোন সমার্থক হাদীস থাকলে চার ইমামসহ অনেক নীতিনির্ধারক ইমামের নিকট তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

حَدَّثَنَا بْنُ جَوْصَاءَ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ قَيْسٍ السَّكُوْنِيُّ. عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসে সে যেন অযু এবং নামায উভয়টাই পুনরায় আদায় করে। (আল্-কামিল লিইবনিল আদী : ৪/১০১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। আর বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদের বিরুদ্ধে তাদলীসের অভিযোগ থাকলেও তিনি এ হাদীসে حَدَّثَنِيْ (আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন) শব্দ স্পষ্টভাবে বলায় সে অভিযোগ এ হাদীসে ক্ষতিকর নয়। আবার পূর্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা এ হাদীসের বিষয়বস্তুও সমর্থিত। বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদের কারণে যারা এ হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন আল্লামা ঝায়লাঈ রহ. তা খণ্ডন করেছেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসটি তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। (নাসবুর রায়াহ-২২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে উচ্চস্বরে হাসলে অযু এবং নামায উভয়টাই ভেঙ্গে যায়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/১২)

এর বিপরীতে অনেকে বলে থাকেন যে, নামাযে উচ্চস্বরে হাসলে নামায ভেঙ্গে যায় তবে অযু ভাঙ্গে না। কিন্তু উপরিউক্ত হাদীসগুলোর আলোকে অযু ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সাথে সাথে এ নিয়ম পালনের মধ্যে নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতে বাড়তি সতর্কতাও রয়েছে যা একান্ত জরুরী।

অযু ভঙ্গ হওয়ার নীতিমালা

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَلْوُضُوْءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ مُوْطَئٍ

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, শরীর থেকে কোন কিছু বের হলে অযু নষ্ট হয় কিন্তু কোন কিছু ঢুকলে নয়। আর কোন কিছু পদদলিত করলে সে কারণে অযু করা লাগবে না। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক : ১০০, ইবনে আবী শাইবা : ৫৪২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীতে হাদীসটি এনে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। অতএব ফতহুল বারীর মুকাদ্দামায় প্রথম পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লেখিত তাঁর বক্তব্য (بشرطالصحة أو الحسن) অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ বা হাসান।

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ বর্ণনা থেকে এ নীতিমালা বের হয়ে আসে যে, শরীর থেকে কোন কিছু অর্থাৎ নাপাক জিনিস বেরিয়ে আসলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। এ নীতিমালার আলোকে রক্ত, পুঁজ, বমি ও ক্ষতস্থান থেকে পানি বের হওয়াসহ শরীর থেকে যে কোন নাপাক বের হওয়ার দ্বারাই অযু নষ্ট হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। পেশাব বা পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন জায়গা থেকে রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গার জন্য রক্ত গড়িয়ে যাওয়া শর্ত। কারণ রক্ত বের হয়ে স্বস্থান অতিক্রম না করলে সেটাকে প্রবাহিত রক্ত হিসেবে ধরা যায় না। আর শরীরের রক্তের মধ্যে কেবল প্রবাহিত রক্তই নাপাক। (ছূরা আনআম : ১৪৫)

সুতরাং যে রক্ত শুধু ক্ষতস্থানে দেখা যায় কিন্তু গড়িয়ে পড়ে না তা নাপাক নয়। এ জাতীয় রক্ত দেখা গেলে অযু ভঙ্গ হয় না। পুঁজ হলো রক্তসহ শরীরের অন্যান্য অংশের পঁচা তরল যা রক্তের মতো নাপাক। তেমনিভাবে বমি দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্যও মুখভরে বমি হওয়া শর্ত। কারণ বমির পরিমাণ সামান্য হলে তা পাকস্থলির উপরিভাগ থেকে নির্গত যা সদ্য ভক্ষণকৃত খাবার হয়ে থাকে। আর এটা নাপাক নয়। তবে বমির পরিমাণ বেশি হলে তা পাকস্থলির পরবর্তী স্তরের খাদ্য হয়ে থাকে যা পায়খানায় রূপান্তরের নিকটবর্তী এবং নাপাকের তালিকাভুক্ত। এ কারণে বমির পরিমাণ বেশি হলে তা দ্বারা অযু ভেঙ্গে যায়।

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হয় না

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ (رواه الترمذي في باب ترك الوضوء من مس الذكر–١/٢٥)

অনুবাদ : হযরত তলক ইবনে আলী রা. রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, লজ্জাস্থান তো তোমার শরীরেরই একটি অঙ্গ। (তিরমিযী : ৮৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এ অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বোত্তম হাদীস। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ : ১৮২, নাসাঈ: ১৬৫, ইবনে মাযা : ৪৮৬ এবং দারাকুতনী : ৫৪৩ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৫২৩২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করলে যেমন অযুর প্রয়োজন হয় না তেমনিভাবে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলেও অযুর প্রয়োজন হবে না। এ হাদীস বর্ণনান্তে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, অনেক সাহাবায়ে কিরাম এবং কোন কোন তাবিঈ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁরা লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে অযুর প্রয়োজন মনে করতেন না। এটাই কুফাবাসী ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর অভিমত। আর এ হাদীসটি এ অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বোত্তম হাদীস।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ لَا يَرَوْنَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءًا وَقَالُوْا لَا بَأْسَ بِه۔

অনুবাদ : হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ও আবু হুরায়রা রা. লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে অযুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন না। তাঁরা বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। (আব্দুর রাযযাক : ৪৩৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, **وهذا إسناد رجاله ثقات** এটা এমন সনদ যার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। (আল মাতালিবুল আলিয়া, ৩ নং হাদীসের আলোচনায়) হযরত হুজাইফা রা.-এর অনুরূপ মন্তব্য দারাকুতনী-৫৪৬ এবং ৫৪৭ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي، أَوْ إِبْهَامِي، أَوْ أُذُنِي، أَوْ أَنْفِي.

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি এ বিষয়ে পরওয়া করি না যে, আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করছি, নাকি বৃদ্ধাঙ্গুলি, কান বা নাক স্পর্শ করছি। (ইবনে আবী শাইবা : ১৭৫৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হয় না।

জ্ঞাতব্য : লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণনার পরে ইমাম ত্বহাবী রহ. এ মন্তব্য করেন যে, **فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَى بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، غَيْرَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** "একমাত্র ইবনে ওমর রা. ব্যতীত সাহাবায়ে কিরামের কেউ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হওয়ার ফতওয়া প্রদান করতেন বলে আমার জানা নেই। আবার ইবনে ওমর রা.-এর এ ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবাগণ তাঁর বিরোধিতা করেছেন"। (ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬২, হাদীস নং-৪৭৪)

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হয় না মর্মে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আরো যাঁদের মতামত বর্ণিত রয়েছে তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার ইবনে

ইয়াসার (ইবনে আবী শাইবা: ১৭৫৪), হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (ইবনে আবী শাইবা: ১৭৫৫), তাবিঈদের মধ্যে সাঈদ ইবনে যুবায়ের (ইবনে আবী শাইবা: ১৭৫৮), ইবরাহীম নাখাঈ (ইবনে আবী শাইবা: ১৭৫৯) অন্যতম। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/১৪৭)

উল্লিখিত হাদীসের বিপরীতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হওয়ার কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। সুতরাং সতর্কতামূলক নতুন করে অযু করে নেয়া উত্তম।

নারীকে স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হয় না

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عُرْوَةُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، (رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ–١/٢٤)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. কোন এক স্ত্রীকে চুমু দিলেন অতঃপর নামায আদায় করতে গেলেন কিন্তু (নতুন করে) অযু করলেন না। হযরত উরওয়া রহ. বললেন,: রসূলুল্লাহ স.-এর উক্ত স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কে হবেন? এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা. হাসলেন। (আবূ দাউদ : ১৭৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ। (মুসনাদে আহমদ : ২৫৭৬৬ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী-৮৬, নাসাঈ-১৭০ এবং ইবনে মাযা শরীফ-৫০২ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল : ৫২২৭)

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابٍ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ... –١/٧٣)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সাথে তুলনা করে বড়ই খারাপ করেছ। অথচ রসূলুল্লাহ স. নামায পড়ার সময় আমি তাঁর সামনে কিবলার দিকে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন আমার পায়ে টোকা দিতেন আর আমি পা গুটিয়ে নিতাম। (বুখারী : ৪৯৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং মুয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৭২০)

বি. দ্র. মুসলিম শরীফের ১০২০ ও ১০২২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নামাযীর সামনে সুতরা না থাকলে গাধা, মহিলা ও কুকুর অতিক্রম করার কারণে নামায ভেঙ্গে যায়। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা. উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا

অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন অতঃপর নামাযে যেতেন কিন্তু (নতুন করে) অযু করতেন না। (আল মু'জামুল আওসাত লিত্তবারানী : ৩৮০৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা হাইসামী বলেন, **رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَثَبَّتَهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.**" হাদীসটি তবারানী তাঁর মু'জামে আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর একজন রাবী ইয়াযীদ ইবনে সিনানকে ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ও ইবনুল মাদীনী জঈফ বলেছেন। আর ইমাম বুখারী ও আবু হাতেম তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং মারওয়ান ইবনে মুআবীয়া তাঁকে দৃঢ় বলেছেন। অবশিষ্ট রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১২৮০)

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদেরকে স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হয় না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৪৭) অন্যদিকে কোন কোন ইমাম ছূরা মায়েদার ৬ নম্বর আয়াতে

বর্ণিত- أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ এবং অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলে থাকেন যে, নারীকে স্পর্শ করলে অযু করতে হবে। অথচ আকাবির (বর্ষীয়ান) সাহাবাদের গ্রহণযোগ্য তাফসীর অনুযায়ী أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ আয়াত দ্বারা সাধারণ স্পর্শ উদ্দেশ্য নয় বরং স্ত্রী সম্ভোগের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য।

আর যে মুজতাহিদগণ নারীকে স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্য থেকে আবার কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করে থাকেন এক. যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা, দুই. হাতের তালু দ্বারা স্পর্শ করা এবং তিন. কোন আবরণ ছাড়া স্পর্শ করা। তাদের মতে এই তিন শর্ত পাওয়া গেলে অযু ভেঙ্গে যাবে। আমাদের বিশ্বাস মতে যদিও অযু ভঙ্গ হয় না তবুও এই তিন শর্ত পাওয়া গেলে অযু করা উত্তম হবে।

আগুনে রান্না করা কোন কিছু খেলে অযু ভঙ্গ হয় না

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (رواه النسائى فى بَابِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ–١/٢٢)

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আগুনে পাকানো খাদ্য খাওয়ার পর অযু করা আর না করার মধ্যে রসূলুল্লাহ স.-এর সর্বশেষ আমল ছিলো অযু না করা। (নাসাঈ : ১৮৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ-৭৬০৫ নং হাদীসের আলোচনায়)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা ও মুয়াত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫২৫৩)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে অযু নষ্ট হয় না। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আল-মাবসূত লিসসারাখসী : ১/৭৯) আরো প্রমাণিত হয় যে, আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে অযু নষ্ট হওয়া সম্পর্কে যে সকল হাদীস বর্ণিত আছে তা হযরত জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

অধ্যায় ৪ : গোসলের বিবরণ

বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ مِنَ الْمَذْىِ الْوُضُوءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ-١/٣١)

অনুবাদ : হযরত আলী রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট মজী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করলেন : মজী বের হলে অযু করতে হবে। আর বীর্যপাত ঘটলে গোসল করতে হবে। (তিরমিযী : ১১৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা, মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫২১৯)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৫৯)

স্বপ্নদোষে বীর্যপাত না হলে গোসল ফরয হয় না

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى

ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ (رواه ابو داود فى بَابٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ-١/٣١)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে ব্যক্তি ভেজা দেখতে পেয়েছে কিন্তু সপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না। রসূল স. বললেন, সে গোসল করবে। রসূল স.কে আরো প্রশ্ন করা হলো- যে ব্যক্তি মনে করে তার সপ্নদোষ হয়েছে তবে ভেজা দেখছে না। রসূল স. বললেন, তার উপর গোসল জরুরী নয়। অতঃপর হযরত উম্মে সুলাইম রা. বললেন, যদি কোন মহিলা এমন দেখে তারও কি গোসল করা লাগবে? রসূল স. বললেন, হ্যাঁ, নারীরা পুরুষের অংশ। (আবূ দাউদ-২৩৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **حديث حسن لغيره** হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী। (আবূ দাউদ-২৩৬)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী-১১৩, ইবনে মাযা-৬১২ এবং মুসনাদে আহমদ-২৬১৯৫ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বীর্যপাত হওয়া স্বপ্নে দেখলেই শুধু হবে না ঘুম থেকে উঠে যদি বাস্তবে বীর্যপাত হওয়া পরিলক্ষিত হয় তাহলে গোসল জরুরী হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৬৪) হযরত উম্মে সালামা রা. থেকেও একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হবে। (বুখারী : ২৭৮)

হায়েয শেষে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা ফরয

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي (رواه البخارى فى بَابِ إِقْبَالِ المَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ-١/٤٦)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, ফাতিমা ডবনতে আবু হুবাইশ-এর ইস্তিহাযা হতো। তিনি এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করলেন: এ হচ্ছে শিরার রক্ত হায়েযের রক্ত

নয়। সুতরাং হায়েয এলে নামায পড়া ছেড়ে দিবে। আর হায়েয শেষ হয়ে গেলে গোসল করে নামায আদায় করবে। (বুখারী : ৩১৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা, নাসাঈ এবং মুয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৪১০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হায়েয থেকে পবিত্র হতে গোসল করা জরুরী। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৬৫)

নিফাস শেষে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল ফরয

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَيَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ : عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ -

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূল স.-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো যে, হে আল্লাহর রসূল! আমি চার/পাঁচ মাস মরুভূমিতে থাকি। আমাদের মাঝে ঋতুমতী মহিলা, নিফাসওয়ালী মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তিও থাকে। আমাদের (গোসলের) ব্যাপারে কী করণীয়? রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: তোমার জন্য মাটি ব্যবহার তথা তায়াম্মুম জরুরী। (মুসনাদে আহমদ-৭৭৪৭, আব্দুর রাজ্জাক-৯১১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث حسن হাদীসটি হাসান। (মুসনাদে আহমদ-৭৭৪৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : পানি না পাওয়া গেলে হায়েয, নিফাস এবং জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় সম্পর্কে জনৈক গ্রাম্য সাহাবী রসূল স.-এর নিকট জানতে চাইলেন। উভয় প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র হতে রসূল স. তাঁকে গোসলের বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের নির্দেশ দিলেন। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হায়েয এবং জানাবাতের মতো নিফাস থেকে পবিত্র হতেও গোসল প্রয়োজন। আর পানি না পাওয়া গেলে গোসলের বিকল্প হতে পারে তায়াম্মুম।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ

النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِمْصِيُّ وَلَقَبُهُ سُلَيْمٌ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ وَهَكَذَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ -

অনুবাদ : হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত রসূল স. বলেন, নিফাসের সাত দিন অতিক্রম করে কোন মহিলা যদি পবিত্রতা লক্ষ্য করে তাহলে সে যেন গোসল করে এবং নামায পড়ে। ইমাম বায়হাকী বলেন, হাকেম আবু আব্দুল্লাহ আমাকে আবু ইসমাঈল থেকেও অনুরূপ বর্ণনা শুনিয়েছেন। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী-১৬১৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। আর বাকিয়্যাহ মুসলিমের রাবী। তাঁর বিরুদ্ধে তাদলীসের অভিযোগ থাকলেও এ হাদীসে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আসওয়াদ। সুতরাং তাঁর তাদলীসের স্বভাব এ হাদীসে ক্ষতিকর নয়। আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। (আল জাওহারুন নাকী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, নিফাসের সাত দিন অতিক্রম করে যদি কোন মহিলা পবিত্রতা লক্ষ্য করে তাহলে সে যেন গোসল করে এবং নামায পড়ে। নামাযের পূর্বে গোসলের শর্ত জুড়ে দেয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নিফাসের রক্ত বন্ধ হলে গোসল ব্যতীত পবিত্র হবে না এবং গোসল না করে নামাযও পড়তে পারবে না। অতএব, নিফাস থেকে পবিত্র হতে গোসল করা ওয়াজিব।

এ ছাড়া হজ্বের সফরে হযরত আয়েশা রা. ঋতুবতী হয়েছিলেন। আর তা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রসূল স. বললেন, أَنُفِسْتِ তুমি কি নিফাসওয়ালী হয়েছো? এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হায়েয ও নিফাস নামের প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি আরেকটি স্থলে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে হাঝাম এ হাদীস থেকে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে দলীল গ্রহণ করে বলেন, وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ أَنُفِسْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَسَمَّى الْحَيْضَ نِفَاسًا. وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْهُ

وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ হযরত আয়েশা রা.-এর হায়েযের বিষয় জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রসূল স. তাঁকে বললেন, তুমি নিফাসওয়ালী হয়েছো? হযরত আয়েশা রা. বললেন, হ্যাঁ। এ হাদীসে রসূল স. হায়েযকে নিফাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিফাসের বিধান প্রতিটি ক্ষেত্রে হায়েযের বিধানের অনুরূপ এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিফাসের কারণে গোসল করা ওয়াজিব। (আল মুহাল্লা : মাসআলা নং-২৬১)

হায়েয এবং নিফাসের বিধি-বিধান অভিন্ন হওয়ার বিষয়টি ইমাম শাওকানী রহ.ও বর্ণনা করেছেন। (নাইলুল আওতার, অধ্যায় : নিফাসওয়ালী মহিলাদের জন্য নামাযের বিধান ছাড়)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, الخروج من النفاس يوجب الغسل بالإجماع،.... ونقل الإجماع ابن المنذر وابن جرير الطبري وغيرهما নেফাস থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে ইজমা তথা উম্মতের ঐকমত্যে গোসল আবশ্যক হয়। আল্লামা ইবনুল মুনজির ও ইবনে জারীর তাবারী এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বর্ণনা করেছেন। (আল নিয়াহ, অধ্যায় : গোসল)

ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত ১৩৯ নং হাদীসের আলোচনায় বলেন, وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং পরবর্তী উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, নিফাসওয়া-লী মহিলারা সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন যাবৎ নামায ছেড়ে দিবে। তবে এর পূর্বে (রক্ত বন্ধ হয়ে) পবিত্রতা অনুভব করলে সে গোসল করবে এবং নামায আদায় করবে। (তিরমিযী-১৩৯) ইমাম তিরমিযী রহ.-এর ভাষ্য মোতাবেক সাহাবা এবং তাবিঈগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, নিফাসওয়ালী মহিলা পবিত্রতা লক্ষ্য করলে গোসল করবে অতঃপর নামায পড়বে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিফাস থেকে পবিত্র হতে গোসল করা জরুরী। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৬৫)

বীর্যপাতবিহীন সহবাসেও গোসল জরুরী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (رواه

مسلم فى بَابٍ: بينان الجماع كان فى اول الاسلام لايوجد الغسل... -١٥٥/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যখন কেউ তার স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝে বসবে এবং তার সাথে মিলবে তখন তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে। মাতার নামক রাবীর বর্ণনায় রয়েছে : যদিও বীর্যপাত না ঘটে। (মুসলিম : ৬৭৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৩০৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বীর্যপাতবিহীন স্ত্রী সহবাসেও গোসল ফরয হয়। মুসলিম শরীফে হযরত আবু মুসা আশআ'রী রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, বীর্যপাতবিহীন স্ত্রী সহবাসে গোসল ফরয হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, যে, শুধু সহবাস হলেই গোসল ফরয হবে। (মুসলিম-৬৭৮) এ থেকে বুঝা যায় যে, এ বিষয়টি নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের শুরু যুগে মতবিরোধ থাকলেও তাঁদের সর্বশেষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো গোসল করতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৬১) উপরিউক্ত হাদীস দুটি হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যিনি এ বিষয়ে অন্য যে কারো চেয়ে ভালো জানতেন। সুতরাং কোন সাহাবার ভিন্ন মত থাকলেও হযরত আয়েশা রা.-এর মত ও বর্ণনা অগ্রাধিকারের জোর দাবী রাখে।

শরীরে নাপাকী লেগে থাকলে গোসলের পূর্বে তা ধুয়ে অযু করে নেয়া

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. (رواه البخارى فى بَابِ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً- ٣٩/١)

অনুবাদ : হযরত মাইমুনা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি দুই বা তিনবার হাত ধুলেন। অতঃপর বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান ধুলেন। এরপর জমিনে হাত ঘসলেন। তারপর

কুলি করলেন, নাক পরিষ্কার করলেন এবং চেহারা ও উভয় হাত ধুলেন। এরপর শরীরে পানি ঢাললেন। তারপর উক্ত স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধুয়ে ফেললেন। (বুখারী : ২৫৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৩২১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীরের কোথাও নাপাক লেগে থাকলে গোসলের পূর্বে তা ধুয়ে নিবে। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে। এটাই হানাফী মাযহবের মত। (শামী : (১/১৫৭) এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে বুখারী-২৪৬ নম্বর হাদীসে। গোসলের জায়গা যদি এমন হয় যে, পায়ের নিচে পানি জমে থাকে তাহলে হাদীসে বর্ণিত নিয়মে গোসলের জায়গা হতে সরে গিয়ে অযু করতে হবে। আর যদি পায়ের নিচে পানি জমে না থাকে তাহলে অযুর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী পা ধুয়ার মাধ্যমে অযুর কাজ শেষ করে গোসল শুরু করবে। (হিদায়াহ- গোসল অধ্যায়)

জানাবাতের গোসলে বিশেষভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া

وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ـ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যদি তোমরা জুনুবী হও তাহলে খুব করে পবিত্রতা অর্জন করো। (ছূরা মায়েদা : ৬)

সারসংক্ষেপ : গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে এ আয়াতে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে বলা হয়েছে। সাধারণ পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে শরীরের উপরিভাগ ধুয়ার প্রতি জোর দেয়া হয়ে থাকে। আর ঐ সকল অভ্যন্তরীণ অঙ্গ যা ক্ষেত্রবিশেষ বাহ্যিক অঙ্গের বিধানভূক্ত হয়ে থাকে যেমন নাক এবং মুখের ভেতরের অংশ সেটা ধুয়ার প্রতি ততটা জোর দেয়া হয় না। এ কারণে অযুতে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ছুন্নাত। কিন্তু ফরয গোসলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা খুব ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে বলায় ঐ সকল অভ্যন্তরীণ অঙ্গ যা ক্ষেত্রবিশেষ বাহ্যিক অঙ্গের বিধানভূক্ত হয়ে থাকে তা ধুয়াও আবশ্যক হবে। এ কারণে গোসলের মধ্যে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া আবশ্যক।

উপরন্তু গোসলের জন্য যখন পুরা শরীরে পানি পৌছানো হয় তখন কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ব্যতীত অবশিষ্ট অযুর অঙ্গগুলি পুনরায় ধোয়া হয়ে যায়। তাই অযুর কাজে ত্রুটি থাকলেও তা গোসলের দ্বারা পূরণ

করা সম্ভব। কেবল নাক এবং মুখের ছিদ্র শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ হওয়ায় গোসলের সময় তা দ্বিতীয়বার ধুয়া হয় না। এ কারণে গোসলের পূর্বে অযু করার সময় কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা আবশ্যক।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَنَّ رَسُولُ اللهِ الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلاَثاً ـ

অনুবাদ : হযরত ইবনে ছীরীন রহ. বলেন, রসূল স. জুনুবী ব্যক্তির জন্য তিনবার নাকে পানি দেয়ার নিয়ম জারী করেছেন। (দারাকুতনী-৪১৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইমাম দারাকুতনী রহ. ৪১৮ নম্বর হাদীস বর্ণনান্তে হযরত ইবনে ছীরীন রহ. থেকে বর্ণিত এ হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, সঠিক হলো ইবনে ছীরীন হতে মুরসালভাবে বর্ণিত ওয়াকী'র হাদীসটি। ইমাম দারাকুতনী এ হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন এবং ইমাম বায়হাকী এ হাদীসের রাবীদেরকে **ثقات** নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। (মা'রেফাতুস সুনান-৩৯০)। ইবনে ছীরীন রহ. কোন সাহাবার নাম উল্লেখ ব্যতীত সরাসরি রসূল স. থেকে বর্ণনা করায় হাদীসটি মুরসাল। অবশ্য হাদীসটি মুরসাল হলেও আমাদের দলীলের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। কারণ হাদীস গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী **ثقةٌ** নির্ভরযোগ্য রাবীদের মুরসাল বর্ণনার পক্ষে কোন সমার্থক বর্ণনা পাওয়া গেলে চার ইমামসহ অনেক মুহাদ্দিসের নিকট তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। (শরহু নুখবাতিল ফিকার : ৫০-৫১) আর এ মুরসালের পক্ষে বেশ কিছু সমার্থক হাদীস রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন নাছবুর রায়াহ কিতাবের ২৪ নং হাদীসের আলোচনায়। অতঃপর ইমাম দারাকুতনী এ হাদীসের সমর্থনে অনুরূপ সনদে আরো একটি সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন :

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِالِاسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلاَثاً.

অনুবাদ : হযরত ইবনে ছীরীন রহ. বলেন, রসূল স. জুনুবী ব্যক্তির জন্য তিনবার নাকে পানি দেয়ার নির্দেশ জারী করেছেন। (দারাকুতনী-৪১৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। জাফর ইবনে আহমদ **ثقةٌ** নির্ভরযে-

াগ্য তারীখে বাগদাদ-৩৭০২। সারি ইবনে ইয়াহইয়া ثِقَةٌ নির্ভরযোগ্য। (ছিকাতু মিম্মাল লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিত্তাহ-৪২৮৩, তারীখে ইসলাম ৬/৫৪৭) অবশিষ্ট সকলে বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে রসূল স. জুনুবীদের জন্য নাকে পানি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এটা জুনুবীদের জন্য জরুরী। কুলি করার বিষয়টিও অনুরূপ। কেননা নাকে পানি দেয়া এবং কুলি করার সম্পর্ক এমন দুটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গের সাথে যা ক্ষেত্রবিশেষ বাহ্যিক অঙ্গের বিধানভূক্ত হয়ে থাকে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ انْصَرَفَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَائِشَةُ بِنْتُ عَجْرَدٍ لاَ تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত (গোসলের সময় কেউ কুলি করতে এবং নাকে পানি দিতে ভুলে গেলে তার করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন) যদি গোসল জানাবাতের হয় অর্থাৎ ফরয গোসল হয় তাহলে কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে অতঃপর নতুন করে নামায পড়তে হবে। আল্লামা ইবনে আরাফা বলেন, জানাবাতের গোসলে কুলি করতে এবং নাকে পানি দিতে ভুলে গেলে নামায ছেড়ে দিয়ে কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে অতঃপর নতুন করে নামায পড়বে। (দারাকুতনী-৪২০)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। এ হাদীস বর্ণনান্তে ইমাম দারাকুতনী রহ. বলেন, لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ এ হাদীস ব্যতীত আয়েশা ডবনতে আজরাদের আর কোন হাদীস নেই। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম উল্লিখিত হাদীস ছাড়াও আয়েশা বিনতে আজরাদ থেকে ভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁর উক্ত বক্তব্যে আয়েশা ডবনতে আজরাদ এর মাজহুল (অপরিচিত) হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। অথচ হাদীস গ্রহণের নীতিমা-

লা অনুযায়ী কোন মুহাদ্দিস থেকে দু'জন রাবী হাদীস বর্ণনা করলে তাঁকে অপরিচিত বলা যায় না। আর আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন উসমান ইবনে রাশেদ, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত এবং ইমাম আবু হানিফার মত শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ। অতএব, তাঁকে অপরিচিত বলার কোন সুযোগ নেই। আয়েশাকে অপরিচিত মন্তব্য করে ইমাম দারাকুতনী আরো বলেন, **عَائِشَةُ بِنْتُ عَجْرَدٍ لاَ تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ** 'আয়েশা ডবনতে আজরাদকে দিয়ে দলীল চলে না'। ইমাম দারাকুতনী রহ.-এর এ মন্তব্যের ভিত্তি হলো আয়েশা অপরিচিত হওয়া। সে ভিত্তিই যখন সঠিক নয় তখন ঐ ভিত্তির উপর দাঁড় করানো মন্তব্যও সঠিক নয়।

উপরন্তু হাফেজ যাহাবী রহ. তাঁর তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা নামক গ্রন্থে (পৃ.২৮৬) ইমাম ইবনে মাঈন থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, **لها صحبة** অর্থাৎ আয়েশা ডবনতে আজরাদ রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌভাগ্যবান সাহাবিয়া ছিলেন। সুতরাং ইমাম দারাকুতনীর বক্তব্য অনুযায়ী আয়েশা ডবনতে আজরাদকে অপরিচিত হওয়া মেনে নিলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা যখন প্রমাণিত হলো যে তিনি সাহাবিয়া ছিলেন তখন শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুযায়ী তাঁর জাহালত বা অপরিচিতা হওয়াটা দোষনীয় নয়। যেহেতু প্রত্যেক সাহাবীই আদেল বা ন্যায়নিষ্ঠ। (আয়েশা ডবনতে আজরাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ইমাম আবু হানিফা কী তাবেয়িইয়্যাত আওর সাহাবা সে উনকে রেওয়ায়েত পৃ. ১০৩ -১০৮)

মোটকথা, সার্বিক বিবেচনায় এ সনদটি এককভাবে কিছুটা দুর্বল হলেও অন্যান্য হাদীস দ্বারা এর মূল বিষয়টি সমর্থিত হওয়ায় এটা হাসান লিগাইরিহীর পর্যায় পৌঁছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আদ্দিরায়াহ কিতাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। (আদ্দিরায়াহ-৩১)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى ثَلاَثًا. وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ. (رواه ابو داود فى بَابِ الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ–١/٣٣)

অনুবাদ : হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, যে

ব্যক্তি জানাবাতের গোসলে একটি পশমের স্থানও না ধুয়ে ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে জাহান্নামে এমন করা হবে অর্থাৎ তাকে শাস্তি দেয়া হবে। হযরত আলী রা. বলেন, এ কারণে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন, । আর হযরত আলী রা. মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলতেন। (আবূ দাউদ-২৪৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ বলেন, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ হাদীসটির সনদ সহীহ। (তালখীসুল হাবির, ১৯০ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি ইবনে মাযা-৫৯৯ এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৩১৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাবাতের গোসলে শরীরের প্রতিটি পশমের গোড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক। একটি পশমের গোড়াও যদি শুকনা থাকে তাহলে গোসল হবে না এবং কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। নাকের মধ্যে যেহেতু পশম রয়েছে সেহেতু জানাবাতের গোসলে নাকে পানি দেয়া জরুরী।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَةَ، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ، قال ابو عيسى حَدِيثُ الحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً–٢٩/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক পশমের নিচে জানাবাত রয়েছে। সুতরাং পশম ধুয়ে ফেলো এবং চামড়া পরিষ্কার করো। এ অধ্যায়ে হযরত আলী এবং আনাস রা-এর হাদীস রয়েছে। হারেস ইবনে অজিহ কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি গরীব। তাঁর সনদ ব্যতীত অন্য মাধ্যমে এ হাদীসটি আমি পাইনি। আর হারেস ইবনে অজিহ অভিজ্ঞ কিন্তু তেমন মানসম্মত নয়। তবে অনেক ইমাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী-১০৬, আবূ দাউদ-২৪৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। হারেস ইবনে অজীহ ব্যতীত এ

হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর অনেক মুহাদ্দিস হারেস ইবনে ওজীহকে জঈফ বললেও ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁকে ‘শায়খ’ বলে প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে, অনেক ইমাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ-এর এ মন্তব্য কোন রাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরো একটি প্রমাণ। উপরন্তু এ হাদীসের কিছু সমার্থক বর্ণনাও রয়েছে। হযরত আবু আইয়ূব রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, (ইবনে মাযা-৫৯৮) হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, (মুসনাদে আহমদ-২৪৭৯৭) হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, (তাহজীবুল আছার লিইবনে জারীর-৪২৯) হাসান সনদে বর্ণিত হযরত আবুদ্দারদা রা.-এর মন্তব্য, (তাহজীবুল আছার লিইবনে জারীর-৪৩১) এবং বুখারী-মুসলিমের রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর নিজের মন্তব্য (তাহজীবুল আছার লিইবনে জারীর-৪৩২) পূর্ববর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর সমর্থন করে। এ সকল বর্ণনর প্রতিটির সনদে স্বতন্ত্রভাবে কিছু আপত্তি থাকলেও সম্মিলিতভাবে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। এর সাথে আরো রয়েছে হযরত আলী রা. সূত্রে বর্ণিত আবূ দাউদ-২৪৯ নম্বর হাদীসের সমর্থন। সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বলা হয়েছে প্রত্যেক পশমের নিচে জানাবাত রয়েছে এবং রসূল স. সেটা পরিষ্কারেরও নির্দেশ দিয়েছেন। আর নাকের মধ্যেও যেহেতু পশম রয়েছে সুতরাং সেটা ধুয়া জরুরী হবে। আর তার মাধ্যম হল নাকে পানি দেয়া। অতএব, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাকে পানি দেয়া জরুরী। আর পূর্ববর্তী হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জানাবাতের গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া বিশেষভাবে জরুরী। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৬৪)

জানাবাতের গোসলে সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধুয়া

জানাবাতের গোসলে সমস্ত শরীর ভালোভাবে ডলে ধুতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৫৯) আর এ বিষয় সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা জানতে পূর্বের অধ্যায়ে আবূ দাউদ শরীফ থেকে হযরত আলী রা. সূত্রে বর্ণিত ২৪৯ নম্বর হাদীস ও তার সারসংক্ষেপ দেখুন।

গোসলের সময় মহিলাদের চুলের বেণী খোলা আবশ্যক নয়

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ

تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ. (رواه مسلم فى بَابِ حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ– ١٤٩/١)

অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি রসূলাল্লাহ স.কে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো মাথার বেণী শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি কি জানাবাতের গোসলের সময় তা খুলে নিবো? উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন: না, খুলতে হবে না। বরং মাথায় শুধুমাত্র তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিলেই যথেষ্ট হবে। এরপর সারা শরীরে পানি পৌঁছে দিলে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। (মুসলিম: ৬৩৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৩২৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয গোসল করার সময় যদি কোন মহিলার চুল শক্ত করে বাঁধা থাকে তাহলে চুল খোলা এবং পূর্ণ চুল ধুয়া জরুরী নয়। বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে গেলে গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/১৩)

গোসলের সময় প্রথমে ডান এবং পরে বাম অঙ্গ ধুয়া

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. (رواه البخارى فى بَابِ مَنْ بَدَأَ بِالحِلاَبِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ– ٣٩/١)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. জানাবাতের গোসল করার সময় দুধ দোহনের পাত্র সাদৃশ্য কোন পাত্র চেয়ে নিতেন। এরপর হাতের কোষ ভরে প্রথমে মাথার ডান পাশে অতঃপর বাম পাশে তারপর দু'হাত ভরে মাথায় পানি দিতেন। (বুখারী : ২৫৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা, মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৩১৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোসলের সময় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে মাথার ডান পাশ অতঃপর মাথার বাম পাশ ধুবে। আর এ নিয়মে অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গও প্রথমে ডান এবং পরে বামটা ধুবে। ডান দিক থেকে শুরু করার এ আমলই হানাফী মাযহাবে গ্রহণ করা হয়েছে। (শামী : ১/১৫৯)

অযু-গোসলে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার না করা

عَنْ أَنَسٍ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. (رواه البخارى فى بَابِ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ– ١/٣٣)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এক সা’ থেকে পাঁচ মুদ অর্থাৎ প্রায় ৩ কেজি সোয়া ৩০০ গ্রাম থেকে ৪ কেজি ১০০ গ্রাম পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক মুদ অর্থাৎ প্রায় ৮২০ গ্রাম পানি দিয়ে অযু করতেন। (বুখারী : ২০১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল-৫২০১)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. হযরত সা’দ রা.-এর পাশ দিয়ে গেলেন যখন তিনি অযু করছিলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন, হে সা’দ! এ কেমন অপচয় করছো? তিনি বললেন, অযুতেও কি অপচয় আছে? রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, অযুতেও অপচয় আছে। যদিও তুমি প্রবাহিত নদীতে অযু করো। (মুসনাদে আহমদ : ৭০৬৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন, سَنَدُهُ حَسَنٌ হাদীসটির সনদ হাসান। (মিরকাতুল মাফাতীহ-৪২৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, অযু-গোসলের সময় যথা সম্ভব পানি কম খরচ করা এবং অপচয় রোধ করা একান্ত জরুরী। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৫৮)

অধ্যায় ৫ : তায়াম্মুম

তায়াম্মুম অযু-গোসলের বিকল্প

وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যদি তোমরা জুনুবী হও (গোসল জরুরী হয়) তাহলে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন করো। আর যদি তোমরা রুগ্ন হও অথবা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ ইস্তিঞ্জা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো অতঃপর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো। (ছূরা মায়েদা : ৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ. (رواه الترمذى فى بَابِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ-١/٣٢)

অনুবাদ : হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী; যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। অতঃপর যখন পানি পাবে তখন যেন নিজের শরীরে প্রবাহিত করে; এটাই তার জন্য উত্তম। বর্ণনাকারী মাহমূদ তাঁর

বর্ণনায় বলেন, নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলমানের অযু। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। (তিরমিযী : ১২৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীস-টি হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫২৯২)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অযু-গোসলের জন্য পানি ব্যবহার করতে না পারলে পবিত্রতা অর্জন করতে তায়াম্মুম পানির বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (হিদায়াহ : ১/২৫)

পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুম করতে পারে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করো। আর যদি তোমরা জুনুবী হও (গোসল জরুরী হয়) তাহলে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন করো। আর যদি তোমরা রুগ্ন হও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। অথবা যদি তোমরা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ ইস্তিঞ্জা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো অতঃপর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চান না; বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিআমত পূর্ণ করতে যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। (ছূরা মায়েদা : ৬)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকলে পানি ব্যবহারের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা বৈধ।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, জাতুস সালাসিল যুদ্ধে প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। গোসল করলে আমি মারা যাবো এ আশঙ্কায় তায়াম্মুম করলাম এবং সাথীদের ফজরের নামায পড়ালাম। তাঁরা রসূল স.-এর নিকট এ ঘটনা জানিয়ে দিলে তিনি আমাকে বললেন, হে আমর! তুমি জুনুবী অবস্থায় সাথীদেরকে নামায পড়িয়েছো? আমি গোসল না করার কারণ বর্ণনা করলাম এবং পেশ করলাম যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। রসূল স. এটা শুনে হাসলেন আর কিছুই বললেন, না। (আবূ দাউদ-৩৩৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ হাদীসটির সনদ মজবুত। (ফাতহুল বারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫৪) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটি সহীহ। (আবূ দাউদ-৩৩৪ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শীতের প্রচণ্ডতা বেশি হওয়ার কারণে যদি গোসল করলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে তাহলে তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/২৩৩)

তায়াম্মুমের তরীকা

وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ -

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "যদি তোমরা জুনুবী হও (গোসল জরুরী হয়) তাহলে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন করো। আর যদি তোমরা রুগ্ন হও অথবা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ ইস্তিঞ্জা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো অতঃপর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো"। আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চান না; বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে। (ছুরা মায়েদা : ৬)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় : ১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। কেননা এটাই তায়াম্মুমের অর্থ এবং এর ভিত্তিতেই তায়াম্মুমকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। ২. সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা যেমন অযুতে সমস্ত মুখ ধৌত করতে হয়। ৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা। অনুরূপ বর্ণনা বুখারী শরীফে হযরত আবু জুহাইম রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী : ৩৩০) কুরআনের আয়াত বা বুখারীর হাদীসে যদিও হাত মাসেহ করার পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তবে অন্যান্য সহীহ হাদীস এবং জলীলুল কদর সাহাবাদের আমল দ্বারা তা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অযুর মতো তায়াম্মুমেও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। তন্মধ্যে হযরত জাবের রা.-এর আমল নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَابَنِي جَنَابَةٌ، وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ: اضْرِبْ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ -

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, আমার গোসল ফরয হয়েছে আর আমি

মাটিতে গড়াগড়ি করে শরীরে মাটি মেখেছি। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন : এভাবে হাত মাটিতে মারবে। এ কথা বলে তিনি উভয় হাত মাটিতে মারলেন এবং মুখ মাসেহ করলেন। এরপর উভয় হাত পুনরায় মাটিতে মেরে তা দ্বারা কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৬৩৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম ঐাহাবী রহ. মুসতাদরাকে হাকেমের তাহকীকে বলেন, হাদীসটি সহীহ। আর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আদ দিরায়াহ : তায়াম্মুম অধ্যায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুমের সময় উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে ।

حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَتَقَارَبُونَ فِي حَدِيثِهِمْ كُلُّهُمْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حَتَّى نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرَبْنَا أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

অনুবাদ : হযরত আম্মার রা. বলেন, আমি কওমের মধ্যে ছিলাম যখন পানি না পেলে মাটি দ্বারা মাসেহ করার অবকাশ নাযিল হলে রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন। আমরা মুখ মাসেহ করার জন্য একবার মাটিতে হাত মারলাম। অতঃপর কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসেহ করার জন্য আরেকবার হাত মারলাম। (মুসনাদে বায্যার : ১৩৮৪)।

হাদীসটির স্তর : হাসান। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আদ দিরায়াহঃ তায়াম্মুম অধ্যায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুমের সময় উভয় হাত কনুই পর্যন্ত (বরং ভিন্ন বর্ণনা মোতাবেক কাঁধ ও বগল পর্যন্ত) মাসেহ করতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/২৩৭)

জ্ঞাতব্য : এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করার কথাও উল্লেখ রয়েছে। সেসব হাদীসের ভিত্তিতে কোন কোন ইমাম কব্জি পর্যন্ত হাত মাসেহের কথাও বলে থাকেন। তবে উপরিউক্ত দলীলের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, তায়াম্মুমের সময় উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। দলীলের বৈপরীত্য থাকায় সতর্কতার চাহিদাও এটাই। এছাড়াও তায়াম্মুম অযুর বদল। সুতরাং তায়াম্মুমে হাত মাসেহের

পরিমাণ সেটাই হওয়া উচিত যা অযুতে ধোয়ার পরিমাণ বর্ণিত রয়েছে।

তায়াম্মুমের কোন সময়সীমা নেই

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ. (رواه الترمذى فى بَابِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ– ١/٣٢)

অনুবাদ : হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী; যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। (তিরমিযী : ১২৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫২৯২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুমের সময়ের কোন সীমারেখা নেই। বরং যত দিন পানি না পাওয়া যাবে ততদিন তায়াম্মুম চলবে। তবে যে সমস্যার কারণে তায়াম্মুম করেছিলো সে কারণ দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। কেউ যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে নামাযে দাঁড়ায় এবং নামাযের মধ্যে ব্যবহার উপযোগী পানি দেখে তাহলে তার তায়াম্মুম এবং নামায উভয়টিই ভেঙ্গে যাবে। (হিদায়া : ১/৫২)

অধ্যায় ৬ : সতরের বিধান

সতর ঢাকা জরুরি

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ.

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। আর পরহেযগারীর পোশাকই সর্বোত্তম। (ছূরা আ'রাফ : ২৬)

শিক্ষা : লজ্জা ঈমানের শাখা। সুতরাং নির্লজ্জতা থেকে বেঁচে থাকতে সতরের স্থান লুকিয়ে রাখা আবশ্যক।

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ قَالَ فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً

(رواه مسلم فى بَابِ الاَعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ–١/١٥٤)

অনুবাদ : হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বয়ে নিয়ে আসছিলাম। তখন আমার পরনে ছিলো একটি পাতলা লুঙ্গি। ইত্যবসরে আমার লুঙ্গিটি খুলে গেলো। পাথরটি আমার কাছে থাকায় সেটি রেখে লুঙ্গি তুলে নিতে পারলাম না। অগত্যা পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে গেলাম। তখন রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন : যাও তোমার কাপড় নিয়ে এসো আর কখনো উলঙ্গ হয়ে চলবে না। (মুসলিম : ৬৬৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (আবূ দাউদ-৩৯৭৫)

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা সতর ঢাকা আবশ্যক প্রমাণিত হয়। এটা মানুষের জন্য সার্বক্ষণিক কর্তব্য। নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্যও সতর ঢাকা শর্ত। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী :

১/৪০৪) আর এ কারণে সতর খোলা থাকাবস্থায় নামাযে দাঁড়ালে নামায হবে না। অনুরূপভাবে যে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক নামাযরত অবস্থায় তা খুলে গিয়ে কিছু সময় স্থায়ী থাকলেও নামায হবে না। তবে খোলার সাথে সাথে ঢেকে নিলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ সামান্য বিষয় থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। আর শরীআত এটা থেকে মানুষকে রেহাই দিয়েছে। (ছূরা বাকারা-২৮৬, ছূরা হজ্ব-৭৮)

পুরুষের সতরের পরিমাণ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়স থেকে নামাযের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর বয়স থেকে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। আর তোমাদের কেউ যখন তাঁর কৃতদাসীকে আপন গোলামের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেয় তখন যেন সে (উক্ত দাসী) তার (নিজ মুনীবের) নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত না দেখে। (আবূ দাউদ-৪৯৬) এ হাদীসটি দারাকুতনীতেও হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, উক্ত দাসী যেন তার নিজ মুনীবের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত না দেখে। কেননা তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর। (দারা কুতনী : ৮৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা মুনাবী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (ফাইযুল কাদীর-৮১৭৪ নং হাদীসের আলোচনায়) ইমাম আবূ দাউদ এবং আল্লামা মুনযেরী রহ. কেউই হাদীসটিকে জঈফ বলেননি যা হাদীসটি হাসান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বিস্তারিত দেখুন মুখতাছারু সুনানি আবী দাউদ-২৭০ পৃষ্ঠায়। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর হওয়ার বিষয়টি হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. থেকে দারাকুতনী-৯২০ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রা. থেকে আল মু'জামুল আওসাত লিততব-ারানী-৭৭৬১ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪০৪)

এর বিপরীতে রসূল স. কখনো কখনো মানুষের সামনে রান খোলা রেখেছেন মর্মে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে কোন কোন ইমাম মন্তব্য করেছেন যে, পুরুষের রান সতরের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ তিনজন সাহাবা যথা- ইবনে আব্বাস, জারহাদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে জাহাশ রা.-এর বরাত দিয়ে রসূল স.-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, রান সতরের আওতাভুক্ত। অতঃপর তিনি এটাকে বেশি সতর্ক আমল বলেও মন্তব্য করেন। সাথে সাথে এটা চার ইমামের সিদ্ধান্ত এবং মুসলিম উম্মাহ'র ব্যাপক মত দ্বারা প্রমাণিত। যদিও ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি মত এর বিপরীতে রয়েছে।

মহিলার সতরের পরিমাণ

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ لها أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. (رواه ابو داود فى بَابِ فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا-٢/٥٦٧)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, আসমা ডবনতে আবু বকর পাতলা কাপড় পরে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলে তিনি আসমা রা. থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন,: হে আসমা! কোন মহিলা যখন হায়েযের বয়সে পৌঁছে যায় অর্থাৎ বালেগা হয়ে যায় তখন তার 'এটা' আর 'এটা' ব্যতীত তার কিছুই খোলা রাখা উচিত নয়। এ কথা বলে তিনি কব্জি ও মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। (আবূ দাউদ : ৪০৫৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম আবূ দাউদ রহ. হাদীসটিকে মুরসাল বললেও বিভিন্ন বর্ণনার সমর্থনে এটা হাসান স্তরে পৌঁছে। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (জামেউল উসূল : ৮২৬৫ নং হাদীসের আলোচনায়) হাফেজ ইবনে

হাজার আসকালানী রহ.ও বলেন, وَلَهُ شَاهِدٌ হাদীসটির সমর্থক বর্ণনা রয়েছে। (আত-তালখীছুল হাবীর : ৩/১০৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীন মহিলার পূর্ণ শরীরই সতরের আওতাভূক্ত। আর মুখ এবং হাতের কব্জি যদিও সতরের আওতাভুক্ত নয় তবে হিজাবের আওতাভুক্ত অর্থাৎ গায়রে মাহরম পুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে।

حدثني عَلِيّ قَالَ: ثنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: ثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ: وَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الوَجْهُ، وَكُحْلُ الْعَيْنِ وَخِضَابُ الْكَفِّ وَالْخَاتَمُ فَهَذِه تَظْهَرُ فِيْ بَيْتِهَا لِمَنْ دَخَلَ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا.

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. আল্লাহর কালাম وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হলো চেহারা, চোখের সুরমা, হাতে লাগানো মেহেদী ও আংটি। কেননা যারা নারীদের নিকট তাদের ঘরে আসে তাদের সামনে এসব অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে যায়। (তাফসীরে তাবারী : ছূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতের তাফসীর)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। তবে আলী ইবনে তলহা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সরাসরি শোনেননি। এসত্ত্বেও এটা সনদ বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ আলী ইবনে তলহা এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর মাঝে মুজাহিদ রহ. রয়েছেন যিনি সর্বসম্মতভাবে নির্ভরযোগ্য রাবী। যেমনটি বলেছেন ইমাম মিজ্জী 'তাহজীবুল কামাল' কিতাবে আলী ইবনে তলহার জীবনীতে। সুতরাং হাদীসটির সনদ সহীহ।

শিক্ষণীয় : ছূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী মহিলাদের পূর্ণ শরীরই সতরের অন্তর্ভূক্ত। কেবল إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলা যতটুকু বাদ দিয়েছেন তা সতরের বাইরে। এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. মুফাসসিরীনে কিরামের এ ইজমা বর্ণনা করেছেন : إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا দ্বারা কেবল হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়া মহিলাদের পূর্ণ শরীরই সতরের অন্তর্ভুক্ত যা নামাযের সময় ঢেকে রাখা জরুরী। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪০৫) অবশ্য মুখ এবং হাতের কব্জি সতর না হলেও গায়রে মাহরাম পুরুষদের থেকে এটা ঢেকে রাখা আবশ্যক।

নামাযের সময় মহিলাদের চুল ঢেকে রাখা জরুরী

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, কোন সাবালিকা নারীর নামায ওড়না ব্যতীত কবুল হয় না। (মুসনাদে আহমদ-২৫১৬৭, ইবনে আবী শাইবা-৬২৭৯, মুসতাদরাকে হাকেম-৯১৭, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৩২৫৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. এ হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম-৯১৭ নং হাদীসের আলোচনায়) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح হাদীসটি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-২৫১৬৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযের সময় মহিলার উড়না ব্যবহার জরুরী। আর উড়না ব্যবহার দ্বারা উদ্দেশ্য মহিলাদের মাথা এবং চুল ঢেকে রাখা। সুতরাং মাথা বা চুল খোলা রেখে নামায পড়লে মহিলাদের নামায শুদ্ধ হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪০৫)

নামাযের জন্য উত্তম পোশাক গ্রহণ করা

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا.

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। (ছূরা আ'রাফ : ২৬)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান কর এবং খাও ও পান কর; তবে অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। (ছূরা আ'রাফ : ৩১)

ব্যাখ্যা : خذوا زينتكم عند كل مسجد আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবুল ফারাজ রহ.-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে: সালাফে সালেহীনগণ মধ্যম ধরনের কাপড় ব্যবহার করতেন যা অত্যন্ত মূল্যবানও নয়, আবার একেবারে নিম্নমানেরও নয়। আর তাঁরা জুমুআ ও ঈদের নামায এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মুলাকাতের সময় উত্তম কাপড় পরতেন। তাঁদের নিকট উত্তম কাপড় পরা অপছন্দনীয় নয়। তবে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জটাধারী সাধুর ন্যায় বেশ ধারন করা বা অতি নিম্ন মানের পোশাক পরিধান করা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার নামান্তর যা মাকরূহ।

সারসংক্ষেপ : উক্ত আয়াতদ্বয়ে পোশাককে লজ্জা ঢাকার মাধ্যম হওয়ার পাশাপাশি সাজ-সজ্জা হিসেবেও প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং নামাযে ব্যবহৃত পোশাকে সাজ-সজ্জা গ্রহণের উপযোগিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ উত্তম পোশাক হতে হবে। অতএব, সতর ঢাকা ছাড়াও অবশিষ্ট শরীর না ঢেকে নামায পড়া অথবা সাজ-সজ্জার পরিপন্থী জীর্ণ-শীর্ণ কাপড়ে নামায পড়া উভয়টাই মাকরূহ হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৬৪০)

উত্তম পোশাক হিসেবে নামাযে পাগড়ী ও টুপি পরা

জেনে রাখা দরকার যে, টুপি পাগড়ীর মতোই একটি ইসলামী পোশাক এবং মুসলিম উম্মাহর ‘শিআর’ জাতীয় নিদর্শন। হাদীস ও আছারের কিতাবে এবং ইতিহাস গ্রন্থে এ বিষয়ে বহু প্রমাণ ও তথ্য রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে বুরনুস নামীয় এক প্রকার টুপি প্রমাণ করেছেন। সহীহ বুখারীতে কিতাবুল লিবাসে باب البرانس “টুপির পরিচ্ছেদ” নামে শিরোনাম এনেছেন। আর দলীল হিসেবে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হজ্ব সংক্রান্ত একটি হাদীস পেশ করেছেন। তিনি নিজ সনদে বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ

وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ البَرَانِسَ وَلاَ الخِفَافَ. (رواه البخارى فى باب البرانس–٢/٨٦٣)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আরজ করলো হে আল্লাহর রসূল! মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের কাপড় পরবে? জবাবে রসূল স. ইরশাদ করেন, মুহরিম ব্যক্তি জুব্বা, পাগড়ী, পা-জামা, টুপি এবং মুজা পরিধার করবে না। (বুখারী-৫৩৮৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে পাগড়ী ও টুপি পরিধানের রীতি ছিলো। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ যাদুল মাআদ-এর প্রথম খণ্ডের: ১৩৫ পৃষ্ঠায় লেখেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি পাগড়ী ছিল, যা তিনি আলী রা.কে পরিয়েছিলেন। তিনি পাগড়ী পরতেন এবং পাগড়ীর নিচে টুপিও পরতেন। তিনি কখনো পাগড়ী ছাড়া টুপি পরতেন। কখনো টুপি ছাড়াও পাগড়ী পরতেন।

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بِطَانَتُهَا مِنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ قَالَ: فَأَلْقَاهَا عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ: مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ ؟. (رواه إِبْنُ أَبِي شَيْبَة : بَابٌ فِي الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত: হযরত ওমর রা. এক ব্যক্তিকে এমন একটি টুপি পরে নামায পড়তে দেখেলেন যে টুপির ভেতরের অংশ ছিলো শিয়ালের চামড়ার তৈরী। হযরত আনাস বলেন, হযরত ওমর রা. সেটা তার মাথা থেকে ফেলে দিলেন এবং বললেন,: তোমার কী জানা আছে? হতে পারে এটা জবাইকৃত না। অর্থাৎ জবাই করা বা দাবাগাত তথা পরিশোধনের মাধ্যমে পবিত্র করা হয়নি। (ইবনে আবী শাইবা: ৬৫৩৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের সকল রাবীই প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং বুখারী-মুসলিমের রাবী। সুতরাং সনদের বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের সময় টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়ার প্রচলন ছিলো। সুতরাং এটা নামাযের

আদব বা মুস্তাহাব। হযরত ওমর রা. তা ফেলে দিয়েছিলেন কেবল নাপাক হওয়ার আশঙ্কায়; অন্যথায় তিনি তা ফেলতেন না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ، فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ، وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ، وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلَاتِهِ. (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا-١/١٣٦)

অনুবাদ : হযরত হিলাল ইবনে ইয়াসাফ রহ. বলেন, আমি (শামের একটি শহর) রক্কায় গেলাম। আমার এক বন্ধু আমাকে বললেন,: রসূলুল্লাহ স.-এর এক সাহাবার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ করবে? আমি বললাম: এটা তো বড় সুবর্ণ সুযোগ। তখন আমরা দু'জনে হযরত ওয়াবিসা রা.-এর নিকট গেলাম। আমার বন্ধুকে বললাম : প্রথমে আমরা তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখবো। তখন দেখলাম তিনি লাঠির উপর ভর দেওয়া অবস্থায় নামাযে রত আছেন। তাঁর গায়ে ছিলো মেটে রঙের টুপিওয়ালা রেশমী জামা এবং মাথায় লেগে থাকা দুই কান বিশিষ্ট টুপি। (আবূ দাউদ: ৯৪৮, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৩৫৭১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম যাহাবী রহ. হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৯৭৫) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح হাদীসটি সহীহ। (আবূ দাউদ-৯৪৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবাগণ টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়েছেন। সুতরাং টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়া মুস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. হযরত ইমাম আবু হানিফা এবং হাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. টুপি ব্যবহার করতেন। (কিতাবুল আছার ৮৫৪)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ، لَقِيَ العَدُوَّ، فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا " وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

অনুবাদ : হযরত ওমর রা. বলেন, আমি রসূল স.কে বলতে শুনেছি যে, শহীদ চার প্রকার। ঐ উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি যে শত্রুর মোকাবেলা করলো এবং আল্লাহ তাআলাকে সত্যায়ন করলো (অর্থাৎ পিছে হটলো না) এমনকি শহীদ হয়ে গেলো। কিয়ামতের দিন মানুষ ঐ ব্যক্তির দিকে এভাবে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখবে। এ কথা বলে তিনি এমনভাবে মাথা উঠালেন যে, তাঁর মাথা থেকে টুপি পড়ে গেলো। আবু ইয়াযীদ বলেন, এটা দ্বারা ওমর রা.-এর টুপি বুঝানো হয়েছে নাকি রসূল স.-এর টুপি বুঝানো হয়েছে তা আমি জানি না। (তিরমিযী-১৬৫০, শুআবুল ঈমান-৩৯৫৭, মুসনাদে আহমদ-১৪৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ হাদীসটি হাসান-গরীব।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. এবং হযরত ওমর রা. উভয়েই টুপি মাথায় দিতেন। আর উভয়ের আলাপচারিত-ার সময় টুপি পড়ে যাওয়া থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, টুপি পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে নামাযের বাইরে। সুতরাং টুপি মূলত পোশাকের ছুন্নাত যা নামাযের সময়ও বহাল থাকবে। এটা শুধু নামাযের সময় ব্যবহারের পোশাক নয়।

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ

وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى خفين–١/١٣٤)

অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত, এক সফরে রসূলুল্লাহ স. সাথীদের থেকে পেছনে রয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে পেছনে রয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন মিটিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার সঙ্গে পানি আছে কি? আমি পানির পাত্র এনে দিলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং মুখ ধুলেন। অতঃপর উভয় বাহু খুলতে গেলেন। কিন্তু জামার হাতা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় জামার ভেতর দিক দিয়ে হাত বের করলেন এবং জামা কাঁধের উপর রেখে দিলেন। এরপর উভয় বাহু ধুলেন। মাথার অগ্রভাগ, পাগড়ী এবং উভয় মোজার উপর মাসেহ করলেন। অতঃপর তিনি সওয়ার হলেন আমিও সওয়ার হলাম এবং কওমের নিকট পৌঁছলাম তখন তারা নামায শুরু করে দিয়েছে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. তাদের নামায পড়াচ্ছি-লেন এবং এক রাকাত পড়িয়ে ফেলেছেন। রসূলুল্লাহ স.-এর আগমন টের পেয়ে তিনি পেছনে সরে আসতে গেলে রসূলুল্লাহ স. তাকে ইশারা করলেন; ফলে তিনি নামায পড়ালেন। অতঃপর যখন হযরত আব্দুর রহমান রা. সালাম ফেরালেন তখন রসূলুল্লাহ স. দাঁড়ালেন। আমিও দাঁড়ালাম এবং যে রাকাত ছুটে গিয়েছিলো তা আদায় করলাম। (মুসলিম : ৫২৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-১৪৯, নাসাঈ-১০৯, মুয়াত্তা মালেক খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৭, অধ্যায়: মোজার উপর মাসেহ করা এবং জামেউল উসূল: ৩৮৯৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

নামাযে পাগড়ী প্রসঙ্গ

এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. অযুতে পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন। আর অযু শেষ করে যখন নামাযে শরিক হয়েছেন তখন পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিলো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাগড়ী নামক

পোশাক পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া ছুন্নাত। তবে নামাযের জন্য নতুন করে পাগড়ী বাঁধা ছুন্নাত এটা প্রমাণিত হয় না। কেননা, এ হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝে আসে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর মাথায় পাগড়ী পূর্ব থেকেই বাঁধা ছিলো। তিনি সে পাগড়ীসহ নামায পড়েছেন। নামাযের জন্য নতুন করে পাগড়ী বাঁধেননি। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, পাগড়ী মূলত পোশাকের ছুন্নাত; নামাযের ছুন্নাত নয়। তবে নামাযের সাথে পাগড়ীর সম্পর্ক হলোঃ পাগড়ী উত্তম পোশাকের আওতাভুক্ত। আর পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত ছূরা আ'রাফের ৩১ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, উত্তম ও সৌন্দর্য পোশাকে নামায পড়া ছুন্নাত। অনুরূপভাবে টুপিও পোশাকের ছুন্নাত। শুধু নামাযের জন্য টুপি ব্যবহার করতে হবে এমন নয়। বরং পোশাক হিসেবে যেখানে জামা, পাজামা, লুঙ্গি, গেঞ্জী, রুমাল এবং অন্যান্য কাপড়-চোপড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তেমনিভাবে টুপি ব্যবহার করাও পোশাকের আওতাভুক্ত। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, রসূল স. পাগড়ী পরেছেন এটা প্রমাণিত। তবে ছুন্নাতী পোশাক ব্যতীত পাগড়ী পরিধানের স্বতন্ত্র ফযীলতের উপর কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। বরং পাগড়ী পড়ার ফযীলত বিষয়ক সব হাদীসই হয়তো সাধারণ দুর্বল, বা অত্যন্ত দুর্বল, অথবা মাউযু' তথা জাল। আর পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় নামায আদায়ের ফযীলত বিষয়ক সব হাদীসই ভিত্তিহীন। অতএব, পাগড়ী ও টুপি পরে নামায পড়া দরকার। তবে এটাকে নামাযের ছুন্নাত হিসেবে বিশ্বাস না করে পোশাকের ছুন্নাত হিসেবে বিশ্বাস করা উচিত। আর এমন কাজ থেকেও বিরত থাকা উচিত যা দ্বারা সাধারণ মানুষ এটাকে নামাযের ছুন্নাত মনে করে। যেমন- ইকামাতের সময় পাগড়ী বাঁধা; আর সালাম ফিরিয়ে খুলে রাখা। অনুরূপভাবে নামাযের সময় টুপি মাথায় দেয়া আর নামায শেষ করে টুপি খুলে রাখা ইত্যাদি।

পাগড়ী সম্বন্ধে লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা

নিম্নে লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হলো, যাতে পাগড়ীসহ নামাযকে বিনা পাগড়ীর নামাযের চেয়ে অনেক গুণ ফযীলতপূর্ণ বলা হয়েছে। যেমন- "পাগড়ীসহ একটি নামায পাগড়ীবিহীন পঁচিশটি নামাযের চেয়ে উত্তম এবং পাগড়ীসহ একটি জুমুআ' পাগড়ীবিহীন সত্তরটি জুমুআর চেয়ে উত্তম"।

হাফেজ সাখাবী রহ. তাঁর আল-মাকাসিদুল হাসানাহ গ্রন্থে ৭১৭ নং হাদীসের আলোচনায় এটাকে জাল বলেছেন। আল্লামা নূরুদ্দীন কানানী রহ.ও এটাকে মাউযু' তথা জাল হাদীস বলেছেন। (তানযীহুশ শরীআতিল মারফূআহ আনিল আখবারিশ শানিআতিল মাউযুআহ: হাদীস নম্বর- ১৩৯) অনুরূপভাবে আল্লামা মুল্লা আলী কারী রহ.ও এটাকে জাল হাদীস বলেছেন। তিনি আরো বলেন, قَالَ الْمنوفِيُّ فَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ "আল্লামা মানুফী রহ. (নামাযে পাগড়ী পড়ার ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসের নামে প্রচারিত) সবগুলোকে বাতিল বলেছেন"। (আল মাউযুআতুছ ছুগরা: হাদীস নম্বর- ১৭৭)

অধ্যায় ৭ : নামাযের ওয়াক্ত

সময়মত নামায পড়া জরুরী

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায এবং আল্লাহ তাআলার জন্য ইবনেয়ের সাথে দাঁড়াও। (ছূরা বাকারা: আয়াত- ২৩৮)

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَات الْخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وَمَا يجب فِيهَا فِي مواقيتها অযু, রুকু, সিজদা এবং নামাযে যা কিছু আবশ্যকীয় রয়েছে সেগুলোসহ নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে সংরক্ষণ করো। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

অনুবাদ : নিশ্চয় মুমিনদের প্রতি নির্দিষ্ট সময় নামায আদায় করা ফরয করা হয়েছে। (ছূরা নিছা : আয়াত-১০৩)

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন : আল্লাহ তাআলা সময়মত নামায সংরক্ষণ, নামাযের সীমারেখা সংরক্ষণ এবং নির্দিষ্ট সময় নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষণীয় : এ আয়াত দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সময়মত নামায পড়া নামায সংরক্ষণের অংশ এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِوَقْتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে কোন নামায নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি (বিদায় হজ্বে) আরাফায় যোহর ও আছর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। (আব্দুর রাযযাক: ৪৪২০, বুখারী: ১৫৭৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ-১৯৩২, নাসাঈ-৬০৯, সহীহ ইবনে খুযাইমা-২৮৫৪, মুসনাদে হুমাইদী-১১৪, মুসনাদে আহমদ-৩৬৩৭, ৪১৩৭, ৪১৩৮ এবং জামেউল উসূল: ৩৩৫১ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

সারকথা : এ হাদীসের সারকথা হল রসূলুল্লাহ স. কোন নামায (নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া) নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে আদায় করেননি, বরং প্রত্যেকটি নামায সময়মত পড়তেন। সুতরাং সময়মত নামায পড়া জরুরী আমল যার ব্যতিক্রম করার কোন সুযোগ নেই।

এ ব্যাপারে হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, আমি রসূলুল্লাহ স.কে একথা বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করবে এবং সব নামায ওয়াক্তমতো পূর্ণ ইবনেয়ের সাথে আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অঙ্গীকার রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্য কোন অঙ্গীকার নেই। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। (আবূ দাউদ: ৪২৫)

হযরত আবু যর রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আমাকে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: যখন তোমার উপর এমন সব আমীরের নেতৃত্ব চলবে যারা দেরি করে নামাযের ওয়াক্ত ইবনেষ্ট করে দিবে তখন তুমি কী করবে? হযরত আবু যর রা. বললেন, আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? রসূলুল্লাহ স. বললেন, সময়মত নামায পড়ে নিও। অতঃপর যদি তাদের সঙ্গে নামায পাও তাহলে আবারও পড়ো, আর সেটা হবে তোমার জন্য নফল। (মুসলিম : ১৩৪১)

এ ছাড়াও জিবরাঈল আ.-এর ইমামতির হাদীসের শেষাংশে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ "এই দুই প্রান্তের মাঝে রয়েছে নামাযের প্রকৃত সময়"। (তিরমিযী : ১৪৯) এ থেকে বুঝা গেলো যে, নামাযের ওয়াক্তের শুরু ও শেষ নির্দিষ্ট রয়েছে। সুতরাং উক্ত গণ্ডির ভেতরে

থেকে নামায আদায় করা জরুরী। একাধিক নামায একত্রে আদায় করা সাধারণভাবে জায়েয থাকলে নামাযের সময় নির্ধারণ এবং উক্ত নির্ধারিত সময়কে হেফাজত করার তাকীদ দেয়া সবই অনর্থক সাব্যস্ত হতো।

এর বিপরীতে আরাফা এবং মুজদালিফার ময়দানে হাজ্বীদের নামায ব্যতীত বাহ্যত কিছু হাদীসের যাহির থেকে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার অবকাশ আছে বলে অনুমতি হয়। নমুনা হিসেবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত সে সম্পর্কিত একটি হাদীস পেশ করা হলো:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَعَجَّلَ العِشَاءَ، وَأَخَّرَ المَغْرِبَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে পূর্ণ আট রাকাত এবং পূর্ণ সাত রাকাত নামায পড়েছি। বর্ণনাকারী হযরত আমর ইবনে দীনার রহ. বলেন, আমি জাবের ইবনে যায়েদকে বললাম, হে আবুশ শা'সা! আমি মনে করি যোহরের নামায দেরি করে ওয়াক্তের শেষে পড়েছেন, আর আছরের নামায ওয়াক্তের শুরুতে পড়েছেন এবং মাগরিব দেরি করে ওয়াক্তের শেষে পড়েছেন, আর ইশা ওয়াক্তের শুরুতে পড়েছেন। হযরত জাবের ইবনে যায়েদ বললেন, আমিও তা-ই মনে করি। (বুখারী-১১০৪, মুসনাদে আহমদ : ১৯১৮)

শিক্ষণীয় : এরকম কিছু হাদীসের ভিত্তিতে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করাকে বৈধ বলা যায় না। যেহেতু এটা দ্বারা একত্রিকরণের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এক ওয়াক্তের নামায তার নির্ধারিত সময়ের শেষ প্রান্তে এবং পরবর্তী ওয়াক্তের নামায পরবর্তী ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাবে যে, দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে তা নয়। বরং উভয় ওয়াক্তের নামাযই তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করা হয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আমর ইবনে দীনার এবং জাবের ইবনে যায়েদ রহ. এ ব্যাখ্যাই করেছেন। এ ব্যাখ্যার পক্ষে আরো একটি বড় প্রমাণ এই যে, দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করার আমল সংক্রান্ত সব হাদীসে এমন দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে

আদায়ের প্রমাণ মেলে, যার এক ওয়াক্ত শেষ হলে কোন বিরতি ছাড়াই পরবর্তী ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। যেমন যোহর-আছর বা মাগরিব-ইশা। এমন কোন হাদীস মেলে না যাতে এ রকম দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায়ের আমল বর্ণিত হয়েছে, যে দুই ওয়াক্তের মাঝে কোন সংযোগ নেই, যেমন ফজর আর যোহর। অথচ এ ওয়াক্ত দুটিও পাশাপাশি অবস্থিত এবং মাঝে কোন নামাযের ওয়াক্ত নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার অনুমতি বা আমল সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে একত্রিকরণের রূপক অর্থই উদ্দেশ্য। হযরত আছওয়াদ ও তাঁর সাথীদের সফরের আমল হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. সহীহ সনদে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৮৩৩২)

এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়া না হলে পূর্ববর্ণিত একাধিক আয়াত ও হাদীসের সাথে একত্রিকরণের হাদীসের বিরোধ সৃষ্টি হবে এবং সেগুলোর উপর আমল বর্জন করা আবশ্যক হবে যা কোনক্রমেই কাম্য নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন অবস্থাতেই দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে আদায় করা যাবে না। এ বিষয়ে তাবিঈদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট দু'জন মুহাদ্দিস ও ফকীহর মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا مَا نَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ إِلَّا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ.

অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী এবং মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন রহ. বলেন, সফর ও হযর (মুকিম অবস্থায় থাকা) কোন অবস্থাতে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রিত করা ছুন্নাতের আওতাভুক্ত বলে আমরা জানি না। তবে (হজ্বের সময়) আরাফায় যোহর ও আছর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা ছুন্নাতের আওতাভুক্ত। (ইবনে আবী শাইবা : ৮৩৪১) এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রকৃত সময়

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ

الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشفق وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِيْ بَابٍ مِنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ– ٣٩/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয় নামাযের ওয়াক্তের শুরু ও শেষ আছে। যোহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে আর শেষ হয় আছরের ওয়াক্ত এলে। সেখান থেকে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় আর শেষ হয় সূর্যের কিরণ হলুদ হয়ে গেলে। মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ডুবে গেলে আর শেষ হয় পশ্চিম আকাশের আভা চলে গেলে। ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় আভা চলে গেলে আর শেষ হয় রাত অর্ধেক হলে। আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে সাদিক উদিত হলে আর শেষ হয় সূর্য উঠলে। (তিরমিযী : ১৫১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটির এ সনদের উপর কিছুটা আপত্তি করলেও ভিন্ন সনদে হাদীসটির এ বক্তব্যকে সহীহ বলেছেন। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, اسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-৭১৭২ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩২৭৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে সাদিক উদিত হওয়া থেকে আর শেষ হয় সূর্য উদয়ের পূর্বক্ষণে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৫৯) যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়তে আরম্ভ করে। যোহর শেষ ও আছর শুরু হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীসে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। আছরের শেষ ওয়াক্তের ব্যাপারে এ হাদীসে বলা হয়েছে সূর্যের কিরণ হলুদ হওয়া পর্যন্ত। তবে এটা আছরের উত্তম ওয়াক্তের শেষ। আর আছরের ওয়াক্ত বাকী থাকে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত। সামনে তার দলীল আসছে। মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ডোবার সাথে সাথে। আর মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্যের

আভা চলে গেলে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৩৬১) ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলে। আর ইশার শেষ ওয়াক্তের ব্যাপারে এ হাদীসে অর্ধরাতের কথা বলা হয়েছে। তবে এটা উত্তম ওয়াক্তের শেষ। আর ইশার জায়েয ওয়াক্ত ফজরের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। সামনে তার দলীল আসছে।

যোহরের ওয়াক্ত শেষ এবং আছরের ওয়াক্ত শুরু

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَىْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لاَ قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوبِ– ١/٧٩)

অনুবাদ : হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছেন: পূর্বেকার উম্মতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হলো আছর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের মতো। তাওরাতের অনুসারীদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিলো। তারা সে অনুযায়ী আমল করতে লাগলো। যখন দুপুর হলো তখন তারা অপারগ হয়ে পড়লো। অতঃপর তাদেরকে এক কিরাত করে (ওজনের নির্দিষ্ট পরিমাণ বা অর্ধ দিরহাম) পারিশ্রমিক দেয়া হলো। এরপর ইনজীলের অনুসারীদেরকে ইনজীল দেয়া হলো। তারা সে অনুযায়ী আমল করতে লাগলো। যখন আছর পর্যন্ত আমল করে অপারগ হয়ে পড়লো তখন তাদেরকেও এক কিরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হলো। এরপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করলাম।

আমাদেরকে দুই কিরাত করে দেয়া হলো। এতে উভয় আহলে কিতাব সম্প্রদায় বললো: হে আমাদের রব! তাদেরকে দুই কিরাত করে দান করলেন, আর আমাদেরকে এক কিরাত করে দিলেন; অথচ আমরাই অধিক আমল করেছি। আল্লাহ তাআলা বললেন,: তোমাদের পারিশ্রমিকের মধ্যে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করেছি? তারা বললো: না। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন,: এ হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দেই। (বুখারী: ৫৩০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে উম্মতে মুহাম্মাদীর কর্মের সময় ইহুদী-নাসারাদের তুলনায় কম দেখাতে গিয়ে আছর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলেই যদি আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়, তাহলে আছর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দুপুর থেকে আছর পর্যন্ত সময়ের সমান বা বেশি হবে। তাহলে এ হাদীসের মূল যথার্থতা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ অল্প আমলে বেশি বিনিময়ের ফযীলত থাকে না। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর ফযীলত সংক্রান্ত এ হাদীসের যথার্থতা তখনই প্রমাণিত হবে যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ» حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ–١/٧٧)

অনুবাদ : হযরত আবু যর গিফারী রা. বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। মুআজ্জিন যোহরের আযান দিতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আর একটু ঠাণ্ডা হলে নামায আদায় করো। অতঃপর আবার আযান দিতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন, আর একটু ঠাণ্ডা হলে নামায আদায় করো। এত বেশি দেরি হলো যে, আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। সুতরাং যখন গরম প্রচণ্ড হয়ে

যায় তখন ঠাণ্ডা হলে নামায আদায় করো । অর্থাৎ বেশ কিছু সময় দেরি করে পড়ো যখন সুর্যের প্রখরতা কমে আসে। (বুখারী : ৫১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা, তিরমিযী এবং মুয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৩৩০৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয়ার জন্য প্রথমবার প্রস্তুত হলেন তখন অবশ্যই নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিলো। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বসিয়ে দিলেন যে, সূর্যের প্রখরতা কমতে দাও। মুয়াজ্জিন রসূল স.-এর নির্দেশ পালন করে অবশ্যই এতটা দেরি করে দ্বিতীয়বার আযানের জন্য দাঁড়িয়েছেন যাতে তিনি সূর্যের প্রখরতা কমে যাওয়া অনুভব করেছেন। আর এর পরিমাণ বেশ দীর্ঘ। এবারও রসূল স. তাঁকে একই কথা বলে বসিয়ে দিলেন। দু'বার মিলে যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণের চেয়ে বেশি না হয়ে পারে না। তাছাড়া টিলা চ্যাপটা হওয়ার কারণে তার ছায়াও দেখতে পাওয়া যাবে বেশ বিলম্বে এটাই স্বাভাবিক। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকাই হাদীসের চাহিদা যা অন্যান্য হাদীস থেকে আরো স্পষ্ট বুঝা যায়।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ , ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ»، ثُمَّ قَالَ:
«الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ صَلَاتِكَ أَمْسِ وَصَلَاتِكَ الْيَوْمَ»

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রসূল স. ইরশাদ করেন, ইনি জিবরাঈল। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায পড়লেন সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার সাথে সাথে। যোহর পড়লেন সূর্য ঢলে পড়লে। অতঃপর আসর পড়লেন যখন তাঁর ছায়া সমপরিমাণ দেখলেন। তারপর মাগরিব পড়লেন সূর্য ডুবে গেলে এবং রোজাদারের জন্য ইফতার বৈধ হলে। আর ইশা পড়লেন যখন শফক তথা আভা ডুবে গেলো। অতঃপর তিনি আবার পর দিন এলেন এবং রসূল স.কে ফজর পড়ালেন যখন সকাল কিছুটা ফর্সা হলো। আর যোহর পড়ালেন যখন তাঁর ছায়া সমপরিমাণ হলো। আর আসর পড়ালেন যখন তাঁর ছায়া দ্বিগুণ হলো। অতঃপর মাগরিব পড়ালেন একই সময় যখন সূর্য ডবে গেলো এবং রোজাদারের জন্য ইফতার করা বৈধ হলো। তারপর ইশা পড়ালেন যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলো। অতঃপর বললেন, ওয়াক্ত হলো গতকাল ও আজকের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে। (নাসাঈ-৫০৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. বলেন, **هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ** হাদীসটি মারফু', প্রমাণিত সহীহ। (আল ইস্তিযক-ার, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৮৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী এবং মুয়াত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩২৭৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত জিবরাইল আ. দ্বিতীয় দিন যোহরের নামায তখন পড়ালেন যখন তাঁর ছায়া সমপরিমাণ হলো। আর ছায়া সমপরিমাণ হওয়ার পরে পড়ার অর্থ হলো দ্বিগুণের মধ্যে পড়া। আর দ্বিতীয় দিন আছরের নামায তখন পড়ালেন যখন ছায়া তাঁর দ্বিগুণ হলো। এর অর্থ হলো তিনগুণের মধ্যে পড়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে যোহর শেষ এবং আছর শুরু হয়।

উপরিউক্ত দলীলের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাশহুর মত হলো: যে কোন জিনিসের ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত তার দ্বিগুণ হলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ এবং আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়। (শামী : ১/৩৫৯) আর ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দ্বিতীয় মতানুসারে যে কোন জিনিসের ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত তার সমপরিমাণ হলেই যোহরের ওয়াক্ত শেষ এবং আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। (শামী :

১/৩৫৯) আর এটা জমহুরে উম্মতেরও মত।

উপরিউক্ত হাদীসগুলোর বিপরীতে জিবরাঈল আ.-এর ইমামতির হাদীসসহ আরো বেশ কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ ছাড়িয়ে গেলে আছর শুরু হয়ে যায়। এ দুই শ্রেণির হাদীসের ভেতর থেকে যতটুকু বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় তা হলো: কোন জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত। আর দ্বিগুণ পার হয়ে গেলে আছরের ওয়াক্ত। আর মাঝের অংশ অর্থাৎ একগুণ পার হওয়ার পর থেকে দ্বিগুণ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়টুকু কোন্ নামাযের ওয়াক্ত এ বিষয় নিয়ে হাদীসের ভাষ্য বিভিন্নমুখী। উপরিউক্ত তিনটি হাদীস থেকে মনে হয় যে, এটা যোহরের ওয়াক্ত। আবার জিবরাঈল আ.-এর ইমামতির হাদীসসহ আরো বেশ কিছু হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এটা আছরের ওয়াক্ত। দলীলের এ ভিন্নতার কারণে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.সহ হানাফী মাযহাবের অনেক আলেম বলেছেন যে, মধ্যবর্তী এ সময়টা যোহর ও আছর উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা প্রথমাংশে যোহর পড়তে পারেনি তারা দ্বিতীয়াংশে পড়বে এবং এটা 'কাযা' নয়; বরং 'আদা' হবে। আর যারা সফরে রওনা হওয়ার কারণে নির্ধারিত সময় আছর পড়তে পারবে না, তারা এ সময় পড়ে নিবে। অথবা যদি কোন ব্যক্তি এমন অঞ্চলে থাকে যেখানে আছরের জামাত জমহুরদের মতানুসারে একগুণ পার হওয়ার পর থেকে দ্বিগুণ পূর্ণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময় অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ঐ মতেই আছরের নামায জামাতের সাথে পড়বে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাশহুর মতের উপর আমল করতে গিয়ে জামাত বাদ দিয়ে একাকী পড়বে না। এ আলোচনার সারসংক্ষেপ ফতওয়ায়ে শামীতে বর্ণনা করা হয়েছে। (শামী : ১/৩৫৯)

মাকরূহসহ আসরের শেষ ওয়াক্ত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا

الْمَغْرِبَ. (رواه البخارى فى بَابِ غَزْوَةِ الخَنْدَقِ وَهِيَ الأَحْزَابُ–٢/٥٩٠)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর রা. খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর এসে (কাফিরদের কারণে নামায ছুটে যাওয়ায়) তাদেরকে শক্ত কটু কথা বলতে বলতে আরজ করলেন: ইয়া রসূলুল্লাহ! স. আমি আজ সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হলেও আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। রসূলুল্লাহ স. বললেন,: আমিও আজ আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। অতঃপর আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বুতহান নামক উপত্যকায় গেলাম। এরপর তিনি নামাযের জন্য অযু করলেন এবং আমরাও নামাযের জন্য অযু করলাম। অতঃপর সূর্যাস্তের পর তিনি আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন। (বুখারী : ৩৮১২)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩২৫৭)

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আসরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। অনুরূপ একটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারিম স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আসরের নামাযের এক রাকাত সূর্য ডোবার পূর্বে পেলো সে আসরের নামায পেয়ে গেলো। (বুখারী-৫৫২) তবে স্বাভাবিক অবস্থায় আসরের নামায শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরি করে পড়া মাকরূহ । কিন্তু কোন কারণবশতঃ দেরি হয়ে গেলে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামায পড়া যাবে এবং এটা 'কাযা' নয়; বরং 'আদা' হবে।

মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا...وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشفق وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ... –١/٣٩)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয় নামাযের ওয়াক্তের শুরু ও শেষ আছে।...মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ডুবে গেলে আর শেষ হয় পশ্চিম আকাশের আভা চলে গেলে। ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় আভা চলে গেলে আর শেষ হয় রাত অর্ধেক হলে। আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে সাদিক উদিত হলে আর শেষ হয় সূর্য উঠলে। (তিরমিযী : ১৫১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটির এ সনদের উপর কিছুটা আপত্তি করলেও ভিন্ন সনদে হাদীসটির এ বক্তব্যকে সহীহ বলেছেন। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **اسناده صحيح** হাদীসটির সনদ সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-৭১৭২ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩২৭৪)

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৬১)

মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوب، فَقَالَ: لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ، فَقَالَ: شُغِلْنَا، قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ (رواه ابو داود تحت بَابٍ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ–١/٦٠)

অনুবাদ : হযরত মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত উকবা ইবনে আমের রা. (হযরত মুআবিয়া রা.-এর পক্ষ থেকে) মিসরের দায়িত্বশীল থাকাকালীন হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. যুদ্ধ হিসেবে আমাদের নিকট আসলেন। হযরত উকবা একদিন মাগরিবের নামায দেরি করলে আবু আইয়ূব রা. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, হে উকবা! এটা কেমন

নামায? জবাবে তিনি বললেন, ব্যস্ততায় পড়ে গিয়েছিলাম। হযরত আবু আইয়ূব বলেন, তুমি কি রসূল স.কে বলতে শোননি যে, এ উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে অথবা বলেছেন ইসলামের মূল নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারকারাজি দেদীপ্যমান হওয়ার পূর্বে মাগরিবের নামায আদায় করবে। (আবূ দাউদ-৪১৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **إسناده حسن** হাদীসটির সনদ হাসান। (আবূ দাউদ-৪১৮ নং হাদীসের আলোচনায়)।

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয় যখন পূর্ণ আকাশ গাঢ় অন্ধকারে ছেঁয়ে যায়। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের আভা আর অবশিষ্ট না থাকে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৬২)

জ্ঞাতব্য: সূর্য ডোবার পরে যত সময় গড়াতে থাকে আকাশও তত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকে। আর অন্ধকার গাঢ় হওয়ার কারণে তারকার আলো অধিক উজ্জ্বল দেখায় এবং ছোট ছোট তারকাগুলিও পরিষ্কার দেখা যায়। এ কারণে মনে হয় যেন তারকারাজী জালের মত ছেঁয়ে আছে। এটা হলো **تَشْتَبِكَ النُّجُومُ** শব্দের অর্থ। আর এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে যেহেতু গাঢ় অন্ধকার প্রয়োজন। তাই **تَشْتَبِكَ النُّجُومُ** শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গাঢ় অন্ধকার।

ইশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:.... لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا– ١/٢٣٨)

অনুবাদ : হযরত আবু কতাদা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে এক আলোচনায় বললেন,: ....ঘুমের কারণে নামায ছুটে যাওয়াটা উদাসীনতা নয়, বরং উদাসীনতার অপরাধ ঐ ব্যক্তির জন্য যে অন্য নামাযের ওয়াক্ত এসে পড়ার আগ পর্যন্তও নামায পড়লো না। (মুসলিম: ১৪৩৫, সংক্ষেপিত) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৮৯০১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত তার পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বাকী থাকে। সুতরাং ইশার নামাযের ওয়াক্তও ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বাকী থাকবে। সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى কোন নামাযের ওয়াক্ত পরবর্তী নামাযের আযান দেয়ার পূর্বে শেষ হয়ে যায় না। (ইবনে আবী শাইবা-৩৩৮৮, আল- কুনা ওয়াল আসমা-৫৯৮) তবে ফজরের ওয়াক্ত যোহরের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে না। কারণ সূর্য উদিত হলে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বহু হাদীস এবং ছূরা ত্বহা-এর ১৩০ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا اخْتَلَطَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ، وَصَلِّ الْفَجْرَ إِذَا نَوَّرَ النُّورُ.

অনুবাদ : হযরত নাফে' ইবনে জুবাইর রহ. বলেন, হযরত ওমর রা. হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে পত্র লিখলেন যে, সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে যোহরের নামায পড়বে। আছরের নামায পড়বে যখন সূর্য উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ থাকে। মাগরিব পড়বে রাত দিনের সাথে মিলে গেলে। আর ইশার নামায পড়বে রাতের যে কোন সময়। আর ফজর পড়বে ভোরের আলো ফুটে বেরোলে। (ইবনে আবী শাইবা: ৩২৫০, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৮, হাদীস নং-৯৫৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। হাবীব ইবনে আবী ছাবেতের বিরুদ্ধে তাদলীসের অভিযোগ থাকলেও তা তেমন মারাত্মক নয়। এ কারণে বুখারী-মুসলিমে তাঁর মাধ্যমে ১৫টির বেশি হাদীস عن শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। নাফে' ইবনে যুবায়ের হযরত ওমর রা. থেকে না শুনলেও হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে তাঁর শ্রবণ সম্ভব। কারণ হযরত আবু মুসা আশআরী রা. মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৮ হিজরীতে। তাঁর চেয়ে ২৬ বছর পূর্বে ৩২ হিজরী-তে মৃত্যুবরণকারী সাহাবা হযরত আব্বাস রা. থেকেও হযরত নাফে'-এর শ্রবণ প্রমাণিত। অতএব, বলা যেতে পারে যে, ইমাম মুসলিমের শর্তানুয-ায়ী হাদীসটি সহীহ। এ ছাড়াও আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটির

বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

শিক্ষণীয় : হযরত ওমর রা. কর্তৃক হযরত আবু মুসা আশআরী রা.কে দেয়া নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইশার নামাযের প্রকৃত ওয়াক্ত ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বাকী থাকে।

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثنا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا إِفْرَاطُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ طُلُوعُ الْفَجْرِ. رواه الطحاوى فى بَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ–١١٨)

অনুবাদ : হযরত উবায়েদ ইবনে জুরাইয রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা.কে জিজ্ঞেস করলেন: ইশার নামাযের সীমালংঘন কী? (অর্থাৎ ওয়াক্তের গণ্ডি পেরিয়ে যায় কীসে?) জবাবে তিনি বললেন, সুবহে সাদিক উদিত হওয়া। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৮, হাদীস নং-৯৫৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। রবী' আল মুআজ্জিন ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর রবী' আল মুআজ্জিন □□□□ নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব : ২০৭২) ইমাম ত্বহাবী ও বায়হাকী রহ. এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যা হাদীসটি তাঁদের নিকট দলীলযোগ্য হওয়ার প্রমাণ। এছাড়াও ইমাম বায়হাকী রহ. এ মাসআলার পক্ষে আরো কিছু দলীল পেশ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন- আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, অধ্যায় : ইশার নামাযের বৈধ ওয়াক্তের শেষ সময়। এ ছাড়াও আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। (আছারুস সুনান, হাদীস নং-২০৯)

শিক্ষণীয় : হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর উপরিউক্ত বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত রাতের যে কোন অংশে ইশার নামায পড়া জায়েয এবং এটাকে তিনি 'আদা' মনে করতেন 'কাযা' নয়। ইমাম বায়হাকী রহ. অনুরূপ মতামত হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণনা করেছেন। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, অধ্যায় : ইশার নামাযের জায়েয ওয়াক্তের শেষ) হানাফী মাযহাবে এ মতই গ্রহণ করা হয়েছে যে, ইশার ওয়াক্ত সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। (শামী : ১/৩৬১) অবশ্য অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দেরি করে নামায আদায়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. কোন পরওয়া করতেন না। (বুখারী : ৫৪৪) সুতরাং অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করার

অবকাশ আছে। আর সুবহে সাদিক পর্যন্ত যদিও ওয়াক্ত থাকে, কিন্তু অর্ধরাতের পরে ইশার নামায পড়ার কোন আমল রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব, স্বাভাবিকভাবে ইশার নামায অর্ধরাতের পরে পড়া মাকরূহ হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৬৭)

পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়া উত্তম

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الْإِسْفَار– ١/ ٦٤)

অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করবে। (নাসাঈ-৫৪৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী-১৫৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করা উত্তম হওয়া প্রমাণিত হয়।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالْأَجْرِ (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الْإِسْفَار– ١/ ٦٤)

অনুবাদ : হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ রা. তাঁর কওমের কিছু আনসারদের থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: তোমরা ফজরের নামায যতই ফর্সা করে আদায় করবে ততই অধিক সওয়াবের কারণ হবে। (নাসাঈ : ৫৫০)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী-১৫৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৩৩০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা ফজরের নামায ভোরের আলো উজ্জ্বল হলে আদায় করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর উৎসাহ প্রদান প্রমাণিত হয়। অনুরূপ আমল সহীহ সনদে বর্ণিত আছে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে, (মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী : ৯২৮১) হযরত আলী রা. থেকে, (আব্দুর রায্‌যাক : ২১৬৫) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. থেকে, (ইবনে আবী শাইবা-৩২৬৯) এবং হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রদের থেকে। (ইবনে আবী শাইবা : ৩২৭০)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, ফজরের নামায ফর্সাতে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম যেমন একমত হয়েছেন অন্য কোন বিষয়ে তাঁরা এমন একমত হননি। (ইবনে আবী শাইবা-৩২৭৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামায ফর্সা হলে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম একমত ছিলেন। আর দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা শরীআতের দলীল।

ফজরের নামাযের উত্তম ওয়াক্ত কোন্‌টি তা নিয়ে হাদীসে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক. ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকার থাকতে নামায পড়া। দুই. পূর্ব দিগন্ত পূর্ণ ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়া। পূর্ববর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের কথা ও আমলের ভিত্তিতে আমরা পূর্ব দিগন্ত পূর্ণ ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়ে থাকি। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৬৭)

এর বিপরীতে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকার থাকতে নামায পড়ার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ত্বহাবী রহ. উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, ফজরের নামাযে লম্বা কিরাত পড়বে। অন্ধকারে শুরু করবে আর শেষ করতে করতে পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হয়ে যাবে। তাহলে শুরু এবং শেষ মিলে উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৩, হাদীস নং-১০৭২)

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সহীহ হাদীসে ওয়াক্তের শুরুতে ফজরের নামায পড়ার আমল রসূলুল্লাহ স. থেকে পাওয়া যায়। অথচ আমরা বলেছি: ফর্সা করে পড়া উত্তম। আবার রমাযান মাসে আমরা ফজরের নামায ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকারে আদায় করে থাকি। আমাদের আমলগত এ ধরনের পার্থক্যের মূল কারণ কী? এ প্রশ্নের জবাবে আমি ভূমিকা হিসেবে বুখারী শরীফ থেকে দুটি হাদীস পেশ করছি: **এক.** হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, وَالْعِشَاء إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ "লোক বেশি হলে ইশার নামায তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, অন্যথায় দেরি করতেন"। (বুখারী : ৫৩৮) **দুই.** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا "রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তাহলে তাদেরকে এভাবে (বিলম্ব করে) ইশার নামায আদায় করতে নির্দেশ দিতাম। (বুখারী : ৫৪৩)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত দেরি করে পড়া। কিন্তু প্রথম হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক মুসল্লী কম হলে রসূলুল্লাহ স. বিলম্ব করতেন। আর মুসল্লী বেশি হলে নামায আগে আগে পড়ে নিতেন। দ্বিতীয় হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক রসূলুল্লাহ স. উম্মতের কষ্টের কথা চিন্তা করে ইশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ছেড়ে দিয়ে আগে আগে নামায আদায় করে নিতেন। রসূলুল্লাহ স.-এর এ আমল থেকে একটি মূলনীতি বের হয়। তাহলো নামাযের প্রকৃত উত্তম ওয়াক্ত যেটাই হোক, জামাত কায়েমের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাকরূহমুক্ত জায়েয ওয়াক্তের ভেতরে থেকে মুসল্লীদের আগমনের সময় ও সুবিধা খেয়াল রাখা উচিত। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা রমাযানে ফজরের নামায শুরু ওয়াক্তে পড়ি। কেননা, ঐ সময় নামায পড়তে দেরি করলে মুসল্লী কম হবে এবং অনেক নিয়মিত মুসল্লী একাকী নামায পড়ে ঘুমিয়ে যাবে। আবার আমাদের দেশের মানুষের সাধারণত তাহাজ্জুদে ওঠার অভ্যাস না থাকায় রমাযান ব্যতীত অন্য সময় ফজর শুরু ওয়াক্তে পড়া হলে মুসল্লীর সংখ্যা খুবই কম হবে। এর বিপরীতে মক্কা-মদীনায় রীতিমতো তাহাজ্জুদের আযান হয় এবং ফজরের ওয়াক্তের পূর্বেই মাসজিদ পূর্ণ হয়ে যায়। সেখানে ফজরের নামায দেরিতে পড়া হলে মুসল্লীদের জন্য তা কষ্টকর হয়ে যাবে। সুতরাং এ অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত হলো পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হলে নামায পড়া। তবে যেসব হাদীসে অন্ধকারে নামায পড়ার আমল বর্ণিত হয়েছে তাতে মুসল্লীদের আগমনের সুবিধার বিষয়টি খেয়াল করা হয়েছে।

জ্ঞতব্য : যেসব ক্ষেত্রে মুসল্লীদের আগমনের সুবিধা বিবেচনা করতে গিয়ে নামাযের প্রকৃত মুস্তাহাব ওয়াক্ত বর্জন করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে কেউ একাকী নামায পড়লে তার জন্য উক্ত নামাযের প্রকৃত মুস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করাই উত্তম হবে।

শীতকালে যোহর ওয়াক্তের শুরুতে এবং গরমকালে বিলম্বে পড়া

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». (رواه البخارى فى بَابِ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ–١/٧٧)

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়ো। কারণ গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। (বুখারী-৫১১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গরমকালে রসূল স. যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়তে বলেছেন অর্থাৎ দেরি করে পড়তে বলেছেন যাতে সূর্যের তাপ কমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এ বিষয়টি হযরত আবু মাসউদ বদরী রা. থেকে আবূ দাউদ শরীফের একটি হাদীসে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, **رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ** আমি রসূল স.কে দেখেছি সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথে যোহরের নামায আদায় করতেন। তবে গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেলে তিনি নামায দেরি করে আদায় করতেন। (আবূ দাউদ-৩৯৪) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ أَبْرَدَ بِهَا» (رواه الطحاوى فى شرح معانى الأثار فى بَابِ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الظُّهْرِ فِيهِ–١٣٨)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, ঠাণ্ডা হলে রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামায ওয়াক্তের শুরুতে পড়তেন। আর গরমের উত্তাপ বেশি হলে যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে আদায় করতেন। অর্থাৎ দেরি করে পড়তে বলেছেন যাতে সূর্যের তাপ কমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অর্থাৎ দেরি করে পড়তেন যাতে সূর্যের তাপ কমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৮, হাদীস নং-১১২৯, নাসাঈ-৫০০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা : ৩৬০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গরমের প্রচন্ডতা বেশি হলে যোহরের নামায এতটুকু দেরি করে পড়তে হয় যেন সূর্যের তাপ কিছুটা কমে আসে। আর শীত থাকলে নামায শুরু ওয়াক্তে পড়ে নিতে হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৬৬)

আছরের নামায সামান্য দেরি করে পড়া উত্তম

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ (رَوَاه التِّرْمِذِيُّ فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعَصْرِ–١/٤٢)

অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামায তোমাদের চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। আর তোমরা রসূলুল্লাহ স.-এর চেয়ে আছরের নামায বেশি তাড়াতাড়ি আদায় কর। (তিরমিযী : **১৬১**)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. উম্মে সালামা রা.-এর এ হাদীসটিকে ভিন্ন একটি সনদে বর্ণনা করে সেটাকে আরো বেশি সহীহ বলেছেন। উক্ত সনদের জন্য দেখুন তিরমিযী : **১৬১** নম্বর হাদীস।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আছরের নামায কিছুটা দেরি করে পড়া মুস্তাহাব। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৬৭) যদি কোন ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দ্বিতীয় মতানুসারে কোন জিনিসের ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতীত সমপরিমাণ হলে আছরের নামায পড়তে চায় তাহলে এ হাদীস মোতাবেক একটু দেরি করে পড়াই মুস্তাহাব হবে। তবে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুসারে কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার পরে আছর পড়তে চাইলে দেরি না করে বরং শুরু ওয়াক্তে পড়াই উত্তম হবে। কেননা, সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আছর পড়ার তাকীদ বহু হাদীসে এসেছে। আর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরে আছর পড়লে সূর্যের রং কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায় বলেই মনে হয়; বিশেষ করে শীতের দিনে।

সূর্য ডোবার সাথে সাথেই মাগরিবের নামায পড়া উত্তম

عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ، يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. (رواه البخارى فى بَابِ وَقْتِ المَغْرِبِ- ١/٧٩)

অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খদীজ রা. বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়ে ফিরতাম। (আর আকাশ এতটুকু আলোকিত থাকতো যে) আমাদের কেউ তীর নিক্ষেপ করলে সে তার নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেতো। (বুখারী : ৫৩২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩২৯৫)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের নামায সূর্য ডোবার সাথে সাথে এত তাড়াতাড়ি আদায় করতে হয় যে নামাযান্তে কেউ তীর ছুঁড়লে সে তার নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পায়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৫২)

عَن عَبْد الله الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (رواه البخارى فى بَابِ الصَّلاَةِ قَبْلَ المَغْرِبِ- ١/٥٧)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ আল মুযানী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, মাগরিবের পূর্বে নামায পড়। এ কথাটি তিনবার বললেন,। তৃতীয়বারে গিয়ে বললেন, 'যে চায়'। কথাটি এ আশঙ্কায় বললেন, যেন মানুষ এটাকে ছুন্নাত বানিয়ে না নেয়। (বুখারী : ১১১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১১৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের আযানের পরে জামাত শুরু করতে দু'রাকাত নফল নামায পড়ার মতো সময় পরিমাণ দেরি করা যেতে পারে। কেননা মাগরিবের জামাতের পূর্বে দু'রাকাত নফল নামায পড়ার অনুমতি এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়বো। বরং উদ্দেশ্য হলো এতটুকু দেরি করলে মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাবে না।

কোন কোন মাসজিদে মাসআলা আলোচনার নামে আরো বেশি দেরি করা হয়ে থাকে যা ঠিক নয়। কেননা জিবরাঈল আ.-এর ইমামতের প্রসিদ্ধ

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি উভয় দিন মাগরিবের নামায সূর্য ডোবার সাথে সাথে আদায় করেছেন (তিরমিযী-১৪৯)

ইশার নামায দেরি করে পড়া মুস্তাহাব

عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. (رواه البخارى فى تاخير الظهر الى العصر–١/٧٨)

অনুবাদ : হযরত সাইয়ার ইবনে সালামা রহ. বলেন, আমি ও আমার পিতা একবার আবু বারযা আসলামী রা.-এর নিকট গেলাম। আমার পিতা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন : রসূলুল্লাহ স. ফরয নামায কিভাবে আদায় করতেন? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ স. হাজীর অর্থাৎ যোহরের নামায যাকে তোমরা উলা বলে থাক– সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে গেলে আদায় করতেন। আসর এমন সময় আদায় করতেন যে, নামাযের পর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে নিজ বাড়ীতে পৌঁছে যেতো, অথচ সূর্য তখনও সতেজ। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন তা আমি ভুলে গেছি। আর ইশার নামায যাকে তোমরা আতামা বলে থাকো তিনি তা দেরি করে আদায় করতে পছন্দ করতেন। তিনি ইশার আগে ঘুমানো এবং ইশার পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। আর ফজরের নামায এমন সময় শেষ করতেন যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারতো। এ নামাযে তিনি ষাট থেকে একশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। (বুখারী: ৫২০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাযা এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩২৭৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইশার নামায দেরি করে পড়া মুস্তাহাব। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৩৬৭) অবশ্য

মুসল্লিদের জন্য কষ্টকর হলে কিংবা মুসল্লী কম হওয়ার আশঙ্কা থাকলে শুরু ওয়াক্তে ইশার নামায পড়ায় কোন দোষ নেই। (বুখারী: ৫৩৮ ও ৫৪৩)

নফল নামাযের জন্য মাকরূহ ওয়াক্ত

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. (رواه البخارى فى بَابٍ: لاَ تُتَحَرَّى الصَّلاَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ–٨٢/١)

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: ফজরের নামাযের পরে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। আর আসরের নামাযের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। (বুখারী : ৫৫৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুবহে সাদেকের পরে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আর কোন নফল নামায পড়া যাবে না। তবে ফজরের ছুন্নাত দু'রাকাত পড়তে হবে। (তিরমিযী-৪১৯) অনুরূপভাবে আসরের নামাযের পরে সূর্য কিরণহীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর কোন নফল নামায পড়া যাবে না। আর সূর্য কিরণহীন হয়ে পড়লে ঐ দিনের আসর ব্যতীত সব ধরনের নামায পড়াই নিষিদ্ধ। তবে সুবহে সাদেকের পরে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্য কিরণহীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কাযা নামায আদায়ের সুযোগ রয়েছে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৭৫)

এর বিপরীতে কোন কোন ইমাম উপরিউক্ত মাকরূহ ওয়াক্তে তওয়াফের নামায পড়া বৈধ বলেন। কিন্তু বুখারী শরীফে ফজর এবং আসরের পরে তওয়াফ করা অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহ. বলেন, وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى হযরত ওমর রা. ফজরের পরে তওয়াফ করলেন অতঃপর সওয়ার হয়ে জি-তুওয়া নামক স্থানে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। হযরত ওমর রা.-এর আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপরিউক্ত মাকরূহ ওয়াক্তে তওয়াফের নামায পড়াও বৈধ নয়। অন্যথায় হযরত ওমর রা. মাসজিদে হারাম ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে কেন নামায আদায় করবেন। এমনিভাবে তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মাসজিদসহ কোন নফল নামাযই এ সময় পড়া বৈধ নয়। যেহেতু পূর্ববর্ণিত নিষেধাজ্ঞার হাদীসটি ব্যাপক অর্থে বর্ণিত হয়েছে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত।

(শামী : ১/৩৭৫)

আবার কেউ কেউ আছরের পরে দু'রাকাত নফল পড়া ছুন্নাত বা কমপক্ষে বৈধ মনে করেন। দলীল হিসেবে পেশ করেন হযরত আয়েশা রা. থেকে বুখারী শরীফের হাদীস। হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূল স. প্রকাশ্যে বা গোপনে কখনো দু'রাকাত নামায ছাড়তেন না ফজরের পূর্বে ও আছরের পরে। (বুখারী-৫৬৫) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন, রসূল স. আছরের পরে আমার নিকট আসলেই দু'রাকাত নামায পড়তেন। (বুখারী-৫৬৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী শরীফে বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এর জবাবে বুখারী শরীফের নিম্নবর্ণিত হাদীসটি পেশ করা যেতে পারেঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর আজাদকৃত গোলাম কুরাইব রহ. বলেন, রসূল স.-এর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হযরত আয়েশা রা. আসরের পরে দু'রাকাত নামায পড়েন মর্মে সংবাদ পেয়ে হযরত ইবনে আব্বাস, আব্দুর রহমান ইবনে আযহার এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ আমাকে হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট কারণ জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন। জবাবে তিনি বললেন, যে, এ ব্যাপারে উম্মে সালামা রা.কে জিজ্ঞেস করো। আমি হযরত উম্মে সালামা রা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি নবী স. থেকে শুনেছি যে, তিনি ঐ দু'রাকাত পড়তে নিষেধ করতেন। অতঃপর এক দিন তিনি আসরের নামায পড়ে আমার ঘরে এসে ঐ দু'রাকাত পড়লেন। আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার নিকট আব্দুল কয়েস গোত্রের কিছু মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানতে এসেছিলো। সে কারণে আমি জোহরের পরের দু'রাকাত পড়তে পরিনি, এটা হলো সেই দু'রাকাত। (বুখারী-৪১৩১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ-৫৮০ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১০৮)

এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! হযরত আয়েশা রা. থেকে বুখারী শরীফের ৫৬৪ ও ৫৬৫ নম্বরে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে রসূল স.-এর মৃত্যুর পরে হযরত আয়েশা রা.কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ঐ সকল হাদীস পেশ না করে এ ব্যাপারে হযরত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন,। অথচ উম্মে সালামার বর্ণনা থেকে হযরত আয়েশা রা.-এর আমলের পক্ষে কোন দলীল মেলেনি। বরং আরো স্পষ্ট হলো যে, এটা রসূল স.-এর নিয়মিত আমল ছিলো না। জোহরের পরের দু'রাকাত

পড়তে না পারার কারণে তার কাযা হিসেবে পড়েছেন মাত্র। সুতরাং এটাকে স্বভাবিক আমল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। যারা হযরত আয়েশ-ার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে আছরের পরে দু'রাকাত নামায আদায় করা ছুন্নাত মনে করেন তারা ভেবে দেখুন যার হাদীসের ভিত্তিতে আপনারা এটাকে ছুন্নাত বলছেন অথচ রসূল স.-এর মৃত্যুর পরে তিনি নিজে ঐ সকল হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেননি। উপরন্তু এ সময় নামায পড়ার আমল সংক্রান্ত হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় রসূল স.-এর নিষেধাজ্ঞার হাদীসের বর্ণনা অনেক ব্যাপক। আবার হতে পারে আছরের পরে নামায পড়ার আমল রসূল স. ঐ সময় করতেন যখন এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আসেনি। অথবা ঐ আমল ছিলো রসূল স.-এর সাথে খাস ও তাঁর বৈশিষ্ট্য যা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় নয়।

নফল নামাযের মাকরূহ ওয়াক্তেও কাযা নামায পড়া জায়েয

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا، وَإِنَّهُ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الخَادِمَ، فَقُلْتُ: قُومِي إِلَى جَنْبِهِ، فَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ؟ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ بِالإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ»

অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা রা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি নবী স. থেকে শুনেছি যে, তিনি ঐ দু'রাকাত অর্থাৎ আসরের পরে দু'রাকাত পড়তে নিষেধ করতেন। অতঃপর এক দিন তিনি আসরের নামায পড়ে আমার ঘরে এসে ঐ দু'রাকাত পড়লেন। আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার নিকট আব্দুল কয়েস গোত্রের কিছু মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানতে এসেছিলো। সে কারণে আমি জোহরের পরের দু'রাকাত পড়তে পরিনি, এটা হলো সেই দু'রাকাত। (বুখারী-৪১৩১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ-৫৮০ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১০৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নফল নামাযের মাকরূহ ওয়াক্তেও কাযা নামায পড়া যায়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৭৫) অবশ্য ছুন্নাতের কাযা পড়ার বিষয়টি রসূলুল্লাহ স.-এর বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া তিনি নফলেরও কাযা পড়তেন। অন্যদের জন্য নফল নামাযের কাযা নেই এবং আসরের পরে তা আদায় করার বৈধতাও নেই।

সব ধরনের নামাযের জন্য মাকরূহ ওয়াক্ত

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ (رواه مسلم فى بَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا– ١/٢٧٦)

অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রা. বলেন, তিনটি সময় রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে নামায পড়তে বা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করতেন। যখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে উদিত হয় অর্থাৎ উঁচু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, ঠিক দুপুরের সময় যখন সূর্য বরাবর উপরে স্থির থাকে অর্থাৎ পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং যখন অস্ত যাওয়ার জন্য অবতরণ করে অর্থাৎ অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (মুসলিম শরীফ-১৮০২) হযরত ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, এ হাদীসের মধ্যে أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا -এর অর্থ হলো জানাযার নামায। (তিরমিযী : ১০৩০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৩৩৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপরিউক্ত তিন ওয়াক্তে সব ধরনের নামায পড়াই মাকরূহ। তবে কেউ ঐ দিনের আসর না পড়ে থাকলে সূর্য ডুবন্ত অবস্থাতেও তা পড়ে নিবে। (বুখারী-৫২৯) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৭১)

উলামায়ে কিরামের তাহকীক মতে উক্ত মাকরূহ সময় হলো সূর্যোদয় থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত, সূর্য মাথায় আসার পূর্বে ৩ মিনিট ও পরে ৩ মিনিট এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ১০ মিনিট।

অধ্যায় ৮ : আযান-ইকামাত

নামাযের জামাতের জন্য আযান দেয়া

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. (رواه البخارى فى بَابِ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ. -١/٨٨.)

অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুআইরিস রা. বলেন, আমরা কয়েকজন সমবয়সী যুবক রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর কাছে ২০ দিন অবস্থান করলাম। রসূলুল্লাহ স. অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা পরিবার কামনা করছি বা পরিবারের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমরা কাদেরকে পেছনে রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জানালাম। তিনি ইরশাদ করলেন : তোমরা পরিবারের কাছে ফিরে যাও। তাদের সাথে বসবাস কর। তাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (ভালো কাজের) নির্দেশ দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মালেক ইবনে হুআইরিস রা. আরো কিছু বলেছিলেন যা আমি স্মরণে রেখেছি অথবা বলেছেন আমি স্মরণে রাখতে পারিনি। রসূলুল্লাহ স. আরো ইরশাদ করেন, তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায আদায় করবে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে। (বুখারী : ৬০৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত

হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭০৩৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের ওয়াক্ত হলে সকলকে জামাতে শামিল করার জন্য আযান দিতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৪)

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন এক সফরে রসূল স. ও সাহাবায়ে কিরামের ফজরের নামায কাযা হয়ে গেলে তা জামা-তের সাথে আদায় করেছেন এবং জামাতের পূর্বে রসূল স. হযরত বিলাল রা.কে আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী : ৫৬৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩২৪৭)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একত্রে অনেক মানুষের নামায ছুটে গেলে তা আদায়ের জন্য জামাত করতে হয় এবং ঐ জামাতে সকলকে শামিল করতে আযানও দিতে হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৪) গ্রহণযোগ্য ওযর ব্যতীত নামায ছুটে যাওয়া যেহেতু অন্যায় তাই দু'চার জনের ছুটে গেলে মানুষকে না জানিয়ে গোপনে পড়ে নেয়া উত্তম হবে। সে ক্ষেত্রে আযান দিবে না। (শামী : ১/৩৯১) মোট কথা কাযা নামাযের জামাত হোক আর ওয়াক্তের নামাযের জামাত হোক সব জামাতেই আযান দিবে।

কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া

أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ لْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَأَيْت رَجُلًا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ، فَقَامَ عَلَى جَذْمِ حَائِطٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ -

অনুবাদ : আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. রসূল স.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি আকাশ থেকে অবতরণ করলো। অতঃপর একটি দেয়ালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার...বললো। অর্থাৎ আযান এবং ইকামাত দিলো। (মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ-এর বরাতে নাছবুর রায়াহ-আযান অধ্যায়ের

৫ম হাদীস, আদ্ দিরায়াহ-১১৭, আত-তালখীছুল হাবীর-২৯৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইবনে আবি লায়লা এ হাদীসটি সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে শুনেছেন। এর প্রমাণ রয়েছে ইবনে আবি শাইবা-২১৩৭, ইবনে খুযাইমা-৩৭৯, ত্বহাবীঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১২, হাদীস নং-৮১১ এবং বায়হাকী-১৯৭৫ নং হাদীসে। এ কারণে ইবনে হাঝাম এবং ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (আত-তালখীছুল হাবীরঃ ২৯৮ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া ছুন্নাত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৯)

নাবালেগ বাচ্চা আযান দিবে না

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ

অনুবাদ : হযরত আবু ইসহাক রহ. বলেন, মুয়াজ্জিনের জন্য বসে আযান দেয়া মাকরূহ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের জন্যও আযান দেয়া মাকরূহ। (আব্দুর রায্যাক-১৮১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ»، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: لَا.

অনুবাদ : হযরত ইবনে জুরাইয রহ. বলেন, আমি হযরত আতা ইবনে আবি রবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, মুয়াজ্জিন কি না দাঁড়িয়ে আযান দিতে পারে? তিনি বললেন, অসুস্থ না হলে পারবে না। আমি বললাম, তন্দ্রা বা অলসতার কারণে কি পারবে? তিনি বললেন, না। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক কি আযান দিতে পারবে? তিনি বললেন, না পারবে না। (আব্দুর রায্যাক-১৮১৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يُؤَذِّنْ لَكُمْ غُلَامٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ"

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা আযান দিবে না এবং তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি আযান দিবে। (নসবুর রায়াহ-আযান অধ্যায়, আল ইমাম লিইবনে দাকীকিল ঈদ-এর বরাতে)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। ইবরাহীম ইবনে আবু ইয়াহইয়া ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইবরাহীম ইবনে আবু ইয়াহইয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক বলেন, ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন আর অন্যরা তাঁকে জঈফ বলেছেন। তবে ইমাম শাফেঈ ব্যতীত অন্যদের থেকে আমি যা শুনেছি তাতে ইনসাফের কথা হলো তাঁর হাদীস লেখার যোগ্য। (নাছবুর রায়াহ : আযান অধ্যায়ের ৮ম হাদীসের আলোচনায়)। উপরোল্লিখিত দুটি সহীহ আছার দ্বারা যেহেতু মূল বিষয় অনেকটা প্রমাণিত, তাই এ হাদীস উপরিউক্ত বিষয়ের সমার্থক দলীল হতে পারে।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللهمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ–١/٥١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, ইমাম হলেন যামিনদার আর মুআজ্জিন হলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! আপনি ইমামদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আর মুআজ্জিনদেরকে ক্ষমা করুন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ বিষয়ে হযরত আয়েশা, সাহাল ইবনে সা'দ এবং উকবা ইবনে আমের রা. থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (তিরমিযী : ২০৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীস-টি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-৭১৬৯ নং হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে রসূল স. মুআজ্জিনকে আমানতদার বলেছেন। আর শরীআতের পক্ষ থেকে আমানতের মত গুরুদায়িত্ব নাবালেগের উপর আরোপিত হতে পারে না। যেহেতু শরীআতের বিধি-বিধান মানার দায়িত্ব এখনো তার উপর বর্তায়নি। উপরন্তু রসূল স. মুআজ্জিনের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর নাবালেগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা অনর্থক। কারণ তার আমলনামায় কোন গুনাহ লেখা হয় না। অতএব, এ হাদীস এবং উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুয়াজ্জিন প্রাপ্তবয়ষ্ক হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক আযান দিলে তা যথেষ্ট হবে না। তবে সে বুঝমান হলে অনেকে তার আযান গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। (শামী : ১/৩৯৩, ৩৯৪)

আযানের তরীকা

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ هَمَّ بِالْبُوقِ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ تَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ أُنَادِي بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ . اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَأَى رُؤْيَا فَاخْرُجْ مَعَ بِلاَلٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلاَلٌ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ (رَوَاه إِبْنُ مَاجه فِيْ بَابِ بَدْءِ الْأَذَانِ– ١/ ٥١)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. (নামাযের জন্য মানুষদেরকে ডাকার উদ্দেশ্যে) শিঙ্গাফুকের ইচ্ছা করলেন এবং ঘণ্টাধ্বনি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ফলে তা প্রস্তুত করা হলো। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদকে স্বপ্নে দেখানো হলো। তিনি বলেন, আমি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তিকে ঘণ্টা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলাম। আমি তাকে বললাম : হে আল্লাহর বান্দা! ঘণ্টা বিক্রয় করবে? সে বললো : তুমি এটা দিয়ে কী করবে? আমি বললাম : এটা দিয়ে নামাযের জন্য ডাকব। সে বললো : আমি কি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম জিনিসের সন্ধান দিব না? আমি বললাম : তা কী? তিনি বললেন, এ কথা বলবে, **اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ** বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. বের হয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলেন এবং যা দেখেছেন তা এভাবে বর্ণনা করলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তিকে ঘণ্টা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলাম। এ কথা বলে তিনি পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমাদের সাথী স্বপ্ন দেখেছে। এরপর রসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি বিলালের সাথে মাসজিদে যাও এবং এগুলো তার কাছে বলো। আর বিলাল আযান দিক, সে তোমার চেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। (ইবনে মাযা : ৭০৬, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৯, হাদীস নং-৮১০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম বায়হাকী, ইবনে খুযাইমা এবং ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নাসবুর রায়াহঃ আযান অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতে আমরা উক্ত পদ্ধতির আযান ও ইকামাত আমাদের আমল হিসেবে গ্রহণ করেছি। (আলমগিরী: ১/৫৫) আমাদের গৃহীত পদ্ধতিতে আযানের শুরুতে اللهُ أَكْبَرُ চারবার বলতে হয়। কোন কোন ইমাম অন্য হাদীসের ভিত্তিতে আযানের শুরুতে দু'বার اللهُ أَكْبَرُ বলে থাকেন। আবার আমাদের গৃহীত পদ্ধতিতে আযানের মধ্যে কোন 'তারজী' নেই। উল্লেখ্য, 'তারজী' হলো: উভয় শাহাদাত দু'বার করে নীচু আওয়াজে বলে পুনরায় দু'বার উঁচু আওয়াজে বলা।

এর বিপরীতে কোন কোন ইমাম হযরত আবু মাহজুরা রা. থেকে

বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আযানের মধ্যে 'তারজী' করে থাকেন। কিন্তু আমাদের গৃহীত পদ্ধতিই উত্তম। কারণ উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা আযা-নের সূচনা হয়েছে। আর এতে যেমন 'তারজী' নেই, তেমন আযানের শুরুতে أَكْبَرُ الله দু'বারও বর্ণিত নেই। এ ব্যাপারে ইবনুল জাওযী 'আত তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ' কিতাবে বর্ণনা করেন যে, وَهٰذَا الحَدِيث أصل التأذين و لَيْسَ فِيهِ تَرْجِيع فَدلَّ عَلَى أَنه الْمُسْتَحبّ و عَلَيْهِ عمل أهل الْمَدِينَة وَالْأَخْذ بالمتأخر من حَال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم এ হাদীসটি আযানের মূল। আর এখানে তারজী' নেই। সুতরাং এ হাদীস এটা প্রমাণ করে যে, 'তারজী' না করা মুস্তাহাব। আর এটা মদীনাবাসীদের আমল এবং এটাকেই রসূলুল্লাহ স.-এর শেষ আমল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। (আত তাহকীক : ৩৫৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

ফজরের আযানে الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ ثنا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আযান দিবে তখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর দু'বার الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা ছুন্নাত। এরপরে اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলবে। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-১৯৮৪)।

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীস বর্ণনান্তে ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর দু'বার الصلاة خير من النوم বলা ছুন্নাত। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৮) এ বিষয়টি উপরিউক্ত হাদীস ছাড়াও আবূ দাউদ-৫০০, ৫০১, ৫০৪, নাসাঈ-৬৩৪, ৬৪৮ ত্বহাবী : ৮৪০-৮৪৪ নং হাদীসসহ (খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৩) অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আযানের সময় ডানে-বামে চেহারা ঘোরানো

عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالاً يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. (رواه مسلم فى بَابِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي–١/١٩٥)

অনুবাদ : হযরত আবু জুহাইফা রা. বলেন, আমি মক্কায় নবী করীম স. এর নিকট এলাম তখন তিনি আবতাহ নামক স্থানে লাল চামড়ার তাবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল রা. তাঁর অযুর পানি নিয়ে বের হলেন অতঃপর কেউ অবশিষ্ট পানি পেলো আর কেউ অন্যের নিকট থেকে পানির ছিটা নিলো। আবু জুহাইফা রা. বলেন, নবী স. লাল চাদর গায়ে দিয়ে বের হলেন আমি যেন এখনো তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি অযু করলেন এবং হযরত বিলাল আযান দিলেন। আমি এদিক-ওদিক চেহারা ফিরায়ে তাঁর অনুসরণ করলাম। বিলাল রা. যথাক্রমে ডানে ও বামে চেহারা ফিরালেন এবং حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ বললেন,। (মুসলিম-১০০২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা, নাসাঈ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৩৭৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলার সময় যথাক্রমে মুখ ডানে এবং বামে ঘুরানো ছুন্নাত। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৭)

আযানের সময় কানে আঙ্গুল দেয়া

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الإِصْبَعِ فِي الأُذُنِ عِنْدَ الأَذَانِ–١/٤٩)

অনুবাদ : হযরত আবু জুহাইফা রা. বলেন, আমি হযরত বিলাল রা.কে আযান দিতে এবং ঘুরতে দেখেছি। তিনি তাঁর তাঁর আঙ্গুলদ্বয় উভয় কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে চেহারা ডানে-বামে ঘুরাচ্ছেন। (তিরমিযী : ১৯৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৩৭৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আযানের সময় কানে আঙ্গুল দেয়া ছুন্নাত। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৮)

আযান ধীরে আর ইকামাত দ্রুত দেয়া

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ، هُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ يَا بِلاَلُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّرَسُّلِ فِي الأَذَانِ– ١/٤٨)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. হযরত বিলাল রা.কে ইরশাদ করলেন: হে বিলাল! তুমি যখন আযান দিবে তখন ধীরে ধীরে দিবে। আর যখন ইকামাত দিবে তখন দ্রুত দিবে। (তিরমিযী : ১৯৫)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। তবে মুসলিম উম্মাহ এ আমলকে আঁকড়ে ধরে আছে বিধায় এ হাদীস আমলের উপযুক্ত।

শিক্ষণীয়: এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আযান ধীর গতিতে আর ইকামাত দ্রুত গতিতে দিতে হবে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৭)

উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ. (رواه ابو داود فى بَابِ الْأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ– ١/٧٧)

অনুবাদ : হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ. বলেন, বনী নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা (সাহাবিয়া) বর্ণনা করেন যে, আমার বাড়ীটি মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী বাড়ীসমূহের মধ্যে সুউচ্চ বাড়ী ছিলো। হযরত বিলাল রা. সেখানে উঠে ফজরের আযান দিতেন। (আবূ দাউদ : ৫১৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান। সীরাতে ইবনে হিশামে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক স্পষ্টভাবে حَدَّثَنِيْ শব্দ উল্লেখ করেছেন। (আবূ দাউদ-৫১৯ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া ছুন্নাত। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৪) বুখারী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, উসমান রা.-এর যামানায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একটি ঘরের ছাদে উঠে আযান দেয়া হতো। (বুখারী : ৮৭০) উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয়ার মূল কারণ হলো আযানের ধ্বনি দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেয়া। বর্তমান যুগে মাইকের সাহায্যে সে কাজ করা হয়ে থাকে। কোথাও যদি মাইকের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আযানের ধ্বনি দূরে পৌঁছে দেয়ার জন্য উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া উত্তম হবে।

অযুর সাথে আযান দেয়া উত্তম; তবে জরুরী নয়

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذى تحت بَابٍ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا–١/٣٨)

অনুবাদ : হযরত আলী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. জুনুবী বা অপবিত্র না হলে সর্বাবস্থায় আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। (তিরমিযী : ১৪৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৩৪৫)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বিবরণ মোতাবেক জানাবাত (গোসল ফরয

হওয়া) ব্যতীত কোন কিছু রসূল স.কে কুরআন তিলাওয়াতে বাধা দিতো না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিনা অযুতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আবূ দাউদ শরীফের ২২৯ নং হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি ইস্তিঞ্জা থেকে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন। অতএব, বিনা অযুতে যখন কুরআন তিলাওয়াত বৈধ তখন আযান দেয়াও বৈধ। বিশিষ্ট দু'জন মুজতাহিদ তাবিঈ হযরত ইবরাহীম নাখাঈ এবং হযরত কতাদা রহ. থেকেও বর্ণিত আছে যে, অযু ব্যতীত আযান দেয়ায় তাঁরা কোন সমস্যা মনে করতেন না। (ইবনে আবি শাইবা-২২০২ ও ২২০৩ এবং ইমাম মুহাম্মাদের রিওয়ায়েতকৃত কিতাবুল আছার-৫৮)

উপরন্তু আযানের শব্দগুলো প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের স্বীকারোক্তি, জিকির ও সাক্ষ্যদান। আর এ জাতীয় ইবাদাতের জন্য পবিত্রতা জরুরী নয়। এমনকি সর্বোত্তম জিকির কুরআন তিলাওয়াতের জন্য যখন অযু শর্ত নয় তখন আযানের বাক্য উচ্চারণে অযু জরুরী হতে পারে না। তবে অযু অবস্থায় আযান দেয়া উত্তম। (হিদায়া : ১/৯০) ইমাম তিরমিযী রহ. 'বিনা অযুতে আযান দেয়া মাকরূহ' শিরোনামে দুটি হাদীস পেশ করেছেন। অতঃপর তিনি নিজেই উভয়টিকে জঈফ বলেছেন। জঈফ হলেও যেহেতু এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে, তাই বিনা অযুতে আযান দেয়া জায়েয হলেও অনুত্তম হবে।

উল্লেখ্য, অযু ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে হাকীম ইবনে হিঝাম থেকে মুসতাদরাকে হাকেম-৬০৫১ নম্বরে। হাকেম এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. উভয়ে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আরো বর্ণিত আছে হযরত আমর ইবনে হাঝম রা. থেকে মুয়াত্তা মালেক-এর ১ম খণ্ডে ২৬০ পৃষ্ঠায়, মুসতাদরাকে হাকেম-১৪৪৭, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৪০৯, শুআবুল ঈমান-১৯৩৫, মা'রেফাতুস সুনান-৭৬৩ এবং সুনানে দারাকুতনী-৪৩৯ নম্বর হাদীসে। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ বিষয়ে সহীহ সনদে আরো হাদীস বর্ণিত আছে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে আল মু'জামুছ ছগীর লিততবারানী-১১৬২, আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী-১৩২১৭ এবং সুনানে দারাকুতনী-৪৩৭ নম্বরে। আল্লামা হাইসামী রহ. এ হাদীসের বর্ণনা কারীদেরকেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (মাযমাউজ যাওয়ায়েদ-১৫১২ নং হাদীসের আলোচনায়)

আযানের জবাব দেয়া

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ـ (رواه البخارى فى بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي–١/٨٦)

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, তোমরা যখন আযান শোন তখন মুআজ্জিন যা বলে তোমরাও তাই বলো। (বুখারী-৫৮৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সকল কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭০৩৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুআজ্জিন আযানের মধ্যে যে সকল শব্দ বলে থাকে আযানের জবাবেও সে সকল শব্দ বলে জবাব দেয়া ছুন্নাত। অবশ্য মুসলিম শরীফের ৭৩৬ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, মুআজ্জিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলেছেন তার জবাবে তিনি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলেছেন। সুতরাং এ হাদীসে বর্ণিত শব্দ দ্বারাও আযানের জবাব দেয়া যেতে পারে। আবার পূর্ববর্ণিত হাদীস এবং ঐ অর্থে বর্ণিত আবূ দাউদ: ৫২৪ নং হাদীস অনুযায়ী حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর জবাবে উক্ত শব্দ দুটিও ব্যবহার করা যেতে পারে। মুসতাদরাকে হাকেম-২০০৪, আদ-দুআ লিততবারানী-৪৫৮ এবং ইবনুছছুন্নী সংকলিত আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলা কিতাবের-৯৮ নং হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, মুআজ্জিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বললে তার জবাবে তোমরা حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে। এসকল হাদীস থেকে যে দুই প্রকার জবাব প্রমাণিত হয় হানাফী মাযহাবেও সে আমল গ্রহণ করা হয়েছে। (শামী : ১/৩৯৭)

এ হাদীসের আলোকে আরো বলা যেতে পারে যে, মুআজ্জিন যখন الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলবে তখন শ্রোতারাও অনুরূপ বলবে। অবশ্য বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম এ ক্ষেত্রে ভিন্ন জবাবের কথাও বলেছেন। ইমাম নববী রহ. বলেন, قَالَ سَامِعُهُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ অর্থাৎ মুআজ্জিন যখন الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলবে তখন শ্রোতা صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ বলবে। (আল্ মিনহাজ-৪/৮৮, দারু এহইয়াইত তুরাস, বৈরুত থেকে প্রকাশিত) الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ এর জবাবে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ বলাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৯৭)

আযানের পরে দুআ পড়া

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللهمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواه البخارى فى **بَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ–١/٨٦**)

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দুআ বলে **اللهمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ** কিয়ামতের দিন সে আমার শাফাআত লাভের অধিকারী হবে। (বুখারী : ৫৮৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭০২৮)

শিক্ষণীয় : ইমাম ইবনুছ ছিন্নী রহ. তাঁর লিখিত আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলা কিতাবের ৯৫ নম্বরে ইমাম নাসাঈ ও তাঁর উস্তাদ আমর ইবনে মানছূর-এর মাধ্যমে উপরিউক্ত হাদীসটি হুবহু সনদে বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসে **آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ** বাক্যের পরে **وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ** শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের রাবীগণ সকলে নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনেকে **وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ** শব্দটিকে শায তথা অপ্রবল এবং কোন লিপিকার থেকে ভুলক্রমে সংযোজিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। আবার এ হাদীস-টি ইমাম বায়হাকী রহ. তাঁর আস সুনানুছ ছগীর কিতাবের ২২৯ নম্বরেও বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনায় উক্ত দুআর শেষে **إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ** বাক্যটি বৃদ্ধি করা আছে। বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ চারজন সংকলকের মধ্যে আল্লামা আবুল হাইছাম কুশ্‌মীহানী রহ.-এর সংকলনেও বুখারী শরীফের হাদীসে উপরিউক্ত বাক্যটি বৃদ্ধি আছে। কোন কোন ইমাম এটাকেও শায বলেছেন। সুতরাং গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত উপরিউক্ত দুআটি পড়াই উত্তম হবে।

ফায়দা: আযানের মধ্যে রসূল স.-এর পুতপবিত্র মোবারক নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আযানের জবাবে তাঁর প্রতি দুরূদ পড়ার নিয়ম নেই। এ কারণে মুআজ্জিন আযান শেষে আর শ্রোতাগণ আযানের জবাব দেয়া শেষ করে প্রথমে দুরূদ পড়বে অতঃপর আযানের দুআ পাঠ করবে। হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. ইরশাদ করেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ তোমরা মুআজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে তখন যেভাবে তাঁকে বলতে শুনবে সেভাবে বলবে অতঃপর আমার প্রতি দুরূদ পড়বে। (মুসলিম-৭৩৫, মুসনাদে আহমদ-৬৫৬৮) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৯৮)

আযানের পরে মাসজিদ থেকে বের না হওয়া

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. (رواه مسلم فى بَابِ فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها– ٢٣٢/١)

অনুবাদ : হযরত আবু শা'ছা বলেন, আমরা আবু হুরায়রা রা.-এর সাথে মাসজিদে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে মুআজ্জিন আযান দিলেন। তখন এক ব্যক্তি মাসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে লাগলো। হযরত আবু হুরায়রা রা. তার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। সে চলে গেলো। তখন হযরত আবু হুরায়রা রা. বললেন, এ ব্যক্তি আবুল কাসেম স.-এর নাফরমানী করলো। (মুসলিম : ১৩৬৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩৬৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আযানের পরে নামায না পড়ে মাসজিদ থেকে বের হওয়া যাবেনা। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/৫৪) তবে ইবনে মাযা শরীফ-৭৩৪ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একান্ত প্রয়োজনে বা মাসজিদে ফিরে আসার নিয়তে বের হওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া আযানের পরে মাসজিদ থেকে বের হওয়া যাবেনা।

ইকামাতের তরীকা

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ

عَشْرَةَ كَلِمَةً، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ سَوَاءً (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)

অনুবাদ : হযরত আবু মাহজুরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে সতেরো শব্দে ইকামাত শিক্ষা দিয়েছেন। اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ অবশিষ্ট শব্দগুলো বর্ণনাকারী রওহ রহ.-এর বর্ণিত (৮৩০ নম্বর, পৃষ্ঠা-১০১) হাদীসের অনুরূপ যা এই:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০২, হাদীস নং-৮৩১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করে এটাকে সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী : ১৯২) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح بطرقه বিভিন্ন সনদের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ : ২৭২৫২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে। (জামেউল উসূল : ৩৩৫৮) এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় হযরত আবু মাহজুরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে ইকামাতের শব্দগুলো এভাবে দু'বার করে বলার শিক্ষা দিয়েছেন যে, اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (নাসাঈ : ৬৩৪)

এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح بطرقه বিভিন্ন সনদের পারস্পারিক সমর্থনের কারণে হাদীসটি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-১৫৩৭৬ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ

الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ، فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً.

অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা রহ. বলেন, রসূল স.-এর সাহাবাগণ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল্ আনসারী রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি স্বপ্নে দেখেছি কেমন যেন সবুজ চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত এক ব্যক্তি দেয়ালের কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান ও ইকামাতের শব্দগুলো দু-দু'বার উচ্চারণ করলেন এবং আযান ও ইকামাতের মাঝে একটু বসলেন। হযরত বিলাল রা. এ সংবাদ শুনে দাঁড়ালেন এবং আযান ও ইকামাতের শব্দগুলো দু-দু'বার উচ্চারণ করলেন এবং (আযান ও ইকামাতের মাঝে) একটু বসলেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২১৩১ ত্বহ্বী : ৮২৪, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-১৯৭৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইবনে হাযাম এবং ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (আত-তালখীছুল হাবীর-২৯৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা ইকামাতের সেই পদ্ধতিই প্রমাণিত হয় যে পদ্ধতিতে আমরা ইকামাত দিয়ে থাকি। অর্থাৎ الله أَكْبَرُ চারবার, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله দু'বার, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله দু'বার, □□□□□ عَلَى الصَّلَاةِ দু'বার, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ দু'বার, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ দু'বার, الله أَكْبَرُ দু'বার, لَا إِلَهَ إِلَّا الله একবার। পূর্বোক্ত প্রমাণাদি ছাড়াও ইকামাতের শব্দগুলো জোড়ায় জোড়ায় বলার মত পোষণ করেন সাহাবা ও তাবিঈদের অনেকেই। তন্মেধ্যে হযরত বিলাল রা.-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: ১৭৬১, হযরত আলী রা.-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২১৪৯, হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া রা.-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২১৫০, হযরত আবু জুহাইফা- আল মু'জামুল কাবীর লিতত্বারানী: আবু জুহাইফার হাদীস নং-২৪৬, হযরত আবুল আলিয়া-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২১৫২, ইবরাহীম নাখাঈ-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২১৫৩ এবং হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রগণ- ইবনে আবী শাইবা: ২১৫৪।

অতএব, ইকামাতের উক্ত পদ্ধতি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হওয়ার সাথে সাথে উম্মতের মধ্যে ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় আমরা তা অনুসরণ করে থাকি। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৫৫)

যিনি আযান দিবেন তিনিই ইকামাত দিবেন

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ–١/٥٠)

অনুবাদ : হযরত যিয়াদ ইবনে হারিস সুদাঈ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে ফজরের নামাযের আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আমি আযান দিলাম। এরপর হযরত বিলাল রা. ইকামাত দিতে গেলে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: তোমার সুদাঈ ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সে-ই ইকামাত দিবে। (তিরমিযী : ১৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা আবু বকর হাঝেমী রহ. বলেন, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ এ হাদীসটি হাসান। (আল ই'তিবার, অধ্যায় : একজন আযান এবং আরেকজন ইকামাত দেয়া) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি ইবনে মাযা এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৩৬৭)

শিক্ষা : এ হাদীসে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা উত্তম। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৯৬) অবশ্য আযান দাতার মনোকষ্টের কারণ না হলে অন্য কেউ ইকামাত দেয়াও বৈধ আছে। কেননা এটা অধিকারের বিষয়। অতএব, কেউ তার নিজের অধিকার ছেড়ে দিলে শরীঅ-াতে কোন বাঁধা নেই। আর যদি সে নিজের অধিকার না ছাড়ে তাহলে অন্য কারো জন্য ইকামাত দেয়া মাকরূহ হবে।

ইকামাতের সময় ডানে-বামে চেহারা ঘুরানো

আযানের সময় ডানে-বামে চেহারা ঘুরানো সম্পর্কে সহীহ হাদীস পূর্বে পেশ করা হয়েছে। ইকামাতের সময় চেহারা ঘুরানোর কোন হাদীস তালাশ করা সত্ত্বেও আমি পাইনি। তবে আযানের মধ্যে যে কারণে ডানে-বামে

চেহারা ঘুরানো হয় অর্থাৎ ডানে-বামে অবস্থিত মুসল্লীদেরকে আযান-ধ্বনি শুনিয়ে দেয়া। মুসল্লীর সংখ্যা অনেক বেশি হলে সেই একই কারণে ইকামাতের সময়ও ডানে-বামে চেহারা ঘুরানো ভালো হবে; যেন সকলে ইকামাতের আওয়াজ শুনে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৩৮৭)

কাযা নামায আদায়ের জন্য ইকামাত দেয়া

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ بِلاَلٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى. (رواه البخارى فى بَابِ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ–١/٨٣)

অনুবাদ : হযরত আবু কতাদা রা. বলেন, আমরা এক রাতে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সফর করলাম। কাফেলার কেউ কেউ বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি রাতের শেষ প্রহরে আমাদেরকে নিয়ে একটু বিশ্রাম নিতেন তাহলে ভালো হতো। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আমার আমার আশঙ্কা হয় তোমরা নামাযের সময় (ঠিকমতো) উঠতে পারো কী না! হযরত বিলাল রা. বললেন, আমি তোমাদেরকে জাগিয়ে দিবো। সুতরাং সবাই শুয়ে পড়লেন। আর হযরত বিলাল রা. তাঁর হাওদার সাথে হেলান দিয়ে বসলেন। অতঃপর তাঁর দু'চোখ জুড়ে ঘুম এসে গেলো, ফলে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। যখন প্রভাতের সূর্য উঁকি দিল তখন রসূলুল্লাহ স. জাগ্রত হলেন এবং বললেন, হে বিলাল! তোমার কথা গেলো কোথায়? বিলাল রা. বললেন, আর কখনো আমার এত অধিক ঘুম পায়নি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রূহ কবয করে নেন, আবার যখন ইচ্ছা তখন ফিরিয়ে দেন। হে বিলাল! ওঠো এবং নামাযের জন্য আযান দাও। তারপর রসূলুল্লাহ স. অযু করলেন এবং সূর্য

উপরে উঠে উজ্জ্বল হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। (বুখারীঃ ৫৬৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩২৪৭) মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এই বাক্যটি বাড়তি আছে যে, ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح রসূলুল্লাহ স. অযু করলেন এবং হযরত বিলাল রা.কে ইকামাত দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ইকামাত দিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. সকলকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। (মুসলিম : ১৪৩৩)

শিক্ষণীয় : বুখারী শরীফের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাযা নামায আদায়ের জন্য আযান দেয়া হয়। আর মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাযা নামায আদায় করতে ইকামাত দেয়াও প্রয়োজন। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৯০) অবশ্য এ ঘটনা যেহেতু সফরের তাই সফরের ক্ষেত্রে এটা পূর্ণ প্রযোজ্য হবে। আর নিজ বাড়ি বা মহল্লায় এমন ঘটনা ঘটলে মহল্লার আযান-ইকামাত তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ২৩০১)

জামাতের পরে মাসজিদে নামায পড়লে ইকামাত লাগবে না

حَدَّثَنَا جَرِيرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْت مَعَ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدَ مُحَارِبٍ، فَأَمَّنِي وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, আমি ইবরাহীম নাখাঈ'র সাথে মুহারিবের মাসজিদে গেলাম। তিনি ইমাম হয়ে আমাকে নামায পড়ালেন তবে আযান-ইকামাত কিছুই দিলেন না। (ইবনে আবী শাইবা-২৩১৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী -মুসলিমের রাবী।

শিক্ষা : বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর আমল থেকে জানা গেলো যে, মাসজিদে জামাত হয়ে যাওয়ার পরে কেউ দ্বিতীয়বার জামাত করলে ইকামাত প্রয়োজন নেই। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন গ্রহণযোগ্য ওজরে জামাত ছুটে গেলে অল্প স্যংখ্যক মানুষ মিলে মাসজিদের বারান্দা বা কোণে ছোট জামাতের অবকাশ থাকলেও এটাকে নিয়মিত করা বা প্রথম জামাতের অনুরূপ করা জামাতের গুরুত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অতএব তা থেকে বেঁচে থাকা দরকার। তবে রাস্তা ষ্টেশন বা বাজারের মাসজিদ হলে ভিন্ন কথা।

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلَّوْا فَذَهَبَ يُقِيمُ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: مَهْ، فَإِنَّا قَدْ أَقَمْنَا

অনুবাদ : হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এমন সময় মাসজিদে এলো যখন কওমের লোকেরা নামায আদায় করে ফেলেছে। অতঃপর সে ইকামাত দিতে চাইলে হযরত উরওয়া রহ. তাকে বললেন, থামো! ইকামাত দিওনা। আমরা ইকামাত দিয়েছি। (ইবনে আবী শাইবা-২৩১৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ يَنْتَهِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ، قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ.

অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন সময় মাসজিদে আসে যখন মাসজিদে নামায হয়ে গিয়েছে তখন সে ব্যক্তি আযান এবং ইকামাত কিছুই দিবে না। (ইবনে আবি শাইবা-২৩১৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত ইবরাহীম নাখাঈর আমল, হযরত উরওয়া এবং হাসান বসরী রহ.-এর ফতওয়া থেকে জানা গেলো যে, মাসজিদে জামাত হয়ে যাওয়ার পরে কেউ মাসজিদে একাকী নামায পড়লে ইকামাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং হযরত উরওয়াহ কর্তৃক জনৈক ব্যক্তিকে ইকামাত দিতে নিষেধ করা থেকে বুঝা যায় যে এটা অনুত্তম তথা মাকরূহে তানঝিহী। আর হানাফী মাযহাব মতে এটাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। (শামী : ১/৩৯৫)

মহল্লায় একা নামায পড়লে মাসজিদের ইকামাত যথেষ্ট

عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

(رواه مسلم فى بَابِ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ ۱/۲۰۲)

অনুবাদ : হযরত আসওয়াদ ও আলকামা রহ. থেকে বর্ণিত, আমারা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ঘরে আসলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, এ সকল লোক কি তোমাদের পেছনে নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না পড়েনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে দাঁড়াও এবং নামায পড়ো। তিনি আমাদেরকে আযান ও ইকামাতের নির্দেশ দিলেন না। (মুসলিম-১০৭২)

এ হাদীসটি মজবুত সনদে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর কিতাবুল আছারেও বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, أَنَّهُ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي بَيْتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَقَالَ: إِقَامَةُ الْإِمَامِ تُجْزِئُ হযরত ইবনে মাসউদ রা. তাঁর সাথীদেরকে তার গৃহে আযান ও ইকামত ছাড়া নামায পড়ালেন এবং বললেন, ইমামের ইকামতই যথেষ্ট। (কিতাবুল আছার-১৩২)

এ বর্ণনা শেষে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমরা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে এ মতকে গ্রহন করি। আর যদি জামাতে নামায পড়ে তাহলে আমাদের নিকট অধিক পছন্দনীয় (মুস্তাহাব) হলো আযান ও ইকামত (উভয়টা) বলা। তবে যদি আযান ছেড়ে দিয়ে শুধু ইকামত বলে তাহলেও কোন অসুবিধা নেই।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى قَامَ يُصَلِّي قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইকামাত না দিয়ে ভুলে নামায শুরু করে দেয় তার সম্পর্কে হযরত আইয়ূব সিখতিয়ানী রহ. বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. যখন এমন শহরে থাকতেন যেখানে জামাতে নামায আদায় করা হয় তখন শহরের ইকামাতই তাঁর জন্য যথেষ্ট হতো। (আব্দুর রাজ্জাক : ১৯৬৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারকথা : উপরিউক্ত ইমামগণের অভিমত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মাসজিদে জামাত হয়ে যাওয়ার পরে উক্ত মহল্লায় একা নামায পড়লে ইকামাত দেয়া জরুরী নয় তবে উত্তম। (শামী : ১/৩৯৫)

মুআজ্জিন ইমামকে দেখে ইকামাত দিবেন

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ (رواه مسلم فى بَابِ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ–١/٢٢٠)

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, হযরত বিলাল রা. সূর্য ঢলার পরে আযান দিতেন। আর রসূল স. বের হওয়ার পূর্বে ইকামাত দিতেন না। যখন তিনি বের হতেন তখন তাঁকে দেখে ইকামাত দিতেন। (মুসলিম-১২৪৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৩৬৮)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের আগমনই মুআজ্জিনের ইকামাতের সময়। মুআজ্জিন বা মুক্তাদীগণ কেউই ঘড়ি দেখে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে না। বরং ইমামের আগমনের অপেক্ষা করবে। ইমাম সাহেব জামাতের নির্ধারিত সময়ে না এলে তাঁর প্রতিনিধি মুয়াজ্জিন বা অন্য কেউ ইমামের স্থলাভিষিক্ত হবেন। তখন মুসল্লীগণ তাঁর সাথে দাঁড়াবে। তবে ইমামকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, যেন তাঁর বিলম্বের কারণে কোন মানুষ কষ্ট না পায়।

ইমামকে দেখে দাঁড়ানোর নিয়ম হলো ইমাম যদি মুসল্লীদের সামনের দিক থেকে আসেন তাহলে তাঁকে দেখে সকলে একসাথে দাঁড়িয়ে যাবে। আর যদি ইমাম মুসল্লীদের পিছন দিক থেকে আসেন তাহলে তিনি যে কাতার অতিক্রম করতে থাকবেন তারা দাঁড়াতে থাকবে। এভাবে ইমাম তাঁর নির্ধারিত স্থানে আসতে আসতে সকল মুসল্লী দাঁড়িয়ে যাবে। (আলমগিরী: ১/৫৭)

ইকামাত শুরু হলে ইমাম ও মুক্তাদীগণের দাঁড়ানোর সময়

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قامَ فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, মুআজ্জিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বললে তিনি দাঁড়াতেন। আর قد قامت الصلاة বললে তিনি তাকবীর দিতেন। (ইবনে আবী শাইবা-৪১১৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : সাহাবায়ে কিরাম থেকে ইল্‌ম সংগ্রহকারী বিশিষ্ট মুজতাহিদ হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইকামাত শুরু হলে ইমাম ও মুক্তাদীগণ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বললে দাঁড়াবে। এ বিষয়ে আল্লামা শামী রহ. বলেন, يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةُ আমাদের তিন ইমামের মতে মুআজ্জিন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বললে ইমাম এবং মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে যাবে। (শামী : ১/৪৭৯)

উল্লেখ্য, মুসল্লীগণ সকলে কাতার সোজা করে বসা থাকলে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পরে দাঁড়িয়ে নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। আর যদি আগে থেকে কাতার সোজা করে বসা না থাকে তাহলে ইকামাত শুরু হলেই কাতার সোজা করার জন্য দাঁড়াতে পারে যেন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলতে বলতে কাতার সোজা করা হয়ে যায়। তবে বিক্ষিপ্ত মুসল্লীদেরকে ইকামাতের পূর্বে দাঁড় করিয়ে কাতার সোজা করে পুনরায় বসিয়ে দেয়া যেন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলার সময় দাঁড়াতে পারে, এর কোন ভিত্তি হাদীস বা মাযহাবের গ্রহণযোগ্য কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইকামাতের জবাব দেয়া

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رضى الله عنه فِي الْأَذَانِ ـ (رواه ابو داود فى بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ– ١/٧٨)

অনুবাদ : হযরত আবু উমামা রা. অথবা অন্য কোন সাহাবা থেকে বর্ণিত, হযরত বিলাল রা. ইকামাত বলতে বলতে যখন قد قامت الصلاة বললেন, তখন রসূলুল্লাহ স. أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا বললেন,। এছাড়া ইকামাতের অন্যান্য শব্দের জবাবে রসূলুল্লাহ স. হযরত ওমর রা. বর্ণিত আযানের অনুরূপ শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন। (আবূ দাউদ : ৫২৮)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। ইকামাতের জবাব দেয়ার ব্যাপারে বর্ণিত এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে জঈফ। তবে মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে ফাযায়েল সংক্রান্ত বিষয়ে জঈফ হাদীসও (শর্তসাপেক্ষে) দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। (মুকাদ্দামাতুল মিশকাত, পৃষ্ঠা-৭) এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত

দেখুন- শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাকৃত হুকমুল আমালি বিল হাদীসিজ জঈফ কিতাবটিতে। উপরন্তু ইমামগণ কোন হাদীসকে দলীলের জন্য গ্রহণ করাও হাদীস সহীহ হওয়ার একটি পদ্ধতি। আর উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবূ দাউদ রহ. তাঁর সুনানে, ইমাম তবারানী তাঁর আদ্ দুআ' কিতাবে, ইমাম বায়হাকী তাঁর আদ্ দাওয়াতুল কাবীর, সুনানে ছগীর, সুনানুল কুবরা ও মারেফাতুস সুনান কিতাবে, আল্লামা ইবনুছ ছুন্নী তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ কিতাবে এবং ইমাম বাগাবী রহ. তাঁর শরহুছ ছুন্নাহ কিতাবে ইকামাতের জবাব দেয়ার শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন। সুতরাং ইকামাতের জবাব দেয়া উত্তম হওয়ার দলীল হিসেবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, মুআজ্জিন ইকামাতের সময় যে শব্দগুলো উচ্চারণ করে সেগুলো দ্বারা ইকামাতের জবাব দেয়া মুস্তাহাব। আর মুআজ্জিন যখন قد قامت الصلاة বলবেন তখন শ্রোতারা তার জবাবে أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا বলবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৫৭)

অযুবিহীন ইকামাত দেয়া মাকরূহ

ইকামাতের সাথে সাথে যেহেতু নামায শুরু হয়ে যায়, তাই অযুবিহীন ইকামাত দিলে ইমামের সাথে নামাযে শরিক হতে পারবে না। বরং অযু করার জন্য বাইরে যেতে হবে। আবার যদি সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে ইকামাত দেয় তাহলে মুসল্লীদের কাতার ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে। সব মিলিয়ে এটা অনেকগুলো খারাবীর সমন্বয়ক। অতএব, অযুবিহীন ইকামাত দেয়া মাকরূহ। (হিদায়াহ : আযান অধ্যায়)

অধ্যায় ৯ : নামায

নামাযের নিয়ত করা

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য দ্বীনকে অর্থাৎ নিয়তকে একনিষ্ঠ করে ইবাদাত করতে। (ছূরা বাইয়্যিনাত : ৪)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخارى فى بابِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟-١/٢)

অনুবাদ : হযরত ওমর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ আপন নিয়ত অনুপাতেই ফল পাবে। সুতরাং যার হিজরত দুনিয়া লাভের আশায় অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার আশায় হয়, তার হিজরতের ফলাফল তাই হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করবে। (বুখারী : ১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম-৪৭৭৪, আবূ দাউদ-২১৯৮, তিরমিযী-১৬৫৩, ইবনে মাযা-৪২২৭, নাসাঈ-৭৫ এবং জামেউল উসূল-৯১৬৩ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই হতে হবে। আর এরই নাম নিয়ত। নিয়তের প্রয়োজন হয় অভ্যাস থেকে ইবাদতকে ভিন্ন করা এবং একই ধরনের বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য।

জ্ঞতব্য : নিয়্যত মানে কোন কাজের ব্যাপারে মনের দৃঢ় ইচ্ছা। নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করে বলা জরুরী নয়। তবে মনের সংকল্পের বিষয়কে যদি

কেউ বাংলায় হোক বা আরবীতে হোক মুখে উচ্চারণ করে তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এর দ্বারা অন্তরের নিয়তের বিষয়টি আরো পরিপক্ক হয়। তাছাড়া শরীয়াতের কোন দলীল দ্বারা এটি নিষিদ্ধ নয়। তাই কেউ মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করলে তা বিদআত হবে না। (শামী: ১/৪১৫, আলবাহরুর রায়েক ১/২৭৭ ও ২৭৮) এ কারণে হানাফী মাযহাব মতে এটা মুস্তাহাব। (শামী : ১/৪১৫)

উল্লেখ্য, সওয়াব পাওয়ার জন্য যে কোন আমলেই নিয়ত করা শর্ত। তবে আমল সহীহ হওয়ার জন্যও নিয়ত শর্ত কিনা সে বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মতামত ও ব্যাখ্যা রয়েছে। তন্মধ্যে হানাফীদের ব্যাখ্যা হলো: 'ইবাদাতে মাকসুদা' তথা মৌলিক ইবাদাত যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি সহীহ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। আর 'ইবাদাতে গাইরে মাকসুদা' তথা ঐ সব ইবাদাত যা অন্য ইবাদাতের মাধ্যম যেমন-পবিত্রতা। এটা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তবে সওয়াব পাওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। (হিদায়া: ১/২০)

দাঁড়িয়ে নামায পড়া জরুরী

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। (ছূরা বাকারা-২৩৮)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رواه البخارى فى بَابِ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ-١/١٥٠)

অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন রা. বলেন, আমার অর্শ্বরোগ ছিলো। তাই রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করলেন: দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। না পারলে বসে আদায় করবে। তা-ও না পারলে কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে। (বুখারী : ১০৫১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী-৩৭২, আবূ দাউদ-৯৫২ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৩৯৯)

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, নামায দাঁড়িয়ে পড়াই জরুরী। তবে কেউ দাঁড়াতে একান্ত অপারগ হলে

তাকে বসে বা তা-ও না পারলে শুয়ে অথবা ইশারা করে নামায পড়তে হবে। সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেউ বসে নামায পড়লে তার নামায হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৪৪, ৪৪৫)

চেয়ারে নামায পড়া প্রসঙ্গ

বর্তমান সময় সামান্য সামান্য অসুস্থতার কারণে মানুষের মধ্যে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ফরয। একান্ত দাঁড়াতে অক্ষম হলে জমিনে বসে নামায আদায় করবে। হাঁটুতে ব্যথার কারণে পা ভাজ করতে না পারলে আসন গেড়ে বা কিবলার দিকে পা লম্বা করে দিয়েও নামায আদায় করতে পারে। অবশ্য দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম কোন ব্যক্তি যদি কোমর ব্যথার কারণে জমিনে বসতেও না পারে কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তার তাকে এ মর্মে সতর্ক করে যে, জমিনে বসা তার জন্য ক্ষতিকর তাহলে কেবল সে চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে পারে। আর বসতে অক্ষম কোন ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁড়ানোর আমল দাঁড়িয়েই করবে আর সিজদা বা অক্ষমতা বশত রুকু-সিজদা চেয়ারে বসে আদায় করবে। মনে রাখতে হবে, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ফরয। দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্যই কেবল প্রয়োজনীয় ছাড় প্রযোজ্য হবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, গ্রামের মহিলাগণ অজ্ঞতার কারণে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সামান্য অজুহাতেই বসে বসে নামায পড়েন। অথচ এতে তাদের নামায হয় না। আবার শহরের অতি আধুনিক মানসিকত-াসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সামান্য কোমরে ব্যথা বা হাঁটু ব্যথার অজুহাতে অভিজ্ঞ মুফতি বা ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত চেয়ারে বসে নামায পড়ে থাকেন। অথচ তারা চেষ্টা করলে একটু কষ্ট হলেও দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারতেন। গ্রহণযোগ্য ওযর ব্যতীত ফরয বিধান (দাঁড়ানো) পরিত্যাগের কারণে তাদের নামায হচ্ছে না; কিন্তু এ দিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ وَمَنْ

صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا (رواه البخارى فى بَابِ صَلَاةِ القَاعِدِ بِالإِيمَاءِ-١/١٥٠)

অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, যিনি অর্শ্বরোগী ছিলেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বসে নামায আদায়কারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করলেন: যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে সে উত্তম। আর যে বসে নামায আদায় করবে সে দাঁড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে। আর যে শুয়ে নামায আদায় করবে সে বসে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। আবু আব্দুল্লাহ বলেন, আমার মতে এ হাদীসে 'নিদ্রিত' শব্দ দ্বারা 'শোয়া' অবস্থা বুঝানো হয়েছে। (বুখারী: ১০৫০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৩৯৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সক্ষম ব্যক্তির জন্য নফল নামায বসে বসে আদায় করা বৈধ। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ২/৩৬) এ হাদীসে যদিও নফলের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু প্রায় সকল মুহাদ্দিসীনে কিরাম এটাকে নফল নামাযের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নববী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, قَالَ الْعلمَاء : هَذَا فِي صَلَاة النَّفْل مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقيام ، فَأَما الْفَرْض فَلَا يجوز قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة بِالْإِجْمَاع ، فَإِن عجز لم ينقص ثَوَابه হাদীস বিশারদ মনীষীগণ বলেন, দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকতেও নফল নামায বসে আদায় করার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি প্রযোজ্য। তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকতে ফরয নামায বসে পড়া বৈধ নয়। যদি কেউ দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে বসে নামায পড়ে তাহলে তার ছওয়াব কম হবে না। অক্ষমতার কারণে নফল নামায বসে পড়লেও ছওয়াব কম হবে না। (খুলাছাতুল আহকাম, ১০২৯ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়, শামী: ২/৩৭)

দু'পায়ের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা রাখা

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ أَلْزِقْ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى لَقَدْ رَأَيْت فِي هَذَا

الْمَسْجِدِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطُّ.

অনুবাদ : উয়াইনা ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মাসজিদে ছিলাম। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন, এক পায়ের সাথে অপর পা মিলিয়ে দাঁড়াও। আমি এ মাসজিদে আঠারো জন সাহাবাকে দেখেছি, তাঁদের কেউ এমন করতেন না। (ইবনে আবী শাইবা-৭১৩৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (আল কাশেফ-৪৪১১) আর উয়াইনার পিতা আব্দুর রহমানও ثقةٌ নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব : ৪২৬৯)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ হাদীসে বর্ণিত উভয় পা মিলিয়ে রাখার নির্দেশ দ্বারা উদ্দেশ্য একেবারে মিলিয়ে রাখা নয় বরং সামান্য ফাঁকা রাখা। এর প্রমাণ মেলে হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে হাসান সনদে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ দ্বারা যে, মুসল্লী তার জুতো দু'পায়ের মাঝে রাখবে। (আবূ দাউদ : ৬৫৪) এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসল্লী তার দু'পায়ের মাঝে কমপক্ষে এতটুকু ফাঁক রাখবে যাতে এক জোড়া জুতো রাখতে পারে। আর তার পরিমাণ হতে পারে চার থেকে ছয় ইঞ্চি।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: خَالَفَ السُّنَّةَ، لَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ

(رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الصَّفِّ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ– ١/١٠٣)

অনুবাদ : হযরত আবু উবায়দাহ রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে নামায পড়ছে। তিনি বললেন, লোকটি ছুন্নাত পরিপন্থী কাজ করেছে। যদি সে দু'পায়ের উপর পালাক্রমে ভর করে নামায আদায় করতো তাহলে সেটা উত্তম হতো। (নাসাঈ : ৮৯৫, ইবনে আবী শাইবা-৭১৩৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার তাহকীকে শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামা বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান। (ইবনে আবী শাইবা-৭১৩৪)

জ্ঞতব্য : হযরত আবু উবায়দাহ তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে কিছুই শোনেননি মর্মে অনেকে মন্তব্য করে এ হাদীস-টিকে সনদ বিচ্ছিন্ন বলার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু আসলে তা সঠিক নয়। ইমাম তাহাবীর লিখিত 'আল কাশেফ' কিতাবের তাহকীকে ২৫৩৯ নম্বর রাবীর জীবনী আলোচনায় শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামা বিভিন্ন ইমামগণের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে শুনেছেন। আবু উবায়দাহ সূত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিযী রহ.ও হাসান বলেছেন। (তিরমিযী: ৩৬৬) এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখুন শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার তাহকীকসহ আল কাশেফ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১-এ।

সারসংক্ষেপ : পালাক্রমে একেক পায়ে ভর করে নামায আদায় করার পদ্ধতি হলো এক পায়ের উপর একটু ওজন বেশি দিয়ে অপর পা'কে বিশ্রাম দেয়া। আবার অপর পায়ের উপর একটু ওজন বাড়িয়ে দিয়ে পূর্বের পা'কে বিশ্রাম দেয়া। জামাতের কাতারে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে বেশি ফাঁক থাকলে যে কোন এক পায়ের উপর ওজন দিতে গেলে পাশের লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া ব্যতীত এক পায়ের উপর ওজন দেয়া সম্ভব নয়। আর দু'পায়ের মাঝে দূরত্ব কম থাকলে এটা সহজে সম্ভব। দীর্ঘ কিয়াম ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে জিরিয়ে নামায পড়ার প্রয়োজন হয় না। তবে এ হাদীস থেকে মাসআলা বেরিয়ে আসে যে, দু'পায়ের মাঝে এতটুকু দূরত্ব রাখতে হয় যতটুকু দূরত্ব রাখলে অন্যকে ঠেলে সরিয়ে দেয় ব্যতীত পালাক্রমে দু'পায়ের মাঝে জিরিয়ে নামায আদায় করা যায়। আর তার পরিমাণ হতে পারে চার থেকে ছয় ইঞ্চি যা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য এটা কোন আবশ্যকীয় বিধান নয়। সুতরাং মোটা মানুষ বা অসুস্থ্য মানুষের জন্য প্রয়োজন অনুসারে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানোতে কোন সমস্যা নেই। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবে বর্ণিত আছে যে, দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখবে। (শামী : ১/৪৪৪)

উল্লেখ্য, দু'পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক ফাঁক রেখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে বর্ণিত মাসআলার বিপরীতে কোন কোন হাদীসে জামাতের কাতারে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের পরস্পর একজন অপরজনের পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথাও বর্ণিত হয়েছে যা থেকে বাহ্যিকভাবে মুসল্লীর নিজের দু'পায়ের মধ্যের ফাঁক অনেক বেশি হওয়ার কথা বুঝা যায়। যেমন নিম্নে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর হাদীস:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ-١/١٠٠)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা কাতার সোজা করো। কেননা, আমি আমার পেছন দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। (হযরত আনাস রা. বলেন,) আর আমাদের প্রত্যেকে তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতো। (বুখারী : ৬৮৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৩৮৬৪) আর আবূ দাউদ শরীফের ৬৬২ নম্বর সহীহ হাদীসে হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রা.-এর মন্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স. কাতার সোজা করার নির্দেশ দিলে আমি লোকদেরকে দেখেছি নিজের ঘাড় পার্শ্বস্থ ব্যক্তির ঘাড়ের সাথে, হাঁটু পার্শ্বস্থ ব্যক্তির হাঁটুর সাথে এবং পায়ের গিট সাথীর পায়ের গিটের সাথে মিলাচ্ছে। (আবূ দাউদ: ৬৬২)

বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর হাদীস, আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রা.-এর হাদীস এবং এ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের দোহাই দিয়ে বর্তমান কালের কিছু লোকজন নিজের দু'পায়ের মধ্যে অনেক ফাঁকা করে অন্যের পায়ের সাথে লাগিয়ে দেয় এবং এটাকে রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাত বলে প্রচার করে থাকে।

এসব হাদীসের ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য হলো : এ সকল হাদীসের দুটি অংশ রয়েছে। এক. কাতার সোজা করার নির্দেশ। দুই. টাখনুর সাথে টাখনু, হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর আমল। এর মধ্যে কাতার সোজা করার নির্দেশটি মারফূ' তথা রসূল স.এর বাণী। আর মিলিয়ে দাঁড়ানোর অংশটি মাউকুফ তথা সাহাবার আমল যা রসূলুল্লাহ স. দেখেছেন কি না তার কোন প্রমাণ হাদীসে বর্ণিত নেই। সুতরাং টাখনুর সাথে টাখনু, হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোকে রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস হিসেবে প্রচার করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। তবে সাহাবাগণের আমল হিসেবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যার অনুসরণ করা আমাদের জন্য উচিত এবং আমরা করেও থাকি। অবশ্য, তারা মিলানোর বাহ্যিক অর্থ করে থাকে। আর হাদীস বিশারদগণ এর উদ্দিষ্ট অর্থ করে

থাকেন। অর্থাৎ গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ানো এবং কাতারের সবাই এক বরাবর হওয়া, আগে/পিছে না হওয়া। টাখনুর সাথে টাখনু, হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর বাহ্যিক অর্থ যেমন এ হাদীসের উদ্দেশ্য নয়, ঠিক তেমনই তা সম্ভবও নয়। কারণ কাঁধ এবং কদম লাগিয়ে দাঁড়ালে হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগানো অসম্ভব। আবার পায়ের পেছনের অংশ তুলনামূলক সরু হওয়ায় গিটের সাথে গিট লাগিয়ে দাঁড়ালে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পা হুবহু কিবলামুখী রাখাও অসম্ভব। বুখারী শরীফের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, **الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِسَدِّ خَلَلِ الصَّفِّ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أجمعها حَدِيث بن عمر عِنْد أبي دَاوُد وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ**"উক্ত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে কাতার সোজা করা এবং ফাঁকা বন্ধ করে পরস্পর মিলেমিলে দাঁড়ানো। তিনি আরো বলেন, ফাঁকা বন্ধ করে দাঁড়ানোর ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবহ হচ্ছে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর রা.-এর হাদীস। ইবনে খুযাইমা ও হাকেম উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন"।

পূর্ববর্ণিত হযরত আব্দুর রহমান, আবু হুরায়রা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস এবং ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিজের দু'পায়ের মধ্যে অনেক ফাঁকা করে অন্যের পায়ের সাথে লাগিয়ে দেয়া রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাতও নয় আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের সঠিক রূপও নয়; বরং এটা কারো কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা সম্বলিত আমল। আর তা বাস্তবায়নের জন্য হাদীসে উল্লিখিত শব্দের বাহানা ও আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। কেবল নবীর আমলই হুজ্জাত, সাহাবীদের আমল হুজ্জাত বা প্রমাণিক ভিত্তি নয় বলে যারা হরহামেশা দরাজ কণ্ঠে প্রচার করে থাকেন তারা আবার এ মাসআলায় এসে তাদের নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটালেন! এ দ্বৈতনীতি আশ্চর্যজনক নয় কি ? প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম জেদ্দা ফিকহ একাডেডমীর সাবেক প্রধান ড. বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবু যায়দ তাঁর 'লা জাদীদা ফী আহকামিস সালাহ' কিতাবে নামাযে নতুন আবিষ্কৃত কিছু পদ্ধতি চিহ্নিত করেছেন। কাতারে পাশের মুসল্লীর পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর এ নব

আবিস্কৃত পন্থাকেও তিনি এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হায়! আমাদের দেশের সালাফী ভাইরাও যদি এর থেকে শিক্ষা নিতেন তাহলে কতইনা ভাল হতো!

কিবলামুখী হওয়া

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আকাশের দিকে আপনার বারংবার তাকানো আমি লক্ষ্য করি। ফলে আমি আপনাকে এমন একটি কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিবো যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। এখন আপনি আপনার মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন সে দিকেই মুখ ফিরাও। (ছূরা বাকারা-১৪৪)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কিবলা-মুখী হওয়া আবশ্যক। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪২৭)

কিবলামুখী হওয়ার পদ্ধতি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ القِبْلَةُ (رواه البخارى فى بَابِ قَوْلِ اللّٰه تَعَالَى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى–١/٥٧)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. (মক্কা বিজয়ের পরে) যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন তখন প্রত্যেক কোণে দুআ করলেন এবং নামায না পড়ে বেরিয়ে এলেন। অতঃপর কা'বাকে সামনে রেখে দু'রাকাত নামায পড়লেন এবং বললেন, 'এটাই কিবলা'। (বুখারী-৩৮৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-১৫১৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক রসূলুল্লাহ স. কা'বা গৃহকে সামনে রেখে নামায আদায় করেছেন এবং বলেছেন যে, এটাই কা'বা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেউ কা'বার সন্নিকটে নামায আদায় করলে তাকে

হুবহু কা'বার দিকে ফিরতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪২৮)

قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

অনুবাদ : আপনি আপনার মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাকো সে দিকে মুখ ফিরাও। (ছূরা বাকারা-১৪৪)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাসজিদুল হারামের বাইরে তোমরা যেখানেই থাকো মাসজিদুল হারামের দিকে নামায আদায় করবে। এটা দ্বারাই তার কিবলামুখী হওয়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر المخْرَمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدٍ المقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه الترمذى فى باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة–١/٨٠)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে কিবলা। (তিরমিযী-৩৪৪, ইবনে মাযা-১০১১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। অনুরূপ হাদীস হযরত ইবনে ওমর রা. থেকেও আব্দুর রায্যাক-৩৬৩৩, ৩৬৩৬, মুয়াত্তা মালেক এবং ইবনে আবী শাইবাতে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : কা'বা গৃহ এবং মাসজিদুল হারাম থেকে দূরে অবস্থানকারী-দের জন্য কিবলামুখী হওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্ব হলো, কা'বা যে দিকে অবস্থিত সে দিকে ফিরে নামায পড়া। যেমন, আমাদের দেশ থেকে কা'বা পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সুতরাং আমরা পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়লেই ওটা কিবলামুখী হিসেবে গণ্য হবে। যদিও মানচিত্র, কম্পাস বা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নামায হুবহু কা'বা বরাবর হয়নি। ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত ইবনে ওমর রা.-এর বরাতে উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন যে, إِذَا جَعَلْتَ المغرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالمشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ، إِذَا اسْتَقْبَلْتَ القِبْلَةَ যখন তুমি কিবলামুখী হবে

তখন পশ্চিম দিককে তোমার ডানে এবং পূর্ব দিককে তোমার বামে রাখবে এ দুইয়ের মাঝে যা আছে সেটা কিবলা। (এটা মদীনার হিসাব যেখান থেকে কা'বা দক্ষিণে) আমাদের দেশের উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায় যে, কা'বাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে তার ডানে-বামে ৪৫ ডিগ্রি পর্যন্ত কা'বার দিক হিসেবে গণ্য। কেননা কুরআন-হাদীসে পৃথিবীর চারটি দিকের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাহলোঃ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ। আর পৃথিবীর চতুর্পার্শ্বকে ডিগ্রিতে ভাগ করলে প্রতি ভাগে ৯০ ডিগ্রি করে পড়ে। অতএব, কা'বা থেকে দূরে অবস্থানকারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কা'বা বরাবর থেকে ডানে ৪৫ ডিগ্রি এবং বামে ৪৫ ডিগ্রি মোট ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত কা'বার দিক হিসেবে গণ্য করা হবে। এ কারণে নামায আদায়ের সময় খুব খিয়াল রাখতে হবে যে, কোন কারণে কিবলার দিক সামান্য পরিবর্তন হলেও যেন এর চেয়ে বেশি সরে না যায়। যে কোন এক দিকে ৪৫ ডিগ্রির চেয়ে বেশি ঘুরে গেলে সেটাকে কা'বার দিক বলে গণ্য করা হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪২৮) অবশ্য ঘুরে যাওয়ার সাথে সাথে আবার কিবলামুখী হয়ে গেলে নামায ভঙ্গ হবে না। কেননা এ সামান্য বিষয় থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। আর শরীআত এটা থেকে মানুষকে রেহাই দিয়েছে। (ছূরা বাকারা: ২৮৬, ছূরা হজ্ব: ৭৮)

চেষ্টা করেও কিবলার দিক নির্ণয়ে ভুল হলে নামায হয়ে যাবে

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ، قَالَ وَحَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالاَ: يُجْزِئُهُ.

অনুবাদ : হযরত হাজ্জাজ রহ. বলেন, আমি হযরত আতা রহ.-এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যিনি মেঘাচ্ছন্ন দিনে (না বুঝে) কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে নামায আদায় করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, তার নামায হয়ে যাবে। হযরত হাজ্জাজ আরো বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বলেছেন যিনি ইবরাহীম ও শা'বীর নিকট জিজ্ঞেস করেছেন এবং তাঁরা দুজনে বলেছেন যে, তার নামায হয়ে যাবে। (ইবনে আবী শাইবা-৩৪০১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসটির তিনজন রাবীই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর হাজ্জাজ ইবনে আরতাত যদিও তাদলীস করেন; কিন্তু এ হাদীসে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, আমি হযরত আতাকে জিজ্ঞেস

করলাম। সুতরাং তাঁর তাদলীস এ হাদীসের জন্য ক্ষতিকর নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا وَأَعْلَمْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَأَنْزَلَ اللهُ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ)

অনুবাদ : হযরত রবীআহ রা. বলেন, আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আসমান মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় কিবলা নির্ধারণ আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। আমরা নামায পড়ে একটি চিহ্ন রাখলাম। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে, আমরা অন্যদিকে নামায পড়েছি। বিষয়টি আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে পেশ করলাম। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন: "তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহর দিক" (ইবনে মাযা-১০২০)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে এ হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। অবশ্য তিনি এ হাদীসটির কয়েকটি সমর্থক বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন; তবে সেগুলোও জঈফ। মুহাদ্দিসীনে কিরামের নীতিমালা অনুযায়ী জঈফ হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা হাসান লিগায়রিহীর মানে উন্নীত হয়। এ কারণে শায়খ আলবানী এ হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও সমার্থক বর্ণনা উল্লেখ করে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। **(ইরওয়াউল গলীল-২৯১)**

শিক্ষণীয় : উল্লিখিত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কিবলার দিক হারিয়ে চিহ্নিত করতে না পারলে তার দায়িত্ব হবে সঠিক দিক নির্ণয়ের সর্বাত্মক চেষ্টা করা। চেষ্টা সত্ত্বেও সঠিক দিক নির্ণয়ে ব্যর্থ হলে নিজের মনে চিন্তা-ফিকির করবে এবং তা দ্বারা যে দিকে কিবলা সাব্যস্ত হয় সে দিকেই নামায পড়বে। যদি সেটা ভুলও হয় তাহলেও

ঐ ব্যক্তির নামায হয়ে যাবে। কেননা সে ব্যক্তি দিক নির্ণয়ের সকল পদ্ধতি যথাসাধ্য ব্যবহার করেছে। আর আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাধ্যের বাইরে কোন বিধান চাপিয়ে দেননি। (ছূরা বাকারা: ২৮৬)। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৩৩) কিন্তু কোন ধরনের চেষ্টা-গবেষণা ব্যতীত যে কোন দিকে ফিরে নামায পড়ে নিলে সে নামায শুদ্ধ হবে না যদিও সেটা প্রকৃত কিবলা হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৩৫)

তাকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু করা

حدثناهناد و قتيبة ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن نا سفيان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ–١/٥ ورواه ابو داود وإبن ماجة)

অনুবাদ : হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, পবিত্রতা নামাযের চাবি। নামাযের (আহকাম ব্যতীত অন্য কাজকে) হারাম-কারী হলো তাকবীর। আর (সেগুলোকে পুনরায়) হালালকারী হলো সালাম। (তিরমিযী-৩, আবূ দাউদ-৬১, ইবনে মাযা-২৭৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে এ অধ্যা-য়র সর্বাধিক সহীহ এবং উত্তম বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা হলো আল্লাহু আকবার বলা। তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামাযে অবৈধ হওয়া কাজগুলো যেহেতু সালামের দ্বারা পুনরায় হালাল হয় তাই সালামকে হালালকারী বলা হয়।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলার বাণী- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى তাঁর রবের নাম স্মরণ করে নামায আদায় করলো। (ছূরা আলা-১৪, ১৫) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নাম নিয়ে নামায আদায় শুরু করতে হবে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৭৯) রসূলুল্লাহ স. তাঁর জীবনীতে এ আয়াতের আমল দেখিয়েছেন 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার

মাধ্যমে। আর নামাযের শুরুতে দেয়া ঐ তাকবীরটির নাম তাকবীরে তাহরীমা। আল্লাহর নাম নিয়ে নামায শুরু করার উদ্দেশ্য তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করা। আর বড়ত্ব প্রকাশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। 'আল্লাহু আকবার' বলতে গিয়ে শব্দগত এমন ভুল থেকে বেঁচে থাকা জরুরী যা দ্বারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী কথা হয়ে যায়। যেমন, 'আকবার'-এর 'বা' টেনে পড়া। অথবা অর্থগত এমন ভুল থেকে বেঁচে থাকা যা দ্বারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী কথা হয়ে যায়। যেমন, 'আল্লাহ' শব্দের 'হামজা' টেনে পড়া, যার অর্থ: আল্লাহ কি এক? এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের উপর প্রশ্ন তোলা হয়। এটা কোনক্রমে একজন মুসলমানের আচার ও বিশ্বাস হতে পারে না। আর এ যাতীয় ভুল উচ্চারণের মাধ্যমে তাকবীরে তাহরীমা সহীহ হবে না; নামাযও শুরু হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৮০)

তাকবীরে তাহরীমার সময় কানের উপর পর্যন্ত হাত উঠানো

حَدّثَنَا أَبُو الْعبّاسِ بْنُ مُحمّدٍ الدوري الْعَلَاءِ بْن إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْه.

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছি তিনি তাকবীর বলার সময় উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কান বরাবর উঠিয়েছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৮২২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীস বর্ণনান্তে হযরত হাকেম রহ. বলেন, صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ এ হাদীসের সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম ত্বহাবী রহ.ও এ হাদীসের তাহকীকে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ) أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ (كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ) حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فرُوعَ أُذُنَيْهِ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ– ١/١٦٨)

অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তিনি যখন তাকবীর দিতেন তখন উভয় হাত কানের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতেন। (মুসলিম :৭৫২) শাব্দিক কিছু

তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ-৭৪৫, নাসাঈ-৮৮৭, ১০২৭, ১০৫৯, ১০৮৮, মুসনাদে আহমদ-১৫৬০০, ১৫৬০৪, ২০৫৩৬ এবং জামেউল উসূল: ৩৩৯২ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইমাম মুসলিম রহ. بهذا الإسناد বলে যে সনদ বুঝাতে চেয়েছেন তা বন্ধনির মাঝে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা-র সময় উভয় হাত কানের উপর পর্যন্ত উঠাতে হবে। তবে কান পর্যন্ত, কানের লতি পর্যন্ত এবং কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর কথাও অন্যান্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এ সকল হাদীসের সমন্বয়ে এভাবে আমল করে থাকি যে, উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছাবে যেন হাতের অন্যান্য আঙ্গুলের মাথা কানের উপর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর হাতের পাঞ্জা কান বরাবর এবং কব্জি কাঁধ বরাবর থাকে। এ নিয়ম অনুসরণ করলে এ বিষয়ক সবগুলো হাদীসের উপরই একত্রে আমল হয়ে যায়। (ফাতহুল কদীর, শামী : ৪৮২)

জ্ঞতব্য : হাত উঠানো এবং তাকবীর বলা একই সাথে হবে নাকি আগে/পিছে হবে এ বিষয়ে হাদীসের ভাষা স্পষ্ট নয়। তবে অনেক ফুকাহ-ায়ে কিরাম আগে হাত উঠিয়ে পরে তাকবীর বলার কথা বলেছেন। তাঁরা এর কারণ হিসেবে একটি হেকমত তুলে ধরেছেন যে, নামাযের জন্য আল্লাহ তাআলার সামনে ইবনেয়ের সাথে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সামনে আত্মসমর্পন এবং গাইরুল্লাহর বড়ত্বকে অস্বীকার করা হয়। অতঃপর তাকবীরে মাধ্যমে কেবল আল্লাহর বড়ত্ব স্বীকার করা হয়। আর গাইরুল্লাহর বড়ত্ব অস্বীকার করার কাজটি হবে আগে। হিদায়াহ কিতাবে এ বিষয়টিকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (হিদায়াহ, অধ্যায়: ছিফাতুস সলাহ)

নারীগণ তাহরীমার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঁচু করবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ كَالرَّجُلِ؟ قَالَ: لاَ تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا، وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ جِدًّا وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ وَإِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে জুরাইয রহ. বলেন, আমি হযরত আতা ইবনে

আবী রবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, নারীগণ তাকবীরের সময় কি পুরুষের মতো হাত ইশারা করবে? তিনি বললেন, না (পুরুষের মতো করবে না)। অতঃপর তিনি নিজে হাত ইশারা করে দেখালেন, আর দু'হাত খুব নিচু করলেন এবং শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখলেন। অতঃপর বললেন, মহিলাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যা পুরুষের মতো নয়। তবে এটা পরিত্যাগ করলেও সমস্যা নেই। (ইবনে আবী শাইবা-২৪৮৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

উল্লেখ্য, হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এটা মাকতু' হাদীস বা 'আছারে তাবিঈ'। ইবাদাত সংক্রান্ত কোন কথা বা কাজ তাবিঈদের থেকে বর্ণিত হয়ে থাকলে তা সাহাবায়ে কিরামকে করতে দেখে বা তাদের থেকে শুনে করেছেন বলে ধরে নেয়া হয়। আর সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কাজের ভিত্তি হলো রসূলুল্লাহ স.-এর কথা ও কাজ। এ হিসেবে বর্ণনাটি শরীআতের দলীল; যদিও তা অবশ্য পালনীয় নয়। হাদীসের কিতাবের লেখকগণ সকলেই নিজ নিজ কিতাবে প্রয়োজন অনুসারে তাবিঈদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী রহ. 'আমীন' বলার অধ্যায়ে হযরত আতা রহ. থেকেই এ উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, قَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ "হযরত আতা রহ. বলেন, 'আমীন' একটি দুআ। হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. থেকে বর্ণিত এ আমলকে আমরা মহিলাদের জন্য উত্তম মনে করি। আর সহীহ মারফু' হাদীসেও কাঁধ পর্যন্ত হাত উত্তোলনের আমল বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী: ৭০০) সুতরাং হযরত আতা রহ.-এর মন্তব্য দ্বারা হাত উত্তোলনের ব্যাপারে বর্ণিত একাধিক সহীহ হাদীসের মধ্যে কেবল একটি হাদীসকে মহিলাদের জন্য প্রাধান্য দেয়া হলো মাত্র। নতুন কোন বিধান প্রমাণিত হলো না। উপরন্তু এ পদ্ধতির অনুসরণ মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্য অন্যের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার বেশি উপযোগী। সুতরাং পর্দার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য এ আমলটিকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। হানাফী মাযহাবের আমল এভাবে বর্ণিত আছে যে, নারীগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত এতটুকু উঁচু করবে যেন হাতের আঙ্গুলের মাথা কাঁধ বরাবর থাকে। (শামী: ১/৪৮৩)

রফউল ইয়াদাইন একবার করা

তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো ছুন্নাত। এ ব্যাপারে হাদীসে ভিন্ন কোন বিধান নেই এবং উম্মতের মধ্যেও এ নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তবে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী অন্যান্য ক্ষেত্রে হাত উঠানো নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি দুটি আমলই চলে আসছে। আমলগত এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ইমাম তিরমিযী রহ. 'রফউল ইয়াদাইন'-এর পক্ষে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর রা.-এর হাদীস পেশ করে বলেন, সাহাবা ও তাবিঈদের মধ্যে কেউ কেউ (রুকু-সিজদাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে) হাত উঠানোর পক্ষে মতামত দিয়েছেন। আবার 'রফউল ইয়াদাই-ন' না করার পক্ষে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস পেশ করে বলেন, সাহাবা ও তাবিঈদের মধ্যে কেউ কেউ হাত না উঠানোর পক্ষেও মতামত দিয়েছেন।

উল্লিখিত দুটি মতের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হাত না উঠানোর যে আমল গ্রহণ করেছেন, হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কিরাম তদানুযায়ী রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক হাত না উঠানে-ার আমলকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। হাদীসের বিভিন্ন কিতাব থেকে উক্ত আমলের দালীলিক ভিত্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. وَفِي البَابِ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِىْ بَابِ رفع اليدين عند الركوع–٥٩/١)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. (উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের মতো নামায পড়াব না? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে প্রথমবার (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা) ব্যতীত আর কোথাও হাত তুললেন না। এ সম্পর্কে বারা ইবনে আযেব রা. থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে

মাসউদ রা.-এর হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। সাহাবা এবং তাবিঈদের একাধিক আলেম এভাবেই আমলের কথা বলেছেন। এটা সুফিয়ান সাওরী এবং কুফাবাসীদেরও মত (তিরমিযী: ২৫৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এটাকে হাসান বললেও শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صححه غير واحد من الأئمة বহু সংখ্যক ইমাম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ১৮৭৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা আবুল হাসান ইবনুল কত্তান রহ. বলেন, وَذكر التِّرْمِذِيّ عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ: لَا يَصح.وَقَالَ الْآخرُونَ: إِنَّه صَحِيح. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ: إِنَّه حَدِيث صَحِيح "ইমাম তিরমিযী রহ. ইবনুল মুবারকের বরাত দিয়ে বলেন যে, হাদীসটি সহীহ নয়। আর অন্যান্যরা বলেন, এটা সহীহ। যারা সহীহ বলেন তাদের একজন ইমাম দারাকুতনী। তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ"। (আল ওয়াহাম ওয়াল ঈহাম: ১১০৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফের তাহকীকে শায়খ আলবানীও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদে আবু ইয়া'লার তাহকীকে শায়খ হুসাইনও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসনাদে আবু ইয়া'লা: ৫০৪০ নম্বর হাদীসের তাহকীকে) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীস-টি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে আবূ দাউদ: ৭৪৮ ও ৭৪৯, নাসাঈ: ১০২৯ ও ১০৬১, মুসনাদে আহমদ: ৩৬৮১ ও ৪২১১, আব্দুর রাযযাক: ২৫৩৩ ও ২৫৩৪, ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৬ ও ২৪৫৮ এবং আবু ইয়া'লা: ৫০৪০ ও ৫৩০২ নম্বরে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. শুধু নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠাতেন। ইমাম তিরমিযী রহ. আরো উল্লেখ করেন যে, এটা কুফাবাসীদের আমল। আর কুফাবাসীদের আমল হওয়ার অর্থ হলো আশারায়ে মুবাশশারাহ এবং বদরী সাহাবাগণের একাংশ-সহ দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরামের আমল। কারণ তখন কুফা নগরীতে বসবাস করতেন দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরাম। হাদীস ও তারীখের ইমাম আল্লামা আবুল হাসান আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল ইযলী (১৮০-২৬১ হি.) যাকে রিজাল শাস্ত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের সমকক্ষ গণ্য করা হয় তিনি বলেন, نَزَلَ الْكُوفَةَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَابٌ فِيْمَنْ نَزَلَ الْكُوْفَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ) "কুফা নগরীতে তখন বসবাস করতেন এক হাজার পাঁচশত

সাহাবায়ে কিরাম"। (মা'রিফাতুছ ছিকাত, অধ্যায়: কুফা ও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী সাহাবাগণ) হাফেজ আবু বিশর দুলাবী হযরত কাতাদা রহ. থেকে সনদসহ আরো বর্ণনা করেছেন যে, نزل الكوفة ألف وخمسون رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأربعة وعشرون من أهل بدر এক হাজার পঞ্চাশ জন সাহাবী কুফা নগরীর অধিবাসী হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে চব্বিশ জন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। (কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা ১/১৭৪)

সুতরাং সাহাবা, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈনের যুগে কুফায় কোন আমল বিস্তার লাভ করে থাকলে নিশ্চিত বলা যায় যে, এটা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল। কারণ দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের সংশ্রবপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নগরীতে কোন ভিত্তিহীন আমলের উপর সবাই একমত হবেন তা কল্পনাতীত। আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামের দলীল হিসেবে সনদের বিশুদ্ধতার চেয়ে আমলের বিস্তৃতির মান কোনক্রমেই কম নয়।

জ্ঞতব্য : হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় বলে তিরমিযী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর যে মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, নাসাঈ-১০২৯ নং হাদীস দ্বারা তার অবসান ঘটে। কারণ 'রফউল ইয়াদাইন' না করার ব্যাপারে বর্ণিত এ সহীহ হাদীসটি হযরত ইবনুল মুবারক রহ. নিজেই বর্ণনা করেছেন। অতএব, তাঁর নিকট এ হাদীস অজানা থাকার কথা নয়। বরং ইবনে মাসউদ রা.-এর অপর একটি মৌখিক বর্ণনা আছে। হয়তো সে বর্ণনাটির ব্যাপারে ইবনুল মুবারক রহ. উক্ত মন্তব্য করেছেন।

আবূ দাউদ ৭৪৮ নম্বর হাদীসের সাথে ইমাম আবূ দাউদ রহ.-এর একটি মন্তব্য এ মর্মে বর্ণিত আছে যে, هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ "এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ, এটা এ শব্দে সহীহ নয়"। আবূ দাউদ শরীফের মূল পাণ্ডুলিপি তাহকীককারী বিজ্ঞ আলেমগণের মন্তব্য হলো: উক্ত কথাটি ইমাম আবূ দাউদ রহ.-এর নয়। ভারতবর্ষের মুদ্রণেও এ কথাটি লেখা নেই। বিস্তারিত দেখুন বজলুল মাযহুদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠায়। আবূ দাউদ শরীফের তাহকী-কে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, زاد بعد هذا الحديث في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي (ভারতের বিশিষ্ট আহলে হাদীস আলেম) মাওলানা আজীমাবাদী আবূ দাউদ শরীফের যে অনুলিপির ব্যাখ্যা

লিখেছেন সে অনুলিপিতে তিনি এ হাদীসের পরে ইমাম আবু দাউদের উক্ত মন্তব্যটি বৃদ্ধি করেছেন। (আবূ দাউদ-৭৪৮ নং হাদীসের আলোচনায়) উল্লেখ্য, শায়খ শুআইব আরনাউত নিজে আবূ দাউদ শরীফের যে তাহকীক (পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধার) করছেন তাতে তিনি ইমাম আবু দাউদের কথিত মন্তব্যটি বর্ণনা করেননি। আরব বিশ্বের আরেক খ্যাতনামা হাদীস বিশারদ ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বিশারদ শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা (দা.বা.)-এর তাহকীকেও যে সুনানে আবূ দাউদ মুদ্রিত হয়েছে সেখানেও উক্ত বক্তব্যটি কিতাবের মূল পাঠে স্থান পায়নি।

উপরন্তু এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী/ মুসলিমের রাবী হওয়ায় ইমাম আবূ দাউদ রহ. এরূপ মন্তব্য করতে পারেন বলেও মনে হয় না। এসত্ত্বেও এ মন্তব্যটি যদি তারই বলে মেনে নেয়া হয় তা-হলেও এটা দলীলবিহীন মন্তব্য যা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে অনেক মুহাদ্দিস এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম দারাকুতনী, ইবনে হাঝাম, ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ, ইমাম ঝায়লাঈ, ইবনুত তুরকুমানী এবং আবুল হাসান ইবনুল কত্তানসহ অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْبَرَّادُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي؟ قَالَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ.

অনুবাদ : হযরত সালেম রহ. বলেন, আমরা হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা.-এর নিকট গিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ স. যেমন নামায পড়তেন আমি কি তোমাদেরকে অনুরূপ নামায পড়ে দেখাবো না? হযরত সালেম বলেন, অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর দিলেন এবং উভয় হাত উঁচু করলেন। এরপর রুকু করলেন এবং উভয় পাঞ্জা হাঁটুর উপর রাখলেন। আর হাত দুটি বগল থেকে ফাঁকা রাখলেন। হযরত সালেম বলেন, তারপর এমনভাবে দাঁড়ালেন যে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে স্থির হলো। এরপর সিজদা করলেন। (মুসনাদে আহমদ : ২২৩৫৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده

حسن হাদীসটির সনদ হাসান। (মুসনাদে আহমদ: ২২৩৫৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. রসূল স.-এর নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণনা করলেন তাতে নামাযের শুরুতে ছাড়া আর কোথাও হাত উঠানোর বিবরণ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. শুধু নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠাতেন। এরপরে আর উঠাতেন না।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছি যখন তিনি নামায শুরু করেন তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠান। আর যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকু থেকে উঠতেন তখন হাত উঠাতেন না। দুই সিজদার মাঝেও তিনি হাত উঠাতেন না। (মুসনাদে হুমাইদী-৬২৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ। অবশ্য এ হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. থেকে আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। সে সকল বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين আমি রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছি তিনি যখন নামায শুরু করেন তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠান। আর রুকু করার ইচ্ছা করলে এবং রুকু থেকে উঠে হাত উঠাতেন। তবে দুই সিজদার মাঝে তিনি হাত উঠাতেন না। এ বর্ণনার ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণে অনেকে উপরিউক্ত শব্দে হাদীসটিকে শায তথা অপ্রবল বলেছেন। তবে হাসান সুলাইম আসাদের তাহকীকসহ প্রকাশিত মুসনাদে হুমাইদীর মুদ্রণে হাদীস-টি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে অনেক বিশিষ্ট আলেম ও মুহাক্কিক মুসনাদে হুমাইদীর উক্ত শব্দে এ বর্ণনার সমর্থন করেছেন। উপরন্তু এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবনে ওমর রা.-এর নিজের আমল সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি রুকুর পূর্বে হাত উঠাতেন না যা এ হাদীসের

বর্ণনাকে আরো শক্তিশালী করে। সব মিলে এর একটি গ্রহণযোগ্যতা আছে এটাই অনুমিত হয়।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. শুধু নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠাতেন। এরপরে আর উঠাতেন না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ–١/١٠٩)

অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন নামায শুরু করতেন তখন উভয় কানের কাছাকাছি হাত উঠাতেন। এরপরে আর উঠাতেন না। (আবূ দাউদ: ৭৫০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। তবে ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, বার্ধক্যে তাঁর স্মৃতিশক্তির বিকৃতি ঘটেছিলো। এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, **ثُمَّ لَا يَعُودُ** (তাকবীরে তাহরীমার পরে তিনি আর হাত উঠাননি) বাক্যটি হাদীসের অংশ নয়, বরং এটা কারো শিখিয়ে দেয়া। কিন্তু একাধিক কারণে এ অভিযোগ সঠিক নয়।

প্রথম কারণ: ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদের উস্তাদ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা। তাঁর থেকে এ বাক্যটি হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ একাই বর্ণনা করেননি, বরং আরো একাধিক মুহাদ্দিস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যেমন- ঈসা ইবনে আব্দুর রহমান (ইবনে আবী শাইবা : ২৪৫৫, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬২, হাদীস নং-১৩৪৭, জুযউ রফইল ইয়াদাইন লিলবুখারী: ৩৪) ও হাকাম ইবনে উতাইবা (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৫, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬২, হাদীস নং-১৩৪৮, জুযউ রফইল ইয়াদাইন: ৩৪) সুতরাং ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদের একার স্মৃতিশক্তি বিকৃত হলেও সবার স্মৃতিশক্তি তো আর বিকৃত হয়নি।

দ্বিতীয় কারণ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো: তাঁর বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তির বিকৃতি ঘটেছিলো। কিন্তু উক্ত বাক্যটি হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদের বৃদ্ধ বয়সের বর্ণনা নয়। কারণ

ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদের যুবক বয়সের ছাত্রদের মধ্যে বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি অনুরূপ শব্দে বা অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন। যেমন- সুফিয়ান সাওরী (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬২, হাদীস নং-১৩৪৬), শু'বা ইবনে হাজ্জাজ (দারাকুতনী : ১১২৭), ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া (দারাকুতনী: ১১২৯), মুহাম্মাদ ইবনে আবী লাইলা (দারাকুতনী: ১১৩২), হামযা আয যাইয়াত (তবারানী আওসাত: ১৩২৫), শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ (আবূ দাউদ: ৭৫০) ও ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (খিলাফিয়্যাত লিল বায়হাকী)। এ ছাড়াও ইবনে আদী তাঁর 'কামিল' কিতাবে বলেন, **وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ وشَرِيك وَجَمَاعَةٌ مَعَهُمَا عَنْ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالُوا فيه ثم لم يعد** হুশাইম, শারীক ও তাঁদের সাথে একদল মুহাদ্দিস ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ থেকে হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা সবাই **ثُمَّ لم يعد** বাক্যটি বলেছেন। (কামিল: ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদের জীবনী আলোচনায়)

অতএব, মুসলিম শরীফের রাবী ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদের স্মৃতিশক্তির আংশিক দুর্বলতার কারণে বিখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরামের সমর্থিত বর্ণনাকে উপেক্ষা করে হাদীসটিকে জঈফ বলা উসূলে হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

উপরিউক্ত সমর্থন ছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত সহীহ মারফূ' হাদীস, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা., হযরত আলী রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.সহ একদল সাহাবায়ে কিরাম আর সেই সাথে বিশিষ্ট তাবিঈগণের আমল হযরত বারা ইবনে আযেব রা.-এর বর্ণিত এ হাদীসকে আরো শক্তিশালী করে।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهَا فِي شَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ،

অনুবাদ : হযরত আব্বাদ ইবনে যুবায়ের রহ. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ স. যখন নামায শুরু করতেন তখন নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন। অতঃপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আর উঠাতেন না। (ইমাম বায়হাকীর খিলাফিয়্যাতের বরাতে নাসবুর রায়াহ)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই উঁচু মানের মুহাদ্দিস। ইমাম বায়হাকীর উস্তাদ হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী প্রসিদ্ধ হাফেজ এবং মুসতাদরাকের লেখক। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব হাফেজে হাদীস (তারীখুল ইসলাম: ৭/৬১৮) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ছগানী মুসলিমের রাবী। (তাকরীব: ৬৪২০) হাসান ইবনে রবী' বুখারী-মুসলিমের রাবী। (তাকরীব: ১৩৬৭) হাফস ইবনে গিয়াছ বুখারী-মুসলিমের রাবী। (তাকরীব: ১৫৫৯) মুহাম্মাদ ইবনে আবী ইয়াহইয়া ثقة "নির্ভরযোগ্য"। (আল কাশেফ: ৫২১৯) আর হযরত আব্বাদ ইবনে যুবায়ের হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর ছেলে। তিনি ছিলেন মক্কার কাযী এবং বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী। (তাকরীব: ৩৪৬৯)

ফায়দা : হযরত আব্বাদ ইবনে যুবায়ের রহ. তাবিঈ হওয়ায় হাদীসটি মুরসাল। আর নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত মুরসাল হাদীসের পক্ষে কোন সমার্থক হাদীস থাকলে চার ইমামসহ হাদীসের অনেক নীতিনির্ধারক ইমামের নিকট সেটা গ্রহণযোগ্য। (শরহে নুখবা: মুরসাল অধ্যায়) আর এ মুরসাল হাদীসের সমর্থনে পূর্ববর্ণিত মারফূ' হাদীসও রয়েছে। আর নিম্নবর্ণিত আকাবির সাহাবায়ে কিরামের আমলও রয়েছে। সুতরাং এ মুরসাল হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। সাহাবায়ে কিরামের সত্যবাদিতা স্বীকৃত হওয়ায় যখন তাঁদের মুরসাল সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য, তখন অন্য রাবীদের সত্যবাদিতা স্বীকৃত হলে তাদের মুরসাল গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? আর আব্বাদ ইবনে যুবায়ের রহ.-এর ব্যাপারে এ স্বীকৃতি রয়েছে যে, وكان أصدق الناس لهجة তিনি ছিলেন সর্বাধিক সত্যভাষী। (তাহজীবুত তাহজীব: ৩১৩৫) সুতরাং যিনি মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলেন না তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যাপারে কোন কথা বলবেন তা কী করে হতে পারে? উপরন্তু তাহজীবুত তাহজীবে হযরত আব্বাদ রহ.-এর উস্তাদগণের নামের যে তালিকা পেশ করা হয়েছে তাঁরা সকলেই সাহাবা। তিনি সাধারণতঃ তাঁদের থেকেই হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। সুতরাং সর্বাধিক সম্ভাবনাময় কথা এটাই যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর উক্ত আমলটি যার মাধ্যমে শুনেছেন তিনি কোন সাহাবা হবেন। আর হাদীস গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী সাহাবার নাম উল্লেখ না করলেও হাদীস সহীহ।

তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের অন্যান্য জায়গায় হাত উত্তোলন না করার আমল উল্লিখিত মারফু' হাদীস ব্যতীত আরো বহু আকাবির সাহাবা ও তাবিঈ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

রফউল ইয়াদাইন-এর ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَرَأَيْت الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ وَأَبَا إِسْحَاقَ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ.

অনুবাদ : হযরত আসওয়াদ রহ. বলেন, আমি হযরত ওমর রা.-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি নামায শুরু করার সময় ব্যতীত নামাযে আর কোথাও হাত উঠাননি। আব্দুল মালেক বলেন, আমি শা'বী, ইবরাহীম ও আবু ইসহাককে দেখেছি; তাঁদের কেউ নামাযের শুরু ব্যতীত হাত উঠাননি। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৯, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪, হাদীস নং-১৩৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, وَهَذَا رِجَاله ثِقَات "এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (আদ দিরায়াহ: ১৮১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা যাইলাঈ রহ. বলেন, وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ "হাদীসটি সহীহ"। (নাসবুর রায়াহ: সিফাতুস সলাত অধ্যায়, ৩৯ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন। আর বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত ইমাম শা'বী, ইবরাহীম নাখাঈ এবং আবু ইসহাক রহ.ও নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قِطَافٍ النَّهْشَلِيِّ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ.

অনুবাদ : হযরত আছেম ইবনে কুলাইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: হযরত আলী রা. শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন পরবর্তীতে আর উঠাতেন না। আব্দুল মালিক বলেন, আমি হযরত ইমাম শা'বী, ইবরাহীম নাখাঈ এবং আবু ইসহাক রহ.কেও দেখেছি তাঁরা নামাযের শুরুতে ব্যতীত আর হাত উঠাতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৭, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৩, হাদীস নং-১৩৫৩ ও ১৩৫৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, **وَرِجَاله ثِقَات وَهُوَ مَوْقُوف** "এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য আর হাদীসটি মাউকুফ"। (আদ দিরায়াহ : ১৮১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, **وَإِسْنَاد حَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب صَحِيح على شَرط مُسلم.** হাদীসটির সনদ সহীহ। (উমদাতুল কারী-৫/২৭৩) এ ছাড়াও আল্লামা যাইলাঈ এবং ইবনুত তুরকুমানী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতে-ন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يفْتَتِحُ ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নামাযের শুরুতে অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় একবার হাত উঠাতেন এরপর আর উঠাতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৮, আব্দুর রাযযাক: ২৫৩৩ ও ২৫৩৪, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪, হাদীস নং-১৩৬৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী বলেন, وهذا سند صحيح এ সনদটি সহীহ। (আল্ জাওহারুন নাকী, ২/৭৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ

অনুবাদ : হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, আমি ইবনে ওমর রা.কে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত হাত উঠাতে দেখিনি। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৭, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৩, হাদীস নং-১৩৫৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী বলেন, □□□□ □□□ □□□□ এ সনদটি সহীহ। (আল্ জাওহারুন নাকী, ২/৭৪) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন, رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح হাদীসটি ইমাম ত্বহাবী রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। (উমদাতুল কারী-৫/২৭৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন। রফউল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. অন্যতম। অথচ তিনি নিজে নামায পড়েছেন রফউল ইয়াদাইন করা ব্যতীত। হযরত ইবনে ওমর রা.-এর এ আমল দেখে বলা যেতে পারে যে, হয়তো তিনি রফউল ইয়াদাইনের আমলকে রহিত মনে করতেন অথবা কমপক্ষে রফউল ইয়াদাইন না করার আমলকে তুলনামূলক উত্তম মনে করতেন। অন্যথায় তিনি রসূলুল্লাহ স.কে রফউল ইয়াদাইন করে নামায পড়তে দেখে নিজে তা ছেড়ে দিবেন এটা হতে পারে না।

জ্ঞতব্য : বুখারী শরীফের ৭০৩ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে রফউল ইয়াদাইন করে নামায পড়ার আমল বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটির ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা মূলত রসূলুল্লাহ স.-এর আমলের বর্ণনা, ইবনে ওমর রা.-এর নিজের আমল নয়। কারণ এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে তাঁর ছেলে সালেমও বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, বুখারী: ৭০২, ৭০০ ও ৬৯৯। এমনকি এ হাদীসটি বর্ণনা শেষে

ইমাম বুখারী রহ. নিজেও মন্তব্য করেছেন যে, এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা আইয়ূব সূত্রে নাফে’ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল, ইবনে উমারের নয়। এ বর্ণনাটি ইমাম বায়হাকী রহ. তাঁর সুনানে কুবরাতেও সহীহ সনদে পেশ করেছেন। (সুনানুল কুবরা-২৫১০) বুখারী শরীফের ৭০৩ নম্বর হাদীসের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, هَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي رَفَعَهَا سَالِمٌ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَوْقَفَهَا نَافِعٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَفِعْلِهِ وَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ سَالِمٍ وَلَمْ يَلْتَفِتِ النَّاسُ فِيهَا إِلَى نَافِعٍ “এ হাদীসটি ঐ চার হাদীসের একটি যা হযরত সালেম তাঁর পিতা সূত্রে রসূলুল্লাহ স.এর আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর নাফে’ এটাকে ইবনে ওমর রা.-এর নিজের আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার নাফে’ কখনো এটাকে ইবনে ওমর রা.-এর আমল হিসেবে বর্ণনা করেন, কখনো ইবনে ওমর সূত্রে হযরত ওমর রা.-এর আমল হিসেবে বর্ণনা করেন। এ ব্যাপারে সালেমের বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ এটা ইবনে উমারের আমল নয়, বরং রসূলুল্লাহ স.-এর আমল। আর নাফে’র বর্ণনার প্রতি মানুষ ভ্রুক্ষেপ করেনি। (আত তামহীদ: ইমাম যুহরীর ২৪ নম্বর হাদীস-এর আলোচন-ায়)

এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথমে ইমাম বুখারীর মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত নাফে’র বর্ণনায় ভিন্নতা রয়েছে। বারংবার হাত উত্তোলনের আমলকে তিনি কখনো কখনো রসূলুল্লাহ স.-এর আমল হিসেবে বর্ণনা করেন। আবার কখনো কখনো ইবনে উমারের আমল হিসেবে বর্ণনা করেন। আর ইবনে আব্দুল বার রহ.-এর মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, এটা হযরত ইবনে ওমর রা.-এর আমল না হওয়ার বিষয়টিই সঠিক। সুতরাং ইবনে ওমর রা. নিজের নামাযে রফউল ইয়াদাইন করতেন মর্মে বুখারী শরীফে বর্ণিত ৭০৩ নম্বর হাদীসের বর্ণনাটি শায তথা অপ্রবল।

হযরত ইবনে ওমর রা. মৃত্যু পর্যন্ত রফউল ইদাইন করতেন মর্মে ইমাম বায়হাকী রহ. যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সে হাদীসের একজন রাবী হলেন ইসমা ইবনে মুহাম্মাদ। ইমামগণ তাঁকে পরিত্যাক্ত, মিথ্যাবাদী, জঈফসহ বহু মারাত্মক দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। (মীযানুল ই’তিদাল: ৫৬৩১) অপর বর্ণনায় আরো একজন রাবী রয়েছেন যার নাম আব্দুর রহমান

ইবনে কুরাইশ। তিনি হাদীস জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, اتهمه السليماني بوضع الحديث। "আল্লামা সুলাইম-ানী তাকে হাদীস জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন"। (লিসানুল মীযান: ৪৬৬৯) সুতরাং ইবনে ওমর রা. মৃত্যু পর্যন্ত রফউল ইয়াদাইন করতেন– তা প্রমাণিত নয়।

রফউল ইয়াদাইন–এর ব্যাপারে বিশিষ্ট তাবিঈনে কিরামের আমল

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَرَأَيْت الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ وَأَبَا إِسْحَاقَ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ.

অনুবাদ : হযরত আছওয়াদ রহ. বলেন, আমি হযরত ওমর রা.-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি নামায শুরু করার সময় ব্যতীত নামাযে আর কোথাও হাত উঠাননি। আব্দুল মালেক বলেন, আমি শা'বী, ইবরাহীম ও আবু ইসহাককে দেখেছি: তাঁদের কেউ নামাযের শুরু ব্যতীত হাত উঠানি-ন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৯, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪, হাদীস নং-১৩৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা যাইলাঈ রহ. বলেন, وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ "হাদীসটি সহীহ"। (নাসবুর রায়াহ: সিফাতুস সলাত অধ্যায়, ৩৯ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন। আর বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত ইমাম শা'বী, ইবরাহীম নাখাঈ এবং আবু ইসহাক রহ.ও নামাযের শুরুতে শুধু একবার হাত উঠাতেন।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ قَالَ وَكِيعٌ : ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ.

অনুবাদ : হযরত আবু ইসহাক রহ. বলেন, হযরত আলী ইবনে আবী

তালিব এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রগণ শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন। হযরত ওয়াকী' বলেন, তাঁরা এরপরে আর হাত উঠাতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী বলেন, **وهذا ايضا سند صحيح** এ সনদটিও সহীহ। (আল্ জাওহারুন নাকী, ২/৭৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত আলী রা.-এর ছাত্রদের নামের যে তালিকা ইমাম মিজ্জী রহ. 'তাহজীবুল কামাল'-এ পেশ করেছেন তার সংখ্যাই ৩৫৪ জন। এর মধ্যে অনেক সাহাবায়ে কিরামও রয়েছেন। এর উপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রদেরকে হিসেব করা হলে তার পরিমাণ আরো কোথায় গিয়ে পৌঁছবে আল্লাহই ভালো জানেন। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এরা সকলেই কেবল নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন এরপরে আর উঠাতেন না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: كَانَ قَيْسٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا.

অনুবাদ : হযরত ইসমাঈল ইবনে আবী খালিদ বলেন, হযরত কয়েস ইবনে আবী হাযেম রহ. নামাযের শুরুতে প্রথমে হাত উঠাতেন এরপরে আর উঠাতেন না। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত কয়েস ইবনে আবী হাযেম রহ. শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন এরপরে আর উঠাতেন না।

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هُشَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ شَيْءٍ إِذَا كَبَّرَ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা রহ. নামাযের শুরুতে তাকবীর দেয়ার সময় হাত উঠাতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৬৬) এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ শিরোনামের শুরু থেকে বর্ণিত সকল প্রমাণাদির ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠানোর আমল গ্রহণ করা হয়েছে। (শামী : ১/৫০৬)

রুকু-সিজদার সময় হাত উঠানোর ব্যাপারেও বেশ কিছু সহীহ হাদীস বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর উপর আমল করা ছুন্নাতের বাইরে নয় বলে হানাফী মাযহাবের কিছু আলেম মন্তব্য করেছেন। (ফাতহুল কদীর : ১/৩১২) তবে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ সার্বিক অনুসন্ধান শেষে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, নিম্নবর্ণিত কারণে রুকু-সিজদার সময় হাত না উঠানোর আমলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রফউল ইয়াদাইন না করার আমল প্রাধান্য পাওয়ার কিছু কারণ

১। রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর আমল তাঁর বর্ণিত হাদীস মোতাবেক। (ইবনে আবী শাইবা : ২৪৫৮, আব্দুর রাযযাক : ২৫৩৩, ২৫৩৪ ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪, হাদীস নং-১৩৬৩)। পক্ষান্তরে রফউল ইয়াদাইন করার হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর আমল তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে রয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা : ২৪৬৭, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৩, হাদীস নং-১৩৫৭)

২। রফউল ইয়াদাইন না করার আমল বর্ণিত হয়েছে আকাবির ও বর্ষিয়ান সাহাবাদের থেকে। যেমন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (ইবনে আবী শাইবা : ২৪৬৯, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪, হাদীস নং-১৩৬৪), আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (ইবনে আবী শাইবা : ২৪৫৭, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৩, হাদীস নং-১৩৫৩ ও ১৩৫৪), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ইবনে আবী শাইবা: ২৪৫৮, আব্দুর রাযযাক : ২৫৩৩ ও ২৫৩৪ ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৪, হাদীস নং-১৩৬৩) প্রমুখ। পক্ষান্তরে রফউল ইয়াদাইন করার আমল বর্ণিত হয়েছে অল্পবয়স্ক নওজোয়ান সাহাবাদের থেকে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা., আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা., আনাস ইবনে মালেক রা., জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ও হযরত আবু হুরায়রা রা.। (তিরমিযী : ২৫৬ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

৩। রসূলুল্লাহ স. নিজে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা মেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ "ইবনে মাসউদ তোমাদেরকে যা বলে তোমরা সেটা সত্য বলে মেনে নাও"। (তিরমিযী : ৩৬৬৩, ইবনে আবী শাইবা-৩৮২০৪, মুসনাদে আহমদ-২৩২৭৫) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীসের ভিত্তিতে

হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত রফউল ইয়াদাইন না করার আমল মেনে নেয়ার অর্থ রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ মেনে নেয়া। আর সেটা পরিত্যাগ করার অর্থ রসূল স.-এর নির্দেশ উপেক্ষা করা।

৪। হাদীস পরখকারী প্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মন্তব্য: إِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتُلِفَ فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ نَعَمْ "কোন বিষয়ে যদি ইবনে মাসউদ ও ইবনে ওমর রা.-এর মতামত থাকে আর তা পরস্পরবিরোধী হয় তাহলে ইবনে মাসউদের মত গ্রহণ করা তুলনামূলক বেশি উত্তম; ইমাম আহমদ বললেন,: হ্যাঁ, তাই"। (দারাকুতনী : ৫৫৫, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৬৪৮ ও মুসতাদরাকে হাকেম : ৪৮২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)। অতএব, হাদীস পরখকারী ইমামদের মতানুসারে ইবনে মাসউদ রা.-এর মতকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ছিলেন রসূলুল্লাহ স.-এর আমল-আখলাকের হুবহু নমুনা। (বুখারী : ৩৪৯০) অতএব, তাঁর আমলকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বলার বেশি উপযুক্ত। অবশ্য রসূলুল্লাহ স.-এর অনুকরণের ক্ষেত্রে হযরত ইবনে ওমর রা.-এর মর্যাদাও অনেক ঊর্ধ্বে।

৬। ছূরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াত وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ -এর তাফসীরে হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, قَانِتِينَ -এর অর্থ হলো শান্ত থাকা, নড়াচড়া না করা। (তাফসীরে তাবারী : হাদীস নম্বর- ৫৫৩১) আর মুসলিম শরীফের ৮৫২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ "তোমরা নামাযে শান্ত থাক"।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের চাহিদা অনুসারে নামাযে নড়াচড়া করা বা না করা সংক্রান্ত যে কোন বিবাদমান বিষয়ে শান্ত থাকার বিধান প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে। এর ভিত্তিতে আমরা রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কেননা এর দ্বারা নামাযে শান্ত থাকার বিধান বেশি পালিত হয়।

৭। নামাযের আহকামের ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নামাযে হাঁটা-চলা, কথা বলা এবং সালাম-কালামসহ বিভিন্ন বিষয়ের অনুমতি ছিলো ইসলামের শুরুর দিকে। আর নিষেধাজ্ঞা এসেছে শেষ দিকে। অন্য দিকে হযরত ইবনে ওমর রা. রসূলুল্লাহ স.কে রফউল ইয়াদাইন করতে দেখেও তাঁর ইন্তেকালের পরে নিজে রফউল ইয়াদাইন করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রফউল ইয়াদাইন না করার আমলটিই

হয়তো রসূলুল্লাহ স.-এর শেষ আমল ছিলো। তাই আমরা রফউল ইয়াদাইন না করার আমলটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সাথে সাথে ছুন্নাহ সম্মত পন্থায় হাদীসের অনুসরণ হিসাবে কেউ হাত উঠালে সেটাকেও আমরা হাদীসসম্মত মনে করি। অতএব, যারা হাত উত্তোলন করেন তাদের উচিত হবে হাত উত্তোলন না করার আমলকেও স্বীকার করা। কারণ এ আমলও হাদীসসম্মত।

৮। জেনে রাখা উচিত, কোন কাজ করার পক্ষে দলীল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু না করার পক্ষে দলীল থাকা অস্বাভাবিক। এ কারণে 'রফউল ইয়াদাইন' না করার পক্ষের দলীল দৃশ্যতঃ কম। তবে যে সব হাদীসে রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের পূর্ণরূপ তুলে ধরা হয়েছে অথবা রসূলুল্লাহ স. কাউকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন; কিন্তু তিনি 'রফউল ইয়াদাই-ন' করার কথা বলেননি, সে সব হাদীস প্রকৃত পক্ষে 'রফউল ইয়াদাইন' না করার দলীল। কারণ 'রফউল ইয়াদাইন' করণীয় আমল হলে উক্ত বর্ণনাসমূহে অবশ্যই তার উল্লেখ থাকতো। এ হিসেবে 'রফউল ইয়াদাইন' না করার হাদীসের সংখ্যাই বেশি।

তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের তালু কিবলামুখী রাখা

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا مِنْجَابٌ (بن الحارث بن عبد الرحمن التميمى)، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (بن الطفيل العامرى البكائى)، قَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَتَكِيُّ (مُجَّاعَةُ بنُ الزُّبَيْرِ البَصْرِيُّ) حَدَّثَنِي، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَيَّانَ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبَانَ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: «كُنْتُ فِي الْوَفْدِ، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَفَعَ يَدَيْهِ اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الْقِبْلَةَ».

অনুবাদ : হযরত আবান আল্ মুহারিবী রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আগমনকারী এক কাফেলায় ছিলাম। রসূলুল্লাহ স. যখন উভয় হাত কিবলামুখী করে উঠালেন তখন আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছিলাম। (মা'রিফাতুস সাহাবা : ১০৩৩, আবু বকর ইবনে খল্লাদ-৩৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে হাকাম ইবনে হাইয়ান আল্ মুহারেবী এবং আবান আল মুহারেবী উভয়জনই সাহাবা। আবু উবায়দাহ আল আতাকীর নাম মুজ্জাআহ ইবনে ঝুবায়ের। ইবনে

হিব্বান তাঁকে مُسْتَقِيم الحَدِيث 'হাদীস বর্ণনায় সঠিক' বলে মন্তব্য করেছেন। (আছ ছিকাত-১১২৫৫) মুহাম্মাদ ইবনে উসমানকে রিজাল শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা ছালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল্ জাঝারা ثقة নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (তারীখুল ইসলাম, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৩৬) আর আবু আলী রহ.কে ইমাম দারাকুতনী মিসরের সর্বোত্তম আলেম বলেছেন। (তারীখুল ইসলাম, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩৮) সুতরাং হাদীসটি কমপক্ষে হাসান।

হাফেজ আবু নুআইম তাঁর কিতাব 'মা'রিফাতুস সাহাবা'তে হাদীসটি কোন আপত্তি ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নম্বর : ৯৬৪) হাফেজ ইবনে হাজারও হাদীসটি 'আলইসাবা' নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর উপর কোন ধরনের আপত্তি করেননি। (সাহাবা নম্বর : ৩) উপরন্তু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের তালু কিবলামুখী রাখার আমল উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে যা এ হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ وَلْيَسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِهِمَا الْقِبْلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَامَهُ

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, তোমাদের যে কেউ নামায শুরু করলে সে যেন উভয় হাত উত্তোলন করে এবং উভয় হাতের তালু কিবলামুখী রাখে। কেননা আল্লাহ তাআলা তার সামনে আছেন। (আল্ মু'জামুল আওসাত লিততবারানী-৭৮০১)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, فِيهِ: عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. এ হাদীসে উমায়ের ইবনে ইমরান জঈফ রাবী। (মাযমাউজ যাওয়ায়েদ-২৫৮৯) ইমাম বায়হাকী রহ.ও হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। (সুনানুল কুবরা-২৩২০) হাদীসটি জঈফ হওয়া সত্ত্বেও এটা উক্ত আমলের দলীল হতে পারে। কারণ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের তালু কিবলামুখী রাখার আমল মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে। আর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর লিখিত 'আন নুকাত আলা ইবনে সালাহ' ১ম খণ্ডের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. তাঁর লিখিত কিতাব 'আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনে সালাহ, ১ম খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, জঈফ হাদীস যদি

উম্মত গ্রহণ করে নেয় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে সেটা আমলযোগ্য বিবেচিত হবে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের তালু কিবলামুখী রাখা ছুন্নাত। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত। (শামী-১/৪৮২)

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের আঙ্গুল খোলা রাখা

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ: كَانَ «إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ، وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا»

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, তিনটি জিনিস মানুষ ছেড়ে দিয়েছে যা রসূল স. করতেন। যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন করতেন। এ কথা বলে আবু আমের হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আর আঙ্গুলগুলো ছড়ালেন না এবং বন্ধও করলেন না। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে খোলা রাখলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম-৮৫৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী উভয়েই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ. (رواه الترمذى فى بَابِ فِي نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ–١/٥٦)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন নামাযের জন্য তাকবীর বলতেন তখন হাতের আঙ্গুলগুলো (স্বাভাবিক) ফাঁকা রাখতে-ন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আবু হুরায়রা রা.-এর এ হাদীসটি হাসান। (তিরমিযী : ২৩৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। অনুরূপ সনদে হাদীসটি সহীহ ইবনে খুযাই-মা-৪৫৮ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত সনদের তাহকীকে শায়খ শুআইব

আরনাউত রহ. বলেন, **يحيى بن اليمان مع كونه من رجال مسلم: سيء الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات** বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্মৃতিশক্তি খারাপ। তবে এ হাদীসের পক্ষে সমর্থক বর্ণনা রয়েছে। আর অবশিষ্ট রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। সুতরাং সহীহ-জঈফের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীসটি হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. **نَشَرَ أَصَابِعَهُ** অর্থাৎ আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রাখতেন শব্দটিকে ভুল বলেছেন। আর এর পরিবর্তে **رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا** অর্থাৎ হাত লম্বা করে উঠাতেন শব্দটিকে বেশি সহীহ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির সনদকে তিনি জঈফ বলেননি। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৩৮৫) সিহাহ সিত্তার বাইরেও এ হাদীসটি আরো বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে বায্যার-৮৪১৩, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৪৫৮, আস-সুনানুল কুবরা লিলব-ায়হাকী-২৩১৮ নম্বরে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে খোলা রাখতে হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৭৪)

ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা

وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ "مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَامَ هَكَذَا وَأَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى لَازِقًا بِالْكُوعِ

অনুবাদ : হযরত আবু যিয়াদ রা. বলেন, আমি আর যা-ই কিছু ভুলি, তবে এটা ভুলিনি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন এভাবে দাঁড়াতেন। একথা বলে তিনি ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কব্জির সাথে মিলিত গিরা ধরলেন। (আল মাতালিবুল আলিয়া : ৪৬০)

হাদীসটির স্তর : হাসন, মাউকুফ। আবু যিয়াদ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আবু যিয়াদ সাহাবাদের তালিকাভুক্ত। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, **له إدراك** "তিনি রসূলুল্লাহ স. কে পেয়েছেন। (আল ইসাবা : রাবী নম্বর- ৩০০১) এ হাদীসের বেশ কিছু

সমার্থক বর্ণনা উল্লেখ করে মতালিবুল আলিয়ার মুহাক্কিগণ বলেন, **فالحديث بشواهده يرتقي إلى مرتبة "الحسن لغيره** বিভিন্ন হাদীসের সমর্থনে এটা হাসান লিগাইরিহীর স্তরে উন্নিত হয়। (আল মাতালিবুল আলিয়া : ৪/৪৫, ৪৬০ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নামাযে দাঁড়িয়ে ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কব্জি ও তার সাথে মিলিত অংশ ধরতেন। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর আমল অবশ্যই রসূলুল্লাহ স.-এর আমল থেকে গৃহীত। এ হাদীসে ধরার স্থান নির্দিষ্ট হলেও পদ্ধতির বিষয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে গেছে। মুজতাহিদ ইমামগণ এ আমলের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, ডান হাতের কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দুটি দ্বারা বাম হাতের কব্জি শক্ত করে ধরবে। আর অবশিষ্ট তিনটি আঙ্গুল কব্জির উপর রেখে দিবে। এর মাধ্যমে রাখা এবং ধরা উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ شَدَّادٍ الْجُرَيرِي أَبُو طَالُوتَ عَنْ غَزْوَان بْنُ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ فَلاَ يُزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلاَّ أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ.

অনুবাদ : হযরত জারীর যব্বী রহ. থেকে বর্ণিত : হযরত আলী রা. নামাযে দাঁড়ালে ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখতেন। রুকুতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাত এভাবেই রাখতেন। তবে কাপড় ঠিক করতে বা শরীর চুলকানোর জন্য সরাতে হলে ভিন্ন কথা। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৯৬১)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকুফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসটিকে সনদবিহীন এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, **ووضع على رضى الله عنه كفه على رسغه الايسر الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا** "আর হযরত আলী রা. আপন বাম হাতের কব্জির উপর (ডান) হাতের তালু রাখতেন। তবে শরীর চুলকাতে হলে বা কাপড় ঠিক করতে হলে ভিন্ন কথা"। (বুখারী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩০{ই.ফা.}

শিক্ষণীয় : দু'জন বিখ্যাত সাহাবা এবং খলিফায়ে রাশেদের আমল থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযে দাঁড়িয়ে হাত ধরার পদ্ধতি হলো ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কব্জি ও তার সাথে মিলিত অংশ ধরা।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ، قَالَ : قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ.

অনুবাদ : হাজ্জাজ ইবনে হাসসান রহ. বলেন, আমি হযরত আবু মিযলাজ রহ.কে বলতে শুনেছি অথবা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি যে, আমি (হাত রাখার আমল) কীভাবে করবো? তিনি বললেন, ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের পাঞ্জার উপর রেখে নাভির নিচে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৯৬৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে হারুন বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হাজ্জাজ ইবনে হাসসান "সত্যনিষ্ঠ"। (আল কাশেফ : ৯৩২)

হাত ধরার পদ্ধতির ব্যাপারে কয়েকজন বিশিষ্ট ইমামের মন্তব্য

এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবিঈদের পরবর্তী বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম কয়েকজন বিশিষ্ট ইমামের মন্তব্য পেশ করা হচ্ছে।

আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন, মুস্তাহাব হলো ডান হাত বাম হাতের কব্জি এবং তার নিকটবর্তী অংশে রাখবে। (আল মুগনী : 'নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত রাখার স্থান' নামক মাসআলায়)

আল্লামা ইবনে হাযাম বলেন, মুসল্লী নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় তার ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখা মুস্তাহাব। (একটু পরে গিয়ে তিনি বলেন) ইবরাহীম নাখাঈ, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, আমর ইবনে মাইমূন, মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন, আইয়ূব সিখতিয়ানী ও হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে আমাদের নিকট অনুরূপ আমল বর্ণিত হয়েছে । আর এটা আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ এবং দাউদ জাহেরী রহ.-এরও মত। (আল মুহাল্লা : মাসআলা নম্বর- ৪৪৮)

আল্লামা শাওকানী বলেন, এ সংক্রান্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পাঞ্জার উপর পাঞ্জা রাখা শরীআতসম্মত এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ এ মত গ্রহণ করেছেন। (নাইলুল আওতার : বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা অধ্যায়)

আবুল ওয়ালিদ আল বাজী বলেন, হাদীসের ভাষ্য 'ডান হাত বাম জিরা'র উপর রাখবে'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখা। যেহেতু (পূর্ণ) ডান হাত বাম হাতের পাঞ্জার উপর রাখা যায় না। (আল মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা : ২/১৬৪)

অনুরূপ মন্তব্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাহলে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের আমল ও মন্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, নামাযে দাঁড়িয়ে হাত ধরার পদ্ধতি হলো ডান হাতের পঞ্জা দ্বারা বাম হাতের কব্জি ও তার সাথে মিলিত অংশ ধরা। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৮৭)

বর্তমান আমাদের সমাজের চিহ্নিত কিছু মানুষ সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন এবং পূর্ববর্তী মহামনীষীদের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে হাদীসের শব্দের ছত্রছায়ায় উম্মতের মধ্যে নতুন আমল সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা বলে থাকে: ডান হাত বাম হাতের জিরার উপর রাখতে হবে। তারা নিজেদের দাবীর পক্ষে হযরত সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে নিম্নবর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের চেষ্টা করে থাকে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ–١/١٠٢)

অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, নামাযে প্রত্যেকে ডান হাত বাম হাতের জিরার উপর রাখবে। (বুখারী : ৭০৪)

এ হাদীস থেকে তাদের বক্তব্য : উল্লিখিত হাদীসে ডান হাতকে বাম হাতের জিরার উপর রাখতে বলা হয়েছে। আর জিরা' হলো হাতের কনুই থেকে নিচের অংশ। সে হিসেবে ডান হাতকে বাম হাতের পূর্ণ জিরা'র উপর রাখবে।

বিশ্লেষণ : এ হাদীসে জিরা'র উপর হাত রাখতে হবে কথাটি বলা হয়েছে। তবে পূর্ণ জিরা' বা তার অংশবিশেষের উপর রাখতে হবে এমন কোন কথা বলা হয়নি। আর সাধারণভাবে কোন একটি অঙ্গের নাম উল্লেখ করে যেমনিভাবে পূর্ণ অঙ্গ বুঝানো হয়ে থাকে, তেমনিভাবে উক্ত অঙ্গের অংশবিশেষকেও বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলার ইরশাদ : **يجعلون أصابعهم فى اذانهم** "তারা কানের মধ্যে আঙ্গুল দেয়"। (বাকারা : ১৯) এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, কানের পূর্ণ ছিদ্রের মধ্যে পূর্ণ আঙ্গুল কোনক্রমেই দেয়া সম্ভব নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে পূর্ণ বা আংশিক কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই কানে আঙ্গুল দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

উক্ত আয়াতে শব্দের ব্যবহার থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, কোন অঙ্গের কথা উল্লেখ করে তার অংশবিশেষ উদ্দেশ্য নেয়ার প্রচলন কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসে পূর্ণ-অপূর্ণের ব্যাখ্যাবিহীন সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'জিরা' শব্দের দ্বারা যদি 'জিরা'র অংশবিশেষ অর্থাৎ হাতের কব্জি উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে কুরআন-হাদীসের কোন নিয়ম লংঘন হবে না। উপরন্তু, হযরত আলী রা. থেকে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের তালু রাখতেন। আর সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের আমলও পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। এসব কিছুর ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিস হযরত সাহল ইবনে সাআদ রা.-এর উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বাম হাতের পূর্ণ জিরার উপর ডান হাত রাখার আমল করেননি; বরং এটা নবসৃষ্ট পদ্ধতি যা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আর যদি জিরা' শব্দ দ্বারা পূর্ণ জিরা' উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে হাত দ্বারা অবশ্যই পূর্ণ হাত উদ্দেশ্য হবে। আর পূর্ণ ডান হাত বাম হাতের জিরা'র উপর রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাহলে জিরা দ্বারা পূর্ণ জিরা আর হাত দ্বারা আংশিক হাত এটা কোন দলীলের অনুসরণে করা হলো? নাকি উম্মতের পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের দিকনির্দেশনা মান্য করা হলো? বরং হাদীসের শব্দ স্পষ্ট থাকলে তার অনুসরণ করা, অন্যথায় উম্মতের পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের থেকে তার পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। এটাই ভ্রান্তি থেকে মুক্তির সঠিক পথ।

হাত বেঁধে নাভির নিচে রাখা

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর রা. বলেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখতে দেখেছি। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৯৫৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। মুসা বিন উমায়ের ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর মুসা বিন উমাইর **ثقة** "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব : ৭৮৭৪) রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার কারণে হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেকের ভাষ্যমতে এ হাদীসে **تحت السرة** শব্দটি ইবনে আবী শাইবার মূল

পাণ্ডুলিপিতে নেই তাই তারা এ শব্দে হাদীসটিকে শায বলেছেন। কিন্তু আরবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার অনুসন্ধান অনুযায়ী উক্ত শব্দটি মূল পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রমাণ হিসেবে তিনি মূল পাণ্ডুলিপির ফটোকপি কিতাবের শুরুতে ছেপে দিয়েছেন। (শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার তাহকীকসহ ইবনে আবী শাইবার টিকায় বিস্তারিত দেখুন)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে রাখতেন।

নামাযে হাত কোথায় বাঁধতে হবে এ ব্যাপারে হযরত আলী রা. থেকে একটি মারফূ' হাদীস আবু দাউদ শরীফে বিদ্যমান আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِىْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ–١/١١٠)

অনুবাদ : হযরত আলী রা. বলেন, নামাযে নাভির নিচে বাম হাতের পাতার উপর ডান হাতের তালু রাখা ছুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ : ৭৫৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। এ হাদীসের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক নামক রাবী জঈফ আর যিয়াদ ইবনে যায়েদ অপরিচিত হওয়ার কারণে অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাকের বর্ণিত হাদীসকে হাসান বলেছেন। (তিরমিযী: ৭৩৯) উপরন্তু হযরত আলী রা.-এর নিজের আমল নাভির নিচে হাত বাঁধা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনে আবী শাইবা-৩৯৬৬, মুসনাদে আহমাদ-৮৭৫, দারাকুতনী-১১০২ ও ১১০৩, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৩৪০, ২৩৪১ ও ২৩৪২। তন্মধ্যে ইবনে আবী শাইবার হাদীসটি হাসান। সব মিলে হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে একটি সম্মিলিত শক্তি সৃষ্টি হয়। আর দ্বীনদার জঈফ রাবীর বর্ণিত হাদীসের পক্ষে সমর্থক বর্ণনা পাওয়া গেলে সেটাকে হাসান লিগাইরিহী হিসেবে গণ্য করা হয়। (মুকাদ্দামায়ে মিশকাত: তাদরীবুর রাবী)

উল্লেখ্য, আবু দাউদ শরীফের চারটি সংকলন রয়েছে। তন্মধ্যে হিন্দুস্তানী মুদ্রণে আবুল কাসেম লুলুঈর সংকলনের অনুসরণ করা হয়েছে।

আবু দাউদ শরীফের উক্ত সংকলনে এ হাদীসটি নেই। তবে হযরত ইবনে আরাবী, ইবনে দাসা এবং অন্যদের সংকলনে এ হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত আবু দাউদ শরীফের ৭৫৬ নম্বরে হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম মিজ্জী বলেন : **هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وابن داسه وغير واحد عن أبي داود , ولم يذكره أبو القاسم** "এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. থেকে আবু সাঈদ ইবনে আরাবী, ইবনে দাসা এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। তবে আবুল কাসেম এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি"। (তুহফাতুল আশরাফ : হাদীস নম্বর-১০৩১৪)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৯৬০)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু'। রবী' ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর রবী'র ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন: صدوق سيء الحفظ و كان عابدا مجاهدا "তিনি সত্যনিষ্ঠ, আবেদ এবং মুজাহিদ; তবে স্মৃতিশক্তি খারাপ"। (তাকরীব: ২০৭৩)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ.

অনুবাদ : হাজ্জাজ বিন হাসসান রহ. বলেন: আমি হযরত আবু মিজলায রহ.কে বলতে শুনেছি অথবা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি যে, আমি কীভাবে করব? তিনি বললেন: ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের পাঞ্জার উপর রেখে নাভির নিচে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা-৩৯৬৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীদ্বয়ের মধ্যে ইয়াযীদ বিন হারুন বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হাজ্জাজ বিন হাসসান صدوق সত্যনিষ্ঠ। (আল কাশেফ: ৯৩২)

সারসংক্ষেপ : বিশিষ্ট দু'জন তাবিঈ এবং মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত ইবরাহীম নাখাঈ এবং হযরত আবু মিজলায রহ.-এর সিদ্ধান্ত থেকে জানা

গেলো যে, নামাযে হাত রাখতে হবে নাভির নিচে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১৪৮৭)

উল্লেখ্য, নামাযের মধ্যে হাত কোথায় বাঁধতে হবে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম আমল বর্ণিত আছে। নাভি বরাবর, নাভির উপরে ও নাভির নিচে। বুকের ওপরে হাত বাঁধার স্পষ্ট কোন সহীহ হাদীস সিহাহ সিত্তার ভেতরে বা বাইরে কোন কিতাবে নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত আবু দাউদ শরীফের ৭৫৯ নম্বর হাদীসে হযরত তাউস রহ. বুকের উপর হাত বাঁধাকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাহাবার মাধ্যম না থাকায় হাদীসটি মুরসাল। আমরা মুরসাল হাদীসকে (শর্ত সাপেক্ষে) দলীল হিসেবে স্বীকার করি। তবে ইবনে আবী শাইবার ৩৯৫৯ নম্বরে সহীহ সনদে বর্ণিত হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র রা.-এর মারফু' হাদীসের বিপরীত হওয়ায় আমরা তাউস রহ.-এর বর্ণিত উক্ত মুরসাল হাদীসটিকে অপ্রবল মনে করি। কিন্তু আজব ব্যাপার হলো যারা তাউসের মুরসাল হাদীস এর দ্বারা দলীল দেয় তারা মুরসাল হাদীসকে দলীলযোগ্য মনে করে না। সহীহ ইবনে খুযাইমার ৪৭৯ নম্বরে বুকের উপর হাত বাঁধার একটি স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত থাকলেও হাদীসটি জঈফ। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট বিতর্কিত। ইমাম বুখারী রহ. তাঁকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বলেছেন, **ومن قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه** যার ব্যাপারে আমি মুনকারুল হাদীস বলে মন্তব্য করে থাকি তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ নয়। (তাগলীকুত তালীক আলা সহীহিল বুখারী ৫/৩৯৭ আল-মাকতাবুল ইসলামী, বায়রূত) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। (মুসনাদে আহমাদ : ১৮৮৭১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) মুসনাদে আহমাদের ২১৯৬৮ নম্বর হাদীসে হযরত হুলাব রা. থেকে বুকের উপর হাত বাঁধার একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের সনদে কবীসা নামক রাবীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. অপরিচিত মন্তব্য করে হাদীসটির সনদ জঈফ বলেছেন। আর উক্ত হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা পেশ করে বুকের উপর হাত রাখার অংশটিকে জঈফ বলেছেন। তিনি আরো বলেন, **وقول الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، تعنُّت لا وجه له** "শায়খ আলবানী রহ. 'সিফাতুস সলাত' কিতাবে বুকের উপর হাত

বাঁধাকে বহাল ছুন্নাত বলে যে মন্তব্য করেছেন সেটা নিছক একগুঁয়েমী"। (মুসনাদে আহমাদ : ২১৯৬৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

চার ইমামসহ কোন বিজ্ঞ ফকীহ বা মুহাদ্দিস বুকের উপর হাত বাঁধার আমল গ্রহণ করেননি। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন: নামাযে হাত বেঁধে কোথায় রাখতে হবে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদ রহ. থেকে নাভি বরাবর, নাভির উপরে এবং নাভির নিচে এ তিনটি মতই বর্ণিত রয়েছে। (বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ : ৩/৯১) ইমাম আহমাদের মতো জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসও বুকের উপর হাত বাঁধার কোন মত পেশ করেননি।

অবশ্য সতর সংরক্ষণে বেশী কার্যকর হওয়ায় এবং ইজমার সমর্থন থাকায় নারীদেরকে আমরা উক্ত আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকি। শায়খ আব্দুল হাই লাখনোভী রহ. নামাযে মহিলাদের সিনার উপর হাত বাঁধার বিষয়টি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বলে মন্তব্য করেছেন। (আস-সিআয়াহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬) আবার পুরুষ ও মহিলাদের হাত বাঁধার স্থানের ভিন্নতার ব্যাপারে হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর রা.কে রসূল স. ইরশাদ করেছেন যে, يَا وَائِلُ بْنَ حُجْرٍ: إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا হে ওয়ায়েল, তুমি যখন নামায পড়বে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলারা সিনা বরাবর হাত উঠাবে। (আল-মু'জামুল কাবীর লিততবারানী, ওয়ায়েল বিন হুজরের হাদীসের তালিকায়, হাদীস নং-২৮) আল্লামা হাইসামী বলেন, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مَنَاقِبِ وَائِلٍ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ حُجْرٍ، عَنْ عَمَّتِهَا أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ আল্লামা তবারানী মাইমূনা সূত্রে তার ফুফু উম্মে ইয়াহইয়ার থেকে হযরত ওয়ায়েল বিন হুজরের ফযীলত সংক্রান্ত এক দীর্ঘ হাদীসে উক্ত বাণীটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি উম্মে ইয়াহইয়াকে চিনি না। তবে অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। অবশ্য তাবিঈদের যুগের অপরিচিত রাবীকে অনেকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। কারণ ঐ যুগে জঈফ রাবীর পরিমাণ খুবই কম।

ছানা পড়া

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ

اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ (رواه ابو داود فى بَابِ مَنْ رَأَى الِاسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ– ١/١١٣)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ (আবূ দাউদ : ৭৭৬, তিরমিযী-২৪৩, ইবনে মাযা-৮০৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (আবূ দাউদ শরীফ-৭৭৬ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে নাসাঈ-৯০২, তিরমিযী-২৪২ এবং আবূ দাউদ-৭৭৫ নম্বরে।

উক্ত শব্দে ছানা পাঠের আমল আরো বর্ণিত আছে হযরত ওমর ইবনুল খত্তাব রা. থেকে মুসলিম-৭৭৭ নম্বর এবং ত্বহাবী-১১৭৫ ও ১১৭৬ নম্বর হাদীসে, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৫। এ ছাড়া হযরত আনাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম স. তাকবীরে তাহরীমার পরে উক্ত ছানাটি পড়তেন। (আল মু'জামুল আওসাত লিততবারানী-৩০৩৯) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এটাকে উত্তম সনদ বলেছেন। (আদ দিরায়াহ-১৪৮ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসসমূহে উল্লিখিত ছানা পড়া উত্তম হবে। তবে সহীহ হাদীসে আরো বিভিন্ন প্রকার ছানা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে যে কোনটি পড়লেই ছানা পড়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। তুলনামূলক ছোট এবং জনসাধারণের জন্য সহজ হওয়ায় সহীহ হাদীসে বর্ণিত এ ছানাটিকে আমরা বেশি উত্তম মনে করি। উপরন্তু ইমাম তিরমিযী রহ. উক্ত ছানা পাঠকে অধিকাংশ তাবিঈ উলামায়ে কিরামের আমল বলে উল্লেখ করেছেন। (তিরমিযী: ২৪২ নং হাদীসের আলোচনায়) আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৩৮৮)

'ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু' নামক যে দুআটি জায়নামাযের দুআ হিসেবে পড়ার প্রচলন জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে হাদীস-কুরআনে তার কোন নির্ভরযে-াগ্য ভিত্তি নেই। বরং রসূলুল্লাহ স. উক্ত দুআটিও মাঝে মধ্যে ছানা হিসেবে নামাযে পড়তেন বলে প্রমাণিত। (নাসাঈ-৯০০, ৯০১ ও ৯০২)

অধ্যায় ১০ : কুরআন পাঠ

নামাযে কুরআন পাঠ করা জরুরী

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কুরআন থেকে যা তোমাদের জন্য সহজ হয় তা পাঠ কর। (ছূরা মুযযাম্মিল : ২০)

শিক্ষণীয়ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে কুরআনের যে কোন স্থান থেকে পাঠ করা ফরয। রসূল স.-এর আমল এবং শিক্ষা থেকেও এর সমর্থন মেলে তিনি এক গ্রাম্য বক্তিকে নামায শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, যখন তুমি নামায আদায় করবে তখন ভালোভাবে অযু করে নিবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে এবং কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ হয় তা তিলাওয়াত করবে। (বুখারীঃ ৬২১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৫৭৮)

তিলাওয়াতের পূর্বে নীরবে আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়া

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে নামায পড়েছি, হযরত আবু বকর, ওমর ও উসমান রা.-এর পেছনেও নামায পড়েছি, তাঁরা কেউই بسم الله الرحمن الرحيم উচ্চস্বরে পড়তেন না। (মুসনাদে আহমদঃ ১২৮৪৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসের তাহকীকে বলেন, إسناده صحيح على شرط الشيخين "হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসনাদে আহমদঃ ১২৮৪৫)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. এবং প্রথম তিন খলিফা নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন। হযরত আনাস রা. থেকে বুখারী-মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স., আবু বকর, ওমর এবং উসমান রা.-এর পেছনে তিনি নামায পড়েছেন, তাঁরা সকলেই الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দিয়ে কুরআন পড়া শুরু করতেন। তাঁরা কুরআন পড়ার শুরুতে ও শেষে কোথাও بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উল্লেখ করেননি। (মুসলিম-৭৭৭, বুখারী-৭০৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুয়াত্তা মালেক এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৩৪১৯)

ছূরা নাহলের ৯৮ নং আয়াতে তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর আবূ দাউদ ৩৯৬০ নং হাদীসে হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তেন। আর এ হাদীসে জানা গেলো যে, রসূলুল্লাহ স. এবং প্রথম তিন খলিফা 'আলহামদু' থেকে কিরাত শুরু করতেন। এছাড়া সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. তাকবীরে তাহরীমার পরে একটু সময় নীরব থাকতেন। (আবূ দাউদ: ৭৭৯) এ হাদীসগুলোর সমষ্টি থেকে বুঝা যায় যে, 'আলহামদু'র পূর্বে পঠনীয় 'ছানা', 'আউযুবিল্লাহ' এবং 'বিসমিল্লাহ' নীরবে পড়তে হবে। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীসে এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن وُهَيْبٍ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স., হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ নীরবে পড়তেন। (আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী: ৭৩৯, আল মু'জামুল আওসাত: ৮২৭৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই ثقةٌ নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২৬৩১) আবার পূর্ববর্ণিত বুখারী-মুসলিমের হাদীস দ্বারাও এ হাদীসের মূল বিষয় সমর্থিত।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ خَمْسٌ يُخْفَيْنَ سُبْحَانَكَ

اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ وَالتَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآمِينَ وَاللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, পাঁচটি জিনিস নীরবে বলতে হয় : ছানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন এবং আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ। (আব্দুর রাযযাক : ২৫৯৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : পূর্বোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ নিরবে পড়তে হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৮৯, ৯০)

নামাযে পঠিত কুরআন সহীহ-শুদ্ধ হওয়া জরুরী

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আপনি কুরআন পাঠ করুন তারতীলের সাথে। (ছূরা মুযযাম্মিল: ৪)

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ. (رواه البخارى فى بَابِ مَدِّ القِرَاءَةِ–٢/٧٥٤)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা.কে রসূলুল্লাহ স.-এর কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কিরাত লম্বা ছিলো। এরপর بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়লেন এবং 'বিসমিল্লাহ', 'আর্ রহমান' ও 'আর্ রহীম' পড়ার সময় টেনে পড়লেন। (বুখারী : ৪৬৭৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৯১৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. কুরআনে কারীম টেনে টেনে মদ সহকারে পাঠ করতেন। হযরত উম্মে সালামা রা. থেকেও হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল স.-এর কুরআন ছিলো শব্দে শব্দে সুস্পষ্ট। (তিরমিযী-২৯২৩, নাসাঈ-১০২৫ ও আবূ দাউদ-১৪৬৬) সুতরাং নামাযে কুরআন পাঠ করার সময় খুব খিয়াল রাখা যেন তিলাওয়াত তারতীলের সাথে হয়। মদ, গুন্নাহ, মাখরাজ ঠিক মত

উচ্চারণ হয় এবং তিলাওয়াত সুস্পষ্ট হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত। (শামী-১/৬৩০)

উল্লেখ্য, নামাযে কুরআন পাঠের নির্দেশ, (ছূরা মুয্‌যাম্মিল : ২০) তারতীলের সাথে পড়ার নির্দেশ (ছূরা মুয্‌যাম্মিল : ৪) এবং রসূল স.-এর তিলাওয়াতের বর্ণনা (বুখারী : ৪৬৭৭, তিরমিযী-২৯২৩, নাসাঈ-১০২৫ ও আবূ দাউদ-১৪৬৬) থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে কুরআন পড়া যেমন জরুরী, তেমনই জরুরী তা সহীহ-শুদ্ধ করে পড়া। সুতরাং নামাযে যদি কুরআন পাঠ না করা হয় অথবা পাঠ করতে গিয়ে শব্দগত বা অর্থগত এমন কোন বড় ধরনের ভুল হয়ে যায় যে তাকে আর কুরআন বলা যায় না, তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে। তবে যদি এমন ছোট-খাটো ভুল-ভ্রান্তি হয় যা থেকে বাঁচা কষ্টকর তাহলে নামায নষ্ট হবে না। কেননা এ সামান্য বিষয় থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। আর শরীআত এটা থেকে মানুষকে রেহাই দিয়েছে। (ছূরা বাকারা : ২৮৬, ছূরা হজ্ব : ৭৮) একটি হাসান হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী কুরআন পাঠে অক্ষম এক ব্যক্তিকে রসূল স. এ নির্দেশ দেন যে, তুমি سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، اللهم ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي দুআটি পড়তে থাকবে। (আবূ দাউদ : ৮৩২, নাসাঈ : ৯২৭) অর্থাৎ এ দুআ বা অনুরূপ কোন দুআ’ সাময়িকভাবে পড়তে থাকবে। আর যথা সম্ভব দ্রুত কুরআন পড়া শিখে ফেলবে।

কুরআন পাঠে অক্ষম ব্যক্তির সাময়িক করণীয়

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، قَالَ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي، قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي "، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ»

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত আছে

যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, আমি কুরআনের কিছুই মুখস্থ রাখতে পারি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআনের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি বলবে, **سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ** সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! এটাতো আল্লাহর জন্য; আমার জন্য কী? উত্তরে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন, তুমি বলবে, **اللهمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي** অতঃপর যখন তিনি দাঁড়ালেন তখন হাত দিয়ে এভাবে করলেন। (অর্থাৎ দুআগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করছেন তা বুঝানোর জন্য হাতের আঙ্গুলে গণনা করলেন) অতঃপর রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন, এ ব্যক্তি উত্তম বস্তু দ্বারা তার হাত পূর্ণ করেছে। (আবূ দাউদ : ৮৩২, নাসাঈ : ৯২৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, বিভিন্ন হাদীসের সমর্থনে হাদীসটির সনদ হাসান। (আবূ দাউদ ৮৩২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পড়তে অক্ষম ব্যক্তি নামায পড়া ছেড়ে দিবে না। বরং কুরআন শিক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। যেহেতু নামাযে কুরআন পাঠ করা ফরয। অবশ্য কুরআন শিখতে যতদিন লাগে ততদিন হাদীসে উল্লিখিত দুআ' অর্থাৎ **سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، اللهمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي** বা অনুরূপ কোন দুআ' সাময়িকভাবে পড়তে থাকবে। আর যথা সম্ভব দ্রুত কুরআন পড়া শিখে ফেলবে।

ছূরা ফাতিহা পাঠ করা

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه البخارى فى بَابِ وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا... -١/١٠٤)

অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না। (বুখারী : ৭২০, মুসলিম-৭৬০, ৭৬১ ও ৭৬২, আবূ দাউদ-৮২২, তিরমিযী-২৪৭, নাসাঈ-৯১৩, ইবনে মাযা-৮৩৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আরো অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪২৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে ছূরা ফাতিহা পাঠ

করা জরুরী। এটাই হানাফী মাজহাবের অভিমত। (শামী-১/৪৫৮) ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তিকে অবশ্যই ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ফাতিহা পাঠে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফাতিহা পাঠ না করে তাহলে তার নামায হবে না। তবে নিম্নোক্ত প্রমাণাদির আলোকে মুক্তাদীর বিধান এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ মুক্তাদী ছূরা ফাতিহা পড়বে না।

মুক্তাদী ছূরা ফাতিহা পাঠ না করে নীরবে শুনবে

ইমাম যখন নামাযে কুরআন পাঠ করতে থাকেন তখন মুক্তাদীর কাজ চুপ থাকা, নাকি ইমামের সাথে ছূরা ফাতিহা বা কুরআনের অন্য কোন ছূরা তিলাওয়াত করা। এ বিষয়টি নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে অদ্যাব-ধি আমলের ভিন্নতা চলে আসছে। উভয় আমলের পক্ষেই সাহাবা, তাবিঈন ও উলামায়ে কিরামের অসংখ্য খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ অবস্থান নিয়েছেন। বিবাদমান দুটি বিষয়ের মধ্যে হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কিরাম ইমামের কুরআন পাঠের সময় মুক্তাদীর নীরব থাকার মত গ্রহণ করেছেন। উক্ত মতের দালীলিক ভিত্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রথম দলীল

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। তাহলে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে। (ছূরা আ'রাফ : ২০৪)

তাফসীর : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বলেন, এ আয়াত নামায ও খুৎবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে কাসীর : ২/২৮১) অর্থাৎ খুৎবা চলাকালীন ও নামাযে তিলাওয়াত চলাকালীন চুপ থাকতে হবে এবং শুনতে হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহ. বলেন, أجمع الناس على ان هذه الآية في الصلوة "উম্মত একমত যে, এ আয়াতটি নামাযের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে"। (আল-মুগনী : ১/৪৯০) ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. তাঁর তাফসীরে তাবারীতে ৩৮টি সনদে সে সব সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের মন্তব্য তুলে ধরেছেন যাঁরা বলেন যে, এ আয়াতে ইমামের কুরআন পাঠের সময় মুক্তাদীদেরকে চুপ থাকা এবং কুরআন শুনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তন্মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা রা., আতা ইবনে আবী রবাহ, মুজাহিদ, যাহহাক, ইবরাহীম নাখাঈ, কতাদা, যুহরী, আমের শা'বী, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবায়ের ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. উল্লেখযে-াগ্য। অবশেষে ইবনে জারীর তাবারী রহ. এ ব্যাপারে নিজে এ মন্তব্য করেনঃ এ ব্যাপারে তাঁদের কথা সর্বাধিক সঠিক যাঁরা বলেন যে, ইমাম যখন নামাযে কুরআন পাঠ করবেন তখন তাদেরকে (মুক্তাদী) মনোযোগ দিয়ে শুনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তাফসীরে তাবারী : ছূরা আ'রাফ, ২০৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর)

এ আয়াতে নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে দুটি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এক. মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, দুই. চুপ থাকা। যেসব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন এবং ইমামের তিলাওয়াতের শব্দ মুক্তাদীগণের কান পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে উক্ত আয়াতের দুটি নির্দেশই পালন করা সম্ভব। আর যেসব নামাযে ইমাম নীরবে তিলাওয়াত করেন অথবা ইমামের তিলাওয়াতের শব্দ মুক্তাদীগণের কান পর্যন্ত না পৌঁছে সেখানেও দ্বিতীয় নির্দেশটি পালন করা অর্থাৎ চুপ থাকা সম্ভব। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা অমান্য বা প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ শরীআতে নেই। সুতরাং ইমাম যখন নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করেন, তা সরবে হোক বা নীরবে– সর্বাবস্থায় মুক্তাদীগণের দায়িত্ব হলো নীরব থাকা। ছূরা ফাতিহা বা অন্য কোন ছূরা তিলাওয়াত না করা।

কুরআনের উক্ত স্পষ্ট আয়াতের উপর আমল করতে যদিও কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না, তবুও উক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ সমর্থন করে রসূলুল্লাহ স. যে বিধান জারী করেছেন তা থেকেও আপনাদের খেদমতে কিঞ্চিত তুলে ধরা হলো।

দ্বিতীয় দলীল

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (رَوَاه إِبْنُ مَاجه فِيْ بَابِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا– ١/٦١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, ইমাম বানানো হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। যখন তিনি তাকবীর দেন তোমরাও তাকবীর দিবে। যখন তিনি কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। (ইবনে মাযা : ৮৪৬, মুসলিম : ৭৯০, ইবনে আবী শাইবা : ৩৮২০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম মুসলিম রহ.-এর নিকট তাঁর ছাত্র আবু বকর রহ. জিজ্ঞেস করেন যে, فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক– হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসের এ খণ্ডাংশটি কেমন? ইমাম মুসলিম রহ. বলেন, ওটা আমার নিকট সহীহ"। (মুসলিম : ৭৯০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের কুরআন পাঠের সময় মুক্তাদীর কাজ হলো চুপ থাকা। সুতরাং মুক্তাদী কুরআন পাঠ করবে না। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের প্রায় হুবহু শব্দে আরো একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে ইবনে মাযা: ৮৪৭, নাসাঈ : ৯২৫, এবং মুসলিম-৭৯০ নম্বরে। ইমাম মুসলিম রহ. উক্ত হাদীসটি সহীহ হওয়ার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। আর ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.ও ইমাম মুসলিমের পক্ষ সমর্থন করে বলেন, فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: ..وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ صَحَّحَهَا مُسْلِمٌ وَقَبْلَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ "হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাক"-এর মধ্যে وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا বাড়তি বাক্যটিকে ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ বলেছেন এবং ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা এটি গ্রহণ করেছেন। (মাযমুউল ফাতাওয়া : 'হাদীসের পরিভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু প্রশ্ন' অধ্যায়)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক- হাদীসটি সহীহ"। (ফাতহুল বারী: 'ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য কিরাত আবশ্যক' অধ্যায়) উপরন্তু এ হাদীসের সমর্থন রয়েছে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে পূর্ববর্ণিত হাদীসেও। সব মিলে এর বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

তৃতীয় দলীল

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ قَالَ ثنا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এক রাকাত নামাযও পড়লো অথচ তাতে ছূরা ফাতিহা পড়লো না, সে যেন নামাযই পড়লো না। তবে যদি সে ইমামের ইকতিদা করে নামায আদায় করে তাহলে ভিন্ন কথা। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯, হাদীস নং-১৩০০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। বাহ্‌র ইবনে নাস্‌র এবং ইয়াহইয়া ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। ইমাম মালেকের অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ছাত্রগণ এ হাদীসটিকে হযরত জাবের রা.-এর নিজের মন্তব্য হিসেবে বর্ণনা করায় উল্লেখযোগ্য অনেক ইমাম এটাকে রসূল স.-এর বাণী হিসেবে স্বীকার করতে নারাজ। তবে আল্লামা ইবনুল কত্তান বলেন, وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بعلة لَو كَانَ يحي بن سَلام مُعْتَمدًا ইয়াহইয়া ইবনে সাল্লাম আস্থাভাজন হলে এটা হাদীসের কোন ইল্লত বা সূক্ষ্ম ত্রুটি নয়। (আল ওহম ওয়াল ইহাম: ৩/২৮০, ১০২৭ নং হাদীসের আলোচনায়) আর ইয়াহইয়া ইবনে সাল্লামকে আল্লামা আবু হাতেম صَدُوْقٌ 'সত্যনিষ্ঠ' বলেছেন। (আল্ জারহু ওয়াত তা'দীল) সুতরাং তাঁর আস্থাভাজন হওয়া এবং হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রমাণিত। সব মিলে এ হাদীসটি হাসান স্তরের নিচে নয়।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যার ইমাম আছে তার জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট। (ইবনে আবী শাইবা-৩৮২৩, ইবনে মাযা-৮৫০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. এ হাদীসের সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। তিনি আরো বলেন, হযরত সুফিয়ান সাওরী, শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ, জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ এবং আবুয যুবায়ের রহ. হাদীসটিকে সহীহ সনদে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল কদীর: কিরাত অধ্যায়)

এ হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা. থেকে ইবনে আবী শাইবা-৩৮০০ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত সনদের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা. সাহাবা। তাঁর বিষয়ে ইবনে হাজার রহ. বলেন, له رؤية "তিনি রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছেন"। (আল ইসাবা: হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ-এর জীবনী আলোচ-নায়) তিনি রসূলুল্লাহ স. থেকে কিছুই শোনেননি বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য তাতে এ হাদীসের বিশুদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। কারণ তিনি সাহাবা। আর সাহাবার মুরসাল গ্রহণযোগ্য। বুখারী শরীফে সাহাবাদের অনেক মুরসাল বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। প্রমাণ হিসেবে দেখুন ৩৭০৫, ৩৮২৭, ৩৮২৮ ও ৩৮২৯ নম্বর হাদীস। এ সকল হাদীস মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী রহ. কর্তৃক এগুলোকে সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবাদের মুরসাল ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতেও সহীহ।

তাছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ রা. এর মুরসাল বর্ণনাটি কিতাবুল আছারে (হাদীস নং ৮৬) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. থেকে মুত্তাসি-লরূপে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এর সনদের উপর আপত্তি করলেও তা কোন ওজনদার ও দলীলসমৃদ্ধ আপত্তি নয়।

শিক্ষণীয় : ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্যই কুরআন পাঠ জরুরী মেনে নেয়া হলেও হযরত জাবের ও আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম এ ব্যাপারে মুক্তাদীর প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং ইমামের কুরআন পাঠই মুক্তাদীর কুরআন পাঠ। এরপরেও মুক্তাদীর কুরআন পাঠ করার অর্থ হলো ইমামের প্রতিনিধিত্বকে অমান্য করা এবং ইমামের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা। (নাসাঈ-৯২২)

চতুর্থ দলীল

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ–١٠٨/١)

অনুবাদ : হযরত আবু বাকরা রা. একবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, রসূলুল্লাহ স. তখন রুকুতে ছিলেন। হযরত আবু বাকরা রা. কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকু করলেন। নামাযের

পরে বিষয়টি রসূলুল্লাহ স.কে জানানো হলে তিনি আবু বাকরা রা.কে বললেন, আল্লাহ তাআলা (নামাযের প্রতি) তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে এমনটি আর করো না। (অর্থাৎ আগে কাতারে শামিল হও তারপর রুকু করো)। (বুখারী: ৭৪৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল: ৩৯০৫)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, হযরত আবু বাকরা রা. ইমামের সাথে শরিক হলেন রুকুতে। তিনি ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করতে পারেননি। আবার নামায শেষে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে দুআ দিলেন এবং একটি উপদেশ দিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়ার কোন নির্দেশ দিলেন না। ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করা যদি মুক্তাদীগণের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হতো তাহলে রসূল স. অবশ্যই হযরত আবু বকরা রা.কে উক্ত নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিতেন। এ হাদীসের ভিত্তিতে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. জমহুরদের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন যে, রুকু পেলে রাকাত পাওয়া প্রমাণিত হবে। (ফাতহুল বারী: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৯, উমদাতুল কারী: খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৫৩) হযরত ইবনে ওমর এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. থেকেও বর্ণিত আছে যে, রুকু ছুটে গেলে রাকাত ছুটে যাবে। (মুয়াত্তা মালেক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৩) অর্থাৎ রুকু পেলে রাকাত পাওয়া প্রমাণিত হবে।

পঞ্চম দলীল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ–١/١٠٨)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বললে তোমরা آمين বলবে। কেননা যার آمين বলা ফিরিশতাদের آمين বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী: ৭৪৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল: ৭১২৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স. ইমামের غير المغضوب عليهم পাঠের পরেই মুক্তাদীগণকে 'আমীন' বলার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি ছূরা ফাতিহা পাঠ করা মুক্তাদীগণের দায়িত্ব হতো তাহলে তারা ইমামের غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهم বলার পরে 'আমীন' বলবে কেন? তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলবে। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী ইমামের আমীনের সাথে ফেরেশতারাও আমীন বলেন। আর সে আমীনের সাথে মুক্তাদীদের আমীন মিললেই কেবল ক্ষমা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সকলের পড়ার গতি যেহেতু এক নয়, তাই সকলে ফাতেহা পাঠ করলে একত্রে আমীন বলা এবং ক্ষমা পাওয়াও সম্ভব নয়। আবার ইমামের আমীনের সাথে মিল রাখতে গেলে তাঁর কিরাতের প্রতি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক যা ফাতেহা পাঠরত মুক্তাদীর জন্য অসম্ভব। এ হাদীসের কারণে ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইমামের ছূরা ফাতিহা পাঠের সাথে মুক্তাদীগণ ছূরা ফাতিহা পাঠ করবে না।

মুক্তাদীগণ ছূরা ফাতিহা পাঠ করবে না– এ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের অভিমত

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রা.-এর অভিমত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الأصبهاني، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ.

অনুবাদ : হযরত আলী রা. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করলো সে ছুন্নাত পরিপন্থী কাজ করলো। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৮০২)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকুফ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ব্যতীত অবশিষ্ট সনদ সহীহ হাদীসের শর্তানুযায়ী। আর মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমানকে ইমাম ত্বাহাবী সত্যনিষ্ঠ বলেছেন, আর ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আর ইবনে হিব্বান তাঁকে দৃঢ় বলেছেন। অতঃপর তিনি এ আছারটিসহ আরো কিছু আছার বর্ণনা করার পরে মন্তব্য করেন যে, هذه الأسانيد كلها صحاح এ সনদগুলো সবই সহীহ। (শরহু আবী দাউদ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর অভিমত

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ»

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো: আমি কি ইমামের পেছনে কুরআন পড়বো? উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাকে বললেন,: কুরআনের কারণে নীরব থাকো। নিশ্চয় নামাযের মধ্যে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদনের বিষয় রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে ইমামই তোমার জন্য যথেষ্ট। (আব্দুর রাজ্জাক-২৮০৩, ইবনে আবী শাইবা: ৩৮০১, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬০, হাদীস নং-১৩০৭, আল-মু'জামুল আওসাত-৮০৪৯, আল-মু'জামুল কাবীর-৯৩১১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। আল্লামা হাইসামী বলেন, এ হাদীস-টির রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (মাযমাউজ যাওয়ায়েদ-২৬৪৭) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার: খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর অভিমত

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ فَقَالَ: لَا ـ

অনুবাদ : আবু হামযা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞেস করলাম: ইমাম আমার সামনে থাকা অবস্থায়ও কি আমি কুরআন পাঠ করবে? জবাবে তিনি বললেন,: না। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬০, হাদীস নং-১৩১৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (শরহু আবী দাউদ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর অভিমত

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ ـ

অনুবাদ : হযরত নাফে’ বলেন, ইবনে ওমর রা.কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ কি ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করবে? জবাবে তিনি বলেন, কেউ ইমামের পেছনে নামায পড়লে তার জন্য ইমামের কুরআন পাঠই যথেষ্ঠ। আর একাকী পড়লে কুরআন পাঠ করবে। ইবনে ওমর রা. নিজেও ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করতেন না। (মুয়াত্তা মালেক: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকুফ। এ হাদীসের সনদকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার সোনালী ধারা বলে থাকেন। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **إسناده صحيح** হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ নং হাদীসের আলোচনায়)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর অভিমত

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا، قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، (رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ–١/٢١٥)

অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা.কে ইমামের সাথে কুরআন পাঠের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইমামের সঙ্গে কোথাও কোন কুরআন পাঠ নেই। (মুসলিম : ১১৭৬)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর অভিমত

مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَام (رواه مالك فى مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ–٢٨ ورواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ –)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. বলেন, যে ব্যক্তি এক রাকাত নামাযও পড়লো অথচ তাতে ছূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না। তবে ইমামের পেছনে থাকলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ ইমামের পেছনে থাকা মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়বে না। (মুয়াত্তা মালেক: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৬, তিরমিযী: ৩১৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। সহীহ সনদে অনুরূপ বর্ণনা হযরত আবুদ দারদা রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে নাসাঈ: ৯২৬ নম্বরে।

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের মতামত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদী কুরআন পাঠ করবে না।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট তাবিঈনে কিরামের অভিমত

হযরত আলকামা ইবনে কয়েস রহ.–এর অভিমত

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا.

অনুবাদ : হযরত আলকামা ইবনে কয়েস বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কুরআন পড়ে তার মুখ যদি মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হতো। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬০, হাদীস নং-১৩১১, আব্দুর রাযযাক : ২৮০৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আত-তামহীদ, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫১)

হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ.–এর অভিমত

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: وَدِدْت أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا.

অনুবাদ : হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কুরআন পড়ে আমি চাই তার মুখ মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হোক। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৮১০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আত-তামহীদ, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫১)

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ.–এর অভিমত

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ: لَيْسَ وَرَاءَ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ.

অনুবাদ : হযরত আবু বিশ্‌র রহ. বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের-এর নিকট ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইমামের পেছনে কুরআন পাঠের বিধান নেই। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৮১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (শরহু আবি দাউদঃ খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৩)

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ.-এর অভিমত

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَنْصِتْ لِلإِمَامِ.

অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. বলেন, ইমামের কারণে চুপ থাকো। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৮১৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (শরহু আবি দাউদ : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৩)

অনুরূপ হাদীস হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন রহ. থেকে ইবনে আবী শাইবা : ৩৮১৫ এবং হযরত আবু ওয়ায়েল রহ. থেকে ইবনে আবী শাইবা : ৩৮২২ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত বিশিষ্ট তাবিঈগণের মতামত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদী কুরআন পাঠ করবে না। পূর্ববর্ণিত আয়াত, হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল ও ফতওয়া থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়েছে। আর এসব কিছুর ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্তাদী ছূরা ফাতেহা পাঠ না করে নীরব থাকবে। তার জন্য ইমামের পিছনে থেকে ছূরা ফাতেহা পাঠ করা মাকরূহ। (শামী : ১/৫৪৪)

একটি বিশ্লেষণ

হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ : "যে ব্যক্তি ছূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না"। (বুখারী-৭২০) দ্বারা অনেকে দলীল পেশ করে থাকেন যে, মুক্তাদীকেও ছূরা ফাতিহা পড়তে হবে; অন্যথায় নামায হবে না।

প্রকৃত অর্থে এ হাদীস মুক্তাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সে ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ ও তাঁর উস্তাদের উস্তাদ যে মন্তব্য করেছেন তা আপনাদের খেদমতে নিম্নে পেশ করা হলো।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহ.-এর অভিমত

ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেন যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি ছূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না"

রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীটি একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (তিরমিযী : ৩১২)

ইমাম বুখারীর উস্তাদের উস্তাদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার-এর অভিমত

ইমাম আবূ দাউদ রহ. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করত হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ.-এর অভিমত বর্ণনা করেন যে, لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ "এটা একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য"। (আবূ দাউদ: ৮২২) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ।

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত ইমামদ্বয়ের অভিমতের মূল কথা এই যে, "ছূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না" বিধানটি একাকী নামায আদায়ক-ারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য, আবূ দাউদ শরীফের এ বর্ণনায় ফাতিহার সাথে আরো কিছু পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ বর্ণনা মুসলিম শরীফেও বিদ্যমান রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। পূর্ণ হাদীসটি হলো: "যে ব্যক্তি ছূরা ফাতিহা এবং সাথে আরো কিছু পড়লো না তার নামায হলো না"। এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হাদীসে বর্ণিত বিধানটি মুক্তাদীর জন্য নয়, বরং ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, لَا تَفْعَلُوا لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ। "তোমরা ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করো না। তবে ছূরা ফাতিহা মনে মনে পড়বে"। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী: ২৯২৩, জুযউল কিরাত : ৩৭ ও ১৫৬) এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য; তবে হাদীসটি মুরসাল। নির্ভরযোগ্য রাবীগণ সকলে এ হাদীসটি হযরত আনাস রা.-এর মাধ্যম ব্যতীত আবু কিলাবা রহ. সূত্রে সরাসরি বা আবু কিলাবা মুহাম্মাদ ইবনে আবী আয়েশা তাবিঈর মাধ্যম হয়ে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন। শুধু উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর একাই এ হাদীসটিকে হযরত আনাসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ বর্ণনায় তিনি নিঃসঙ্গ হওয়ায় হাদীসটি শায। ইমাম বায়হাকী রহ. নিজেই তার পরের হাদীসে বলেন, تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَنَسٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ "আনাস রা.-এর মাধ্যম হয়ে বর্ণনার ক্ষেত্রে উবায়দুল্লাহ নিঃসঙ্গ"। আবার এ হাদীসটি সহীহ সনদে ত্বহাবী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনায় لَا تَفْعَلُوا বাক্যের পরে আর কিছু উল্লেখ নেই। অর্থাৎ ছূরা ফাতিহা মনে মনে পড়বে কথাটি ঐ হাদীসে উল্লেখ নেই। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯, হাদীস নং-১৩০২) উক্ত হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। মুরসাল হাদীস যদিও আমাদের নিকট শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সহীহ, মারফু'-মুত্তাসিল হাদীসের বিপরীতে তা অপ্রবল।

কুরআন, সহীহ হাদীস, বিশিষ্ট সাহাবা ও তাবিঈগণের আমল দ্বারা এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীগণ ছূরা ফাতিহা বা অন্য কোন ছূরা পাঠ করবে না। তাই আমরা এর উপর আমল করে থাকি।

ইমামের পেছনে ছূরা ফাতিহা পাঠ করার দলীল হিসেবে আরো যেসব হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে তন্মধ্যে স্পষ্ট কোন সহীহ-মারফু' হাদীস আমাদের নজরে পড়েনি। তবে কিছু হাদীস সহীহ কিন্তু স্পষ্ট নয়। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর হাদীস। আবার কিছু হাদীস স্পষ্ট কিন্তু সহীহ নয়। যেমন বিভিন্ন কিতাবে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (মুদাল্লিস), মাকহুল শামী (মুদাল্লিস) ও নাফে' ইবনে মাহমুদ (মাজহুল) এর মাধ্যমে عن শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস যা কুরআন ও স্পষ্ট মারফু' হাদীসের বিপরীতে কোনক্রমেই দলীল হতে পারে না।

ছূরা ফাতিহা পাঠ শেষে আমীন বলা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخارى فى بَابِ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ–١/١٠٨)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বললে তোমরা آمِين বলবে। কেননা যার آمِين বলা ফেরেশতাদের آمِين বলার সাথে মিলে যাবে তার

পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী : ৭৪৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা, মুয়াত্তা মালেক এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭১২৭) এ ছাড়াও ছূরা ফাতেহা পাঠ শেষে আমীন বলার হাদীস বর্ণিত হয়েছে: বুখারী-৭৪৪ ও ৫৯৬০, মুসলিম-৮০০-৮০৫, ইবনে মাযা-৮৪৬, আবূ দাউদ-৯৩৫ ও ৯৩৬, নাসাঈ-৯৩১ ও ৯৩২ নম্বরে।

শিক্ষণীয় : এসকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছূরা ফাতেহা শেষে আমীন বলা রসূল স.-এর নির্দেশ এবং ছুন্নাত। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৯২)

আমীন নীরবে বলা

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: آمِينَ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ.

অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়ছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ স. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বললেন, তখন নীরবে 'আমীন' বললেন,। (মুসতাদরাকে হাকেম: ২৯১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. উভয়ই এ হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আরো বর্ণিত হয়েছে সুনানে আবূ দাউদ তয়ালিসী-১১১৭, আহাদীসুস সিরাজ-৪২৯, তিরমিযী-২৪৮ নম্বরে। ইমাম তিরমিযী রহ. প্রথমে সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এরপরে ইমাম বুখারী এবং ইমাম আবু যুরআর বরাত দিয়ে বলেন, حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا "এ বিষয়ে বর্ণিত সুফিয়ান সাওরীর (উচ্চস্বরে আমীন বলার) হাদীসটি শু'বার (নীরবে

আমীন বলার) হাদীসের তুলনায় বেশি সহীহ”। ইমাম বুখারী এবং ইমাম আবু যুরআ রহ.-এর মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, শু’বার এ হাদীসটিও সহীহ। তবে তাঁদের ভাষায় এটা সুফিয়ানের হাদীসের তুলনায় কম সহীহ। তবে তাঁরা এটাকে জঈফ বলেননি। অবশ্য ইমাম শু’বার হাদীসের উপর যে সব অভিযোগের কারণে এটাকে তাঁরা কম সহীহ বলেছেন উক্ত বিষয়গুলোর পর্যালোচনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে। বিশ্লেষণের পরে আশা করি এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইমাম শু’বার হাদীসকে কম সহীহ বলা যথার্থ কি না? প্রথমে অভিযোগগুলো পেশ করা হবে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগের সাথে দলীল-নির্ভর জবাবও পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

অভিযোগ ১. হাদীসটির বর্ণনাকারী শু’বা তাঁর উস্তাদের উস্তাদ হজর-এর উপনাম ‘আবুল আম্বাস’ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার উপনাম হচ্ছে ‘ইবনুল আম্বাস’।

জবাব : ইমাম শু’বার উস্তাদের উস্তাদ হযরত হজর রহ.-এর ছেলে ও পিতা উভয়ের নামই ছিলো ‘আম্বাস’। তাই তাঁকে ‘আবুল আম্বাস’ ও ‘ইবনুল আম্বাস’ উভয় উপনামেই ডাকা হতো। হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, **حجر بن العنبس الحضرمي، ابوالعباس، ويقال ابوالسكن الكوفي** “হজর ইবনুল আম্বাস হাযরামী, আবুল আম্বাস এবং তাকে আবুস সাকানও বলা হয়”। (তাহজীবুত তাহজীব: উক্ত রাবীর জীবনী আলোচনায়)। সুতরাং শু’বা কর্তৃক আবুল আম্বাস উল্লেখ করা কোন ত্রুটি নয়। উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলা সম্পর্কিত হাদীসেও হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.-উক্ত রাবীর উপনাম আবুল আম্বাস উল্লেখ করেছেন। (আবূ দাউদ: ৯৩২) সেখানে এটা কোন ত্রুটি না হলে এখানে কেন হবে?

অভিযোগ ২. ইমাম শু’বার উস্তাদের উস্তাদ হযরত হজর রহ. এবং সাহাবা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা.-এর মাঝে ‘আলকামা’ নামক অপর এক বর্ণনাকারীকে মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন মাধ্যম নেই। বরং হজর ইবনুল আম্বাস রহ. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে সরাসরি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জবাব: হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ‘তাহজীবুত তাহজীব’ গ্রন্থে ‘হজর ইবনুল আম্বাস’-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **روى عن علي ووائل بن حجر وروى عن علقمة بن وائل** “হযরত হজর ইবনুল আম্বাস রহ. হযরত আলী রা. থেকে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র থেকে এবং আলকামা ইবনে ওয়ায়েল রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন”।

এ বিবরণ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত হজর ইবনুল আম্বাস রহ. হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন, হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল রহ.-এর মাধ্যমেও বর্ণনা করেন। এর আরো প্রমাণ লক্ষ্য করুন : ইমাম আবূ দাউদ তয়ালীসী রহ.ও এ হাদীসটি তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নম্বর- ১১১৭) তিনি সনদটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ وَائِلٍ "আমি হাদীসটি আলকামা সূত্রে হযরত ওয়ায়েল থেকে শুনেছি এবং সরাসরি হযরত ওয়ায়েল থেকেও শুনেছি"। এটাকে বলা হয় **مزيد فى متصل الاسانيد**। অর্থাৎ মুত্তাসিল সনদের মাঝে বাড়তি রাবীর মাধ্যম। হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এটা কোন দোষণীয় বিষয় নয়, বরং সত্য প্রকাশ। সুতরাং এটা ইমাম শু'বার কোন ত্রুটি নয়।

আর এ অভিযোগ দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে হযরত আলকামা তাঁর পিতা থেকে শুনা/না শুনার বিষয়ে সন্দেহ তাহলে ইমাম তিরমিযী রহ. নিজেই এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলকামা রহ. তাঁর পিতা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র থেকে শুনেছেন। (দেখুন তিরমিযী : ১৪৬০ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) সুতরাং ইমাম তিরমিযীর নিজের বর্ণনামতেও এটা হযরত শু'বার কোন ভুল নয়। ইমাম আবূ দাউদ তয়ালীসী রহ.-এর মৃত্যু ২০৪ হিজরী সনে; ইমাম বুখারী রহ.-এরও ৪৮ বছর পূর্বে। সুতরাং তয়ালীসীর সনদ ইমাম বুখারীর না জানা থাকার কথা নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এ বিষয়টি কেন ইমাম শু'বার নামে অভিযোগ হলো তা অজানাই থেকে গেছে।

অভিযোগ ৩. হাদীসটির মূল বাক্য ছিলো: **مد بها صوته** "রসূলুল্লাহ স. উঁচু আওয়াজে 'আমীন' বললেন,"। কিন্তু শু'বা ভুল করে এখানে বলেছেন: **خفض بها صوته** "রসূলুল্লাহ স. নীরবে 'আমীন' বললেন,"।

জবাব: রসূলুল্লাহ স. কী বলেছিলেন তা ইমাম বুখারী রহ.-এর জানার মাধ্যম হলো রাবীগণের বর্ণনা। রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হলে তাঁরা যা বলবেন তা-ই রসূলুল্লাহ স.-এর কথা। রাবীদের বর্ণনা ব্যতীত ভিন্ন কোন কথার সম্বন্ধ রসূলুল্লাহ স.-এর দিকে করলে তা হবে ইমাম বুখারী রহ.-এর নিজস্ব মন্তব্য যা শরীআতের দলীল নয়। উপরন্তু একই আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি যখন শরীআতে স্বীকৃত, তখন একজনের বর্ণনা দ্বারা অপরজনের বর্ণনাকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা না করে নির্ভরযোগ্য দু'জন রাবীর বর্ণনা থেকে 'আমীন' বলার দুটি পদ্ধতি প্রমাণ করলেই মনে হয় ভালো হতো।

ইমাম বুখারী রহ.-এর বরাতে নীরবে 'আমীন' বলার পক্ষে ইমাম শু'বার বর্ণিত হাদীসের উপর আরোপিত আপত্তিগুলোর প্রমাণনির্ভর জবাব উল্লেখ করা হলো। এখন বলা যেতে পারে যে, ফাতিহা শেষে নীরবে 'আমীন' বলা রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত ছুন্নাত।

ইমাম তিরমিযী রহ. এতগুলো আপত্তি উল্লেখ করার পরও হাদীসটিকে জঈফ বলতে পারেননি। বরং এটার চেয়ে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা সম্পর্কে বর্ণিত সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর হাদীসটিকে বেশি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন যা এ হাদীসটি জঈফ না হওয়ার স্বীকারোক্তি বৈ কী? আর হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. স্পষ্ট ভাষায় এটাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (দেখুন, মুসতাদরাকে হাকেম: হাদীস নম্বর- ২৯১৩)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ. (رواه ابو داود فى بَابِ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ–١/١١٣)

অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব ও ইমরান ইবনে হুছইন রা. পরস্পর আলোচনা করার সময় হযরত সামুরা রা. বললেন,: তিনি রসূলুল্লাহ স. থেকে দুটি নীরবতা স্মরণ রেখেছেন। একটি নীরবতা হলো তাকবীরে তাহরীমা বলার পর। অপরটি হলো غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলার পর। এ কথাটি হযরত সামুরা স্মরণ রাখলেও হযরত ইমরান অস্বীকার করায় উভয়ে এ ব্যাপারটি হযরত উবাই ইবনে কাআব রা.-এর নিকট লিখে জানালেন। তিনি তাঁদের পত্রের জবাবে জানালেন যে, সামুরা হাদীসটি সঠিকভাবে স্মরণ রেখেছেন। (আবূ দাউদ: ৭৭৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ সামুরার হাদীসটি হাসান। (তিরমিযী-২৫১) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, رجاله ثقات رجال الصحيح "এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য, সহীহ হাদীসের রাবী"। (মুসনাদে আহমদ: ২০১৬৬ নং

হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ ৭৭৭, ৭৭৮ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. ছূরা ফাতিহা শেষে নীরব রয়েছেন। অথচ অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ স. ছূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলতেন। উভয় প্রকার হাদীসের সমন্বয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ স. ছূরা ফাতিহা শেষে নীরবে 'আমীন' বলতেন।

উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ স. উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেছেন এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে অনেক মুহাক্কিক আলেম মনে করেন যে, রসূলুল্লাহ স. উচ্চস্বরে 'আমীন' বলেছেন ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলতে হয় তা শিক্ষা দেয়ার জন্য, সার্বক্ষণিক আমলের জন্য নয়। যেমন যোহরের নামাযে মাঝে মধ্যে রসূলুল্লাহ স. এক আয়াত উচ্চ আওয়াজে পড়তেন। (বুখারী: ৭৪২) অথচ যোহরের নামাযের কিরাত সর্বসম্মতিক্রমে নীরবে পড়তে হয়। অনুরূপভাবে 'আমীন'ও নীরবে বলতে হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. মাঝে মধ্যে উচ্চস্বরে বলতেন। এ বিষয়টি ইমাম আবু বিশ্‌র দূলাবীর রহ. বর্ণিত একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যোহরের কিরাতের মতো উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার আমলটিও মূলত সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ছিলো। হাদীসটি এই যে,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَكَنٍ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَقَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا.

অনুবাদ : ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করার পরে আমি তাঁকে দেখেছি। এমনকি এদিক ওদিক থেকে আমি তাঁর গণ্ডদেশ দেখেছি। তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়লেন তখন দীর্ঘ আওয়াজে 'আমীন' বললেন, । আমি মনে করি তা আমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেছিলেন। (আল কুনা ওয়াল আসমা: হাদীস নম্বর-১০৯০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইয়াহইয়া ইবনে সালামা ইবনে কুহাইল

ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। আর ইয়াহইয়া যদিও বিতর্কিত তবে ইবনে হিব্বান নির্ভরযোগ্য রাবীদের তালিকা সম্বলিত 'আছ-ছিকাত' কিতাবে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। (আছ-ছিকাত-১১৬৩০) আবার জঈফদের তালিকায়ও তাঁর নাম এনেছেন। হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' কিতাবে ইয়াহইয়া ইবনে সালামা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন (হাদীস নম্বর-২৯৭০) ইমাম ইবনে খুযাইমা তাঁর সহীহ কিতাবে ইয়াহইয়া ইবনে সালামার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। (হাদীস নম্বর-৬২৮) সুতরাং তিনি অগ্রহণযোগ্য নন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আমীন' বলার মূল নিয়ম হলো নীরবে বলা। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষার জন্য রসূলুল্লাহ স. কখনো কখনো উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলতেন। অবশ্য হাদীসটি যেহেতু সহীহ নয় তাই আমরা এটাকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত হিসেবে নেইনি। তবে এটা নীরবে 'আমীন' বলার আমলকে প্রাধান্য দেয়ার একটি প্রমাণ অবশ্যই হতে পারে।

উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা মুক্তাদীদের শিক্ষার জন্য বলে মন্তব্য করে বিখ্যাত ইমাম ইবনুল কয়্যিম আল জাওযিয়া বলেন, মুক্তাদীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য যদি ইমাম সাহেব কখনো কখনো (দুআয়ে কুনূত) উচ্চস্বরে পড়েন তাহলে কোন ক্ষতি নেই। হযরত ওমর রা. মুক্তাদীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য ছানা উচ্চ আওয়াজে পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. মুক্তাদীগণকে ছুন্নাত শিক্ষা দেয়ার জন্য জানাযার নামাযে (দুআ হিসেবে) ছূরা ফাতিহা উচ্চ আওয়াজে পড়েছেন। ইমাম কর্তৃক উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলাও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। (যাদুল মাআদ, ১/২৬৬, অধ্যায়: 'রসূলুল্লাহ স. মুক্তাদী এবং অন্যদের খেয়াল রাখতেন')

নীরবে 'আমীন' বলার বিধান সম্বলিত বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে নীরবে 'আমীন' বলার দালীলিক ভিত্তি সবার সামনে স্পষ্ট হয়েছে বলে আশা করি। এবার এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে শরীআতের মূলনীতি আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে যা থেকে এ বিষয়ের সুরাহা আরো স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসবে।

'আমীন' একটি দুআ

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا

حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : হযরত মুসা আ. বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফিরাউন ও তার সভাসদবর্গকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর এবং সম্পদ দান করেছেন। হে আমার প্রতিপালক! এ জন্যই তারা আপনার পথ থেকে (মানুষকে) বিপথগামী করে। হে আমার প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠোর করে দিন যাতে তারা বেদনাদায়ক আজাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বে ঈমান না আনে। তিনি বললেন,: তোমাদের দুআ কবুল করা হয়েছে। অতএব, তোমরা দু'জন অটল থাকো এবং অজ্ঞদের পথে চলো না। (ছূরা ইউনুস: ৮৮-৮৯)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, দুআ করেছেন মুসা আ. একা। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন: "তোমাদের উভয়ের দুআ কবুল করা হলো"। বাহ্যিকভাবে দুই আয়াতের মাঝে কিছুটা বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. বলেন, إِنَّ الدَّاعِيْ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا ، فَإِنَّ الثَّانِيْ كَانَ مُؤَمِّنًا، وَهُوَ هَارُوْنُ، فَلِذَالِكَ نُسِبَتِ الْإِجَابَةُ إِلَيْهِمَا، لِأَنَّ الْمؤَمِّنَ دَاعٍ "দুআপ্রার্থী একজন হলেও অপরজন ছিলো 'আমীন' উচ্চারণকারী। আর তিনি হলেন হযরত হারুন আ.। এ কারণেই দুআর সম্বন্ধ উভয়ের দিকেই করা হয়েছে। কেননা 'আমীন' উচ্চারণকারীও দুআপ্রার্থী। উপরিউক্ত আয়াত এবং ইবনে জারীরের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'আমীন' একটি দুআ।

অনুরূপ তাফসীরই করেছেন আল্লামা ইবনে কাসীরসহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ। তাঁরা বিভিন্ন হাদীসের বরাত দিয়ে এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন যে, 'আমীন' একটি দুআ। ইমাম বুখারী রহ.ও 'আমীন' বলার অধ্যায়ে আতা ইবনে আবী রবাহ-এর মন্তব্য তুলে ধরে এটা প্রমাণ করেছেন যে, আমীন একটি দুআ।

দুআ করার আদব

এবার দুআর আদবের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করলে নীতিমালা আকারে আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, 'আমীন' সরবে বলতে হবে না নীরবে!

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত দুআর পদ্ধতি

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অনুবাদ : তোমাদের রবকে ইবনেয়ের সাথে ও নীরবে ডাকো। তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (ছূরা আ'রাফ: ৫৫)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাসান লিগাইরিহী সনদে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা দুআ বা দুআর বাইরে কোন স্থানেই সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। উক্ত সনদে হযরত ইবনে জুরাইয রহ. বলেন, নিশ্চয় দুআর মধ্যে সীমালঙ্ঘন রয়েছে। দুআতে চিৎকার করা, হাক-ডাক করা ও উচ্চস্বরে দুআ করা মাকরূহ । তাই তিনি দুআর সময় ইবনেয় ও নম্রতার নির্দেশ দিতেন। (তাফসীরে তাবারী: ১৪৭৮১) প্রসিদ্ধ সাহাবা হযরত ইবনে আব্বাস রা. এবং বিশিষ্ট ইমাম হযরত ইবনে জুরাইয রহ.-এর তাফসীর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, দুআ করার সাধারণ নিয়মের আওতায় 'আমীন' নীরবে বলাই বিধেয়।

হাদীসে বর্ণিত দুআর পদ্ধতি

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. যখন খাইবার অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন একটি উপত্যক-ার নিকট এসে সাহাবাগণ উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগলেন। তখন রসল স. বললেন, ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা এমন কোন সত্ত্বাকে ডাকছো না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা ডাকছো সেই সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটে এবং তিনি তোমাদের সাথে আছেন। (বুখারী: ৩৮৯০)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস থেকেও এ নীতিমালা পাওয়া যায় যে, দুআর মধ্যে নীরবতা বা ক্ষীণ আওয়াজ আল্লাহ তাআলা ও রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বেশি প্রিয়। তাই আমরা 'আমীন' নীরবে বা ক্ষীণ আওয়াজে বলার আমলকে তুলনামূলক বেশি উত্তম বলে মনে করি।

আমীন উচ্চ আওয়াজে না বলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল

হযরত ওমর ও আলী ও ইবনে মাসউদ রা.-এর আমল

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَايَجْهَرَانِ بِبَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِالتَّأْمِينِ.

অনুবাদ : হযরত আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত: হযরত ওমর ও হযরত আলী রা. বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ ও আমীন উচ্চ আওয়াজে বলতেন না। (ত্বহাবী শরীফ: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫০, হাদীস নং-১২০৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। আবু সাআদ বাক্কাল ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। আর আবু সাআদ বাক্কাল-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি জঈফ। তবে উল্লেখযোগ্য অনেক ইমাম তাঁর ব্যাপারে ভালো মন্তব্যও করেছেন। যেমন আবু উসামা তাঁকে ثقة নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে আদী বলেন, و له من الحديث شيء صالح তাঁর কিছু হাদীস ভালোও রয়েছে। (তাহজীবুত তাহজীব) ইমাম বুখারীর বরাত দিয়ে ইমাম তিরমিযী তাঁকে مقارب الحديث (তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্যতার নিকটবর্তী) বলেছেন।

রিজাল শাস্ত্রের ভাষায় শব্দটির উদ্দেশ্য ও স্তর নিয়ে ইখতেলাফ থাকলেও ইমাম তিরমিযী রহ. এর দ্বারা ছিকা রাবী উদ্দেশ্য দেন। (ইলালুল কুবরা লিততিরমিযী: হাদীস নম্বর- ৩৯৪) সুতরাং সব মিলে তাঁর বর্ণনা হাসান পর্যায়ে পৌঁছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِآمِينَ (المعجم الكبير-٩٣٠٤)

অনুবাদ : হযরত আবু ওয়ায়েল রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আলী এবং ইবনে মাসউদ রা. বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ এবং আমীন উচ্চস্বরে বলতেন না। (মু'জামে কাবীর লিততবারানী-৯৩০৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। আবু সাআদ বাক্কাল এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আবু সাআদ (সাঈদ) বাক্কালের জীবনী পূর্বের হাদীসে দেখুন।

আর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নির্ভরযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী বলেন, ثِقَةٌ جَبَلٌ নির্ভরযোগ্য, পাহাড়তুল্য। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, তবকা-১৬, রাবী নং-১৫)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা., চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রা. এবং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিশিষ্ট মুজতাহিদ হযরত ইবনে মাসউদ রা. নামাযে নীরবে আমীন পাঠের আমল করতেন। এ ছাড়াও নীরবে আমীন বলার প্রমাণ হিসেবে আল্লামা ইবনে হাযাম জাহেরী রহ. বর্ণনা করেন, আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, ইমাম চারটি জিনিস নীরবে বলবেন। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রব্বানা লাকাল হামদ। (মুহাল্লা: ৩৬৯ নম্বর মাসআলা-এর অধীনে)

আমীন উচ্চ আওয়াজে না বলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট তাবিঈনে কিরামের আমল

হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর আমল

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَمْسٌ يُخْفَيْنَ سُبْحَانَك اللهمَّ وَبِحَمْدِك وَالتَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآمِين وَاللهمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ.

অনুবাদ : ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, নীরবে পঠনীয় কাজ পাঁচটি: ছানা পড়া, আউযুবিল্লাহ পড়া, বিসমিল্লাহ পড়া, আমীন বলা এবং আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ বলা। (আব্দুর রাযযাক: ২৫৯৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং প্রসিদ্ধ ইমাম।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ آمِينَ

অনুবাদ : হযরত মানসুর রহ. বলেন, হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. 'আমীন' নীরবে বলতেন। (আব্দুর রাযযাক: ২৬৩৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলি-

লমের রাবী।

হযরত সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আমল

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَقُولُهَا الإِمَامُ سِرًّا ذَهَبُوا إِلَى تَقْلِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما

অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, ইমাম এগুলো নীরবে বলবেন। এসব ব্যক্তিগণ হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ রা.-এর মতাবলম্বনে এরূপ মতামত গ্রহণ করেছেন। (মুহাল্লা: ৩৬৯ নম্বর মাসআলা-এর অধীনে)

সারসংক্ষেপ : কুরআন, সহীহ হাদীস, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মুজতাহিদ ইমামগণের আমলের ভিত্তিতে আমরা 'আমীন' নীরবে বা ক্ষীণ আওয়াজে বলার আমলকে তুলনামূলক বেশি উত্তম বলে মনে করি। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৯২)

অবশ্য উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার পক্ষেও যেহেতু সহীহ হাদীস রয়েছে তাই উচ্চস্বরে 'আমীন' বলাও শরীআতে স্বীকৃত। ছুন্নাহ সম্মত পন্থায় কেউ হাদীসের অনুসরন হিসাবে এরূপ আমল করলে আমরা তা ছুন্নাত মনে করি। তবে আমলের জন্য নীরবে 'আমীন' বলাকে এজন্য প্রাধান্য দিয়ে থাকি যে, নীরবে 'আমীন' বলার আমল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআর পদ্ধতির সাথেও বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। সর্বোপরি কথা হলো উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলার হাদীসের মূল ভিত্তি হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর নিজের আমলও নীরবে 'আমী-ন' বলার অনুকূলে।

একটি পরামর্শ

একই ইবাদাত আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি শরীআতে স্বীকৃত। সুতরাং শরীআতে স্বীকৃত আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে কোনক্রমে ফাটল সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যার নমুনা সাহাবায়ে কিরাম দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এ বিষয় নিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ফাটল পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই মুসলমানদের পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুসংহত রাখতে আমলের পদ্ধতিগত পার্থক্য মিটিয়ে ফেলা বা কমপক্ষে কমিয়ে আনা একান্ত জরুরী।

তার একটি পদক্ষেপ এটা হতে পারে যে, পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট আমলের প্রত্যেকটির পক্ষে যদি গ্রহণযোগ্য দলীল থাকে তাহলে পার্থক্য সৃষ্টি না করে মতভেদ দূরীকরণে আমরা বড় দলের আমলে যুক্ত হয়ে যেতে পারি। যেহেতু রসূলুল্লাহ স. সর্ববৃহৎ দলে যুক্ত হওয়ার প্রতি বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন। (মুসতাকরাকে হাকেম: ৩৯১) মুল্লা আলী কারী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, বড় দল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উলামায়ে কিরামের দল। (মিরকাতুল মাফাতীহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬১) উলামায়ে কিরামের মাঝে কখনো মতবিরোধ দেখা দিলে উলামাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পথ অনুসরণ করাই হলো নিয়ম।

অতএব, যেখানে নীরবে 'আমীন' বলার আমল ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে সেখানে আমরা তা অনুসরণ করবো। কারণ উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা ছুন্নাত হলেও যেখানে এর ব্যাপক প্রচলন নেই সেখানে কেউ উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলে উঠলে অনেক ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর একগ্রতা নষ্টেরও কারণ ঘটে। এর বিপরীতে যেখানে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার আমল ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে সেখানে কেউ নীরবে 'আমীন' বললে অন্য কারো একাগ্রতা নষ্ট হয় না। আশা করা যায় যে, এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে নিজেদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে। তবে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে যদি দলীলের ভিত্তিতে কোন একটিকে অবৈধ মনে করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সমঝোতা করার কোন সুযোগ নেই।

ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে ফাতিহার সাথে ছূরা মিলানো

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا (رواه مسلم فى بَابِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ..–١٦٩/١)

অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছূরা ফাতিহা ও তার সাথে কুরআন থেকে আরো কিছু পড়লো না তার নামায হলো না। (মুসলিম: ৭৬৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, নাসাঈ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪২৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স. জোর দিয়ে বলেছেন যে, ছূরা

ফাতিহা ও তার সাথে কুরআন থেকে আরো কিছু পাঠ না করলে তার নামায হবে না। সুতরাং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ফাতিহার সাথে ছূরা মিলানো পরিত্যাগ করে তার নামায হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত। (শামী-১/৪৫৮,৮৫৯) অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফাতেহার সাথে ছূরা মিলানোর আবশ্যকতা শুধু প্রথম দু'রাকাতে। ফরযের অন্য রাকাতগুলোতে ছূরা মিলানো আবশ্যক হবে না।

ফরয নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে ছূরা ফাতেহা পাঠ করা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ (رواه البخارى فى بَابٍ: يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ–١/١٠٧)

অনুবাদ : হযরত আবু কতাদা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যোহরের প্রথম দু'রাকাতে ছূরা ফাতিহা এবং দুটি ছূরা পড়তেন। আর শেষ দু'রাকাতে ছূরা ফাতেহা পড়তেন। আর কখনো কখনো আমাদেরকে একটি আয়াত শুনিয়ে দিতেন। প্রথম রাকাতে ছূরা এই পরিমাণ লম্বা করতেন যা দ্বিতীয় রাকাতে করতেন না। এমনই করতেন আসর ও ফজরে। (বুখারী: ৭৪০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪৪৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাত ব্যতীত অন্য রাকাতগুলোতে শুধু ছূরা ফাতিহা পড়তেন।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ يَعْنِي عَلِيًّا يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ -

অনুবাদ : হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবী রাফে' রহ. বলেন, হযরত আলী রা. যোহর ও আসরের নামাযের প্রথম দু'রাকাতে ছূরা ফাতিহা ও অন্য একটি ছূরা পড়তেন। আর শেষ দু'রাকাতে কুরআন পড়তেন না।

(আব্দুর রাযযাক: ২৬৫৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ্, মাউকূফ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ বলেন, এ সনদটি সহীহ। (উমদাতুল কারী-৬/১৯, শরহু আবি দাউদ-৪/৫১)

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمَا قَالاَ : اقْرَأْ فِي الأُولَيَيْنِ، وَسَبِّحْ فِي الأُخْرَيَيْنِ.

অনুবাদ : হযরত আবু ইসহাক রহ. হযরত আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা দু'জনই বলেন, প্রথম দু'রাকাতে কুরআন পড়। আর শেষ দু'রাকাতে তাসবীহ পড়। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৭৬৩)

হাদীসটির স্তর : মুরসাল, মাউকূফ। এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। তবে আবু ইসহাক হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর যুগ পাননি। তাই এ অংশটি মুরসাল। আর হযরত আলী রা.কে পেয়েছেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এ ক্ষেত্রেও আপত্তি তুলেছে। তবে হযরত আলী রা.-এর মৃত্যুকালে আবু ইসহাকের বয়স ছয় বছর ছিলো যা হাদীস শ্রবণ ও ধারণ করার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ রা. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাত ব্যতীত অন্য রাকাতসমূহে ছূরা ফাতেহা পাঠ করা আবশ্যক মনে করতেন না। অনুরূপ মন্তব্য সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে হযরত আলকামা রহ. থেকে, (আব্দুর রাযযাক: ২৬৫৮) হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে (আব্দুর রাযযাক: ২৬৫৯) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ রহ. থেকে। (ইবনে আবী শাইবা: ৩৭৬৭)

হযরত আলী রা. খুলাফায়ে রাশেদার অন্যতম যাঁদের ছুন্নাত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ রসূল স. নিজে দিয়েছেন (আবূ দাউদ-৪৫৫২, মুসনাদে আহমদ-১৭১৪৪ তিরমিযী-২৬৭৬ এবং ইবনে মাযা-৪২) আর হযরত ইবনে মাসউদ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর অতি ঘনিষ্ঠ সাহাবা এবং তাঁর আমল-আখলাকের বাস্তব নমুনা, (বুখারী-৩৪৯০) সাথে সাথে এটি ইবাদত সংক্রান্ত বিষয় হওয়ার কারণে বিধানগতভাবে রসূলুল্লাহ স.-এরই কথা হিসেবে পরিগণিত। এ সকল মহামনীষীগণ কর্তৃক ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাত ব্যতীত অন্য রাকাতগুলোতে ছূরা ফাতেহা পাঠ না করতে বলার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব ক্ষেত্রে ছূরা ফাতেহা পাঠ করা জরুরী নয় মর্মে তাঁদের নিকট কোন দলীল অবশ্যই রয়েছে যার ভিত্তিতে তাঁরা এরূপ আমল

করেছেন বা করতে বলেছেন। অতএব, এ সকল দলীলের ভিত্তিতে ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাত ব্যতীত অবশিষ্ট রাকাতগুলোতে ছূরা ফাতেহা পাঠ করা জরুরী নয় বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। তবে আমল বর্জন করা কোনক্রমেই উচিত হবে না। কারণ রসূলুল্লাহ স. কখনো ঐ রাকাতগুলোতে ফাতেহা পাঠ করেননি মর্মে কোন দলীল আমাদের সামনে নেই। বরং হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত মাউকুফ হাদীস, (তিরমিযী-৩১৩) হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত মারফু' হাদীস, (ত্বহাবীঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯, হাদীস নং-১৩০০) হযরত আবু কতাদা রা থেকে বর্ণিত হাদীস, (বুখারী-৭৪০) এবং হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসসহ (মুসলিম-৭৬৪) অসংখ্য হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাকাতে ফাতেহা পাঠ করা রসূল স.-এর স্থায়ী আমল ছিলো। তাই ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাত ব্যতীত বাকি রাকাতগুলোতেও ছূরা ফাতেহা পাঠের আমল বর্জন করা ঠিক হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত। (শামী-১/৫১১)

ফরয নামাযের সব রাকাতে ছূরা মিলানোর অবকাশ রয়েছে

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ. (رواه مسلم فى بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ–١/١٨٥)

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যোহরের প্রথম দু'রাকাতের প্রতি রাকাতে ৩০ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষ দু'রাকাতের প্রতি রাকাতে ১৫ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। আসরের প্রথম দু'রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে ১৫ আয়াত পরিমাণ এবং শেষ দু'রাকাতে তার অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করতেন। (মুসলিমঃ ৮৯৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাত ব্যতীত বাকী রাকাতগুলোতেও ছূরা মিলানো যেতে পারে।

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ. وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذلِكَ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ. (رواه مالك فى باب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ–٢٧)

অনুবাদ : হযরত নাফে রহ. বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. যখন একাকী নামায পড়তেন তখন পূর্ণ চার রাকাতেই কুরআন পাঠ করতেন। প্রতি রাকাতে ছূরা ফাতেহা এবং কুরআনের অপর একটি ছূরা পাঠ করতেন। তিনি কখনো কখনো ফরয নামাযের এক রাকাতে দুই/তিনটি ছূরাও পাঠ করতেন। মাগরিবের নামাযের দু'রাকাতেও তিনি অনুরূপ ছূরা ফাতেহা এবং একটি করে ছূরা পাঠ করতেন। (মুয়াত্তা মালেক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (জামেউল উসূল-৩৪৬৬ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের সব রাকাতে ছূরা মিলানো যেতে পারে। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত। (শামী-১/৫১১)

ফরয ব্যতীত সব নামাযে প্রতি রাকাতে ছূরা মিলানো জরুরী

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً...(رواه ابو داود فى بَابِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ–١٨٣/١)

অনুবাদ : হযরত আবু রাফে’ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. হযরত আব্বাস রা.কে বললেন, হে চাচা, আমি কি (একটি জিনিস শিক্ষাদানের মাধ্যমে) আপনার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করবো না? আমি কি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে দশটি গুণ শিক্ষা দিবো না? যখন আপনি তা করবেন আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্ব-পর, নতুন-পুরান, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, ছোট-বড় এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। গুণ দশটি হলো- আপনি চার রাকাত নামায পড়বেন, প্রত্যেক রাকাতে ছূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি ছূরা পড়বেন।... (আবূ দাউদ শরীফ-১২৯৭)।

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده حسن وله شواهد يصح بها হাদীসটির সনদ হাসান। তবে এর পক্ষে অনেক সমার্থক বর্ণনা থাকায় এটাকে সহীহ বলা যায়। (আবূ দাউদ ১২৯৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামাযের প্রত্যেক রাকাতে ছূরায়ে ফাতেহার সাথে অন্য ছূরা মিলানো জরুরী।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى: أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأْسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ الله سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ الله...(رواه ابو داود تحت باب في صَلاَةِ اللَّيْلِ-١/١٩٠)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা.কে রসূলুল্লাহ স.-এর মধ্যরাতের নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইশার নামায জামাতে পড়তেন। অতঃপর ঘরে ফিরে এসে চার রাকাত পড়তেন। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়তেন এবং এমন অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন যে,

পবিত্রতা অর্জনের পানি ও মিসওয়াক তাঁর মাথার নিকট রাখা থাকতো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা তাঁকে ঘুম থেকে উঠাতেন তখন তিনি মিসওয়াক করতেন, পরিপূর্ণভাবে অযু করতেন, এরপর দাঁড়িয়ে আট রাকাত নামায পড়তেন। প্রত্যেক রাকাতে ছূরা ফাতিহা, অন্য ছূরা এবং কুরআন থেকে আল্লাহ তাআলা যা তৈফিক দিতেন পড়তেন..। (আবূ দাউদ: ১৩৪৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح হাদীসটি সহীহ। (আবূ দাউদ-১৩৪৬ নং হাদীসের আলোচনায়)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৪১৯৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামাযের প্রতি রাকাতে ফাতেহার সাথে অন্য ছূরা মিলানো জরুরী। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত। (শামী-১/৪৫৮,৮৫৯)

প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া যথেষ্ট

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি প্রত্যেক রাকাতে বিসমিল্লাহ পড়তেন। (ইবনে আবি শাইবা-৪১৮৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، وَأَبَا إِسْحَاقَ فَقَالُوا: اقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

অনুবাদ : হযরত হাকাম ইবনে উতায়বা, হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান এবং আবু ইসহাক রহ. বলেন, প্রত্যেক রাকাতে বিসমিল্লাহ পড়ো। (ইবনে আবি শাইবা-৪১৮৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : উল্লিখিত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাকাতে একবার বিসমিল্লাহ পড়লে চলবে। আর উক্ত বিসমিল্লাহ পড়া হবে

কিরাতের শুরু অর্থাৎ ছূরা ফাতেহার পূর্বে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ» (رواه مسلم فی باب إذا نهض من الركعة الثانية)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠতেন তখন চুপ না থেকে আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন দ্বারা কিরাত শুরু করতেন । (মুসলিম-১২৩৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. শুধু প্রথম রাকাতে কুরআন পাঠের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তেন। অবশিষ্ট রাকাতগুলোতে কুরআন পাঠের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তেন না। হাদীসের কোন কোন ব্যাখ্যাকারী এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করে বলেছেন যে, প্রথম রাকাতে ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়লেই যথেষ্ট হবে যদিও প্রতি রাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। (আত্ তাহবীর লিঈযাহি মাআনিত তাইসীর-৫/২৬৫) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৯০, বাদায়েউস সানায়ে': ১/২০৪)

ফাতেহার শেষে ছূরা মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া ভালো

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ السُّورَةِ وَبَعْدَهَا إِذَا قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাযে ছূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া ছাড়তেন না। ঐ ছূরার সাথে আরেকটি ছূরা পড়লেও প্রথম ছূরার পরে বিসমিল্লাহ পড়া ছাড়তেন না। (ত্বহাবী শরীফ: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৭, হাদীস নং-১১৮৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। আবু বাকরাহ ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আবু বাকরাহকে আল্লামা ঔাহাবী 'আল্লামাতুল মুহাদ্দিস' বলে প্রশংসা করেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: তবকা-১৪, রাবী নং-২২৯)

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالسُّورَتَيْنِ، كُلَّمَا قَرَأَ سُورَةً اسْتَفْتَحَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

অনুবাদ : হযরত হাকাম ইবনে উতায়বা, হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইম-ান এবং আবু ইসহাক বলেন, যে ব্যক্তি এক রাকাতে দুটি ছূরা পড়ে সে প্রত্যেক ছূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে। (ইবনে আবি শাইবা-৪১৮৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছূরা ফাতেহার সাথে অন্য ছূরা মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। এক রাকাতে একাধিক ছূরা পড়লেও প্রতি ছূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম হবে। হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এ মতটি গ্রহণ করেছেন। (শামী: ১/৪৯০, বাদায়েউস সানায়ে’: ১/২০৪) উক্ত দুটি মতের যে কোনটির উপর আমল করা যেতে পারে।

ছূরা ফাতিহার পরে কুরআন পাঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ فَقُلْتُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ (رواه البخارى تحت بَابٍ: فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ–٢/٧٥٥)

অনুবাদ : হযরত ইবনে শুবরুমা বলেন, একজন মানুষের জন্য নামাযে কী পরিমাণ কুরআন পাঠ যথেষ্ট হবে তা নিয়ে আমি ফিকির করেছি। অতঃপর আমি তিন আয়াত থেকে কম সংখ্যা বিশিষ্ট কোন ছূরা পাইনি। তাই বলি, কারো জন্য তিন আয়াতের কম পড়া উচিত নয়। (বুখারী: ৪৬৮২)

সারসংক্ষেপ : নামাযে সর্বনিম্ন কি পরিমাণ কুরআন পাঠ করলে নামায সহীহ হবে সে ব্যাপারে যদিও এ হাদীসে স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত নেই। তবুও এ হাদীস থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিন আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াতই যথেষ্ট। এক রাকাতে একটি পূর্ণ ছূরা পড়লে নামায সহীহ হওয়ার বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। আর কুরআনের সর্বকনিষ্ঠ ছূরার আয়াত সংখ্যা তিনটি। সে অনুযায়ী কুরআনের সর্বকনিষ্ঠ তিন আয়াত পড়লে নামায শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি মোটামটি নিশ্চিত। এখন কুরআনের

সর্বকনিষ্ঠ আয়াত খুঁজে পাওয়া যায় ছূরা মুদ্দাসসিরের ২০, ২১ ও ২২ নম্বর আয়াত যার মোট অক্ষর সংখ্যা ২৯টি। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি এমন এক বা একাধিক আয়াত তিলাওয়াত করে যা কমপক্ষে ২৯ অথবা ততোধিক অক্ষরবিশিষ্ট হয় তাহলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। অবশ্য আয়াতের অংশবিশেষ পড়া যা দ্বারা একটা বাক্য পূর্ণ হয় না এটা মাকরূহ। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৫৩৮) আল্লামা শামী রহ. উপরিউক্ত তিনটি আয়াতকে ৩০ অক্ষর বিশিষ্ট বলেছেন। অথচ বাস্তবে ২৯ অক্ষর পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে পেশকৃত ইবনে শুবরুমার হাদীসে নামাযে পঠিত আয়াত সংখ্যার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। তবে মুজতাহিদ ইমামগণের গবেষণার ফলাফল পূর্বের সারসংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমামের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে উত্তম কিরাতের পরিমাণ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: الم تَنْزِيلُ وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً (رواه مسلم فى بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ–١/١٨٥)

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমরা রসূল স.-এর যোহর ও আসরের নামাযে দাঁড়ানোর পরিমাণ হিসেব করতাম। যোহরের নামাযের প্রথম দু'রাকাতে জাবের তাঁর দাঁড়ানোর পরিমাণ ছিলো আলিফ-লাম মীম সিজদাহ নামক ছূরার পরিমাণ। আর পরবর্তী দু'রাকাতে দাঁড়ানোর পরিমাণ হিসেব করলাম তা ছিলো এর অর্ধেক। আর আসরের নামাযের প্রথম দু'রাকাতের দাঁড়ানোর পরিমাণ হিসেব করলাম তা ছিলো যোহরের নামাযের শেষ দু'রাকাতের মত। আর আসরের শেষ দু'রাকাতের দাঁড়ানোর পরিমাণ ছিলো এর অর্ধেক। আবু বকর ইবনে আবী শাইবা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় যোহরের নামাযের প্রথম দু'রাকাতে

ছূরা সিজদার পরিবর্তে ত্রিশ আয়াতের সমপরিমাণ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। (মুসলিম-৮৯৮)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রসূল স. যোহরের নামাযে আলিফ লাম মীম সিজদা বা ভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী ৩০ আয়াত বিশিষ্ট ছূরা তিলাওয়াত করেছেন। আর এটা তিওয়ালে মুফাছ্ছাল (হুজুরাত থেকে বুরুজ পর্যন্ত)-এর সমপরিমাণ বা তার কাছাকাছি হয়। আর আসরের নামাযে তিনি যোহরের অর্ধেক পরিমাণ তিলাওয়াত করেছেন যা আওসাতে মুফাছ্ছাল (ত্বরিক থেকে বায়্যিনাহ পর্যন্ত)-এর সমপরিমাণ হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যোহরের নামাযের উত্তম কিরাত হলো তিওয়ালে মুফাছ্ছাল। আর আসরের নামাযের উত্তম কিরাত হলো আওসাতে মুফাছ্ছাল। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৯২) এর বিপরীতে মুসলিম শরীফের ৯১৩ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামাযে ছূরা আল-লাইল পড়তেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যোহরের নামাযে আওসাতে মুফাছ্ছাল (ত্বরিক থেকে বায়্যিনাহ পর্যন্ত) পড়তেন। এটাও আমল করা যেতে পারে।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ (رواه النسائى فى تَخْفِيفِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ–١/١١٣)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, অমুকের চেয়ে রসূল স.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নামায আমি আর কারো পেছনে পড়িনি। বর্ণনাকারী সুলাইমান বলেন, তিনি যোহরের প্রথম দু'রাকাত দীর্ঘ করতেন এবং শেষের দু'রাকাত হালকা করতেন। আর আসরের কিরাত হালকা করতেন এবং মাগরিবে কিসারে মুফাছ্ছাল (ঝিলঝাল থেকে নাছ পর্যন্ত) পড়তেন। ইশার নামাযে আওয়াছতে মুফাছ্ছাল (ত্বরিক থেকে বায়্যিনাহ পর্যন্ত) এবং ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাছ্ছাল (হুজুরাত থেকে বুরুজ পর্যন্ত) পড়তেন। (নাসাঈ-৯৮৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ ইবনে হিব্বানের বরাতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আদ দিরায়াহঃ ১৯৬ নং হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাছ্ছাল (ঝিলঝাল থেকে নাছ পর্যন্ত), ইশার নামাযে আওয়াছতে মুফাছ্ছাল (ছূরা ত্বরিক থেকে বায়্যিনাহ পর্যন্ত) এবং ফজরে নামাযে তিওয়ালে মুফাছ্ছাল (হুজুরাত থেকে বুরুজ পর্যন্ত) পড়তেন। আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স. যোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাছ্ছাল আর আসরের নামাযে আওসাতে মুফাছ্ছাল (ছূরা ত্বরিক থেকে বায়্যিনাহ পর্যন্ত) পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে উপরিউক্ত নিয়মে কুরআন পাঠ করা উত্তম, তবে আবশ্যকীয় নয়। এ নিয়মের বিপরীতে রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের বিভিন্ন অংশ থেকে পাঠ করতেন মর্মে অনেক সহীহ হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। ইমামের তিলাওয়াতের প্রতি মুসল্লিদের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখা গেলে এবং দুর্বল, অসুস্থ্য বা ব্যস্ত মানুষ না থাকলে ইমাম সাহেব কিরাত লম্বা করতে পারেন। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় উপরিউক্ত নিয়ম বা তার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করা উত্তম হবে।

ইমামের জন্য যে সকল নামাযে সশব্দে কিরাত পড়া জরুরী

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰه صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ (رواه البخارى فى بَابِ الجَهْرِ فِي المَغْرِبِ–١/١٠٥)

অনুবাদ : হযরত যুবায়ের ইবনে মুতইম রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে মাগরিবের নামাযে ছূরা তুর পড়তে শুনেছি। (বুখারীঃ ৭২৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা, মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪৫৯)

শিক্ষণীয় : মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের মাগরিবের নামাযের কিরাত শ্রবণ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. মাগরিবের নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন। এ আমলের ব্যতিক্রম তিনি কখনো করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব, মাগরিবের নামাযে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কুরআন পড়া জরুরী।

عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي العِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً

"(رواه البخارى فى بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ–١/١٠٦)

অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে ইশার নামাযে ছূরা ত্বীন পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে সুললিত কণ্ঠ বা তিলাওয়াত আর কারো থেকে শুনিনি। (বুখারী-৭৩৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা, মুয়াত্তা মালেক এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪৬৪)

শিক্ষণীয় : মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের ইশার নামাযের কিরাত শ্রবণ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. ইশার নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন। এ আমলের ব্যতিক্রম তিনি কখনো করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব, ইশার নামাযে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কুরআন পড়া জরুরী।

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} (رواه مسلم فى بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ–١/١٨٦)

অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে হুরাইস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ স.কে ফজরের নামাযে ছূরা তাকবীর পড়তে শুনেছেন। (মুসলিম: ৯০৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪৩১)

শিক্ষণীয় : মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের ফজরের নামাযের কিরাত শ্রবণ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. ফজরের নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন। এ আমলের ব্যতিক্রম তিনি কখনো করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব, ফজরের নামাযে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কুরআন পড়া জরুরী।

عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ، فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(رواه مسلم فى بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ–١/٢٨٧)

অনুবাদ : হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবী রাফে’ বলেন, মারওয়ান ইবনে হাকাম একবার হযরত আবু হুরায়রা রা.কে মদীনায় তার প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলেন এবং নিজে মক্কায় চলে গেলেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. আমাদেরকে জুমুআর নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম রাকাতে ছূরা জুমুআহ পড়ার পরে দ্বিতীয় রাকাতে ছূরা মুনাফিকুন পড়লেন। হযরত উবায়দুল্লাহ বলেন, নামায শেষে আমি হযরত আবু হুরায়রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি যে দুটি ছূরা পড়েছেন, হযরত আলী রা. কুফায় এ ছূরা দুটি পড়তেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে জুমুআর নামাযে এ ছূরা দুটি পড়তে শুনেছি। (মুসলিম-১৮৯৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-১১২৪, ইবনে মাযা-১১১৮ এবং তিরমিযী-৫১৯ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের জুমুআর নামাযের কিরাত শ্রবণ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. জুমুআর নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন। এ আমলের ব্যতিক্রম তিনি কখনো করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব, জুমুআর নামাযে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কুরআন পড়া জরুরী।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ. (رواه مسلم فى فصل فى سورة الجمعة والمنافقين–١/١٨٧)

অনুবাদ : হযরত নু’মান ইবনে বাশীর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. উভয় ঈদ এবং জুমুআর নামাযে ছূরা আ’লা এবং ছূরা গাশিয়াহ পড়তেন। জুমুআহ এবং ঈদ এক দিনে হলেও তিনি ঐ ছূরা দুটি উভয় নামাযে পড়তেন। (মুসলিম-১৮৯৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুয়াত্তা মালেক এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৯১)

সারসংক্ষেপ : মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের জুমুআহ এবং উভয় ঈদের নামাযের কিরাত শ্রবণ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. জুমুআহ এবং উভয় ঈদের নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন। এ আমলের ব্যতিক্রম তিনি কখনো করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব, উভয় ঈদের নামাযে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কুরআন পড়া জরুরী।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَإِنْ كَانُوا لَيَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ مِنَ الْقُرْآنِ.

অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন, তাঁরা হযরত ওমর রা.-এর যামানায় রমাযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায আদায় করতেন। আর কারীগণ কুরআন থেকে দু'শত আয়াতবিশিষ্ট ছূরা তিলাওয়াত করতেন। (মুসনাদে আলী ইবনুল জাআদ-২৮২৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ কিতাবের লেখক আল্লামা আলী ইবনুল জাআদ রহ. ইমাম বুখারীর উস্তাদ। আর তাঁর উপরের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের তারাবীহ'র নামাযের কিরাত শ্রবণ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহ'র নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন। এ আমলের ব্যতিক্রম তাঁদের কেউ তারাবীহ'র নামাযে ইমাম হয়ে নীরবে কুরআন পাঠ করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের ভিত্তি হতে পারে কেবল রসূলুল্লাহ স.-এর আমল। অতএব, নিশ্চিত বলা যায় যে, তারাবীহ'র নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠের আমল করেছেন রসূলুল্লাহ স. নিজেই। সুতরাং তারাবীহ'র নামাযে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কুরআন পড়া জরুরী।

জ্ঞবত্য : উপরিউক্ত হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমুআহ, উভয় ঈদ এবং তারাবীহ'র নামাযে ইমামের জন্য সশব্দে কুরআন পাঠ করা জরুরী। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৫৩৩) এ ছাড়া রমাযান মাসের বিতির নামায জামাতে পড়া হলে উচ্চস্বরে কুরআন পড়া জরুরী। (শামী: ১/৫৩৩) তাহাজ্জুদ নামায জামাতে পড়া হলে সে নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করার প্রমাণও রয়েছে। (মুসলিম-১৬৮৭) ইস্তিসকার নামাযে রসূলুল্লাহ স. সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন মর্মে সহীহ হাদীসের বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। (বুখারী-৯৬৮) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (বাদায়ে': ১/২৮৩) বুখারী শরীফের উক্ত হ্দীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, وَهُوَ مِمَّا أجمع عَلَيْهِ الْفُقَهاء এ বিষয়টির উপর ফকীহগণ একমত হয়েছেন। (উমদাতুল কারী: ৭/৪৮) সূর্য গ্রহণের নামাযেও তিনি সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন মর্মে হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়। (বুখারী-১০০৫) তবে এর বিপরীতে নীরবে

কুরআন পাঠের অনুকূলে সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকায় অনেক ইমাম এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তিরমিযী-৫৩২) উপরন্তু যে সকল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. সূর্য গ্রহণের নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করেছেন সে সকল হাদীসের কোন বর্ণনাতে সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যায় না যে, রসূল স. কোন্ ছূরা পড়েছিলেন। এ কারণেও ইমামগণ সূর্য গ্রহণের নামাযে নীরবে কুরআন পাঠ করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, وأحب إلينا أن لا يجهر فيها بالقراءة আমাদের নিকট অধিক গ্রহণ যোগ্য হলো সূর্যগ্রহণের এ নামাযে আস্তে কিরাত পড়া। (কিতাবুল আছার লি মুহাম্মাদ-২২২)

উপরিউক্ত নামাযসমূহ ব্যতীত দিনের বেলায় পঠিত নামাযে নীরবে কুরআন পাঠ করতে হবে। আর রাতের নামাযে নীরবে বা স্বরবে উভয়ভাবে পড়া যেতে পারে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৫৩৩)

একাকী নামাযীর জন্য সশব্দে কুরআন পাঠ জরুরী নয়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا" قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ، كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ" أَيْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ "وَلَا تُخَافِتْ بِهَا" عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ، "وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا" (رواه البخارى فى بَابٍ: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا-١/٦٨٦)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. আল্লাহ তাআ'লার ইরশাদ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতটি রসূল স. মক্কায় লুকায়িত অবস্থায় নাজিল হয়েছে। তিনি যখন সাহাবায়ে কিরামকে নামায পড়াতেন তখন উচ্চ আওয়াজে কুরআন পাঠ করতেন। যখন মুশরিকরা কুরআন তিলাওয়াত শুনতো তখন তারা কুরআনকে গালি দিতো। যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং যিনি তা নিয়ে এসেছেন তাঁদেরকেও গালি

দিতো। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا আপনি আপনার নামায তথা কুরআনকে উচ্চ আওয়াজে পড়বেন না যাতে মুশরিকরা শোনে। আবার এমন নীচুস্বরে পড়বেন না যাতে আপনার সাথীরা শুনতে না পায়। বরং এর মাঝামঝি পন্থা অবলম্বন করুন। (বুখারী-৪৩৬৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭০৩)

শিক্ষণীয় : এ আয়াত এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সশব্দে কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য মুক্তাদীদেরকে কুরআন শুনানো। অতএব, যার পেছনে কোন মুক্তাদী নেই এমন একাকি ব্যক্তির জন্য জিহরী (সশব্দে) নামাযে সশব্দে কুরআন পড়া জরুরী নয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৮২, ৫৩৩)

ফরয নামাযের ১ম রাকাত ২য় রাকাতের চেয়ে লম্বা হওয়া

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ -

(رواه البخارى فى بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ–١/١٠٥)

অনুবাদ : হযরত আবু কতাদাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যোহরের প্রথম দু'রাকাতে ছূরা ফাতিহা এবং দুটি ছূরা পড়তেন। প্রথম রাকাতে ছূরা লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাকাতে খাটো করতেন এবং কখনো কখনো একটি আয়াত শুনিয়ে দিতেন। তিনি আসরের নামাযেও ছূরা ফাতিহা এবং দুটি ছূরা পড়তেন আর প্রথম রাকাতে ছূরা লম্বা করতেন। ফজরের নামাযেও তিনি প্রথম রাকাতে ছূরা লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাকাতে খাটো করতেন (বুখারী : ৭২৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪৪৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক ফরয নামাযের প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় লম্বা করতেন।

অতএব, এটাই ছুন্নাত এবং উত্তম পদ্ধতি। এখানে নমুনা হিসেবে তিন ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৪২)

ফরয নামাযে এক রাকাতে একাধিক ছূরা পড়া যেতে পারে

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

(رواه البخارى فى بَابِ الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ–١/١٠٦)

অনুবাদ : হযরত আবু ওয়ায়েল বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট এসে বললো, আমি গতরাতে এক রাকাতে মুফাছছল ছূরাগুলো তিলাওয়াত করেছি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, তাহলে তুমি কবিতার ন্যায় দ্রুত পড়েছো। রসূলুল্লাহ স. একই রকম যে সকল ছূরা মিলিয়ে পড়তেন সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি। অতঃপর তিনি মুফাছছল ছূরাসমূহের বিশটি ছূরার নাম উল্লেখ করে বললেন, রসূলুল্লাহ স. প্রতি রাকাতে এর দুটি করে ছূরা পড়তেন। (বুখারী: ৭৩৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪৭০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. এক রাকাতে একাধিক ছূরা পাঠ করতেন। অবশ্য এ হাদীসে ফরয বা নফল কোন কথা উল্লেখ না থাকায় নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে, এটা ফরযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না। তবে সাহাবায়ে কিরাম ফরয নামাযের একই রাকাতে একাধিক ছূরা পড়ার আমল করতেন। তা থেকে অনুমিত হয় যে, এক রাকাতে একাধিক ছূরা পড়ার আমলটি হয়তো রসূলুল্লাহ স.-এর ফরয নামাযেও ছিলো। আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর থেকেই এ আমল গ্রহণ করেছেন।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ أَلَمْ تَرَ، وَلِئِيلَافِ جَمِيعًا ـ

অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে মাইমূন রহ. বলেন, হযরত ওমর রা.

আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ালেন। তিনি মাগরিবের নামাযে প্রথম রাকাতে ছূরা তীন এবং দ্বিতীয় রাকাতে ছূরা ফীল ও কুরাইশ পাঠ করেছেন। (আব্দুর রাজ্জাক-২৬৯৭, ইবনে আবি শাইবাহ-৩৬১৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী। আবু ইসহাকের বিরুদ্ধে তাদলীসের অভিযোগ থাকলেও তা তেমন জোরাল নয়। বুখারী-মুসলিমে ত্রিশটির বেশি হাদীস রয়েছে যা তিনি عَنْ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষণীয় : হযরত ওমর রা.-এর আমল সম্বলিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের এক রাকাতে একাধিক ছূরা পাঠ করা যায়। এ নামাযে যেহেতু তিনি ইমাম ছিলেন, তাই বলা যায় যে, ফরয নামাযের ইমাম চাইলেও এ আমল করতে পারেন। অনুরূপ আমল হযরত ইবনে ওমর রা. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। (মুসনাদে আহমদ-৪৬১০) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আবার তিনি একাকী নামাযে একাধিক ছূরা পাঠ করেছেন মর্মেও সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে মুয়াত্তা মালেক, প্রথম খণ্ডের ১৩২ পৃষ্ঠায়। জামেউল উসূল ৩৪৬৬ নং হাদীসের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাকী ফরয নামায আদায়কারী কোন ব্যক্তি চাইলেও এ আমল করতে পারে।

হযরত ওমর রা.-এর আমল সম্বলিত হাদীসটি বর্ণনান্তে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, وفيه ردٌّ صريح على من يكره من أصحابنا الجمع بين السورتين في ركعة من الفرض. আমাদের ইমামগণের মধ্যে যারা ফরয নামাযের এক রাকাতে একত্রে দুটি ছূরা পাঠ করাকে মাকরূহ মনে করেন হাদীস দ্বারা তাদের বক্তব্য স্পষ্টরূপে খণ্ডিত হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১৫৪৬)

ফরয নামাযে একই ছূরা একাধিক রাকাতে না পড়া ভালো

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا

فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا (رواه ابو داود فى بَابِ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ-١/١١٨)

অনুবাদ : জুহাইনা গোত্রের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ স.কে ফজরের নামাযের উভয় রাকাতে ছূরা ঝিলঝাল পড়তে শুনেছেন। সাহাবী বলেন, আমি জানি না তিনি এটা ভুলে করেছেন, নাকি ইচ্ছা করে করেছেন। (আবূ দাউদ-৮১৬, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৪০২১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (উমদাতুল কারী, অধ্যায়: ফজরের নামাযে কুরআন পাঠ)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ বলেন, إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه لا يكره، ولكن ينبغي أن لا يفعل، ولو فعل لا بأس به যদি কোন ব্যক্তি নামাযের উভয় রাকাতে একই ছূরা পাঠ করে তা নিয়ে মাশায়েখগণ মতবিরোধ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো এটা মাকরূহ নয়। তবে এ রকম না করা উচিত, অবশ্য করলেও ক্ষতি নেই। (শরহু সুনানি আবি দাউদ, অধ্যায়: উভয় রাকাতে একই ছূরা পাঠ করা) নফল নামাযে একই আয়াত বা একই ছূরা বারবার পড়ার উদাহরণ রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলে অহরহ পাওয়া যায়। এ কারণে নফল নামাযে এ আমল বৈধ। তবে ফরয নামাযে এ আমলের উদাহরণ তেমন পাওয়া যায় না। অতএব, ফরয নামাযে এটা অনুত্তম বা মাকরূহে তানযিহী। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৫৪৬)

নামাযে পঠিত ছূরার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا قَالَ: ذَاكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ. (رواه القاسم بن سلام فى فضائل القرآن فى بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ)

অনুবাদ : হযরত আবু ওয়ায়েল রহ. বলেন, অমুক ব্যক্তি কুরআন উল্টা করে পড়ে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বললেন, ঐ ব্যক্তির অন্তর উল্টা। (ফাযায়েলুল কুরআন লিলকাসেম ইবনে সাল্লাম, আব্দুর রাজ্জাক-৯৭৪৭, ইবনে আবি শাইবা-৩০৯৩৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী-৮৮৪৬, শুআবুল ঈমান-২১১০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। আল্লামা হাইসামী বলেন, এ হাদীস-টির রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ-১১৬৮৬)

وَلَكِن وَجهه عِنْدِي أَن يَبْدَأ من آخر الْقُرْآن من المعوذتين ثمَّ يرْتَفع إِلَى الْبَقَرَة كنحو مَا يتعَلَّم الصّبيان فِي الْكتاب لِأَن السّنة خلاف هَذَا (ذكره أبو عُبيد القاسم بن سلاّم ، المتوفى: ٢٢٤هـ ، في كتابه: غريب الحديث)

"نكس" তথা উল্টো কুরআন পাঠের ব্যাখ্যা অনেকে এভাবে করে থাকে যে, উল্টো পড়া হলো- ছূরার শেষ থেকে পড়তে পড়তে প্রথমে আসা। আমি মনে করি এটা কারো দ্বারা সম্ভব নয়। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের যুগে এর প্রচলনও ছিলো না। আর আমি নিজেও ঐ শব্দের এ অর্থ বুঝি না। বরং আমার নিকট এর অর্থ হলো- কুরআনের শেষ তথা ছূরা নাস ও ফালাক থেকে পড়তে পড়তে ছূরা বাকারায় এসে থামা; ছোট ছেলে-মেয়েরা যেভাবে কুরআন পড়ে থাকে। এটা কুরআন পাঠের ছুন্নাত তরীকা নয়। (গরীবুল হাদীস, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০৩)

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ الْبَقَرَةِ إِلَى أَسْفَلَ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আমার নিকট পছন্দনীয় হলো বাকারা থেকে নিচের দিকে পড়া। (আল মুগনী লিইবনে কুদামা, পরিচ্ছেদ নং-৬৮৬)

সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি, বিশিষ্ট শায়খ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল উছাইমীন (মৃত্যু-১৪২১হি.) বলেন, وأما تنكيس السُّور؛ فيُكره، وقيل: يجوز. ولكن؛ القول بالكراهة قولٌ وسطٌ ছূরা উল্টা দিক থেকে পাঠ করা মাকরূহ, কেউ বলেন, জায়েয। তবে মাকরূহের মন্তব্যটি বেশি ভারসাম্যপূর্ণ। (আশ শরহুল মুমতি' আলা ঝাদিল মুস্তানকি', খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৯)

এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী রহ. (মৃত্যু-৫২০হি.) বলেন, ذهب ابن حبيب إلى أن القراءة على تأليفه أفضل، وحكى ذلك عن مالك ইবনে হাবীব এ মত গ্রহণ করেছেন যে, কুরআনের সংকলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পড়া উত্তম। ইমাম মালেক রহ. থেকেও তিনি এ মত বর্ণনা করেছেন। (আল্ বয়ান ওয়াত তাহসীল, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪১)

উপরিউক্ত হাদীস ও তার ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, উল্টাভাবে কুরআন পাঠ করা মাকরূহ। আর রসূল স.ও ছূরার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নামাযে কুরআন পাঠ করতেন। এর ব্যতিক্রম তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। কেবল মুসলিম শরীফে হযরত হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. তাহাজ্জুদ নামাযে প্রথমে ছূরা নিসা এবং পরে আল ইমরান পাঠ করেছেন। এ সব কিছুর আলোকে

হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এই যে, ফরয-ওয়াজিব নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে ছূরার ধারাবাহিকতা লঙ্ঘন করা মাকরূহে, তবে নফল নামাযে সর্বাবস্থায় মাকরূহবিহীন বৈধ। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৪৬)

প্রত্যেক উঠা-বসায় 'আল্লাহু আকবার' বলা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. (رواه البخارى فى بَابِ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ– ١٠٨/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. সাথীদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন এবং প্রতি উঠা-বসায় তাকবীর বলতেন। নামায শেষ করে বলতেন, তোমাদের মধ্যে আমার নামায রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। (বুখারীঃ ৭৪৯, মুসলিম-৭৫৩, ৭৫৭ ও ৭৫৮, নাসাঈ-১১৫৮, জামেউল উসূল-৩৩৮৫)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে প্রত্যেক উঠা-বসার সময় তাকবীর বলতে হয়। এ ছাড়াও হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন আবার রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। রুকু থেকে পিঠ সোজা করে উঠার সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه বলতেন এবং দাঁড়িয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন। অতঃপর সিজদাতে যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময়, আবার দ্বিতীয় সিজদাতে যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর বলতেন। এভাবেই পুরো নামায শেষ করতেন। আর দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক শেষে যখন উঠতেন তখনও তাকবীর বলতেন। (বুখারীঃ ৭৫৩) এ হাদীস থেকে আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে প্রত্যেক উঠা-বসায় তাকবীর বলতে হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামীঃ ১/৪৭৬)

অধ্যায় ১১ : রুকু-সিজদা

রুকু-সিজদায় দেরি করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (رواه البخارى فى بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ–٢/٩٨٦)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ স. মাসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে সালাম করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় করে ফিরে এসে সালাম করলো। তিনি উত্তরে বললেন, তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। লোকটি তৃতীয় বারে বললো, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যখন তুমি নামায আদায় করবে তখন ভালোভাবে অযু করে নিবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে এবং কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমার সমস্ত নামাযে এমনই করবে। (বুখারী: ৬২১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি

মুসলিম-৭৭০, নাসাঈ-৮৮৭, আবূ দাউদ-৮৫৬, ইবনে মাযা-১০৬০ এবং তিরমিযী শরীফ-৩০২ এবং জামেউল উসূল-৩৫৭৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রুকু-সিজদায় স্থির হওয়া ওয়াজিব। রুকু-সিজদায় গিয়ে সর্বনিম্ন কতটুকু সময় অপেক্ষা করলে ওয়াজিব আদায় হয় এ ব্যাপারে উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, مِقْدَارُ الرُّكُوعِ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ رَاكِعًا وَمِقْدَارُ السُّجُودِ أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، فَهَذَا مِقْدَارُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ রুকু এবং সিজদায় যে পরিমাণ দেরি না করলেই নয় তা হলো, রুকু-সিজদায় গিয়ে স্থির হওয়া। (ত্বহাবী শরীফ-১৩৯২ নং হাদীসের আলোচনায়, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৭) ইমাম ত্বহাবীর এ বক্তব্য থেকেও সর্বসাধারণের নিকট ধীরস্থিরের পরিমাণ নির্ধারণ করা কষ্টকর হতে পারে। তাই তাদের জন্য আরো সহজ করে বলা যেতে পারে যে, একবার তাসবীহ পাঠ করা যায় এই পরিমাণ সময় রুকু-সিজদায় অপেক্ষা করলে সেটাকে স্থিরতা বলা যায় এবং এর দ্বারা রুকু-সিজদা পূর্ণ হয়ে যায়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ৪৬৪) তবে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতে এ ধরনের তাড়াহুড়া কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পাঠ করার মতো সময় অপেক্ষা করা উচিত।

রুকুতে শক্ত করে হাঁটু ধরা, হাত সোজা রাখা, পাঁজর থেকে পৃথক রাখা মাথা, পিঠ ও কোমর বরাবর রাখা এবং হাতের আঙ্গুল ফাঁকা রাখা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ

(رواه ابو داود فى بَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ–١/١٠٧)

অনুবাদ : হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী, আবু উসায়েদ, সাহল ইবনে সাআদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এ সময় আবু হুমায়েদী রা. বললেন,

তোমাদের মধ্যে আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে বেশি জানি। অতঃপর নামাযের কিছু বিষয় আলোচনা করে বললেন, রসূলুল্লাহ স. রুকুতে উভয় হাত দ্বারা হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং উভয় হাত পার্শ্বদেশ থেকে আলাদা রাখতেন। (আবূ দাউদ: ৭৩৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীস-টি হাসান-সহীহ (তিরমিযী-২৬০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী-৭৯০, তিরমিযী-২৬০, ইবনে মাযা-৮৬৩ এবং জামেউল উসূল-৩৫৫৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আরো হাদীস বর্ণিত আছে সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৫৪৭, ২৫৪৯, ২৫৫০ ও ২৫৫১ নম্বরে।

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلامٌ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ اسْتَوَى فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ الْمَاءُ لاسْتَقَرَّ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন রুকু করতেন তখন সোজাভাবে করতেন। যদি তাঁর পিঠের উপর পানি ঢালা হয় তাহলে অবশ্যই তা আপন স্থানে স্থির থাকবে। (আল মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী-১২৭৮১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, رجاله موثقون হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (মাযমাউজ যাওয়ায়েদ-২৭৩৭) আল্লামা মুনাবী বলেন, جيد من طَرِيق الطَّبَرَانِيِّ তবারানীর বর্ণনায় হাদীসটির সনদ উত্তম। (আত-তাইসীর: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫১)

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. রুকুতে আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁকা রাখতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম-৮১৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম যাহাবী রহ. উভয়ে এ হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে আরো হাদীস বর্ণিত আছে সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৫৫০ নম্বরে।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত তিনটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. রুকুতে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন, হাত সোজা রাখতেন, হাত দু'টো পাঁজর থেকে আলাদা রাখতেন, হাতের আঙ্গুল ফাঁকা রাখতেন, মাথা, পিঠ ও কোমর এমনভাবে সমান রাখা যে পিঠের উপর পানি ঢেলে দিলেও তা সহজে কোন দিক না গড়ায়। রুকুর ক্ষেত্রে এ নিয়মগুলো মেনে চলা দরকার। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৯৩) হযরত আয়েশা রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. যখন রুকু করতেন তখন মাথা নীচুও করতেন না, উঁচুও করতেন না। বরং উঁচু-নীচুর মধ্যবর্তী অবস্থায় রাখতেন। (মুসলিম: ৯৯৩)

রুকু-সিজদায় তাসবীহ পাঠ ও তার পরিমাণ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ سليمان بن مهران الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. (رواه الترمذی فی بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ– ١/ ٦٠)

অনুবাদ : হযরত হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়লেন। তিনি রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ এবং সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলছিলেন। আর রহমতের আয়াত আসলে সেখানে থেমে রহমত প্রার্থনা করছিলেন এবং আজাবের আয়াত আসলে সেখানে থেমে তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর সিজদা ছিলো প্রায় কিয়ামের সমপরিমাণ। (তিরমিযী-২৬২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম-১৬৮৭, নাসাঈ: ১০৪৯, আবূ দাউদ-৮৭১ এবং ইবনে মাযা-৮৯৭ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রুকুর তাসবীহ

হলো سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ এবং সিজদার তাসবীহ হলো سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা। এ তাসবীহ ছাড়াও রসূলুল্লাহ স. মাঝে-মধ্যে বিভিন্ন তাসবীহ পড়েছেন মর্মে হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাঁর সার্বক্ষণিক আমল ছিলো এটাই। অতএব, রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলের অনুসরণে আমরা এটাই আঁকড়ে ধরবো।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ. (رواه النسائى فى عَدَدِ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ- ١/١٢٧)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, আমি এই যুবক অর্থাৎ ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ-এর চেয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নামায আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর রুকুতে এবং সিজদাতে তাসবীহ পাঠের পরিমাণ দশবার হবে বলে অনুমান করেছি। (নাসাঈ: ১১৩৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-৮৮৮ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. রুকু-সিজদায় দশবার তাসবীহ পড়তেন। মুসল্লীদেরকে এ আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। তারা দীর্ঘ নামাযে আগ্রহী হলে এবং তাদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল বা ব্যস্ত মানুষ না থাকলে ইমাম এ আমল করতে পারেন। কিন্তু মুক্তাদীদের জন্য কষ্টকর হলে রুকু-সিজদার তাসবীহ আরো কম পড়বে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রাহওয়াইহ) ইমামের জন্য পাঁচবার তাসবীহ পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন যেন মুক্তাদীদের তিনবারের কম না হয়। (তিরমিযী-২৬১)

حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا سُحَيْمٌ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا.

অনুবাদ : হযরত হুজাইফা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. রুকুতে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ এবং সিজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলতেন। (ত্বহাবী শরীফ: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৯, হাদীস নং-১৪১৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বলেন, وهو حديث حسن (তাখরীজু আহাদীসি এহইয়াউ উলূমিদ্দীন-২/৮১৪) এ ছাড়া হযরত উকবা ইবনে আমের রা. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. রুকু-সিজদার তাসবীহ তিনবার করে পাঠ করতেন। (আবূ দাউদ-৮৭০)

শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আবূ দাউদ-৮৭০ নং হাদীসের আলোচনায়) প্রসিদ্ধ অনেক ইমাম হযরত উকবা ইবনে আমের রা.-এর হাদীসটিকে রুকু-সিজদায় তিনবার তাসবীহ পাঠের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি প্রমাণ।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. রুকু-সিজদায় তিনবার তাসবীহ পাঠ করতেন। সুতরাং সকল মুসল্লীকেই সতর্ক থাকতে হবে যে, কারো রুকু-সিজদার তাসবীহ যেন তিনবারের কম না হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৯৪) এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন,

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ يَقُولُ الْمصَلِّي فِي رُكُوعِهِ سبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَفِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهُوَ أَقَلُّ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقُولَهَا الْإِمَامُ خَمْسًا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتَّى يُدْرِكَ الَّذِي خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -

অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আওঝাঈ, আবু ছাওর, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. বলেন, মুসল্লী রুকুতে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ এবং সিজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়বে। আর এটা হলো পূর্ণতার সর্বনিম্ন পরিমাণ। হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন, আমার নিকট পছন্দনীয় এই যে, ইমাম সাহেব পাঁচবার তাসবীহ পাঠ করবে যেন মুক্তাদী-

গণ তিনবার পাঠ করতে পারে। এ সকল ইমামগণের দলীল হলো উকবা ইবনে আমের রা.-এর হাদীস। (আল ইস্তিযকার: ১/৪৩২)

রুকু-সিজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পাঠের হাদীস আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত উকবা ইবনে আমের রা. থেকে, (আল মুজামুল কাবীর লিত তবারানী-৮৯০, আবূ দাউদ-৮৭০) হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে, (আবূ দাউদ-৮৮৬, তিরমিযী-২৬১, দারাকুতনী-১২৯৯, ইবনে মাযা-৮৯০, মুসনাদে বায্যার-১৯৪৭, ত্বহাবীঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৭, হাদীস নং-১৩৯১ ইবনে আবী শাইবা-২৫৮৭, ২৫৯০) জুবায়ের ইবনে মুতইম রা. থেকে, (মুসনাদে বায্যার-৩৪৪৭, দারাকুতনী-১২৯৬) হযরত হুজাইফা থেকে, (দারাকুত-নী-১২৯২, ইবনে মাযা-৮৮৮, মুসনাদে বায্যার-২৯২১, ২৯২৩,২৯৩১, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৬০৪, ৬৬৮, ত্বহাবীঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৯, হাদীস নং-১৪১৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আকরাম রা. থেকে, (দারাকুতনী-১২৯৭) হযরত আবু বাকরাহ রা. থেকে (মুসনাদে বায্যার-৩৬৮৬) বুরায়দাহ ইবনে হুসাইব রা. থেকে (মুসনাদে বায্যার-৪৪৬২) হযরত আলী রা. থেকে (ইবনে আবী শাইবা-২৫৭৭ ও ২৫৮৮) এবং হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে। (ইবনে আবী শাইবা-২৫৭৮) এ সকল হাদীসের প্রত্যেকটির উপরে স্বতন্ত্রভাবে কিছু আপত্তি থাকলেও সম্মিলিতভাবে এর একটি বাড়তি গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয় যা জঈফ হাদীসকেও হাসান লিগাইরিহীর স্তরে উন্নীত করে। উপরন্তু আল্লামা আলাউদ্দীন মুগল্তঈ রহ. হযরত আবু বাকরাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (শরহে সুনানে ইবনে মাযা অধ্যায়ঃ রুকু-সিজদায় তাসবীহ পাঠ)

সর্বনিম্ন কতটুকু ঝুঁকলে রুকু শুদ্ধ হয়

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ

অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন বলেন, দু'হাত দ্বারা হাঁটু ধরতে পারে এতটুকু ঝুঁকাই রুকুর জন্য যথেষ্ট, আর জমিনে কপাল রাখতে পারে এতটুকু ঝুঁকাই সিজদার জন্য যথেষ্ট। (ইবনে আবী শাইবা-২৫৯৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/ মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

অনুবাদ : হযরত মা'কিল ইবনে উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বনিম্ন কতটুকু হলে রুকু-সিজদা আদায় হয়? তিনি বললেন, (সিজদায়) যখন জমিনে কপাল রাখবে আর (রুকুতে) দুই হাঁটুতে হাত রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৫৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের সকলে রাবীই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাঁটু স্পর্শ করতে পারা পর্যন্ত ঝুঁকলে রুকু শুদ্ধ হয়ে যাবে। অনুরূপ বর্ণনা হযরত মুজাহিদ রহ. থেকেও বর্ণিত আছে। (ইবনে আবী শাইবা-২৬০০) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ৪৪৭)

উল্লেখ্য, এ মাসআলাটি আমলের জন্য লেখা হয়নি; বরং বিশেষ দুটি কারণে লেখা হয়েছে।

এক. এ বিষয়টি জেনে রাখা দরকার যাতে রুকু শুদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্ন দেখা দিলে তখন এ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তি জামাতে এসে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে তার সাথে রুকু করলো। মুক্তাদী মাত্র হাঁটুতে হাত রেখেছে এখনো পূর্ণভাবে ঝুঁকতে পারেনি ইতিমধ্যে ইমাম রুকু থেকে উঠে গেছে তখন এ মাসআলা দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে যে, ঐ ব্যক্তির রুকু শুদ্ধ হয়েছে এবং ইমামের সাথে সে উক্ত রাকাত পেয়েছে।

দুই. নারীগণ পূর্ণ না ঝুঁকে তাদের রূপ সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য এতটুকু ঝুঁকে রুকু করবে যেন দু'হাত হাঁটু স্পর্শ করে। এ বিষয়ের প্রমাণ পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে।

নারীদের রুকু-সিজদার তরীকা

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا.

অনুবাদ : হযরত আলী রা. বলেন, মহিলারা যখন সিজদা করবে তখন নিজেদেরকে গুটিয়ে নিবে এবং রান (পেটের সাথে) মিলিয়ে রাখবে।

(ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৩, আব্দুর রাজ্জাক-৫০৭২)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকূফ। হারেস ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর হারেসকে অধিকাংশ ইমাম জঈফ বললেও কোন কোন ইমাম তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আহমদ ইবনে সালেহ বলেন, الحارث الاعور ثقة ما احفظه وما احسنه ما روى عن على وأثنى عليه "হারেস আল-আওয়ার নির্ভরযোগ্য, হযরত আলী রা. থেকে তাঁর বর্ণনাকে তিনি কত সুন্দরভাবে স্মৃতিস্থ করেছেন! এ কথা বলে তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন"। ইবনে আবী খাইসামা বলেন, قيل ليحى يحتج بالحارث فقال مازال المحدثون يقبلون حديثه "ইমাম ইয়াইয়া রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলো: হারেসের দ্বারা কি দলীল গ্রহণ করা যায়? তিনি বললেন,: মুহাদ্দিস-গণ সর্বদাই তাঁর হাদীস গ্রহণ করে থাকেন"। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন, ليس به بأس "কোন অসুবিধা নেই"। (তাহজীবুত তাহজীব) হারেস সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান বলেছেন। (তিরমিযী-২৭৩৬)

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে মহিলাদের নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, জড়োসড়ো হয়ে এবং গুটিয়ে থাকবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا، وَلْتَضَعْ بَطْنَهَا عَلَيْهِمَا.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, নারীগণ যখন সিজদা করবে তখন রান মিলিয়ে রাখবে এবং পেট রানের উপর রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى

فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ.

অনুবাদ : পুরুষগণ নারীদের মতো সিজদার সময় রানের উপর পেট রাখাকে মুজাহিদ রহ. অপছন্দ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُلْزِقْ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، وَلاَ تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا، وَلاَ تُجَافِي كَمَا يُجَافِي الرَّجُلُ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, নারীগণ যখন সিজদা করবে তখন তার পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। আর নিতম্ব উঁচু করে রাখবে না এবং (বাহু) পুরুষদের মতো ফাঁকা করে রাখবে না। (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ "

অনুবাদ : হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. বলেন, মহিলারা যখন রুকু করবে তখন জড়োসড়ো হয়ে করবে। হাত উঠিয়ে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। অতঃপর যখন সিজদা করবে দু'হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পেট ও সিনা রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। (আব্দুর রায্যাক: ৫০৬৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

কিছু ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী উপরিউক্ত হাদীসগুলো মাউকূফ বা মাকতু'। ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের কথা মারফু' হাদীসের অনুরূপ। আর তাবিঈগণের মাকতু' হাদীস বা 'আছার এর মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে।

উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদের জন্য রুকু সিজদায় জড়োসড়ো হয়ে থাকা উত্তম।

এ হাদীসগুলো থেকে একটি নীতিমালাও বের হয়ে আসে যে, নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নারীদের কণ্ঠস্বর নীচু রাখা, রূপ-সৌন্দর্য ও শারীরিক অবয়ব ঢেকে রাখার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের জন্য এটা ছুন্নাত তরীকার আওতাভূক্ত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৯৪, ৫০৪)

এ নিয়মের আওতায় নামাযে কিছু ঘটলে পুরুষগণ তাসবীহ দ্বারা সতর্ক করবে আর নারীগণ ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পৃষ্ঠদেশে সজোরে আঘাত করে সতর্ক করবে। (বুখারী: ১১৩০)। ঠিক একই নিয়মের আওতায় নারীদের নামায অন্দর কুটিরে উত্তম। (আবূ দাউদ: ৫৬৭) এ ছাড়া নারীদের জন্য রুকু-সিজদায় জড়োসড়ো হয়ে থাকা, (ইবনে আবী শাইবা: ২৭৯৩-২৭৯৮) নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় বুকের উপর হাত বাঁধা এবং বৈঠকের সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্ব জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখাসহ বেশ কিছু মাসআলায় নারীদের ভিন্নতা রয়েছে। এ নিয়মের আওতায় নারীগণ রুকুতে সামান্য ঝুঁকবে। এ শেষোক্ত মাসআল-ার দলীল হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীসটিও পেশ করা যেতে পারে।

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الجَعْدِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنَةٍ لِسَعْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تَطَأْطُؤًا مُنكَرًا ، فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ : إِنَّمَا يَكْفِيك إِذَا وَضَعْت يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك.

অনুবাদ : আয়েশা ডবনতে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি রুকুতে খুব বেশি ঝুঁকতেন যা দৃষ্টিকটু। অতঃপর হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. তাকে বললেন, তোমার দু'হাত হাঁটুতে রাখলে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (ইবনে আবী শাইবা: ২৫৯২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের ভিত্তিতে নারীদের জন্য ছুন্নাত হলো পুরুষের তুলনায় কম ঝুঁকা। তবে অবশ্যই এতটুকু ঝুঁকতে হবে যাতে উভয় হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। অন্যথায় রুকু হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ১/৪৯৪) এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে নারীদের শরীর তুলনামূলক বেশি আবৃত থাকে, রুকু শুদ্ধ হয় আবার জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা.-এর কথার প্রতি আমলও হয়ে যায়।

রুকু থেকে উঠার সময় এবং উঠার পরে যা পড়তে হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (رواه البخارى فى بَابِ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ–١/١٠٨)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। আবার রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। রুকু থেকে পিঠ সোজা করার সময় **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** এবং দাঁড়িয়ে **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** বলতেন। (বুখারীঃ ৭৫৩) অনুরূপ বর্ণনা আরো বর্ণিত হয়েছে নাসাঈ-১১৫৯ এবং আবূ দাউদ-৭৩৩, জামেউল উসূল-৩৫৮১ নম্বরে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাকী নামাযী রুকু থেকে উঠার সময় **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** এবং রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বলবে। ইমামও অনুরূপ বলবে। অবশ্য বুখারী শরীফের ৭৬০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম শুধু **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলবেন। আর মুক্তাদীরা শুধু **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** বলবে। উভয় হাদীসের উপরই আমল করা যেতে পারে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামীঃ ১/৪৯৭) বুখারী শরীফের ৭৬৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জনৈক সাহাবা রসূল স.-এর পেছনে নামায পড়ছিলেন। রসূল স. **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলে রুকু থেকে উঠলে তিনি বললেন, **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ** নামায শেষে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন, আমি ত্রিশজনেরও বেশি ফেরেশ্তাকে দেখলাম কে আগে এর সওয়াব লিখবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। এটাকেও আমরা ছুন্নাত আমল বলে বিশ্বাস করি। রসূল স. নিজে কখনো এ আমল করেছেন বলে আমার জানা নেই। অবশ্য, তাঁর প্রশংসাই আমলের জন্য যথেষ্ট।

রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে স্থির হওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ

تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (رواه البخارى فى بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ-٢/٩٨٦)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ স. মাসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে সালাম করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় করে ফিরে এসে সালাম করলো। তিনি উত্তরে বললেন, তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। লোকটি তৃতীয় বারে বললো : অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যখন তুমি নামায আদায় করবে তখন ভালোভাবে অযু করে নিবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে এবং কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমার সমস্ত নামাযে এমনই করবে। (বুখারী : ৬২১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম-৭৭০, নাসাঈ-৮৮৭, আবূ দাউদ-৮৫৬, ইবনে মাযা-১০৬০ এবং তিরমিযী শরীফ-৩০২ এবং জামেউল উসূল-৩৫৭৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

(رواه البخارى فى بَابِ حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةِ١/١٠٩)

অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, নামাযে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ব্যতীত রসূলুল্লাহ স.-এর রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মাঝের বৈঠক ও রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো প্রায় সমপরিমাণ ছিলো। (বুখারী : ৭৫৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৪৯৪)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ র.-এর আমল ছিলো রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তারপরে সিজদা করা। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৯৭, ৫০৫)

এ শিরোনামের অধীনে বর্ণিত প্রথম হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, প্রতি রাকাতে দুটি সিজদা করাও আবশ্যক। এ বিষয়ে আরো অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

সিজদায় যাওয়ার সময় সোজা হয়ে নীচু হওয়া

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ، وَهُوَ ابْنُ مَاهِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ أَخِرَّ إِلاَّ قَائِمًا. (رواه النسائى فى بَابِ كَيْفَ يخِر لِلسُّجُودِ–١/١٢٢)

অনুবাদ : হযরত হাকীম ইবনে হিঝাম রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এ কথার উপর বাইআত গ্রহণ করেছি যে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থা ছাড়া সিজদার জন্য নীচু হব না। (নাসাঈ : ১০৮৭ মুসনাদে আহমদ-১৫৩১২, সুনানুল কুবরা লিননাসাঈ-৬৭৫, শরহু মুশকিলিল আছার-২০৪, আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী-৩১০৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, **إسناده حسن** হাদীসটির সনদ হাসান। (জামে-উল উসূল-৩৫১৬ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. রুকু থেকে পূর্ণ সোজা হওয়ার পরে সিজদার জন্য নীচু হওয়া। দুই. সিজদার জন্য নীচু হওয়ার সময় ঝুঁকে না পড়া। বরং শরীর সোজা রেখে হাঁটু এবং কোমর ভাজ করা। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৯৭)

সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু এবং পরে হাত রাখা

حَدّثَنَا أَبُو الْعبّاسِ بْنُ محمّدٍ الدوري الْعَلَاءِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ.

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে তাকবীর বলার সময় উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কান বরাবর করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি এমনভাবে রুকু করলেন যে, তাঁর প্রতিটি জোড়া স্থির হয়ে গেলো। আর তাকবীর বলে (সিজদার জন্য) নীচু হলেন এবং উভয় হাঁটু হাতের আগে রাখলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ৮২২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম যাহাবী রহ. হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ছিলো সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু এবং পরে হাত রাখা।

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ فِي وَضعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ-١/٦١)

অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে দেখেছি: তিনি সিজদার সময় উভয় হাত রাখার আগেই উভয় হাঁটু রেখেছেন। আর সিজদা থেকে উঠার সময় উভয় হাত উভয় হাঁটুর আগে উঠিয়েছেন। (তিরমিযী: ২৬৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-গরীব বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি আবূ দাউদ-৮৩৮, নাসাঈ-১০৯২ এবং ইবনে মাযা-৮৮২ এবং জামেউল উসূল: ৩৫১৭ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ছিলো সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু এবং পরে হাত রাখা। আর সিজদা থেকে উঠার সময় এর বিপরীত করা। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসের আলোচনায় আরো মন্তব্য করেছেন যে, অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের আমলও এ হাদীস অনুযায়ী।

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

অনুবাদ : হযরত ওমর রা. হাঁটুর উপর ভর করে (সিজদার জন্য) নীচু হতেন (ইবনে আবী শাইবা : ২৭১৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত হায়াতুল হায়ওয়ানের হাদীস ও আছারের তাখরীজে ৮৪৪ নং পৃষ্ঠায় এ হাদীসটিকে সহীহ বলা হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমর রা.-এর আমল ছিলো সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু রাখা।

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: هَلْ يَفْعَلُهُ إِلاَّ مَجْنُونٌ ؟!.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ.কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সিজদার সময় হাঁটুর আগে হাত রাখে। তিনি এটাকে অপছন্দ করলেন এবং বললেন,: পাগল ছাড়া কেউ এমন করে? (ইবনে আবী শাইবা : ২৭২২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত সকল হাদীস এবং সাহাবা ও তাবিঈগণের আমল থেকে প্রমাণিত হলো যে, সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু এবং পরে হাত রাখতে হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৯৭)

উল্লিখিত পদ্ধতির বিপরীতে সিজদা করার সময় আগে হাত এবং পরে হাঁটু রাখা, আর উঠার সময় আগে হাঁটু এবং পরে হাত উঠানোর আমলও হাদীসে বর্ণিত আছে। তবে আমরা এ হাদীসকে আমলের জন্য বেশি উপযোগী মনে করি। কারণ ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান

বলার সাথে সাথে এ হাদীসের উপর অধিকাংশ আহলে ইল্‌ম-এর আমল রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা.-এর আমলও এটাই। ইবনে খুযাইমা রহ. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে এ বিষয়ক একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين "আমরা হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতাম। অতঃপর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে"। (সহীহ ইবনে খুযাইমা : ৬২৮) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখার হাদীসটি রহিত। অবশ্য সহীহ ইবনে খুযাইমার এ হাদীসটি সহীহ নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখার ব্যাপারে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে বর্ণিত তিরমিযী-২৬৮ নং হাদীসটি মিশকাত শরীফের ৮৯৮ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। এরপর হযরত আবু হুরায়রা রা. অপর একটি হাদীসে এর বিপরী-তে সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত ও পরে হাটু রাখার আমল বর্ণনা করার পর মাসাবীহুছ্ছুন্নাহর লেখক ইমাম ইমাম খত্তাবী রহ.-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি হাদীসটিকে রহিত বলেছেন। অর্থাৎ সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত ও পরে হাঁটু রাখার আমল বহাল নয়; বরং রহিত।

সিজদার সময় যে সকল অঙ্গ জমিনে লাগিয়ে রাখতে হয়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ . وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ (رواه البخارى فى بَابِ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ-١/١١٢)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আমাকে সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ কপাল দ্বারা, এ কথা বলে তিনি হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা করে নাককেও এর অন্তর্ভুক্ত করলেন। (অতঃপর বললেন,) উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর এটাও বলা হয়েছে যে, আমরা যেন কাপড় ও চুল না গুটাই। (বুখারী : ৭৭৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী-৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৮, ৭৭৯, মুসলিম-৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১,

৯৮২, ৯৮৩, নাসাঈ-১০৯৬, ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, তিরমিযী-২৭৩, আবূ দাউদ-৮৯০, ৮৯১, ইবনে মাযা-৮৮৩ এবং জামেউল উসূল-৩৫২৭ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদার সময় উপরিউক্ত সাতটি অঙ্গ জমিনে লাগাতে হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৯৭, ৪৯৮)

সিজদার সময় চেহারা দু'হাতের মাঝে রাখা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ–١/٦٢)

অনুবাদ : হযরত আবু ইসহাক রহ. বলেন, আমি হযরত বারা ইবনে আযেব রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল স. সিজদার সময় চেহারা কোথায় রাখতেন? উত্তরে তিনি বললেন, উভয় হাতের মাঝে রাখতেন। (তিরমিযী : ২৭১)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে সহীহ সনদে অনুরূপ হাদীস ইবনে আবী শাইবা-২৬৮১ এবং মুসলিম-৭৮১ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদার সময় মাথা উভয় হাতের মাঝে রাখতে হয়। আর দু'হাত থেকে মাথার দূরত্ব এতটুকু রাখতে হয় নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত দুটি মাথা থেকে যতটুকু দূরে ছিলো। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৯৭, ৪৯৮)

সিজদায় হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَازِنُ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন

সিজদা করতেন তখন (হাতের) আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৮২৬, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৬৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান-১৯২০, আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী, ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র-এর হাদীস নং-২৬, দারাকুত-নী-১২৮৩, সুনানে কুবরা লিলবায়হাকী-২৬৯৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম যাহাবী রহ. উভয়ই হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদায় হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখতে হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৯৮)

সিজদায় বাহু পাঁজর থেকে, কনুই জমিন থেকে এবং পেট রান থেকে পৃথক রাখা আর পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ (رواه البخارى فى بَابِ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ–١/١١٤)

অনুবাদ : হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী রা. বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি তাকবীর বলার সময় উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত উঠাতেন। যখন রুকুতে যেতেন তখন উভয় হাত দ্বারা হাঁটু মজবুত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান রাখতেন। অতঃপর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন এমনভাবে সোজা হতেন যে, হাড্ডির প্রতিটা জোড়া স্বস্থানে ফিরে যেত। এরপর যখন সিজদা করতেন, উভয় হাত বিছিয়েও দিতেন না, আবার একেবারে গুটিয়েও রাখতেন না। আর পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলার দিকে রাখতেন। (বুখারী : ৭৯০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী-৩০৪ এবং আবূ দাউদ শরীফ-৭৩০ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল-৩৫৭৬) এ হাদীসের সনদের উপর হাদীস বিশারদগণের দুটি আপত্তি রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন "তাশাহুদে বৈঠকের পদ্ধতি" শিরোন-

ামে।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদার সময় বাহু পাঁজর থেকে এবং কনুই জমিন থেকে পৃথক রাখতে হয়। আর পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কিবলামুখী করে রাখতে হয়। এ বিষয়টি আরো বর্ণিত হয়েছে নাসাঈ : ১১০৪, সুনানুল কুবরা লিননাসাঈ-৬৯২, তিরমিযী-৩০৪ নম্বরে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫০৩)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ. (رواه ابو داود فى بَابِ صِفَةِ السُّجُودِ–١/١٣٠)

অনুবাদ : হযরত মাইমুনা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন সিজদা করতেন তখন উভয় হাতকে এত দূরে রাখতেন যে, কোন বকরীর বাচ্চা ইচ্ছা করলে হাতের নীচ দিয়ে চলে যেতে পারতো। (আবূ দাউদ : ৮৯৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **إسناده صحيح** হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ-৮৯৮ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম-৯৯০, ইবনে মাযা-৮৮০, এবং নাসাঈ শরীফ-১১১২ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৫০২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদায় পেট রান থেকে পৃথক রাখতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫০৩) এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুমায়েদ রা. থেকে বর্ণিত আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে। সে বর্ণনায় তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন সিজদা করতেন তখন দুই রান এমনভাবে ফাঁকা রাখতেন যে, পেটের কোন অংশ রানের উপর চাপাতেন না। (আবূ দাউদ : ৭৩৫)। তবে নারীদের ক্ষেত্রে মাসআলা ব্যতিক্রম। তারা পেট রানের সঙ্গে মিলিয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। (শামী : ১/৫০৪) তার বিবরণ "নারীদের রুকু-সিজদার তরীকা" শিরোনামে দেখুন।

সিজদায় উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ.

(رواه مسلم فى بَابِ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ–١/١٩٢)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ স.কে বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাত তাঁর পায়ের তালুতে গিয়ে লাগলো। তখন তিনি সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর পা দুটি খাড়া ছিলো। (মুসলিম : ৯৭৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-৮৭৯, তিরমিযী-৩৪৯৩, নাসাঈ-১৬৯, ইবনে মাযা-৩৮৪১, মুসনাদে আহমদ-২৫৬৫৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৬৫৫ এবং মুয়াত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৫৯)

পর্যালোচনা : এ হাদীসে উভয় পা খাড়া রাখার কথা বলা হয়েছে। তবে পা মিলিয়ে রাখবে বা ফাঁকা রাখবে এমন কিছুই বলা হয়নি। অবশ্য হানাফী মাযহাবে উভয় পা মিলিয়ে রাখা ছুন্নাত বলা হয়েছে। (শামী : ১/৪৯৩) লুঙ্গি পরিহিত ব্যক্তির জন্য এ নিয়ম পালন করা বেশি উপযোগী হবে। কারণ বাতাসে লুঙ্গি উড়ে সতর খুলে যেতে পারে।

দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে ধীরস্থিরভাবে বসা

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ. وَالْقِرَاءَةِ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. নামায শুরু করতেন তাকবীর দ্বারা এবং কুরআন পাঠ শুরু করতেন ছূরা ফাতিহা দ্বারা। আর রুকু করার সময় তিনি মাথা নীচুও করতেন না, উঁচুও করতেন না; বরং উঁচু-নীচুর মধ্যবর্তী অবস্থানে সমানভাবে রাখতেন। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন একেবারে সোজা না হয়ে সিজদায় যেতেন না। অতঃপর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। আর তিনি প্রত্যেক দু'রাকাত শেষে আত্তাহি-য়্যাতু... পড়তেন। বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। (দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে) পায়ের গোড়ালীর উপর নিতম্ব

রেখে শয়তানের মতো বসা থেকে তিনি নিষেধ করতেন। (মুসলিম : ৯৯৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-৭৮৩, মুসনাদে আহমদ-২৪০৩০ এবং সহীহ ইবনে হিব্বান-১৭৬৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৫৮২)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ"

অনুবাদ : হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. আমাকে বলেছেন, দুই সিজদার মাঝে তুমি ইকআ করো না। অর্থাৎ উভয় পায়ের পাতা খাড়া রেখে এবং নিতম্ব ও হাত জমিনে ঠেকিয়ে বসবে না। (ইবনে মাযা-৮৯৪ ও ৮৯৫, তিরমিযী-২৮২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসের তাহকীকে বলেন, صحيح لغيره এ হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (ইবনে মাযা-৮৯৪ হাদীসের আলোচনায়) অনুরূপ বিষয়ের হাদীস আরো বর্ণিত আছে- হযরত আনাস রা. থেকে মুসনাদে আহমদ-১৩৪৩৭, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে আল-মু'জামুল আওসাত লিত্‌তবারানী-৪৪৬৮ এবং মুসতাদরাকে হাকেম-১০০৫ নম্বরে।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম সিজদা থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে বসে তারপরে দ্বিতীয় সিজদা করা। আরো প্রমাণিত হয় যে, এ বৈঠকে উভয় পা খাড়া রেখে গোড়ালির উপর বসা ধীরস্থিরতার পরিপন্থী। তাই তাশাহহুদের বৈঠকের নিয়ম অনুযায়ী বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর নিতম্ব রেখে শান্তভাবে বসা। তাশাহহুদের বৈঠকের মত হাত দুটি দুই রানের উপর রাখা। ধীরস্থিরভাবে বসার জন্য এ বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। এটা হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫০৫)

দুই সিজদার মাঝে পঠিতব্য দুআ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللهمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَعَافِنِى وَاهْدِنِى

وَارْزُقْنِي. (رواه ابو داود فى بَابِ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ–١/١٣٣)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. উভয় সিজদার মাঝে এ দুআ পড়তেন, اللهمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي। (আবূ দাউদ : ৮৫০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীস-টিকে হাসান বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ-৩৫১৪ নং হাদীসের আলোচনায়)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী-২৮৪) এ দুআটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত আছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুই সিজদার মাঝে উপরিউক্ত দুআটি পড়তে হয়। হযরত হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, রসূল স. দুই সিজদার মাঝে رَبِّ اغْفِرْ لِي দুআটি বারংবার পড়তেন। (ইবনে মাযা-৮৯৭, আবূ দাউদ-৮৭৪, নাসাঈ-১১৪৮, মুসনাদে আহমদ-২৩৩৭৫) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ দুটি দুআ ছাড়াও অন্যান্য দুআ হাদীসে বর্ণিত আছে। অতএব, রসূলুল্লাহ স. বা সাহাবায়ে কিরাম যা পড়েছেন অথবা ইমামগণ যেটাকে বৈধ বলেছেন এমন যে কোন দুআই এখানে পড়া যেতে পারে। একা নামাযের ক্ষেত্রে সময়-সুযোগ ও সামর্থ অনুযায়ী বড় ও প্রয়োজনীয় দুআ পড়া ভালো। আর জামাতের নামাযে অসুস্থ ও দূর্বল মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে যথা সম্ভব ছোট দুআ পড়া উত্তম হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫০৫)

বৈঠক না থাকলে দ্বিতীয় সিজদার পরে দ্রুত দাঁড়িয়ে যাওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِىْ بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي

الأَيْمَانِ-٢/٩٨٦)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে (গলদ তরীকায়) নামায আদায় করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ স. মাসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে সালাম করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় করে ফিরে এসে সালাম করলো। তিনি উত্তরে বললেন, তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। লোকটি তৃতীয় বারে বললো, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যখন তুমি নামায আদায় করবে তখন ভালোভাবে অযু করে নিবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে এবং কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমার সমস্ত নামাযে এমনই করবে। (বুখারী : ৬২১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম-৭৭০, নাসাঈ-৮৮৭, আবূ দাউদ-৮৫৬, ইবনে মাযা-১০৬০ এবং তিরমিযী শরীফ-৩০২ এবং জামেউল উসূল-৩৫৭৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের শেষাংশে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৈঠক না থাকলে দ্বিতীয় সিজদার পরে বসবে না; বরং সোজা দাঁড়িয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ : أَدْرَكْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

অনুবাদ : নু'মান ইবনে আবী আইয়াশ বলেন, আমি অনেক সাহাবায়ে কিরামকে পেয়েছি যারা ১ম ও ৩য় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৪০১১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-/মুসলিমের রাবী। উপরন্তু এ আমলটি বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

শিক্ষণীয় : এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের আমল ছিলো বৈঠক না থাকলে দ্বিতীয় সিজদার পরে না বসে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া। সহীহ সনদে এ আমল আরো বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকে (ইবনে আবী শাইবা : ৪০০৫), হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে (ইবনে আবী শাইবা : ৪০০৭) এবং হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৯৯৯) ইমাম বায়হাকী রহ. এটাকে সহীহ বলেছেন। (আস-সুনানুল কুবরা-২৭৬৪)

জ্ঞতব্য : দ্বিতীয় সিজদা করার পরে প্রথমে বসে তারপর দাঁড়ানোর কথাও বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত ৭৫৭ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, বুখারী শরীফের সর্ববৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَهْمٌ فَإِنَّهُ عَقَّبَهُ بِأَنْ قَالَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَلَى الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ.

অনুবাদ : বুখারী শরীফের ৭৫৭ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ‘দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে বসো’ দ্বারা جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ তথা বিশ্রামের বৈঠক জরুরী প্রমাণিত হয়। অথচ এ মত কেউ গ্রহণ করেননি। বরং ইমাম বুখারী রহ. এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দ্বিতীয় সিজদার পরে বসার কথাটি কোন রাবীর ভুল। এ হাদীসের অপর রাবী হযরত আবু উসামা বলেন, দ্বিতীয় সিজদা করার পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ইবনে হাজার বলেন, “দ্বিতীয় সিজদার পরে বসে তারপরে দাঁড়ানোর” কথাটি যদি হাদীসের সংরক্ষিত ও সঠিক অংশ হয়, তাহলে হতে পারে এটা তাশাহহুদের বৈঠক। (ফাতহুল বারী)

ইমাম বায়হাকী রহ.ও আবু উসামার ঐ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন যাতে দ্বিতীয় সিজদার পরে বসার কথা নেই। (সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী : ৩৯৪৩)

রসূল স. বেজোড় রাকাতে না বসে দাঁড়াতেন না মর্মে বর্ণিত মালেক ইবনে হুআইরিস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. (মৃত্যু-৪৪৯ হি.) বলেন,

ذهب جمهور العلماء إلى ترك الأخذ بهذا الحديث، وقالوا: إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والركعة الثالثة ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب الرسول إذا رفع رأسه من السجدة فى الركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس.

অনুবাদ : অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এ হাদীসকে আমলরূপে গ্রহণ করেননি। তাঁরা বলেন, ১ম ও ৩য় রাকাতে শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠানে-ার পরে বসবে না। বরং পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যাবে। এ মত বর্ণিত আছে হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর এবং উবনে আব্বাস রা. থেকে। হযরত নু'মান ইবনে আবী আইয়াশ বলেন, আমি অনেক সাহাবায়ে কিরামকে পেয়েছি যারা ১ম ও ৩য় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন। (শরহুল বুখারী লিইবনে বাত্তাল-২/৪৩৭)

মোটকথা, যেসব রাকাতে তাশাহহুদের বৈঠক নেই সে সব রাকাতে দ্বিতীয় সিজদার পরে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাওয়ার আমল খোদ রসূলুল্লাহ স.-এর এবং সাহাবায়ে কিরাম ও অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের। অতএব, আমরা এ আমলকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫০৬) আর দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসে তারপরে দাঁড়ানোর হাদীস বুখারীতে বর্ণিত হয়ে থাকলেও হতে পারে উক্ত শব্দটি কোন রাবীর বর্ণনাগত ভুল। উপরন্তু উক্ত আমলটি বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। কোন কোন ব্যখ্যাকার এটাকে নবীজীর বৃদ্ধকালীন আমল বলেও মন্তব্য করেছেন। অবশ্য দুর্বলতা, অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে যদি সিজদা থেকে সরাসরি দাঁড়ানো কারো জন্য কষ্টকর হয় তাহলে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসে তারপরে দাঁড়াতে পারে। আর কোন ওযর ব্যতীতত এমনটা করলে অনুত্তম হবে। (শামী : ১/৫০৬)

২য় রাকাতের সিজদা শেষে বৈঠক করা

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ (رواه البخارى فى بَابِ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ-١/١١٤)

অনুবাদ : হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী রা. বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি তাকবীর বলার সময় উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত উঠাতেন। যখন রুকুতে যেতেন তখন উভয় হাত দ্বারা হাঁটু মজবুত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান রাখতেন। অতঃপর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন এমনভাবে সোজা হতেন যে, হাড্ডির প্রতিটা জোড়া স্বস্থানে ফিরে যেত। এরপর যখন সিজদা করতেন, উভয় হাত বিছিয়েও দিতেন না, আবার একেবারে গুটিয়েও রাখতেন না। আর পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলার দিকে রাখতেন। (বুখারী : ৭৯০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী-৩০৪ এবং আবূ দাউদ শরীফ-৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪ ও ৭৩৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৫৭৬) এ হাদীসের সনদের উপর হাদীস বিশারদগণের দুটি আপত্তি রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন "তাশাহুদে বৈঠকের পদ্ধতি" শিরোনামে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. (رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ-١/١٩٤)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. নামায শুরু করতেন তাকবীর দ্বারা এবং কুরআন পাঠ শুরু করতেন ছূরা ফাতিহা দ্বারা। আর রুকু করার সময় তিনি মাথা নীচুও করতেন না, উঁচুও করতেন না; বরং উঁচু-নীচুর মধ্যবর্তী অবস্থানে সমানভাবে রাখতেন। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন একেবারে সোজা না হয়ে সিজদায় যেতেন না। অতঃপর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। আর তিনি প্রত্যেক দু'রাকাত শেষে আত্তাহি-য়্যাতু... পড়তেন। (মুসলিম : ৯৯৩) শাব্দিক কিছু তারম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৫৮২)

শিক্ষণীয় : হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী এবং আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় রাকাতের সিজদা শেষ করে বৈঠক করা জরুরী। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৬৫) এ বিষয়টি আরো বর্ণিত হয়েছে আবূ দাউদ-৭২৬, নাসাঈ-১২৬৮, তিরমিযী-২৯৩, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৪, হাদীস নং-১৫৪২, আব্দুর রায্যাক-২৫২২, মুসনাদে আহমদ-১৮৮৫৮, ১৮৮৭০, ১৮৮৭৬, সুনানে দারেমী-১৩৯৭)

প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দেরি না করে দাঁড়িয়ে যাওয়া

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، هُوَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَقُولُ حَتَّى يَقُومَ فَيَقُولُ حَتَّى يَقُومَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ .(رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ–١/١٨٥)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. প্রথম দুই রাকাতের পরে যখন বৈঠক করতেন, তখন মনে হতো তিনি যেন উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন। বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, এরপর হযরত

সাআ'দ ঠোট নেড়ে কী যেন বললেন, । আমি বললাম, দাঁড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, হ্যা, দাঁড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত। (তিরমিযী : ৩৬৬, পৃষ্ঠা: ১/৮৫, আবূ দাউদ-৯৯৫, নাসঈ-১১৭৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে হযরত আবু উবায়দাহ তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে কিছুই শোনেননি মর্মে তিনি যে মন্তব্য করেছেন অনেক মুহাক্কিক ইমাম এ মন্তব্যের সাথে একমত নয়। ইমাম যাহাবীর লিখিত আল-কাশেফ কিতাবের তাহকীকে ২৫৩৯ নং রাবীর জীবনী আলোচনায় শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামা বিভিন্ন ইমামগণের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর পিতার নিকট হতে তিনি শুনেছেন। ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর মৃত্যুর সময় আবু উবায়দাহ রহ.-এর বয়স ছিলো ৭ বছর। (তাহজীবুল কামাল, রাবী নং-৩০৫১) হাদীসের নীতিনির্ধারক ইমামগণের নিকট রাবীর বয়স পাঁচ বছর হলে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। আর পিতার মৃত্যুর সময় সন্তানের ৭ বছর হওয়া সত্ত্বেও সে তার পিতা থেকে কিছুই শোনেনি কথাটা কোনক্রমেই বাস্তব সম্মত নয়। ইমাম তবারানী রহ. তাঁর আল-মু'জামুল আওছাতের ৯১৮৯ নম্বরে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার সনদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতার নিকট হতে শুনেছেন। সনদটি এই যে, حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، ثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ অর্থাৎ আবু ইবাইদা তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন...। এ হাদীসটির সনদ হাসান। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত দেখুন শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামার তাহকীকসহ আল-কাশেফ ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৬১।

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি কোন ব্যক্তি তাশাহহুদের পরে অতিরিক্ত কিছু পড়ে, তাহলে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর ফরয আমল আদায়ে বিলম্ব হওয়ার কারণে সিজদায়ে সাহু করতে হবে।

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ؛ فَكَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ، كَأَنَّهُ عَلَى الْجَمْرِ حَتَّى يَقُومَ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. এমন এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি হযরত আবু বকার ছিদ্দীক রা.-এর পিছে নামায পড়েছেন, প্রথম দুই রাকাতে (বৈঠকে) হযরত আবু বকার ছিদ্দীক রা. এমন থাকতেন কেমন যেন গরম পাথরের উপর অর্থাৎ তাশাহুদের পরে মোটেও দেরি করতেন না। (ইবনে আবী শাইবা-৩০৩৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। তবে আবু বকার রা.-এর পিছে নামায পড়া রাবীর পরিচয় জানা যায়নি। অবশ্য সাহাবায়ে কিরামের যুগে কোন রাবীর পরিচয় না জানা গেলেও অনেক নীতিনির্ধারক ইমাম সেটাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আবার ঐ অপরিচিত রাবী থেকে বর্ণনাকারী হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বড় মাপের ফকীহ ও মুহাদ্দিস। উপরন্তু এ হাদীসের সমর্থক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সবমিলে এটা গ্রহণযোগ্য।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «لَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ»

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা রহ. বলেন, আমি হযরত তাউস রহ.কে বলতে শুনেছি, দুই রাকাত পরে তাশাহহুদ ব্যতীত আর কোন কিছু করণীয় আছে বলে মনে করি না। (আব্দুর রায্যাক-৩০৫৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : «الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنَّ الْآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ، وَالْآخِرُ أَطْوَلُهُمَا»

অনুবাদ : হযরত আতা রহ. বলেন, প্রথম দু'রাকাত (-এর বৈঠক) তাশাহহুদের জন্য। আর শেষ বৈঠক আল্লাহ'র নিকট দুআ' এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেসের জন্য। আর শেষ বৈঠক প্রথম বৈঠকের চেয়ে লম্বা হবে। (আব্দুর রায্যাক-৩০৬০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত আছারসমূহ থেকেও প্রমাণিত হলো যে, প্রথম বৈঠকটি শুধু তাশাহহুদের জন্য। অতএব, এ বৈঠকের পরে দেরি করা যাবে না।

অধ্যায় ১২ : বৈঠক

তাশাহহুদে বৈঠকের পদ্ধতি

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى بَابِ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ–١/١٩٤)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. নামায শুরু করতেন তাকবীর দ্বারা এবং কুরআন পাঠ শুরু করতেন ছূরা ফাতিহা দ্বারা। আর রুকু করার সময় তিনি মাথা নীচুও করতেন না, উঁচুও করতেন না; বরং উঁচু-নীচুর মধ্যবর্তী অবস্থানে সমানভাবে রাখতেন। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন একেবারে সোজা না হয়ে সিজদায় যেতেন না। অতঃপর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। আর তিনি প্রত্যেক দু'রাকাত শেষে আত্তাহি-য়্যাতু... পড়তেন। বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। (দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে) পায়ের গোড়ালীর উপর নিতম্ব রেখে শয়তানের মতো বসা থেকে এবং হিংস্র প্রাণীর ন্যায় (সিজদায়) হাত বিছিয়ে দেয়া থেকে তিনি নিষেধ করতেন। (মুসলিম : ৯৯৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৫৮২)

শিক্ষণীয় : হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদে বৈঠকের পদ্ধতি এই যে, বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতে হবে, আর ডান পা খাড়া রাখতে হবে। এ হাদীসে প্রথম ও শেষ বৈঠকের কোন পার্থক্য বর্ণিত না হওয়ায় আরো প্রমাণিত হয় যে, উভয় বৈঠকের পদ্ধতি একই রকম।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى . فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ إِنَّ رِجْلَيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي. (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ **سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ–١/١١٤**)

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.কে নামাযের বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমি তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম; তাই আমিও সেরূপ করলাম। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আমাকে এভাবে বসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, নামাযে বসার ছুন্নাত তরীকা হলো তুমি তোমার ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে দিবে। আমি বললাম, আপনি তো নিতম্বের উপর বসেন। তিনি বললেন, আমার দু'পা আমার ভর বহন করতে পারে না। (বুখারী : ৭৮৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং মুয়াত্তা মালেকেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৫৬০)

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে ওমর রা.-এর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নামাযে বৈঠকের ছুন্নাত তরীকা হলো ডান পা খাড়া রাখা আর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা। হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত এ পদ্ধতি শুধু প্রথম বৈঠকের নয়। কারণ মুয়াত্তা মালেকে এ হাদীসের বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইবনে ওমর রা. শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসেছি-লন। আর তা দেখে তাঁর ছেলে সে আমল করলে তিনি তাকে বসার উপরিউক্ত ছুন্নাত তরীকা শিখিয়ে দেন যা বিশেষভাবে শেষ বৈঠকেরই তরীকা। (মুয়াত্তা মালেক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪২, অধ্যায়: নামাযে বসা প্রসঙ্গ)

এ হাদীস থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, অসুস্থতা, বার্ধক্য বা দুর্বলতাজনিত কোন কারণ থাকলে নিতম্বের উপরও বসা যেতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِىْ بَابِ كَيْفَ الجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ– ١/٦٥)

অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. বলেন, আমি মদীনাতে এসে মনে মনে বললাম, অবশ্যই আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায দেখবো। (লক্ষ্য করলাম) তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং ডান পা খাড়া রাখলেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। আর অধিকাংশ আলেমের মতে এ হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে হবে। এটিই সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও কুফাবাসীদের অভিমত। (তিরমিযী : ২৯২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৫৫৪)

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَأَحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَ وَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ وَجَعَلَ حَلْقَةً

الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالْأُخْرَى. (رواه الطحاوى فى بَابِ صِفَةُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ , كَيْفَ هُوَ؟–١/١٨٤)

অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে নামায আদায় করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নামায সংরক্ষণ করবো। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন তাশাহুদের জন্য বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসলেন এবং বাম হাতের পাঞ্জা বাম উরুর উপর এবং ডান কনুই ডান উরুর উপর রাখলেন। অতঃপর আঙ্গুলসমূহ বন্ধ করলেন এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করলেন এরপর অপর আঙ্গুল (শাহাদাত) দ্বারা দুআ করতে থাকলেন। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৪, হাদীস নং-১৫৪২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম ত্বহাবী রহ. এ হাদীসটিকে দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. উক্ত দুটি সনদকেই সহীহ মন্তব্য করেছেন। (নুখাবুল আফকার : পৃষ্ঠা-৪, খণ্ড-৩৩২, ওজারাতুল আওকাফ, কাতার থেকে প্রকাশিত)

পর্যালোচনা : এ হাদীসের আলোচনায় ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, **وَفِي قَوْلِ وَائِلٍ ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ يَدْعُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ** এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স.-এর বৈঠকের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা শেষ বৈঠকের পদ্ধতি। কারণ এ হাদীসে তাশাহহুদের পরে দুআ করার কথা উল্লেখ রয়েছে যা প্রথম বৈঠকে হতে পারে না। সুতরাং তিরমিযী এবং ত্বহাবী শরীফে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, রসূলুল্লাহ স. তাশাহহুদের উভয় বৈঠকে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। অতএব এটাই ছুন্নাত।

ফায়দা : পূর্বোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও শেষ বৈঠকে বসার আরো দুটি পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ১. ডান পা খাড়া রেখে বাম পা সামনের দিকে অগ্রসর করে নিতম্বের উপর বসা। (বুখারী : ৭৯০) ২. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিয়ে বাম নিতম্বের উপর ভর করে বসা। (আবূ দাউদ : ৭৩১) এ উভয় পদ্ধতি হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী রা.-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাও বৈধ। তবে বুখারী শরীফে বর্ণিত ৭৯০ নম্বর হাদীসের আমলকে আমরা শায তথা তুলনামূলক অপ্রবল বর্ণনা মনে করি। কারণ ঐ হাদীসটির সনদের উপর হাদীস বিশারদগণের দুটি আপত্তির রয়েছে। **এক.** এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে আমর সরাসরি আবু হুমায়েদ সায়েদী রা.

থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ অন্যান্য বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনে আমর এবং আবু হুমায়েদ সায়েদী রা.-এর মাঝে অন্য একজন রাবীর মাধ্যম রয়েছে। সে হিসেবে এ হাদীসটি منقطع "সনদবিচ্ছিন্ন"। ইমাম ত্বহাবী ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এ হাদীসটিকে সনদবিচ্ছিন্ন বলেছেন। (ফাতহুল বারী : উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়) **দুই.** যে সকল রাবী এ হাদীসটিকে সনদের ধারাবাহিকত-াসহ বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই শেষ বৈঠকের ঐ বিবরণ পেশ করেননি যা এ বর্ণনায় রয়েছে। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৪)

মোটকথা, বুখারী শরীফে বর্ণিত আবু হুমায়েদ সায়েদী রা.-এর হাদীস-টির উপর ইমামগণের দুটি আপত্তি রয়েছে। এক. মুনকাতি' অর্থাৎ সনদবিচ্ছিন্নতা এবং দুই. শেষ বৈঠকের এ পদ্ধতি শায অর্থাৎ অপ্রবল হওয়া। সুতরাং বুখারী শরীফে বর্ণিত আবু হুমায়েদ সায়েদী রা.-এর হাদীসের সনদ এবং মূল বক্তব্যের বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ আপত্তিগুলোর গ্রহণযোগ্য জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

এর তুলনায় পূর্ববর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া এবং সাহাবা ও পরবর্তীদের আমলের কারণে আমরা উভয় বৈঠকে ডান পা খাড়া রাখা আর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসার আমলকে উত্তম মনে করি। (শামী : ১/৫০৮) তবে অসুস্থতা, বার্ধক্য বা দুর্বলতাজনিত কোন কারণ থাকলে নিতম্বের উপরও বসা যেতে পারে। এ হিসেবে বলা যায় যে, নিতম্বের উপর বসা হয়তো রসূলুল্লাহ স.-এর বার্ধক্যের আমল ছিলো যা স্বাভাবিক অবস্থায় করণীয় নয়। উপরন্তু, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আলী ইবনে আবী তালিব রা.সহ সাহাবায়ে কিরামের এক বড় জামাত, ইবরাহীম নাখাঈ, শা'বী ও ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহসহ বহু তাবিঈ এবং সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারকসহ অসংখ্য তাবে তাবিঈ এবং কুফাবাসীদের আমল এমনই ছিলো। (ইবনে আবী শাইবা : ২৯৪২-২৯৪৬, আব্দুর রাযযাক: ৩০৪৭, তিরমিযী : ২৯২)

মহিলাদের বৈঠকের পদ্ধতি

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ.

অনুবাদ : হযরত মাকহুল শামী বর্ণনা করেন, উম্মুদ দারদা নামাযে পুরুষের মতো বসতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ২৮০১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ মাকতু'। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে সনদবিহীন আর আত-তারীখুছ ছগীর কিতাবে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে যা দৃঢ়তার সাথে সনদবিহীন বর্ণনা করেন তা সহীহ। মুল্লা আলী কারী রহ. ইমাম নববীর বরাতে এমনই মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। (মিরকাত-১৭০৪ নং হাদীসের আলোচনায়।)

মন্তব্য : এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি অধ্যায়ে সনদবিহীন মুআল্লাকরূপে বর্ণনা করেছেন। 'পুরুষের মতো বসতেন' শব্দটি ব্যবহার করায় বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে মহিলা ও পুরুষের বসার নিয়মের পার্থক্য আছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ قَالَ كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ، يُتَّقِي ذٰلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيْءُ.

অনুবাদ : হযরত খালিদ ইবনে লাজলাজ বলেন, নারীগণ যখন নামাযে বসে তখন তাদেরকে আসন গেড়ে বসার নির্দেশ দেয়া হতো এবং বলা হতো যে, তারা যেন পুরুষের ন্যায় উরুর উপর না বসে। নারীদেরকে এ ধরনের বৈঠক থেকে বিরত রাখা হতো যেন তাদের থেকে লজ্জার কিছু প্রকাশ না পায়। (ইবনে আবী শাইবা : ২৭৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতু'। যুরআ ইবনে ইবরাহীম ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর যুরআ ইবনে ইবরাহীম-এর হাদীস গ্রহণযোগ্য। (আছ-ছিকাত : রাবী নম্বর- ৮০৩৪) আর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও এ হাদীসের অনেক متابع তথা 'সমার্থক হাদীস' রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ تُصَلِّي وَهِيَ مُتَرَبِّعَةٌ.

অনুবাদ : হযরত ছফিয়া রা. নিতম্বের উপর ভর করে আসন গেড়ে বসে নামায আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ২৮০০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/ মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ.

অনুবাদ : হযরত নাফে' বলেন, ইবনে ওমর রা.-এর স্ত্রীগণ আসন গেড়ে বসে নামায আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ২৮০৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল্ উমরী মুসলিমের রাবী হলেও তাঁর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মিশ্র মন্তব্য রয়েছে।

ফায়দা : হাদীসে বর্ণিত **تربع** শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ যদিও আসন গেড়ে বসা। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম এটাকে সে অর্থে ব্যবহার করেননি; বরং **تورك** -এর অর্থে ব্যবহার করেছেন– যার অর্থ উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। উভয় বৈঠকের মধ্যেই মাটিতে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসতে হয়। তাই বৈশিষ্ট্যগতভাবে উভয় বৈঠকের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। এ কারণে একটি অপরটির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ হাদীসে **تربع** শব্দ দ্বারা **تورك** -এর অর্থ নেয়া না হলে এ হাদীসের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর আমলের ব্যাপক অমিল পরিলক্ষিত হবে। কারণ আসন গেড়ে বসার আমল মুসলিম উম্মাহর নিকট একেবারেই অপরিচিত। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত দেখুন- মাআরিফুস সুনান : ৩/১৬৪ পৃষ্ঠা।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীসসমূহ এবং তার অধীনে সর্বশেষে বর্ণিত ফায়দার সমন্বয়ে এ পদ্ধতি বেরিয়ে আসে যে, নারীগণ নামাযের বৈঠকে উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসবে। সাহাবা ও তাবিঈগণের ব্যাপক আমলের কারণে আমরা পুরুষের জন্য বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখার আমলকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আর শারীরিক অবয়ব ও রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর হওয়ার কারণে 'উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসার' আমল মহিলাদের জন্য বেশি পছন্দ করি। হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী রা. থেকে বসার এ পদ্ধতি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসে তিনি বলেন, فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ রসূলুল্লাহ স. শেষ বৈঠকে বসার সময় বাম নিতম্ব দ্বারা জমিনে ভর দিয়ে বসতেন এবং উভয় পা এক দিকে বের

করে দিতেন। (আবূ দাউদ : ৭৩১) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীস-টিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীসে যদিও নারী-পুরুষের বৈঠকের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়নি, তবুও সাহাবা ও তাবিঈগণের ব্যাপক আমলের দ্বারা এ পার্থক্য বুঝে আসে। আবার নারীদের শারীরিক অবয়ব ও রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে এটা বেশি কার্যকর। সাথে সাথে এ আমল করা হলে নারী-পুরুষ মিলে উভয় প্রকার সহীহ হাদীসের উপর উম্মতের আমল হয়ে যাবে। উপরন্তু, উম্মুদ দারদা রহ.-এর হাদীসে নারী-পুরুষের বৈঠকের যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তারও বাস্তবায়ন হয়ে যায়।

'তাশাহহুদে বৈঠকের পদ্ধতি' শিরোনামে বর্ণিত বৈঠকের বৈধ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে এটাও একটি পদ্ধতি। এ হাদীসে বর্ণিত 'উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসার আমল আমরা মহিলাদের জন্য বেশি পছন্দ করি। (শামী : ১/৫০৮) যদিও এখানে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদের কথা উল্লেখ নেই। তবে নারীদের নামাযের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের শারীরিক অবয়ব ও রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখা। আর তা এ পদ্ধতিতে বেশি আদায় হয়।

উল্লেখ্য যে, যারা পুরুষ ও নারীর নামাযের মাঝে কোন ব্যবধান নেই মর্মে অপপ্রচার করে তারা সাধারণতঃ নবীজীর এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। **صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم** "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো সেভাবে নামায পড়ো। যখন নামাযের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দিবেন আর বয়সে যিনি বড় তিনি নামায পড়াবেন।" (বুখারী-৬০৩) নারী-পুরুষের নামাযের কোন পার্থক্য না থাকার পক্ষে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হাদীসের শব্দের প্রতি উদাসিনতারই বহি.প্রকাশ। কারণ এ হাদীসের প্রমাংশে বর্ণিত রসূল স.-এর বাণী- "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো সেভাবে নামায পড়ো" দ্বারা যদি নারী-পুরু-ষর নামায একই রকম প্রমাণিত হয় তাহলে হাদীসের শেষাংশের বাণী অর্থাৎ "যখন নামাযের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দিবেন আর বয়সে যিনি বড় তিনি নামায পড়াবেন" দ্বারা আযান এবং ইমামতির অধিকারের বিষয়েও কি নারী-পুরুষ সমান হবে? নারীরা কি আযানও দিবে? উপস্থিত নারী-পুরুসের মাঝে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নারীও কি ইমামি-তর হকদার সাব্যস্ত হবে?

নীরবে তাশাহহুদ পাঠ করা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ، وَنُسَمِّي، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. (رواه البخارى فى بَابِ مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ–١/١٦٠)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পড়তাম। তখন কারো নাম উল্লেখ করতাম, আমাদের একে অপরকে সালাম দিতো। রসূলুল্লাহ স. এটা শুনে ইরশাদ করলেন, তোমরা এটা পড়ো-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

তোমরা যখন এটা বলবে তখন আসমান ও জমিনে অবস্থানরত আল্লাহর সকল নেক বান্দাদেরকে তোমরা সালাম করলে। (বুখারী : ১১২৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৫৪৫)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের প্রত্যেক বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু... পাঠ করতে হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫১০) হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে একটি হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, তাশাহহুদ নিঃশব্দে পড়া ছুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। (তিরমিযী : ২৯১) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদ নীরবে পড়তে হয়। আর এটাই উম্মতের সর্বসম্মত আমল।

তাশাহহুদের সময় ইশারা করার পদ্ধতি

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخْذَيْنِ–١/٢١٦)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন দুআ করতে বসতেন (তাশাহহুদের দুআ) তখন ডান হাত ডান রানে এবং বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। আর বৃদ্ধাঙ্গুল মধ্যমার উপর রাখতেন এবং বাম হাতের পাঞ্জা দ্বারা বাম হাঁটু আঁকড়ে ধরতেন (কেমন যেন হাঁটুকে লুকমা বানিয়ে নিতেন)। (মুসলিম শরীফ : ১১৮৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে হবে।

জ্ঞাতব্য : ইশারা কখন করতে হবে এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের গবেষক ইমামগণ বলেছেন যে, يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ নফী তথা لَا إِلَهَ বলার সময় উঠাবে। আর ইসবাত তথা□□□□ □□□□□□ বলার সময় নামাবে। (শামী : ১/৫০৯) আল্লামা নববী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের আমল হিসেবেও প্রায় অনুরূপ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। (শরহু মুসলিম : ১১৮৫ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায়, 'সালাতে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম' অধ্যায়)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ–١/١٣٨)

অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা. বলেন, আমি মনে মনে বললাম, অবশ্যই আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায দেখবো। (লক্ষ্য করলাম) রসূলুল্লাহ স. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, । আর তখন উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। রুকু করার সময় আবারও তেমনিভাবে হাত উঠালেন। এরপর তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং ডান হাতের কনুই ডান উরু থেকে পৃথক রাখলেন। আর কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দুটি গুটিয়ে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করলেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। (আবূ দাউদ : ৯৫৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده قوي সনদটি শক্তিশালী। (আবূ দাউদ : ৯৫৭ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারমতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (নাসাঈ : ৮৯২, জামেউল উসূল : ৩৫৭৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইশারা করার পদ্ধতি হলো, উভয় হাত উভয় উরুর উপর রেখে অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুল বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করবে। অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। আর আবূ দাউদ শরীফের ৯৯০ নম্বর সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ইশারার সময় দৃষ্টিও সেদিকে থাকবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫০৯)

ইশারার সময় আঙ্গুল নাড়াচাড়া না করা

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبَعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا. (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ–١/١٤٢)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. দুআ করার (অর্থাৎ তাশাহহুদ পড়ার) সময় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তবে তিনি এ সময় আঙ্গুল নাড়াতেন না। (আবূ দাউদ : ৯৮৯, নাসাঈ-১২৭৩, মুসতাখরাখে আবু আওয়ানা-২০১৯, শরহুছ ছুন্নাহ লিলবাগাবী-৬৬৩, ৬৭৫, সুনানুল কুবরা লিন্‌নাসাঈ-১১৯৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। মুসলিম শরীফের **১১৮৫** নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ.ও আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে এটাকে সহীহ বলেছেন। আবূ দাউদ রহ. এ হাদীসটি আরো একটি সহীহ সনদে ৯৯০ নম্বরে বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদের সময় ইশারা করতে গিয়ে আঙ্গুল বারংবার নাড়াচাড়া করবে না।

জ্ঞাতব্য : উপরিউক্ত নিয়মের বিপরীতে কেউ কেউ শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে থাকে। দলীল হিসেবে নাসাঈ শরীফে বর্ণিত এ হাদীস পেশ করে থাকে যে, **ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا** "রসূলুল্লাহ স. দুটি আঙ্গুল গুটিয়ে বৃত্ত তৈরী করলেন আর আঙ্গুল উঠালেন। আমি দেখেছি তিনি সেটা নাড়াচাড়া করছেন, তা দ্বারা দুআ করছেন"। (নাসাঈ : ৮৯২) এ হাদীসের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে খুযাইমা রহ. বলেন, **لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ «يُحَرِّكُهَا» إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ زَائِدٌ ذِكْرُهُ** "শুধু এই হাদীসটি ব্যতীত কোন হাদীসের মধ্যে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার অংশটি নেই। এটা এ হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা : ৭১৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **حديث صحيح دون قوله : " فرأيته يحركها يدعو بها" فهو شاذ انفرد به زائدة– وهو ابن قدامة– من بين أصحاب عاصم بن كليب** "ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রা.-এর হাদীসটি সহীহ। তবে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার অংশটি শায (অপ্রবল)। কেননা, আছেম ইবনে কুলাইবের ছাত্রদের মধ্যে যায়েদা ইবনে কুদামা ব্যতীত আর কেউ এ অংশটি বর্ণনা করেননি"। (মুসনাদে আহমদ : ১৮৮৭০ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আল্লামা ইবনে খুযাইমা রহ. এবং শায়খ শুআইব আরনাউতের মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, এ হাদীসে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার অংশটি সহীহ নয়।

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, **فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ** "হতে পারে আঙ্গুল নাড়াচাড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা; বারবার নাড়াচাড়া করা নয়। তাহলে এ হাদীসটির বক্তব্য (পূর্ববর্ণিত) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর

হাদীসের মূল বক্তব্য অনুযায়ী হয়ে যাবে”। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী: ২৭৮৭) ইমাম বায়হাকী রহ.-এর এ মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার বাক্যটি যদি আমরা সহীহ মেনে নেই তাহলেও এটা দ্বারা উদ্দেশ্য ইশারা করা, বারবার নাড়াচাড়া করতে থাকা নয়। তাহলে আল্লামা ইবনে খুযাইমা, ইমাম বায়হাকী রহ. এবং শায়খ শুআইব আরনাউতের বক্তব্য মতে তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করা সহীহ নয়। অথবা ঐ বাক্য দ্বারা একবার নেড়ে ইশারা করা উদ্দেশ্য, বারবার নাড়াচাড়া করা উদ্দেশ্য নয়।

আঙ্গুল উঠিয়ে সামান্য নোয়ানো অবস্থায় ধরে রাখার একটি হাদীস আবূ দাউদ শরীফের ৯৯১ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। মাযহাব বিরোধীদের গুরুজন শায়খ আলবানী এ হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। (জঈফ আবূ দাউদ-১৭৬) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা একত্রিত করে বলেন, حديث صحيح لغيره، دون قوله: قد حناها شيئاً "হাদীস-টি অবশিষ্ট অংশ সহীহ লিগাইরিহী”। তবে আঙ্গুল উঠিয়ে সামান্য নোয়ানো অবস্থায় ধরে রাখার অংশটি সহীহ নয়। (মুসনাদে আহমদ : ১৫৮৬৬ নম্বর হাদীসের তাহকীকে) এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আঙ্গুল উঠিয়ে সামান্য নোয়ানো অবস্থায় ধরে রাখার হাদীস সহীহ নয়। সুতরাং কেবল সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু না মানার দাবীদারদের উচিত হবে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করা বা আঙ্গুল উঠিয়ে সামান্য নোয়ানো অবস্থায় ধরে রাখার এ আমলটি পরিহার করা।

উল্লেখ্য, শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার পদ্ধতি এই যে: আঙ্গুল উঠিয়ে আবার নামানো, আঙ্গুল উঠিয়ে ধরে না রাখা। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ স. আরাফার ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে আকাশের দিকে যে ইশারা করেছিলেন তার বিবরণ মুসলিম শরীফে এভাবে পেশ করা হয়েছে, فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ "তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন, তা আকাশের দিকে উঠালেন এবং মানুষের দিকে নামালেন”। (মুসলিম : ২৮২১) আঙ্গুল উঠিয়ে ধরে রাখা বা নাড়াচাড়া করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

তাশাহহুদের পরে দুরূদ তারপরে দুআয়ে মাছুরা পড়া

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ

الله صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو فِي الصلاة لَمْ يحمد الله وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلِّي فَمَجَّدَ الله وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ. (رواه النسائى فى بَابِ التَّمْجِيدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ–١/١٤٤)

অনুবাদ : হযরত ফুযালা ইবনে উবায়েদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে নামাযে এভাবে দুআ করতে শুনলেন যে, সে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব বর্ণনা করেনি এবং রসূলুল্লাহ স.-এর উপর দুরূদও পড়েনি। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, হে মুসল্লী! তুমি খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। তারপর রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে দুআ শিক্ষা দিলেন। রসূলুল্লাহ স. অপর এক ব্যক্তিকে এভাবে দুআ করতে শুনলেন যে, সে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব বর্ণনা করলো এবং রসূলুল্লাহ স.-এর উপর দুরূদও পড়লো। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি দুআ করো, কবুল হবে। আল্লাহর কাছে চাও, তোমাকে দেয়া হবে। (নাসাঈ : ১২৮৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (ব্যাপক দুআর দ্বিতীয় অধ্যায়, হাদীস নং-তিরমিযী-৩৪৭৬) শাব্দিক কিছু তারমতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-১৪৮১, তিরমিযী-৩৪৭৬, ৩৪৭৭, ১৪৮১, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৭০৯, ৭১০ এবং জামেউল উসূল-২১২০ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহ্হুদের পরে প্রথমে দরূদ এবং তারপর দুআ করতে হয়। এ পদ্ধতিতে দুআ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫১২)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ قُلِ اللهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (رواه البخارى فى بَابِ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ–١/١١٥)

অনুবাদ : হযরত আবু বকর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আরয করলেন, আমাকে এমন একটি দুআ শিক্ষা দিন যা আমি নামাযে পড়বো। তিনি বললেন, তুমি এ দুআ বলবে যে, اللهمَّ إني ظَلمتُ نفسي ظُلْماً كثيراً، ولا يَغفِرُ الذُّنوبَ إلا أَنتَ، فَاغْفِر لي مَغْفِرَة من عِنْدِكَ، وارحمني، إنك أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ (বুখারী : ৭৯৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৮৬)

সারসংক্ষেপ : নামাযের শেষ বৈঠকে দুরূদের পরে আরবী ভাষায় নিজের জন্য মাগফিরাত বা রহমত চাওয়া অথবা আখেরাতের কল্যাণ কামনা করা বিষয়ক কুরআন-ছুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে কোন দুআ' করা যেতে পারে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫২১) অবশ্য এ দুআটি পাঠ করা বেশি উত্তম হবে।

ডানে-বামে পূর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে সালাম দিয়ে নামায শেষ করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ.(رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ– ١/٥)

অনুবাদ : হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, পবিত্রতা নামাযের চাবি। নামাযের তাহরীমা হলো তাকবীর। আর তাহলীল হলো সালাম। (তিরমিযী : ৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি এ অধ্যায়ের সর্বাধিক সহীহ ও উত্তম। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-৬১ ও ৬১৮, তিরমিযী-২৩৮, ইবনে মাযা-২৭৫ ও ২৭৬, আব্দুর রায্যাক-২৫৩৯, মুসনাদে আহমদ-১০০৬, ১০৭২ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামায শুরু করতে হয় তাকবীরে তাহরীমার দ্বারা আর শেষ করতে হয় সালাম দ্বারা।

জ্ঞাতব্য : নামাযের বাইরে যে সব কাজ জায়েয থাকে যেমন, কথাবার্তা, পানাহার ইত্যাদি। তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামায শুরু হয়ে গেলে সেগুলো নিষিদ্ধ এবং হারাম হয়ে যায়। এ কারণে উক্ত তাকবী-রকে তাহরীমা অর্থাৎ হারামকারী বলা হয়। আর সালামের মাধ্যমে ঐ কাজগুলো পুনরায় হালাল হয়। এ কারণে সালামকে বলে তাহলীল অর্থাৎ হালালকারী বলা হয়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ـ

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ বলে ডানে-বামে এমন ভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর চেহারার শুভ্রতা প্রকাশ পেতো। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০, হাদীস নং-১৫৮৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, □□□□ إسناد صحيح এ সনদটি সহীহ। (নুখাবুল আফকার : পৃষ্ঠা-৪৯৫, খণ্ড-৪)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ "، قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

(رواه النسائى فى بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ–١٢٨/١)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রসূল স.কে দেখেছি তিনি প্রত্যেক উঠা-নামা এবং দাঁড়ানো ও বসায় তাকবীর বলতেন। আর السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে ডানে-বামে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। হযরত ইবনে মাসউদ রা. আরো বলেন, আমি হযরত আবু বকর এবং ওমর রা.কেও এমন করতে দেখেছি। (নাসাঈ-১১৪৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী-২৯৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-৯৯৬, তিরমিযী-২৯৫, ইবনে মাযা-৯১৪, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৭২৮, মুসনাদে আহমদ-৩৬৯৯, ৩৮৭৯, ৩৮৮৭, ৪২৪১ নম্বরে বর্ণিত আছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামায শেষ করতে হয় ডানে-বামে পূর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে দু'দিকে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫২৪)

এক নজরে দু'রাকাত নামায আদায়ের ছুন্নাত তরীকা
দুই রাকাত নামাযে একশটি মাসআলা

নামায শুরু করার পূর্বে ১৩টি মাসআলা

১। অযু করার দ্বারা হাদাস তথা ছোট নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া। (ছূরা মায়েদা-৬, বুখারী-১৩৭, মুসলিম-৪৩০, আবু দাউদ-৬০ ও তিরমিযী-৭৬)

২। গোসল করার দ্বারা জানাবাত তথা বড় নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া। (ছূরা মায়েদা-৬, ছূরা নিছা-৪৩, বুখারী-২৭২, মুসলিম-১২৪৪, আবু দাউদ-২৩৫ ও নাসাঈ-৭৯৩)

৩। শরীরে নাপাক লেগে থাকলে ধুয়ে পবিত্র করা। (মুসলিম-৪২৮, তিরমিযী শরীফ- ১, ইবনে মাযা-২৭২ ও মুসনাদে আহমাদ-৪৯৬৯)

৪। কাপড়ে নাপাক লেগে থাকলে ধুয়ে পবিত্র করা। (বুখারী-২২৭ ও ২২৯, আবু দাউদ-২১০, তিরমিযী-১১৫, ইবনে মাযা-৫০৬ ও সহীহ ইবনে খুযাইমা-২৯১)

৫। নামাযের জায়গা পবিত্র রাখা। (ছূরা বাকারা-১২৫, ইবনে মাযা-৭৫৮ ও তিরমিযী-৫৯৪)

৬। সতর ঢাকাসহ নামাযের জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করা। (ছূরা আ'রাফ-২৬ ও ৩১, মুসলিম-৬৬৬ ও আবু দাউদ-৩৯৭৫)

৭। উত্তম পোশাক হিসেবে টুপি পরা। (বুখারী-৫৩৮৭ ও ২৬৪ নং পরিচ্ছেদ, ইবনে আবী শাইবা-৬৫৩৬ ও ২৫৪৮৯ আবু দাউদ-৯৪৮ ও মুসতাদরাকে হাকেম : ৯৭৫)

৮। উত্তম পোশাক হিসেবে পাগড়ী পরা। (বুখারী-৫৩৮৭ ও ২৬৪ নং পরিচ্ছেদ, ইবনে আবী শাইবা-২৭৫৪, ও ২৫৪৮৯, মুসলিম-৫২৬, নাসাঈ-১০৯, মুয়াত্তা মালেক, ১/৮৭ ও জামেউল উসূল-৩৮৯৮।)

৯ । সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া। (ছূরা নিছা-১০৩, বুখারী-৫৫৪৫, মুসলিম-১৩৪০, আবু দাউদ-৪২৫)

১০। নামাযের নিয়ত করা। (ছূরা বাইয়্যিনাত-৪, বুখারী-১, মুসলিম-৪৭৭৪, আবু দাউদ-২১৯৮, তিরমিযী-১৬৫৩, ইবনে মাযা-৪২২৭, নাসাঈ-৭৫ ও জামেউল উসূল-৯১৬৩।)

১১। পরিধেয় কাপড় সর্বাবস্থায় টাখনুর উপরে রাখা বিশেষ করে নামাযের সময়। (আবু দাউদ-৬৩৬)

১২। দু'পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো। (ইবনে আবী শাইবা-৭১৩৫ ও ৭১৩৬ ও নাসাঈ-৮৯৫)

১৩। কিবলার দিকে ফেরানো সম্ভব এমন সকল অঙ্গ কিবলামুখী করা। (ছূরা বাকারা-১৪৪, বুখারী-৬২১২, মুসলিম-৭৭১, নাসাঈ-৪৯৪, জামেউল উসূল-৪৭৯ এবং তাফসীরে কাবীরঃ ছূরা বাকারা-১৪৪ নং আয়াতের তাফসী-রে)

নামাযের শুরুতে ১৫টি মাসআলা

১। বড় ধরণের সমস্যা না হলে ফরয নামায দাঁড়িয়ে নামায পড়া। (ছূরা বাকারা-২৩৮, বুখারী-১০৫১, তিরমিযী-৩৭২, আবু দাউদ-৯৫২ ও জামেউল উসূল-৩৩৯৯)

২। তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে উভয় হাত উঠিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতি বরাবর রাখা। (মুসলিম-৭৫২ আবু দাউদ-৭৪৫, নাসাঈ-১০২৭, মুসনাদে আহমাদ-১৫৬০০, মুসতাদরাকে হাকেম-৮২২, জামেউল উসূল-৩৩৯২, শামীঃ ১/৪৮২)

৩। হাতের তালু কিবলামুখী রাখা। (আল্ মু'জামুল আওসাত লিত্তব-ারানী-৭৮০১, মা'রিফাতুস সাহাবা-১০৩৩)

৪। শীতের প্রচণ্ডতা বা অন্য কোন সমস্যা না থাকলে আস্তিনের ভিতর থেকে হাত বের করা। (শামী : ১/৪৭৮)

৫। আঙ্গুলসমূহ খোলা রাখা। (মুসতাদরাকে হাকেম-৮৫৬, তিরমিযী-২৩৯, মুসনাদে বায্যার-৮৪১৩, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৪৫৮ ও আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৩১৮)

৬। নারীগণের জন্য কাঁধ পর্যন্ত হাত উঁচু করা। (ইবনে আবী শাইবা-২৪৮৫, ২৪৮৭ ও ২৪৮৯, আল-মু'জামুল কাবীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯)

৭। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করা। (ছূরা আলা-১৪ ও ১৫, তিরমিযী-৩, আবু দাউদ-৬১ এবং ইবনে মাযা-২৭৫, ২৭৬ ও ১০৬০)

৮। তাকবীরে তাহরীমা, তিলাওয়াত, তাসবীহ ও দুআসহ নীরবে পড়ার সকল বিষয় এতটুকু শব্দে পড়া যে নিজের কানে শুনা যায়। অথবা কমপক্ষে জ্বিহবা ও ঠোট নেড়ে হরফের উচ্চারণ সহীহ করা হয়।। (বুখারী-৭২৪, বাদায়েউস সানায়ে': ১/১৬১, হেদায়া : সিফাতে সলাত, শামী : ১/৪৮১ ও ৫৩৪)

৯। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য স্থানে রফউল ইয়াদাইন না করা। (তিরমিযী : ২৫৭, নাসাঈ-১০২৯, আবু দাউদ-৭৪৮, ৭৪৯ ও ৭৫০, দারাকুত-নী-১১২১, মুসনাদে আহমাদ-২২৩৫৯, মুসনাদে হুমাইদী-৬২৬, ইবনে আবী শাইবা-২৪৬৯, ২৪৫৭, ২৪৫৮ ও ২৪৬৭, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৩ ও ১৬৪, হাদীস নং-১৩৫৩, ১৩৫৪, ১৩৫৭, ১৩৬৩ ও ১৩৬৪ এবং আব্দুর রাযযাক: ২৫৩৩ ও ২৫৩৪)

১০। তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে হাত নামিয়ে ডান হাতের পাঞ্জা দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা। (বুখারী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩০{ই.ফা.} আল্-মাতালিবুল আলিয়া-৪৬০ এবং ইবনে আবী শাইবা-৩৯৬১ ও ৩৯৬৩)

১১। ডান হাতের পাঞ্জা দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরে নাভির নিচে রাখা। (ইবনে আবী শাইবা-৩৯৫৯, ৩৯৬০, ৩৯৬৩ ও ৩৯৬৬, আবু দাউদ-৭৫৬, মুসনাদে আহমাদ-৮৭৫, দারাকুতনী-১১০২ ও ১১০৩ এবং আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৩৪০, ২৩৪১ ও ২৩৪২)

১২। বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা কব্জি ধরে অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল কব্জির উপর রাখা। (শামী : ১/৪৮৭)

১৩। হাত বাঁধার পরে ছানা অর্থাৎ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ...বা হাদীসে বর্ণিত অন্য কোন ছানা পড়া। (মুসলিম-৭৭৭, আবু দাউদ-৭৭৫ ও ৭৭৬, তিরমিযী-২৪২ ও ২৪৩, ইবনে মাযা-৮০৬, নাসাঈ-৯০২, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৫, হাদীস নং-১১৭৫ ও ১১৭৬ এবং আল-মু'জামুল আওসাত লিততবারানী-৩০৩৯)

১৪। নারীদের জন্য ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের পাঞ্জার উপর রেখে সীনার উপর রাখা। (শামী : ১/৪৮৭, আস-সিআয়াহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬)

১৫। নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় এদিক ওদিক না তাকিয়ে দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা। (বুখারী-৭১৫, তিরমিযী-৫৮৯ এবং ইবনে আবী শাইবা-৬৫৬৩ ও ৬৫৬৪)

ছানা থেকে রুকু পর্যন্ত ১৩টি মাসআলা

১। ছানা পড়ার পর তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া। (ছুরা নাহল-৯৮)

২। আউযুবিল্লাহ নীরবে পড়া। (আব্দুর রাযযাক-২৫৯৭, ত্বহাবী : খণ্ড-১,

পৃষ্ঠা-১৫০, হাদীস নং-১২০৮, আল-মু'জামে কাবীর লিততবারানী-৯৩০৪ এবং আল-মুহাল্লা-৩৬৯ নম্বর মাসআলায়)

৩। আউযুবিল্লাহ পড়ার পর নীরবে বিসমিল্লাহ পড়া। (মুসনাদে আহমাদ-১২৮৪৫, মুসলিম-৭৭৭, আল-মু'জামুল কাবীর লিততবারানী-৭৩৯, আল-মু'জামুল আওসাত লিততবারানী-৮২৭৭, আব্দুর রাযযাক-২৫৯৭ এবং ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৯ ও ১৫০, হাদীস নং-১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৮, ১২০৯ ও ১২১০)

৪। কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে প্রথমে ছূরা ফাতিহা পাঠ করা। (বুখারী-৭০৭, ৭৪০, মুসলিম-৮৯৬, আবু দাউদ-৭৮২, ৭৮৩, তিরমিযী-২৪৬, ইবনে মাযা-৮১২, ৮১৩, ৮১৪ এবং মুসনাদে আহমাদ-১১৯৯১ ও ১২৮৪)

৫। ছূরা ফাতিহা পাঠ শেষে আমীন বলা। (বুখারী-৭৪৬, মুসলিম-৮০২, ইবনে মাযা-৮৫৪, নাসাঈ-৯৩৫ ও তিরমিযী-২৪৮)

৬। আমীন নীরবে বলা। (তিরমিযী-২৪৮, মুসতাদরাকে হাকেম-২৯১৩, সুনানে আবী দাউদ তয়ালিসী-১১১৭, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫০, হাদীস নং-১২০৮, আল-মু'জামুল কাবীর লিততবারানী-৯৩০৪, আহাদীসুস সিরাজ-৪২৯ এবং আল-মুহাল্লা বিল্‌আছার: ৩৬৯ নম্বর মাসআলা-এর অধীনে)

৭। ছূরা ফাতিহার সাথে অন্য ছূরা মিলানো। (বুখারী-৭২৩, মুসলিম-৭৬৩, আবু দাউদ-৮১৮ এবং নাসাঈ-৯৮০ ও ৯৮১)

৮। ছূরা ফাতেহার সাথে কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পাঠ করা যা ২৯ অক্ষরের কম হবে না। (বুখারী : ৪৬৮২, শামী : ১/৫৩৮)

৯। ছূরা মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। (ইবনে আবি শাইবা-৪১৮৩, ৪১৮৪ ও ৪১৮৫ ও ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৭, হাদীস নং-১১৮৯)

১০। নামাযে পঠিত ছূরার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। (নাসাঈ-১৭০৩, আব্দুর রাজ্জাক-৯৭৪৭, ইবনে আবি শাইবা-৩০৯৩৮, আল-মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী-৮৮৪৬ ও শুআবুল ঈমান-২১১০)

১১। যোহর এবং আসরের নামাযে নীরবে কুরআন পাঠ করা। (বুখারী-৭২৫, ৭৪১, আবু দাউদ-৮০১, ইবনে মাযা-৮২৬, আব্দুর রাজ্জাক-২৬৭৬, মুসনাদে আহমাদ-২১০৬০ এবং সহীহ ইবনে হিব্বান-১৮২৬)

১২। মাগরিব, ইশা এবং ফজরের নামাযে মুনফারিদ (একাকি নামাযী)-এর জন্য সরবে কুরআন পড়া জরুরী নয় তবে উত্তম। (আব্দুর রাযযাক: ২৬৫৫, শামী : ১/৫৩৩)

১৩। ছানা পড়ার পর মুক্তাদীর দায়িত্ব হলো- নীরব থাকা এবং ইমামের

কুরআন পাঠ শুনতে পারলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, ছূরা ফাতিহা বা অন্য ছূরা পাঠ না করা। (ছূরা আ'রাফ-২০৪, তিরমিযী-৩১৩, ইবনে মাযা-৮৪৬, ৮৪৭ ও ৮৫০, মুসলিম-৭৯০ ও ১১৭৬, নাসাঈ-৯২৫ ও ৯২৬, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৯ ও ১৬০, হাদীস নং-১৩০০, ১৩০৭ ও ১৩১৬, মুয়াত্তা মালেক : ১/১৩৬ ও ১৩৯ এবং ইবনে আবী শাইবা-৩৮০০, ৩৮০১, ৩৮০২, ৩৮২০ ও ৩৮২৩)

রুকুতে ১৫টি মাসআলা

১। কুরআন পাঠ শেষে রুকু করা। (ছূরা বাকারা-৪৩, ছূরা হুজ্ব-৭৭ ও বুখারী : ৬২১২)

২। রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা। (বুখারী-৭৫৩, মুসলিম-৭৫৪ ও নাসাঈ-১১৫৯)

৩। রুকুতে মাথা, পিঠ ও কোমর সমান রাখা। (মুসলিম-৯৯৩, ইবনে মাযা-১০৬০, আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৫৪৯ ও ২৫৫০, আল-মু'জামুল কাবীর লিত্তবারানী-১২৭৮১, মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ ২৭৩৭ ও ২৭৩৮ এবং জামেউল উসূল-৩৫৮২)

৪। রুকুতে দেরি করা। (বুখারী-৬২১২, মুসলিম-৭৭০, নাসাঈ-৮৮৭, আবু দাউদ-৮৫৬, ইবনে মাযা-১০৬০, তিরমিযী-৩০২ ও জামেউল উসূল-৩৫৭৮)

৫। নারীদের জন্য রুকুতে পুরুষের তুলনায় কম ঝুঁকা। (ইবনে আবী শাইবা-২৫৯২)

৬। রুকুতে হাতের আঙ্গুল ফাঁকা রাখা। (মুসতাদরাকে হাকেম-৮১৪, আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৫৫০, ইবনে হিব্বান-১৯২০, আল-মু'জামুল কাবীর লিততবারানীঃ খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯)

৭। রুকুতে হাঁটু শক্ত করে ধরা। (বুখারী-৭৯০, আবু দাউদ-৭৩৪, তিরমিযী-২৬০, ইবনে মাযা-১০৬০ এবং আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৫৪৭, ২৫৪৯, ২৫৫০ ও ২৫৫১)

৮। রুকুতে হাত সোজা রাখা। (আবু দাউদ : ৭৩৪, তিরমিযী-২৬০, আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৫৫১)

৯। রুকুতে হাত পাঁজর থেকে পৃথক রাখা। (আবু দাউদ-৭৩৪, তিরমিযী-২৬০ ও আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৫৫১)

১০। রুকুতে দুপায়ের পাতার উপর দৃষ্টি রাখা। (শামী : ১/৪৭৭)

১১। রুকুতে তাসবীহ পাঠ করা। (মুসলিম-১৬৮৭, তিরমিযী-২৬১, আবু দাউদ-৮৭০ ও ৮৭১, ইবনে মাযা-৮৮৮ ও ৮৯০, ইবনে আবী শাইবা-২৫৮৭, ২৫৮৮ ও ২৫৯০ এবং ত্বহাবীঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৭ ও ১৬৯, হাদীস নং-১৩৯১

ও ১৪১৭)

১২। রুকুতে তাসবীহ পাঠ কমপক্ষে ৩ বার হওয়া। (তিরমিযী-২৬১, আবু দাউদ-৮৭০, ইবনে মাযা-৮৮৮ ও ৮৯০, ইবনে আবী শাইবা-২৫৮৭, ২৫৮৮ ও ২৫৯০ এবং ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৭ ও ১৬৯, হাদীস নং-১৩৯১ ও ১৪১৭)

১৩। ইমাম ও মুনফারিদ (একাকি নামাযরত ব্যক্তি) রুকু থেকে উঠার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা। (বুখারী-৭৫৩ ও ৭৬৩, মুসলিম-৭৫৪, নাসাঈ-১১৫৯, আবু দাউদ-৮৪৭ এবং জামেউল উসূল-৩৫৮১ ও ২১৭৩)

১৪। রুকু থেকে উঠার পর ইমাম, মুনফারিদ ও মুক্তাদী সব শ্রেণীর নামাযীই 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ বা ওয়া লাকাল হাম্‌দ বলা। (বুখারী-৭৫৩, মুসলিম-৭৫৪ ও নাসাঈ-১১৫৯)

১৫। রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়ানো। (বুখারী-৭৫৬, ৭৫৭, ৭৯০ ও ৬২১২, মুসলিম-৭৭০, নাসাঈ-৮৮৭ ও ১০৩০, আবু দাউদ-৮৫৫ ও ৮৫৬, ইবনে মাযা-১০৬০, তিরমিযী-২৬৫ ও ৩০২ এবং জামেউল উসূল-৩৫৭৮)

সিজদায় ২৬টি মাসআলা

১। রুকু শেষে তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া। (বুখারী : ৭৫৩ ও ৭৬৭, মুসলিম-৭৫৪, আবু দাউদ-৮৩৬, মুসনাদে আহমাদ-৯৮৫১, নাসাঈ-১১৫৩)

২। সিজদায় যাওয়ার সময় সোজা হয়ে নীচু হওয়া। (তিরমিযী-২৬৫, নাসাঈ-১০৩০, মুসনাদে আহমাদ-১৫৩১২, আস-সুনানুল কুবরা লিননাস-াঈ-৬৭৫, শরহু মুশকিলিল আছার-২০৬ ও আল-মু'জামুল কাবীর লিত্‌তব-ারানী-৩১০৬)

৩। সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু এবং পরে হাত অতঃপর নাক ও শেষে কপাল রাখা। (তিরমিযী-২৬৮, আবু দাউদ-৮৩৮ ও ৮৩৯, নাসাঈ-১০৯২, ইবনে মাযা-৮৮২, ইবনে আবী শাইবা-২৭১৯, ২৭২২ এবং জামেউল উসূল-৩৫১৭ এবং শামী : ১/৪৯৭ ও ৪৯৮)

৪। সিজদায় উভয় হাতের পাতা, নাক, কপাল, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ের মাথা (আঙ্গুল) জমিনে লাগিয়ে রাখা। (বুখারী-৭৭৫, মুসলিম-৯৮২, ৯৮৩, নাসাঈ-১০৯৯ ও ১১০০, ইবনে মাযা-৮৮৪ ও জামেউল উসূল-৩৫২৭)

৫। সিজদার স্থান দাঁড়ানোর স্থানের চেয়ে আধা হাতের বেশী উঁচু না হওয়া। (শামী : ১/৫০৩)

৬। সিজদার সময় চেহারা দু'হাতের মাঝে রাখা। (তিরমিযী-২৭১, আবু দাউদ-৭৩৬ এবং ইবনে আবী শাইবা-২৬৮১ ও ২৬৮২)

৭। সিজদায় বাহু পাঁজর থেকে পৃথক রাখা। (বুখারী-৭৯০, মুসলিম-৯৮৮, আবু দাউদ-৭৩২, ৭৩৪ ও ৭৩৫, নাসাঈ-১১০৪, তিরমিযী-৩০৪, ইবনে মাযা-৮৮০ ও ৮৮৬ এবং জামেউল উসূল-৩৫০২)

৮। সিজদায় কনুই জমিন থেকে পৃথক রাখা। (বুখারী-৫০৭ ও ৭৯০, মুসলিম-৯৮৫ ও ৯৮৭, আবু দাউদ-৭৩২, তিরমিযী-২৭৫, নাসাঈ-১১১৩ ও সহীহ ইবনে খুযাইমা-৬৪৩)

৯। সিজদায় পেট রান থেকে পৃথক রাখা। (আবু দাউদ-৭৩৫, আস-সুনানুল কুবরা লিননাসাঈ-২৭১২ ও ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৫, হাদীস নং-১৫৪৮)

১০। সিজদায় হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখা। (মুসতাদরাকে হাকেম-৮২৬, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৬৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান-১৯২০, আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী: খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৯, দারাকুতনী-১২৮৩ ও সুনানে কুবরা লিলবায়হাকী-২৬৯৫)

১১। সিজদায় হাতের আঙ্গুলের মাথা কিবলামুখী রাখা। (আবু দাউদ-৮৯২, নাসাঈ-১১০২, তিরমিযী-২৭২ ও ইবনে মাযা-৮৮৫)

১২। সিজদায় উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা। (মুসলিম-৯৭৪, আবু দাউদ-৮৭৯, নাসাঈ-১৬৯, ইবনে মাযা-৩৮৪১, মুসনাদে আহমাদ-২৫৬৫৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৬৫৫ ও জামেউল উসূল-২১৫৯)

১৩। সিজদায় উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কিবলামুখী রাখা । (বুখারী-৭৯০, আবু দাউদ-৭৩২, নাসাঈ-১১০৪, আস-সুনানুল কুবরা লিননাসাঈ-৬৯২ ও তিরমিযী-৩০৪)

১৪। সিজদার সময় দৃষ্টি নাকের ডগায় নিবদ্ধ রাখা। (শামী : ১/৪৭৮)

১৫। নারীগণ সিজদায় জড়সড় হয়ে থাকবে। (ইবনে আবী শাইবা-২৭৯৩, ২৭৯৪, ২৭৯৫, ২৭৯৬ ও ২৭৯৮ এবং আব্দুর রায্যাক-৫০৬৯)

১৬। সিজদায় তাসবীহ পাঠ করা। (মুসলিম-১৬৮৭, তিরমিযী-২৬১, আবু দাউদ-৮৭০ ও ৮৭১, ইবনে মাযা-৮৮৮ ও ৮৯০, ইবনে আবী শাইবা-২৫৮৭, ২৫৮৮ ও ২৫৯০ এবং ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৭ ও ১৬৯, হাদীস নং-১৩৯১ ও ১৪১৭)

১৭। সিজদায় তাসবীহ পাঠ কমপক্ষে ৩ বার হওয়া। (তিরমিযী-২৬১, আবু দাউদ-৮৭০, ইবনে মাযা-৮৮৮ ও ৮৯০, ইবনে আবী শাইবা-২৫৮৭, ২৫৮৮

ও ২৫৯০ এবং ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৭ ও ১৬৯, হাদীস নং-১৩৯১ ও ১৪১৭)

১৮। তাকবীর দিয়ে প্রথম সিজদা থেকে উঠা। (বুখারী : ৭৫৩ ও ৭৬৭, মুসলিম-৭৫৪, আবু দাউদ-৮৩৬, মুসনাদে আহমাদ-৯৮৫১, নাসাঈ-১১৫৩)

১৯। সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে ধীর-স্থিরভাবে বসা। (বুখারী-৭৫৭, মুসলিম-৭৭০, নাসাঈ-১০৫৬, আবু দাউদ-৮৫৬, ইবনে মাযা-৮৯৩, তিরমিযী-৩০২ এবং জামেউল উসূল-৩৫৭৮)

২০। পুনরায় তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় সিজদা করা। (বুখারী : ৭৫৩ ও ৭৬৭, মুসলিম-৭৫৪, আবু দাউদ-৮৩৬, মুসনাদে আহমাদ-৯৮৫১, নাসাঈ-১১৫৩)

২১। দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে পায়ের পাতা খাড়া না রাখা, বরং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তাশাহহুদের বৈঠকের মত বসা। (মুসলিম : ৯৯৩, আবু দাউদ-৭৮৩, মুসনাদে আহমাদ-২৪০৩০ এবং সহীহ ইবনে হিব্বান-১৭৬৮)

২২। দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে হাত জমিনে না রাখা, বরং তাশাহহুদের বৈঠকের মত উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখা। (মাযা-৮৯৪ ও ৮৯৫, তিরমিযী-২৮২)

২৩। দুই সিজদার মাঝে رَبِّ اغْفِرْ لِي বা হাদীসে বর্ণিত অন্য কোন দুআ পড়া, (আবু দাউদ-৮৫০ ও ৮৭৪, মুসনাদে আহমাদ-৩৫১৪, ইবনে মাযা-৮৯৭ ও ৮৯৮, নাসাঈ-১১৪৮ ও মুসনাদে আহমাদ-২৩৩৭৫)

২৪। তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠা। (বুখারী : ৭৫৩ ও ৭৬৭, মুসলিম-৭৫৪, আবু দাউদ-৮৩৬, মুসনাদে আহমাদ-৯৮৫১, নাসাঈ-১১৫৩)

২৫। প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পরে না বসে দ্রুত দাঁড়িয়ে যাওয়া। (বুখারী-৬২১২, ইবনে আবী শাইবা-৩৯৯৯, ৪০০৫, ৪০০৭ ও ৪০১১, আস্-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৭৬৪ ও ৩৯৪৩)

২৬। দাঁড়ানোর সময় প্রথমে কপাল তারপর নাক এরপর হাত এবং শেষে হাঁটু উঠানো। (শামী : ১/৪৯৭ ও ৪৯৮)

বৈঠকে ১৩টি মাসআলা

১। দ্বিতীয় রাকাতও (রফউল ইয়াদাইন, ছানা ও আউযুবিল্লাহ ব্যতীত) প্রথম রাকাতের মত পড়া। (বুখারী : ৭৫৩ ও ৭৬৭, মুসলিম-৭৫৪, আবু দাউদ-৮৩৬, মুসনাদে আহমাদ-৯৮৫১, নাসাঈ-১১৫৩)

২। দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর তাশাহহুদের বৈঠক করা। (বুখারী-৭৯০, আবু দাউদ-৭২৬ ও ৭৩৪, নাসাঈ-১১৬২, তিরমিযী-২৮৯, আব্দুর রায্যাক-২৫২২, মুসনাদে আহমাদ-১৮৮৫৮, ১৮৮৭০, ১৮৮৭৬ ও ২৪৯২১ এবং সুনানে দারেমী-১৩৯৭,)

৩। বৈঠকের সময় পুরুষগণ ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা। (বুখারী-৭৮৯ ও ৭৯০, মুসলিম: ৯৯৩, তিরমিযী-২৯২ ও ২৯৩, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৪, হাদীস নং-১৫৪২, ইবনে খুযাইমা-৬৯১ ও শুআবুল ঈমান-৫৩৯৬)

৪। বৈঠকের সময় উভয় হাত উভয় রানের উপর এমনভাবে রাখা যে আঙ্গুলের মাথা হাঁটু বরাবর থাকে। (মুসলিম-৯৯৩, তিরমিযী-২৯৩, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৭১৮, সহীহ ইবনে হিব্বান-১৯৪৪, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৪, হাদীস নং-১৫৪২ ও শুআবুল ঈমান-৫৩৯৬, শামী : ১/৫০৮)

৫। বৈঠকে হাতের আঙ্গুল সামান্য ফাঁকা রাখা। (শামী : ১/৫০৮)

৬। বৈঠকের সময় দৃষ্টি কোলের উপর নিবদ্ধ রাখা। (শামী : ১/৪৭৮)

৭। নারীদের জন্য বৈঠকের সময় ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে বাম নিতম্বের উপর বসা। (ইবনে আবী শাইবা-২৭৯৯ ও ২৮০৫)

৮। বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা। (বুখারী-১১২৯ ও তিরমিযী:-৮৯)

৯। তাশাহহুদ নীরবে পাঠ করা। (তিরমিযী-৯১ ও ইবনে আবী শাইবা-৮৮৩৬)

১০। তাশাহহুদে (أشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলার সময়) অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুল বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা। (মুসলিম শরীফ-১৮৬, আবু দাউদ: ৯৫৭ ও আল্ মিনহায শরহু সহীহি মুসলিম বিন হাজ্জায-৫/৮১,)

১১। ইশারার সময় দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ রাখা। (আবু দাউদ-৯৯০, নাসাঈ-১২৭৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৭১৮ ও সহীহ ইবনে হিব্বান-১৯৪৪)

১২। ইশারার জন্য আঙ্গুল বারবার নাড়াচাড়া না করা। (আবু দাউদ: ৯৮৯, নাসাঈ-১২৭৩, সুনানুল কুবরা লিন্নাসাঈ-১১৯৪, ইবনে আবী শাইবা-৮৪৩৭, ২৯৬৯৫, মুসতাখরাজু আবী আওয়ানা-২০১৯ ও শরহুছ ছুন্নাহ লিলবাগাবী-৬৭৭)

১৩। তাশাহহুদের পর দুরূদ তারপর দুআয়ে মাছুরা পড়া। (নাসাঈ-১২৮৭, আবু দাউদ-১৪৮১, তিরমিযী-৩৪৭৬ ও ৩৪৭৭, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৭০৯

ও ৭১০ এবং জামেউল উসূল-২১২০)

সালামে ৫টি মাসআলা

১। দুআয়ে মাছুরা শেষে السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله বলে ডান-বাম উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা। (নাসাঈ-১১৪৫, ত্বহাবীঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০, হাদীস নং-১৫৮৯, আবু দাউদ-৯৯৬, তিরমিযী-২৯৫, ইবনে মাযা-৯১৪, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৭২৮ ও মুসনাদে আহমাদ-৩৬৯৯)

২। সালামের সময় ডানে-বামে পূর্ণ ঘাড় ঘুরানো। (নাসাঈ-১১৪৫, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯০, হাদীস নং-১৫৮৯, আবু দাউদ-৯৯৬, ইবনে মাযা-৯১৪, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৭২৮ ও মুসনাদে আহমাদ-৩৬৯৯)

৩। ডান দিকে সালামের সময় ডান কাঁধের দিকে দৃষ্টি দেয়া। আর বাম দিকে সালামের সময় বাম কাঁধের দিকে দৃষ্টি দেয়া। (শামী : ১/৪৭৮)

৪। উভয় দিকে সালাম ফেরানোর সময় উভয় দিকের মুসল্লীদের নিয়ত করা। (শামী : ১/৫২৬)

৫। দ্বিতীয় সালামের আওয়াজ প্রথম সালামের আওয়াজের তুলনায় একটু নীচু হবে। (শামী : ১/৫২৬)

অধ্যায় ১৩ : সালামের পর করণীয়

ফরয নামাযের পরে ছুন্নাত না থাকলে মুসল্লীদের দিকে ঘুরে বসা উত্তম

عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. (رواه البخارى فى بَابِ الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنِ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ–١/١١٨)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার নামাযের কোন কিছু শয়তানের জন্য নির্ধারণ না করে। তাহলো, সালামের পরে শুধু ডান দিকে ফেরা জরুরী মনে করা। আমি রসূলুল্লাহ স.কে অনেক সময় বাম দিকে ফিরতে দেখেছি। (বুখারী : ৮১০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩৬০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ডানে বা বামে ফিরে বসবেন।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (رواه البخارى فى بَابٍ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ–١/١١٧)

অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন নামায শেষ করতেন তখন আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেন। (বুখারী : ৮০৫)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পরে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবেন। আর পূর্বের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ডানে বা বামে ফিরে বসবেন। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। তবে এ আমলটি আবশ্যক নয় বরং উত্তম। (শামী : ১/৫৩১) অবশ্য এ আমল ঐ সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে সকল নামাযের পরে ছুন্নাত নেই। আর নামাযের পরে ছুন্নাত থাকলে রসূল স. দেরি করতেন না। বরং সংক্ষিপ্ত দুআ' করে ছুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুসলিম-১২১৩)

সালামের পরে তাসবীহ পাঠ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ (رواه البخارى فى بَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ–١/١١٦)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, দরিদ্র লোকেরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ দ্বারা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করেছে। তারা আমাদের মতো নামায আদায় করছে, আমাদের মতো রোজা রাখছে এবং অর্থের দ্বারা হজ্ব, উমরা, জিহাদ ও সদকা করার ফযীলত লাভ করছে। রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু আমলের কথা বলবো যা করলে তোমরা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তিদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে। আর তোমাদের নিচের কেউ তোমাদের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না। বরং তোমরাই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে? তবে যারা এমন আমল করবে তাদের কথা ভিন্ন। আমলটি হলো: প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে। (বুখারী : ৮০৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৯৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলা অনেক ফযীলতপূর্ণ আমল। সুতরাং এটা গুরুত্ব সহকারে করা উচিত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। মাযহাবের কিতাবে আরো বর্ণিত আছে যে, তিন প্রকারের তাসবীহ মিলে ৯৯বার হয়। এটাকে শতবার পূর্ণ করতে শেষবার لاإله الا الله বলবে। (শামী : ১/৫৩০) আর যে সকল নামাযের পরে ছুন্নাত আছে সে সকল নামাযের পরে প্রথমে ছুন্নাত পড়ে তারপরে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। যেহেতু নামাযের পরে ছুন্নাত থাকলে রসূল স. দেরি

করতেন না। বরং সংক্ষিপ্ত দুআ' করে ছুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুসলিম-১২১৩) উপরন্তু হাদীসে ব্যবহৃত خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ বা دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ 'প্রতি নামাযের পর' শব্দ দু'টির মধ্যে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। দু'রাকাত ছুন্নাত পড়ার মত সময়ে হাদীসে বর্ণিত ফযীলত হাত ছাড়া হওয়ার কথা নয়। এভাবে করা হলে ছুন্নাত আদায়ে দেরি না করা এবং নামাযের পরে তাসবীহ পড়া উভয় প্রকারের হাদীসের উপর একত্রে আমল করা সম্ভব।

ফরয নামাযের পরে দুআ করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. (رواه الترمذى فى بابٍ من أَبْوَابِ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–١٨٧/٢)

অনুবাদ : হযরত আবু উমামা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করা হলো: ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন দুআ বেশি কবুল হয়? উত্তরে তিনি বললেন, শেষ রাতের এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পরের দুআ। (তিরমিযী : ৩৪৯৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের পরে দুআ কবুল হয়। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ করা উত্তম।

فَإِذَا فَرَغْت من الْغَزْو وَالْجِهَاد والقتال فانصب فِي الْعِبَادَة وَيُقَال إِذا فرغت من الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة فانصب فِي الدُّعَاء

অনুবাদ : ছূরা 'আলাম নাশরাহ'-এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন তুমি যুদ্ধ-জিহাদ ও লড়াই থেকে ফারেগ হবে তখন ইবাদাতে মশগুল হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, যখন তুমি ফরয নামায থেকে ফারেগ হবে তখন দুআয় মশগুল হবে। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)

শিক্ষণীয়: এ তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজে ফরয নামাযের পরে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ করা উত্তম।

عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (رواه البخارى فى بَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ–١/٢٣٧)

অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা.-এর আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ বলেন, মুগীরা ইবনে শু'বা রা. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর নিকট একখানা পত্র লিখলেন যে, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক নামাযে সালাম ফিরানোর পর এই দুআ পড়তেন যে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (বুখারী : ৫৮৯১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৯২)

পর্যালোচনা : এ বর্ণনায় ফরয নামায শব্দটি উল্লেখ না থাকলেও এ হাদীসের অপর বর্ণনায় তা উল্লেখ আছে। (বুখারী-৮০৪) সুতরাং এ হাদীসের দুটি বর্ণনার সমন্বয়ে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পরে দুআ করতেন। এটা পূর্ববর্ণিত আয়াত ও হাদীসের প্রতি তাঁর আমলী সমর্থন। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ করা উত্তম।

দুআর সময় হাত উঠানো

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللهمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ اللهمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ (رواه البخارى فى الوضوء عند الدعاء–٢/٩٤٤)

অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. অযুর জন্য পানি চেয়ে নিয়ে অযু করলেন। এরপর উভয় হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আবু আমের উবায়েদকে মাফ করে দিন। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম।

তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে কিয়ামতের দিন আপনার অনেক বান্দার উপরে মর্যাদাবান করুন। (বুখারী : ৫৯৪১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৬১৭৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. দুআর সময় হাত উঠাতেন। সুতরাং দুআয় হাত উঠানো ছুন্নাত। বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা. বনী যাজীমা গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের ভাষা বুঝতে না পেরে তাদেরকে মুশরিক মনে করে হত্যা করেছিলেন। এ সংবাদ রসূল স.-এর নিকট পৌঁছলে তিনি হাত তুলে দুআ করলেন : হে আল্লাহ! আমি খালিদের কর্মকাণ্ড থেকে নিজের দায়মুক্তি প্রকাশ করছি। কথাটি রসূলুল্লাহ স. দু'বার বললেন,। (বুখারী : ৪০০৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৬১৭৭)

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ، صَاحِبَ الْأَنْمَاطِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»

অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলা বড় লজ্জাশীল, বড় দয়ালু। বান্দা তাঁর কাছে হাত তুললে তা খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (আবূ দাউদ-১৪৮৮, সহীহ ইবনে হিব্বান : ৮৭৬, মুসতাদরাকে হাকেম : ১৮৩১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। সহীহ ইবনে হিব্বানের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث قوي হাদীসটি মজবুত। মুসতাদরাকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে হাকেম বলেন, وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ সহীহ সনদে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর হাদীস দ্বারা এর সমর্থন মেলে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাত উঠিয়ে যে দুআ করা হয় তা কবুল হওয়ার বেশি উপযোগী।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ

السَّكُونِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ.(رواه ابو داود فى بَابِ الدُّعَاءِ–۱/۲۰۹)

অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে ইয়াসার আস সাকূনী আল্ আওফী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা যখন আল্লাহর নিকট চাইবে তখন তোমাদের হাতের তালু দিয়ে চাইবে। হাতের পিঠ দিয়ে নয়। (আবূ দাউদ : ১৪৮৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (আবূ দাউদ-১৪৮৬ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুআ করার আদব হলো হাতের তালু দ্বারা দুআ করা। অবশ্য দুআর আমল হাত উত্তোলন করা ছাড়াও রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং হাত উত্তোলন না করার আমলও জায়েয। হযরত আনাস রা. থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ। ইসতিস্কা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার দুআ ব্যতীত অন্য কোন দুআয় নবী কারীম স. হাত উঠাতেন না। (বুখারী-৯৭৪) এ হাদীসের কারণে অনেকে বলে থাকেন যে, ইসতিস্কা ব্যতীত কোন দুআয় রসূল স. হাত উঠাননি। অথচ এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ এ হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ আছে যে, وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ইসতিস্কার দুআয় তিনি হাত এতটা উঁচু করতেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেতো। এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আনাস রা.-এর উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করা নয় যে, তিনি অন্য কোন দুআয় মোটেও হাত উঠাতেন না। বরং উদ্দেশ্য এ কথা বর্ণনা করা যে, অন্য কোন দুআয় তিনি ইসতিস্কার মতো হাত এতটা উঁচু করতেন না। এ অর্থ করা না হলে হযরত আনাস রা.-এর বর্ণনা বেশ কিছু সহীহ হাদীসের পরিপন্থী হয়ে যাবে। কারণ ইসতিস্কা ব্যতীত অন্য দুআয় হাত উঠানোর অনেক প্রমাণ হাদীসে রয়েছে।

নমুনা হিসেবে দেখুন- বুখারী : ৫৯৪১, ৪০০৩, মুসলিম-৩৯৩, ৪৪৭১, তিরমিযী-৩৩৮৬, মুয়াত্তা মালেক-২/৫২৭, মুসনাদে আহমদ-৭৩১৫, নাসাঈ-৩০১৩, ইবনে আবী শাইবা-৩০০২০, ৩০২৯১ ও ৩৩০১৮, আল-আদাকুল মুফরাদ-৬১৩ নম্বরে।

নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করা

حدثنا سليمانُ بن الحسنِ العطّارُ، قال: حدثنا أبو كاملٍ الجحدريُّ، قال: حدثنا الفضَيلُ بن سليمانَ، قال: حدثنا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ -

অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইবনে আবী ইয়াহইয়া বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এক ব্যক্তিকে নামায শেষ করার পূর্বেই হাত উত্তোলন করে দুআ করতে দেখলেন। যখন সে ব্যক্তি দুআ শেষ করলো, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বললেন,: রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ না করে (দুআর জন্য) হাত উত্তোলন করতেন না। (আল্ মু'জামুল কাবীর লিত্তবারানী: ১৪৯০৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা হাইসামী বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই ثقة নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১৭৩৪৫) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাঁর 'ফাজ্জুল বিআ' কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (হাদীস নম্বর : ৪২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করতেন। সুতরাং নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করা ছুন্নাত। অবশ্য হাত উত্তোলন না করার আমলও মাকরূহবিহীন জায়েয।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بن سُوَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي

كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ، وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ»، يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَذَا وَكَذَا، يَعْنِي خِدَاجٌ "

অনুবাদ : হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, নামায দু'রাকাত করে। প্রতি দু'রাকাতে তাশাহহুদ পড়বে, মিনতি প্রকাশ করবে, ডবনীত হবে এবং হাত উত্তোলন করবে। তিনি বলেন, উভয় হাতের তালু মুখের দিকে রেখে তোমার রবের জন্য তা উত্তোলন করবে এবং বলবে- হে রব, হে রব। যে ব্যক্তি এটা না করে তার নামায এমন এমন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। (নাসাঈর সুনাননুল কুবরা-৬১৮, তিরমিযী-৩৮৫, আবূ দাউদ-১২৯৬, ইবনে মাযা-১৩২৫, মুসনাদে আহমদ-১৭৫২৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইবনে হাজার মক্কী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান। (মিরকাতুল মাফাতিহ-৮০৫ নং হাদীসের আলোচনায়, তুহফাতুল আহওয়াযী-৩৮৫ নং হাদীসের আলোচনায়) আল ফাতহুর রব্বানীর লেখক আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান আস-সাআতী এটাকে صالح "উপযুক্ত" এবং مستقيم "সঠিক" বলে মন্তব্য করেছেন। (আল ফাতহুর রব্বানীর: খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬০) এ হাদীসটি ইমাম শু'বা এবং লাইস ইবনে সাআদ উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, শু'বা তাঁর বর্ণনায় কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন। অতঃপর তিনি ভুলগুলো চিহ্নিত করে বলেন, وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ লাইস ইবনে সাআদ-এর হাদীসটি শু'বার হাদীসের তুলনায় বেশি সহীহ। (তিরমিযী-৩৮৫) ইমাম বুখারী রহ. আরো বলেন, وقد توبع الليث وهو أصح লাইস ইবনে সাআদ-এর হাদীসের সমর্থন রয়েছে আর এটাই বেশি সহীহ। (আত্ তারীখুল কাবীর: ৯৭২ নং রাবীর জীবনী আলোচনায়) ইমাম বুখারী রহ. যে হাদীসটিকে বেশি সহীহ বলেছেন এটা সেই হাদীস। ইমাম বুখারীর মত লাইস ইবনে সাআদ-এর এ হাদীসটির সমর্থন করে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন আরো অনেকে। এ ছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত পূর্বের সহীহ হাদীসটি নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে দুআ করার আমলকে সমর্থন করে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে সব ধরনের নামাযের পরে হাত উঠিয়ে

দুআ করার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

সম্মিলিত দুআ

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَرَفَعْنَا أَيْدِينَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُمَّ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ.

অনুবাদ : হযরত ইয়ালা ইবনে রাশেদ বলেন, হযরত আবু শাদ্দাদ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আর হযরত উবাদা ইবনে ছামেত রা. তা সত্যায়ন করেছেন। হযরত আবু শাদ্দাদ বলেন, আমরা নবী করিম স.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন গরীব তথা আহলে কিতাব আছে? আমরা বললাম, না। হে আল্লাহর রসূল, আমাদের মধ্যে আহলে কিতাবের কেউ নেই। তিনি আমাদেরকে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা হাত উঠাও এবং لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলো। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠিয়ে রাখলাম। অতঃপর রসূল স. হাত নামালেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এ কালিমা দিয়ে পাঠিয়েছো, তা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছো এবং তাতে জান্নাত দানের অঙ্গীকার করেছো। আর তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা সুসংবাদ শোন। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমদ-১৭১২১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা মুনজেরী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব-২৩৫১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তবারানী, মুসনাদে বায্যার, মুসতাদরাকে হাকেমসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. নিজে হাত

উঠিয়ে সম্মিলিত দুআ করেছেন। সুতরাং এটা দুআর একটি আদব। তবে নির্জনে একাকী দুআও উত্তম।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ، قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، بَشِقَ الْمُسَافِرُ، وَمُنِعَ الطَّرِيقُ. (رواه البخارى فى بَابِ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ-١/١٤٠)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি জুমুআর দিন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! পশু মরে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন ও মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন রসূলুল্লাহ স. দুআর জন্য হাত তুললেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে হাত তুলে দুআ করতে লাগলো। হযরত আনাস রা. বলেন, আমরা মাসজিদ থেকে বের না হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত বৃষ্টি হতেই থাকলো। সে ব্যক্তি পুনরায় এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! মুসাফির কষ্টে পড়ে গেছে, রাস্তা-ঘাট চলার অনুপযোগী হয়ে গেছে। (বুখারী : ৯৭৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৮৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারাও ইজতিমাঈ দুআ প্রমাণিত হয়। আর এটা ইসতিস্কার নামায ছিলো না, যেখানে হাত উত্তোলন করে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত; বরং এটা জুমুআর নামাযের খুৎবা ছিলো।

এ ছাড়া হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা আল ফিহরী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: যখন কোন দল একত্রিত হয়ে তাদের কেউ দুআ করে এবং অন্যরা আমীন বলে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। (আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী : ৩৪৫৬, মুসতাদরাকে হাকেম : ৫৪৭৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১৭৩৪৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন দুআ করে আর

অন্যরা আমীন বলে এমন ইজতিমাঈ দুআ আল্লাহর তাআলার নিকট কবুল হওয়ার বেশি উপযুক্ত।

নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَه. (رواه البخارى فى بَابِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ١/١٣٢)

অনুবাদ : হযরত উম্মে আতিয়াহ রা. বলেন, ঈদের দিন আমাদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। এমনকি কুমারীদেরকে তাদের অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী নারীদেরকেও। তারা পুরুষদের পেছনে থাকতো, তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং তাদের দুআর সাথে দুআ করতো। তারা সে দিনের বরকত ও পবিত্রতা আশা করতো। (বুখারী : ৯২০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৬৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ প্রমাণিত হয়। এ হাদীসে ঋতুমতী মহিলাদেরকে ঈদগাহে গিয়ে মুসলমানদের দুআয় শরিক হতে বলা হয়েছে যা নামাযের পরে হয়ে থাকে। কেননা ঈদের ময়দানে প্রথম যে কাজটি করা হয় তাহলো নামায পড়া। (বুখারী : ৯১৭ ও ৫১৬২) আর খুৎবা ও দুআ হয় নামাযের পরে। 'মুসলমানদের সাথে দুআয় শরিক হওয়া' শব্দ থেকে সম্মিলিত দুআর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এ ছাড়াও বুখারী ৯২৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِين তারা যেন কল্যাণকর কাজ এবং মুমিনদের দুআয় শরিক হয়। এ থেকেও নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ

حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنقَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: اللهمَّ خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ،

وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ.

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. সালাম ফিরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি মুক্তি দিন ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে, আইয়াশ ইবনে আবী রবীঅ-াকে, সালামা ইবনে হিশামকে এবং সেসব দুর্বল মুসলমানকে যারা কাফিরদের হাত থেকে মুক্তির কোন পথ বা পন্থা খুঁজে পায় না। (তাফসীরে আবু হাতিম : ছূরা নিসা : ৯৮, হাদীস : ৫৯০৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসটির রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। মুসলিমের রাবী আলী ইবনে যায়েদকে অনেকে জঈফ বললেও ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁকে صَدُوقٌ "সত্যনিষ্ঠ" বলেছেন। (তিরমিযী-২৬৭৮) আর আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ হাদীসটির ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ সহীহ হাদীসে এ হাদীসটির সমর্থন রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ছূরা নিছা ৯৮ নং আয়াতের তাফসীরে) সুতরাং রবীগণের গ্রহণযোগ্যতা এবং সহীহ হাদীসের সমর্থনের কারণে এ হাদীসটি হাসান স্তরের নিচে নয়।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. নামাযের পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উত্তোলন করে দুআ করতেন। সুতরাং নামাযের পরে এভাবে দুআ করা ছুন্নাত। এ হাদীসে নির্দিষ্ট কোন নামাযের কথা উল্লেখ না থাকায় ফরয নফল যে কোন নামাযের জন্য এটা প্রযোজ্য হতে পারে। এতদ্সত্ত্বেও মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটির আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। সে বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ: اللهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ... রসূল স. যোহরের নামাযের পরে দুআ করতেন যে হে আল্লাহ আপনি ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে মুক্তি দিন..। (মুসনাদে আহমদ-৯২৮৫) এ হাদীসের রাবীগণের ক্ষেত্রেও কেবল আলী ইবনে যায়েদকে নিয়ে আপত্তি। অবশিষ্ট রাবীগণ সকলেই নির্ভরযেগ্য। আর মুসলিম শরীফের রাবী আলী ইবনে যায়েদের বিষয়ে একটু পূর্বেই আলোচ-

না করা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাপারেও আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তাঁর তাফসীরে এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন যে, وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ সহীহ হাদীসে এ হাদীসটির সমর্থন রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ছুরা নিছা ৯৮ নং আয়াতের তাফসীরে) এ হাদীসটির একাধিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ফরয নামাযের পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উত্তোলন করে দুআ করা রসূল স.-এর আমল ছিলো। অতএব, এর অনুসরণ করা উত্তম।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، قَالَا: أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ صَقْرِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُوسَى السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ فِي سُوَيْقَةِ غَالِبٍ مِنْ كِتَابِهِ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ وَقَتْلِهِمْ قَالَ: فَقَالَ لِي أَنَسٌ: لَقَدْ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، يَعْنِي عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ "

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে ক্বারীগণের ঘটনা ও তাঁদের শাহাদাতের বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, আমি রসূল স.কে দেখেছি যখনই তিনি ফজরের নামায পড়েছেন দু'হাত উঠিয়ে তাদের বিরুদ্ধে দুআ' করেছেন যারা ক্বারীগণকে শহীদ করেছে। (আস সুনানুল কুবরা লিলবায়হ-াকী-৩১৪৫, মুসনাদে আহমদ-১২৪০২, আবু আওয়ানা-৭৩৪৩, আল মু'জামুল কাবীর-৩৬০৬, আওসাত-৩৭৯৩, ছগীর-৫৩৬ ও মা'রেফাতুস সুনান-৩৯৯৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম নববী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বা হাসান সনদে বর্ণিত বলে মন্তব্য করেছেন। (শরহুল মুহাজ্জাব; খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৮-দারুল ফিকর থেকে প্রকাশিত) আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন তুহফাতুল মুহতাজ কিতাবের ২৩৪ নং হাদীসের আলোচনায় এবং আল্লামা যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. তাখরীজু আহাদীসিল এহইয়া কিতাবের ৪৬৮ নং হাদীসের আলোচনায় এ সনদটিকে উত্তম সনদ বলেছেন।

পর্যালোচনা : বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স. উক্ত কওমের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছেন নামাযের ভেতরে। এমনকি হযরত আনাস রা. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এ কারণে অনেকে এটাকে

নামাযের মধ্যের দুআ হিসেবে মনে করেন। তবে এ হাদীসে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স. যখনই ফজরের নামায পড়েছেন তখন হাত উঠিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছেন। অর্থাৎ নামায শেষ করে সালা-মর পরে বদদুআ করেছেন। উপরন্তু ইমাম নববী রহ. এ হাদীস দ্বারা নামাযের বাইরে দুআর সময় হাত উঠানোর দলীল পেশ করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ের শিরোনাম এভাবে পেশ করেন যে, فَرْعٌ فِي اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ "নামাযের বাইরে হাত উঠিয়ে দুআ করা মুস্তাহাব হওয়ার অংশ" ইমাম নববী রহ.-এর শিরোনাম থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি উক্ত হাদীস থেকে এ অর্থই বুঝেছেন যে, রসূল স. হাত উঠিয়ে দুআ করতেন ফজরের নামায শেষ করে।

জ্ঞাতব্য: রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাহাবায়ে কিরামও দুআয় শরিক হতেন কিনা তা এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। তবে সম্মিলিত দুআর প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ, (মুসনাদে আহমদ-১৭১২১) আল্লাহ তাআলা সম্মিলিত দুআ কবুল করে থাকেন মর্মে ঘোষণা প্রদান করে উক্ত আমলের প্রতি সাহাবায়ে কিরামকে উৎসাহিত করা (মু'জামুল কাবীর লিত্তবারানী: ৩৪৫৬, মুসতাদরাকে হাকেম: ৫৪৭৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৩৪৭) এবং জুমুআর খুৎবায় রসূলুল্লাহ স.-এর হাত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করার সময় সাহাবায়ে কিরামের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ (বুখারী-৯৭৩) ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য ছিলো রসূলুল্লাহ স.কে দুআ করতে দেখলে তাতে শরিক হওয়া। সুতরাং উপরিউক্ত হাদীস এবং রসূলুল্লাহ স.-এর দুআ করার সময় সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে এটাই অনুমেয় হয় যে, রসূলুল্লাহ স. ফরয নামাযের পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে যে দুআ করতেন সাহাবায়ে কিরাম সে দুআয় শরিক হতেন। অতএব, ফরয নামাযের পরে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত দুআ মুস্তাহাব।

قَالَ (الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيُّ) : أَيُّها النَّاس أَلَسْتُمُ الْمُسْلِمِينَ؟ أَلَسْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ أَلَسْتُمْ أَنْصَارَ اللهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَأَبْشِرُوا فَوَاللهِ لَا يَخْذِلُ اللهُ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكُمْ، وَنُودِيَ بِصَلَاةِ الصُّبح حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قَضَى الصَّلاة جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَثَا النَّاس، وَنَصِبَ فِي الدُّعاء وَرَفَعَ يَدَيْهِ

وَفَعَلَ النَّاس مِثْلَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

অনুবাদ : হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা. তাঁর সাথীদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা কি মুসলমান নও? তোমরা কি আল্লাহর রাস্তায় নও? তোমরা কি আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী নও? তারা বললেন, হ্যাঁ। হযরত আলা বলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মতো অবস্থা যার হবে আল্লাহ তাদেরকে অপদস্ত করবেন না। অতঃপর সুবহে সাদিকের সময় হলে ফজরের আযান দেয়া হলো। অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন এবং নামায শেষ করে হাঁটু গেড়ে (তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায়) বসলেন। লোকেরাও হাঁটু গেড়ে বসলেন। হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা. নিজে সূর্যোদয় পর্যন্ত হাত উত্তোলন করে দুআয় মশগুল থাকলেন এবং লোকেরাও অনুরূপ করলো। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: বাহরাইনের মুরতাদদের আলোচনায়)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. কর্তৃক বর্ণিত এ ঘটনাটি সনদসহ প্রায় হুবহু বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রহ. তাঁর 'তারীখে তাবারী' কিতাবে (অধ্যায় : বাহরাইনবাসী এবং তাদের মুরতাদ হওয়ার আলোচনা) এবং আল্লামা ইবনে আসীর জাঝরী রহ. তাঁর 'আল কামিল ফিত্ তারীখ' কিতাবে।

পর্যালোচনা : ইল্‌মে হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন তিন তিনজন মহামনীষী হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা.-এর উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার নীতিমালা অনুযায়ী ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমল হুকমী মারফু' অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা দেখে করেছেন বলে ধরে নেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা. ও তাঁর সাথীদের আমল থেকে ফরয নামাযের পরে ইজতিম-াঈ দুআ শরীআতসম্মত বলে প্রমাণিত হয়।

ফায়দা : তারীখে তাবারীতে উল্লিখিত সনদটি গ্রহণযোগ্য। কারণ হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা. বর্ণিত বাহরাইনের মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এ ইতিহাস উম্মতের নিকট প্রসিদ্ধ। হাদীস ও ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণের মানদণ্ডের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কিছুটা শিথিল নীতির আশ্রয় নেয়া হয়।

তার প্রমাণ হিসেবে এ ঘটনার বর্ণনাকারী সাইফ ইবনে ওমর রহ.-এর প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন, **ضعيف فى الحديث عمدة فى التاريخ** "তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল; তবে ইতিহাসের ব্যাপারে **عمدة** নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব : ৩০১৫)। সুতরাং ইতিহাস হিসেবে এ ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ–١/٨٢)

অনুবাদ : হযরত ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করা জায়েয নেই। কেউ যদি কারো ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করে, তবে তো সে তাতে প্রবেশই করে ফেললো। কোন জনসমষ্টির ইমামতি করে দুআর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে। পেশাব-পায়খানার বেগরুদ্ধ করে কেউ নামাযে দাঁড়াবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ছাওবান রা.-এর হাদীসটি হাসান এবং এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা ও আবু উমামা রা. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। (তিরমিযী : ৩৫৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেন, أَصَحُّ مَا يُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ এটা এ অধ্যায়ের সবচেয়ে সহীহ হাদীস। (আল আদাবুল মুফরাদ-১০৯৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি ইবনে মাযা এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৪৭)

পর্যালোচনা : এ হাদীসে মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে ইমাম শুধু তাঁর নিজের জন্য দুআ করলে এটাকে রসূলুল্লাহ স. মুক্তাদীদের সাথে খেয়ানত

বলে উল্লেখ করেছেন। নামাযের মধ্যে আমরা যে দুআ পড়ে থাকি তার কোনটায় মুক্তাদীদেরকে শরিক করে কোন দুআ নেই। দুই সিজদার মাঝে এবং দুরূদের পরে যে দুআ হাদীসে বর্ণিত আছে তা-ও কেবল নিজের জন্য। তাহলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, খেয়ানত থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নামাযে পঠিত দুআগুলোতে নেই। অবশ্য, নামাযের পরের দুআকে হিসেব করলে উক্ত খেয়ানত থেকে বাঁচার একটি পথ পাওয়া যেতে পারে। নামাযের পরে দুআর আমল পূর্ববর্ণিত বেশ কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীসের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলেও নামাযের পরের দুআই বুঝে আসে। কারণ ইমামতি করা আর দুআ করা এ দুইয়ের মাঝে ف অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে যা ধারাবাহিকতার অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ আগে ইমামতির কাজ শেষ করবে তারপর দুআ করবে। আর ইমামতির কাজ শেষ হয় সালামের মাধ্যমে। সুতরাং দুআ হবে সালামের পরে। হাদীসের অপর অংশে উল্লিখিত রসূল স.-এর বাণী فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ "তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করবে না"-এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. শুধু নিজের জন্য দুআ করা, অন্যদের জন্য না করা; দুই. অন্যদেরকে সাথে না নিয়ে একা একা দুআ করা। দ্বিতীয় অর্থটি হয়তো নতুন মনে হচ্ছে। এ অর্থটিও গ্রহণের অবকাশ আছে কী না আরবী ইবারতের সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বিজ্ঞ আলেমদের প্রতি ডবনীত অনুরোধ রইল। যদি ইবারতে এ অর্থের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আর যদি সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এটাও ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআর একটি দলীল হতে পারে।

ফায়দা : উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা নামাযের পরে দুআ, দুআর সময় হাত উত্তোলন করা, ইজতিমাঈ দুআ, একজন দুআ করা আর অন্যান্যদের আমীন বলা, ঈদের নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ, এমনকি ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআকে ভিত্তিহীন বলার কোন সুযোগ নেই। অবশ্য, রসূলুল্লাহ স. বা সাহাবায়ে কিরাম এ আমলটি স্থায়ীভাবে করেছেন মর্মে কোন পরিষ্কার বর্ণনা হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই হাদীসের মর্মানুসারে ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে

ইজতিমাঈ দুআ মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ বুঝ সৃষ্টি হয় যে, এটা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল। সুতরাং করা উত্তম হলেও না করাতে কোন দোষ নেই।

কোন কোন আলেম ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআর আমলকে ভিত্তিহীন এবং বিদআত বলে থাকেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। পূর্ববর্ণিত মারফু’ হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলের সমষ্টি দ্বারা প্রায় স্পষ্টভাবেই এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। কোন কোন আলেম ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআর প্রচলিত পরিপূর্ণ রূপটি নির্দিষ্ট একটা হাদীস বা একটা আয়াতে না থাকার অভিযোগ তুলে এটাকে বিদআত বলে থাকেন। অথচ কোন আমলের পরিপূর্ণ রূপ একটি আয়াত বা একটি হাদীসে থাকতে হবে এমন দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতসহ প্রায় সব ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ রূপই কোন একটি হাদীসে আসেনি। সুতরাং ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআর আমল একই হাদীসে বর্ণিত থাকতে হবে তা সঠিক নয় এবং কোন আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার শর্তও নয়।

আবার অনেকে ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআ প্রমাণিত হওয়ার শর্ত হিসেবে হাদীসের ভাষা স্পষ্ট হওয়ার দাবি করে বলে থাকেন এমন কোন হাদীস আছে কি? যাতে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, রসূল স. সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত দুআ করতেন। তাঁদের দাবি শুনে মনে হয় এ মাসআলায় তাঁরা কেবল عِبَارَةُ النَّص তথা বাক্যের মূল উদ্দেশ্যকেই শরীআতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। অথচ এটা কুরআন-হাদীস থেকে দলীল গ্রহণের أصول বা মূলনীতির পরিপন্থী। উছূলের কিতাবসমূহের ভাষ্য মোতাবেক কুরআন-হাদীসের عِبَارَةُ النَّص যেমনিভাবে শরীআতের দলীল। তেমনিভাবে دلالة النص তথা বাক্যের মূল উদ্দেশ্য ছাড়া তা থেকে আরো যা বুঝে আসে এবং إقتضاء النص তথা বাক্যের মূল উদ্দেশ্য ছাড়া বাক্যের চাহিদার আওতায় আরো যা যা শামিল হয় এগুলোও শরীআতের দলীল। সুতরাং শুধু বাক্যের মূল উদ্দেশ্যকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করবো, এর বাইরে অন্য কিছু গ্রহণ করবো না এটা দলীল গ্রহণের মূলনীতির পরিপন্থী।

কোন কোন আলেম এটাকে মুস্তাহাব স্বীকার করে এটাকে স্থায়ীভাবে করতে নিষেধ করেন এবং বলে থাকেন যে, মুস্তাহাব কাজ স্থায়ীভাবে

করলে সেটা জরুরী সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর এর মাধ্যমে শরঈ বিধানের স্তর লঙ্ঘিত হয় যা অবৈধ। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীস দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। হযরত আয়েশা রা. চাশতের আট রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর বলতেন, لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ আমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেয়া হলেও আমি এটা ছাড়বো না। (মুয়াত্তা মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১০, অধ্যায় : সলাতুয যুহা) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নফল ইবাদত গুরুত্ব সহকারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করলে সেটা অবৈধ বা বিদআত হয়ে যাবে তা নয়। অতএব, ফরয নামাযের পরে দুআ করা একটি নফল কাজ। এটা মাঝে মধ্যেও করা যেতে পারে আবার নিয়মতান্ত্রিকভাবেও করা যেতে পারে।

অনেকে আবার এটাকে বৈধ বললেও একাকী নির্জনে দুআ করাকে উত্তম বলে সেটা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। একাকী নির্জনে দুআ করা নিঃসন্দেহে উত্তম। তবে প্রকাশ্যে সম্মিলিত দুআও রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ও ঘোষণা দ্বারা উত্তম হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। (বুখারী : ৯৭৩, মুসনাদে আহমদ-১৭১২১, আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী : ৩৪৫৬, মুসতাদরাকে হাকেম : ৫৪৭৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১৭৩৪৭) অতএব, ফরয নামাযের পরের দুআও একত্রে করা যেতে পারে। হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা.-এর আমল দ্বারা এ বিষয়টির বাস্তব উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। হাদীসের ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা এটা যতটা পরিষ্কার হয়েছে নফল বা মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর আমল উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং ছুন্নাত আদায়ে দেরি না হয় এবং মাসবুকদের নামায আদায়ে সমস্যা না হয় এমনভাবে ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর আমল করা উত্তম হবে।

সারকথা, এটা সর্বজন বিদিত যে, দুআ একটি নফল ইবাদাত। এর জন্য কোন নির্ধারিত সময় নেই। তবে দুআ কবুল হওয়ার কিছু খাছ সময়ের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। আর কিছু খাছ আদবের কথাও বর্ণিত আছে যা দুআ কবুলের জন্য সহায়ক। সে সব খাছ সময়ের মধ্যে একটি হলো ফরয নামাযের পর। (তিরমিযী : ৩৪৯৯) আর আদবসমূহের মধ্যে রয়েছে হাত উত্তোলন করা। (আবূ দাউদ : ১৪৮৬) ইজতিমাঈ দুআ যদিও

দুআর কোন আদব নয়, তবে একত্রে অনেক মানুষের দুআ রসূলুল্লাহ স.-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত (বুখারী : ৯৭৩) এবং আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১৮৩১) আর বুখারী শরীফের ৯২০ নম্বর হাদীসও এর প্রতি ইঙ্গিত করে। নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে সম্মিলিত দুআ করা উপরিউক্ত নিয়মের বাইরে নয়। উপরন্তু, হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা.-এর আমল দ্বারা এর গ্রহণযোগ্যতা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। (তারীখে তাবারী, আল কামিল ফিত তারীখ ও আল্ বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ : ৬/৩৬১) এসব কিছুর পরও এটাকে বিদআত বলার কারণ কী তা আমার বোধগম্য নয়। বিদআত তো এমন বিষয়কে বলা হয় যার কোন ভিত্তি কুরআন-হাদীসে নেই এবং خير القرون তথা উত্তম তিন যুগেও পাওয়া যায় না। অথচ হাদীসের ইঙ্গিত এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রা.-এর খিলাফত আমলে সংঘটিত রসূল স.-এর বিশিষ্ট সাহাবা হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা.-এর আমলসহ পূর্ববর্ণিত একাধিক দলীল দ্বারা সম্মিলিত দুআর মজবুত ভিত্তি প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে দেখা যায়, ফজর ও আসরের নামাযের পরে প্রায় অর্ধেক মুসল্লী মুনাজাতের পূর্বেই উঠে যায়। ইজতিমাঈ দুআকে বিদআত বলার অশুভ পরিণামে একাকী দুআর ছুন্নাতও ইতিমধ্যে বিদায় নিতে চলেছে। তারপরেও মুনাজাতকে 'জনসাধারণ জরুরী মনে করে তাই ছেড়ে দেয়া উচিত' বলে আমরা নতুন করে আর কোন প্রমাণের অপেক্ষায় আছি? কুরআন-হাদীসের মূলনীতির আলোকে যেটা জায়েয হয় এবং সাহাবার আমল দ্বারা সমর্থিত হয় সেটাকে স্পষ্ট কোন দলীল ব্যতীত বিদআ'ত বলে প্রত্যাখ্যান করায় দ্বীনের স্বার্থ রক্ষা হবে কি?

উপরিউক্ত বিষয়টিকে আরো একটু স্পষ্ট করতে এ ব্যাপারে প্রখ্যাত কয়েকজন উলামায়ে কিরামের মন্তব্য পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত দুআর ব্যাপারে বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের অভিমত

ইমাম নববী রহ.-এর অভিমত

قَدْ ذَكَرْنَا اسْتِحْبَابَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عَقِبَ كُلِّ الصَّلَوَاتِ بِلَا خلاف وأما ما اعْتَادَهُ النَّاسُ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مِنْ تَخْصِيصِ دُعَاءِ الْإِمَامِ بِصَلَاتَيْ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فَلَا أَصْلَ لَهُ...بَلْ الصَّوَابُ اسْتِحْبَابُهُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى النَّاسِ فَيَدْعُوَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামাযী সকলের জন্য প্রত্যেক নামাযের পরে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তবে ইমামের দুআ করার বিষয়টিকে শুধু ফজর এবং আসরের সাথে সম্পৃক্ত করার যে অভ্যাস মানুষের মধ্যে রয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। বরং প্রত্যেক নামাযের পরে দুআ মুস্তাহাব হওয়াই সঠিক। এটাও মুস্তাহাব যে, ইমাম সাহেব মুসল্লীদের দিকে ফিরে দুআ করবে। (শরহুল মুহাজ্জাব: ৩য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর অভিমত

হযরত বলেন, নামাযের পরে ইমামের দুআ করা এবং উপস্থিত লোকদের আমীন বলার বিষয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইমাম ইবনে আরাফা এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের সার কথা এই যে, যদি নামাযের পরের দুআ এই বিশ্বাসে করা হয় যে, এটা নামাযের ছুন্নাত-মুস্তাহাবসমূহের একটি ছুন্নাত বা মুস্তাহাব আমল। তাহলে এটা বৈধ নয়। তবে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা ব্যতীত যদি কেউ এ জন্য দুআ করে যে, এটা স্বতন্ত্র একটা মুস্তাহাব ইবাদাত। তাহলে দুআর মূল হুকুমের উপর ভিত্তি করে এটাও মুস্তাহাব হবে যেহেতু দুআর ফযীলত কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (ইমদাদুল ফতোয়া-১ম খন্ড, ৮০৪ পৃষ্ঠা)

মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রহ.-এর অভিমত

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ. বলেন, ফরয নামাযের পরে ইমাম সাহেব কর্তৃক উচ্চ আওয়াজে দুআ করা এবং মুক্তাদী কর্তৃক আমীন আমীন বলার পদ্ধতিকে জরুরী মনে না করলে বৈধ। (কিফায়াতুল মুফতী: ৩য় খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর অভিমত

فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنةٍ بمعنى ثبوتها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين...

অনুবাদ : আমাদের যুগের এ দুআ রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত ছুন্নাতও নয়। আবার দ্বীনের মধ্যে ভিত্তিহীন বিদআতও নয়। তিনি আরো বলেন,

فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد، فقد عَمِلَ بما رغَّب فيه، وإن لم يكثره بنفسه.

অনুবাদ : আমাদের কেউ যদি নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করার আমল করতে থাকে তাহলে সে এমন আমল করলো যে কাজে রসূলুল্লাহ স. উৎসাহ দিয়েছেন; যদিও তিনি নিজে এ কাজ বেশি করেননি। (ফাইজুল বারী : 'মুয়াজ্জিনের আযান শুনে কী বলবে' অধ্যায়)

আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ.-এর অভিমত

فهذه وما شاكلها تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس فى البلاد من الدعات الإجتماعية دبر الصلوات ولذا ذكره فقهاؤنا أيضا كما فى نور الإيضاح و شرحه مراقى الفلاح للشرنبلالى ويقول النووى فى شرح المهذب الدعاء للإمام و المأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف ويستحب ان يقبل على الناس قلت وثبت الدعاء مستقبل القبلة أيضا كما تقدم فى حديث ابى هريرة عند ابى حاتم فثبتت الصورتان جميعا فلينبه–(معارف السنن,٣/١٢٣ باب ما يقول إذا سلم)

অনুবাদ : হযরত মাওলানা ইউসুফ বানুরী রহ. বেশ কিছু হাদীস পেশ করার পর বলেন, এগুলো এবং এর অনুরূপ যা আছে তা দ্বারা আমাদের দেশে প্রচলিত নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর প্রমাণের জন্য প্রায় যথেষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর কথা আমাদের ফকীহগণ বলেছেন। যেমনটি উল্লেখ রয়েছে আবুল হাসান শারাম্বুলালীর লিখিত 'নুরুল ঈযাহ' এবং উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মারাকিল ফালাহ'

কিতাবে। ইমাম নববী ‘শরহুল মুহাজ্জাব’ কিতাবের ৩য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামাযী সকলের জন্য প্রত্যেক নামাযের পরে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। আর ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো (দুআর সময়) মুসল্লীদের দিকে ফেরা। আল্লামা ইবন্নেরী রহ. বলেন, কিবলার দিকে ফিরে দুআ করাও প্রমাণিত, যেভাবে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে তাফসীরে আবু হাতেমে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং (মুসল্লীদের দিকে ফিরে এবং কিবলামুখী হয়ে) উভয় পদ্ধতিই প্রমাণিত হলো। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখুন। (মাআরিফুস সুনান : ৩/১২৩, ‘সালামের পরে কী বলবে’ অধ্যায়)

আল্লামা জফর আহমদ উসমানী রহ.-এর অভিমত

ان ما جرى به العرف فى ديارنا ان الإمام يدعو فى دبر بعض الصلوات مستقبلا للقبلة ليس ببدعة بل له أصل من السنة وإن كان الأولى أن ينحرف الإمام بعد كل صلاة يمينا أويسارا (إعلاء السنن)

অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদীস সংকলক হযরত মাওলানা জফর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, “আমাদের দেশে যে রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, ইমাম সাহেব কোন কোন নামাযের পরে কিবলামুখী হয়ে দুআ করেন, তা বিদআত নয়। বরং হাদীসে উক্ত দুআর ভিত্তি রয়েছে। যদিও ইমামের জন্য প্রত্যেক নামাযের পর ডানে বা বামে ফেরা উত্তম”। (ই’লাউস সুনান : ৩/১৯৯)

তিনি আরো বলেন, “আমাদের দেশে সম্মিলিত মুনাজাতের যে প্রথা চালু আছে অর্থাৎ ইমাম সাহেব নামাযের পরে কিবলামুখী হয়ে দুআ করে থাকেন, এটা কোন বিদআত কাজ নয়। বরং হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো ডানদিক বা বামদিকে ফিরে মুনাজাত করা”। (ই’লাউস সুনান : ৩/১৬৩, ৩/১৯৯)

তিনি আরো বলেন, “হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। যেমন আমাদের দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে”। (ই’লাউস সুনান : ৩/১৬৭, ৩/২০৪) এরপর তিনি নামাযের পরে মুনাজাত অস্বীকারকারীদের

কঠোর সমালোচনা করেছেন। (ই'লাউস সুনান : ৩/২০৩)

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর নিম্নলিখিত মন্তব্যকে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। হযরত বলেন, "যদি নামাযের পরের দুআ এই বিশ্বাসে করা হয় যে, এটা নামাযের ছুন্নাত-মুস্তাহাবসমূহের একটি ছুন্নাত বা মুস্তাহাব আমল। তাহলে এটা বৈধ নয়। তবে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা ব্যতীত যদি কেউ এ জন্য দুআ করে যে, এটা স্বতন্ত্র একটা মুস্তাহাব ইবাদাত। তাহলে দুআর মূল হুকুমের উপর ভিত্তি করে এটাও মুস্তাহাব হবে যেহেতু দুআর ফযীলত কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত"। (ইমদাদুল ফতোয়া-১ম খণ্ড, ৮০৪ পৃষ্ঠা)

এ বিষয়টি নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা কাউকে দিয়ে ফরয নামাযের পরে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত দুআ করানো বা ছাড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আমার উদ্দেশ্য হলো যারা এটাকে বিদআত বলে থাকেন তারা বিদআত বলা বন্ধ করুন। আর যারা এটাকে আবশ্যকীয়ভাবে ছুন্নাত হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন তারা তা থেকে নেমে আসুন। এটা একটি স্বতন্ত্র মুস্তাহাব আমল। পালন করতে পারলে উত্তম। তবে না করাতে কোন দোষ নেই।

অধ্যায় ১৪ : বিবিধ মাসআলা

নামাযে কথা বললে, সালাম দিলে বা জবাব দিলে নামায ভঙ্গ হয়

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عن أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ، وَمَا بَعُدَ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হাবশায় যাওয়ার পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ স.কে নামাযে থাকাবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি সালামের উত্তরও দিতেন। হাবশা থেকে ফিরে এসে আমি রসূলুল্লাহ স.কে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। নিকট ও দূরের সকল দুশ্চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে নিলো। নামায শেষ করে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআ'লা নিজ আহকামের মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন নতুন বিধান জারী করেন। আর তিনি এ বিধান জারী করেছেন যে, তোমরা নামাযে কথা বলবে না। (ইবনে আবী শাইবা-৪৮৩৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح হাদীসটি সহীহ। (আবূ দাউদ-৯২৪ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৬৮৯)

শিক্ষণীয় : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক রসূল স.কে সালাম দেয়ার ঘটনায় তিনি ইরশাদ করেন, "তোমরা নামাযে কথা বলবে না"। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া, কথা বলার শামিল যা নামায ভঙ্গের কারণ। (শামী : ১/৬১৩, ৬১৫)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নতুন ইসলাম গ্রহণক-ারী সাহাবা হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস্ সুলামী রা. নামাযরত অবস্থায় এক লোকের হাঁচির জবাবে □□□□ □□□□□□□□□□ বললে নামাযান্তে রসূল স. তাঁকে ইরশাদ করলেন: নামাযে কথাবার্তা বলা উচিত

নয়। নামায তো তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য। (মুসলিম: ১০৮২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৬৯০)

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স. মূলত একটি নীতিমালার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, নামায হলো তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন পাঠের জায়গা। সুতরাং রসূলুল্লাহ স. নামাযের যে পদ্ধতি উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তার সবটাই হয়তো তাসবীহ, না হয় তাকবীর, (আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ) অথবা কুরআন পাঠ। তাসবীহ ও কুরআন পাঠ কিসের দ্বারা হয় তা অনেকটা পরিষ্কার। তবে তাকবীর কতভাবে কিসের দ্বারা প্রকাশ পায় তা সাধারণ মানুষের জানার বাইরে। এ কথার দ্বারা আমি আল্লাহু আকবার শব্দের দ্বারা বড়ত্ব প্রকাশের কথা বলছি না। কেননা এটা তো সকলেরই জানা। বরং রুকুর দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ, সিজদার দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ, কিয়ামের দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ ইত্যাদির কথা বলছি। এটা এমন একটি বিষয় যা নববী ইল্‌ম ছাড়া অনুধাবন করা যায় না। অতএব, নামাযের মধ্যে যে সব কাজ করণীয় বলে প্রমাণিত, তার বাইরে কিছু করা যাবে না। এর বাইরে যত ধরনের কাজ আছে তার ধরণ হিসেবে কোন্‌টা নামায ভঙ্গের কারণ হবে, কোন্‌টা মাকরূহ হবে, আবার কোন্‌টা বৈধ হবে ইত্যাদি বিষয় ইজতিহাদ বা গবেষণার সাথে সম্পর্কিত। এ ব্যাপারে গবেষক ইমামগণের শরণাপন্ন হতে হবে।

যে কারণে নামায ভেঙ্গে দেয়া যায়

عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ، فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلاَتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاَتَهُ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْىٌ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ. فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ. (رواه البخارى

فِى بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا–٢/٩٠٤)

অনুবাদ : আযরক ইবনে কায়েস রহ. বলেন, আমরা আহওয়ায নামক স্থানের একটা শুকিয়ে যাওয়া খালের কিনারায় ছিলাম। তখন আবু বারযা আসলামী রা. একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এলেন। তিনি ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। আর ঘোড়া চলে গেলো। তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার অনুসরণ করলেন এবং ঘোড়াটি ধরে নিয়ে এসে তারপর নামায আদায় করলেন। আমাদের মধ্যে তখন একজন ভিন্ন মানসি-কতার ব্যক্তি ছিলো। সে এগিয়ে গিয়ে বললো, এই বৃদ্ধের দিকে দেখো! তিনি ঘোড়ার জন্য নামায ছেড়ে দিলেন। তখন হযরত আবু বারযা রা. এগিয়ে এসে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে হারানোর পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এভাবে তিরস্কার করেনি। আর আমার বাড়ী বহু দূরে। যদি আমি নামায আদায় করতে থাকতাম আর ঘোড়াটিকে এভাবেই ছেড়ে দিতাম, তাহলে আমি রাত পর্যন্ত নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছাতে পারতাম না। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্য লাভ ও তাঁর সহজীকরণ প্রত্যক্ষ করার কথা আলোচনা করলেন। (বুখারী : ৫৬৯৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ এবং সহীহ ইবনে খুযাইমাতে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৭১৯)

শিক্ষা : এ হাদীসে বর্ণিত হযরত আবু বারযা আসলামী রা.-এর উক্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, নামাযরত অবস্থায় যদি এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাতে নামায ছেড়ে না দিলে বড় কোন ক্ষতি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। যেমন, মালামাল চুরি হওয়া, যানবাহন ছেড়ে দেয়া (যেখানে বিকল্প নেই) তাহলে নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/৫২)

নামাযের মধ্যে দৃষ্টি অবনত রাখা

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ (رواه البخارى فى بَابِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ–١/١٠٤)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট

নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা এক ধরনের ছিনতাই যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায থেকে অংশবিশেষ ছিনিয়ে নেয়। (বুখারী : ৭১৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৭০০)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا ذُكِرَ فِي الِالتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ–١/١٣٠)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: হে প্রিয় বৎস! নামাযে এদিক-ওদিক দেখা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা নামাযে এদিক-ওদিক দেখা ধ্বংসের কারণ। যদি (বিশেষ কোন প্রয়োজনে) এমন করতেই হয়, তবে তা নফলের ক্ষেত্রে করবে, ফরযে নয়। (তিরমিযী : ৫৮৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরূহ। একান্ত যদি দেখতে হয় তো নফল নামাযে দেখতে পারে ফরযে নয়। বরং মুসল্লীর জন্য উচিত হলো তার দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা। হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পছন্দ করতেন মুসল্লীর দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম না করুক। (ইবনে আবী শাইবা : ৬৫৬৩) হযরত ইবনে ছীরীন রহ. থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি পছন্দ করতেন মুসল্লী তার দৃষ্টি সিজদার জায়গা বরাবর রাখবে। যদি সে এটা না করে তাহলে তার দু'চোখ বন্ধ করে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা : ৬৫৬৪)

নামাযে করণীয় কাজসমূহের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (رواه البخارى فى بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ–٢/٩٨٦)

অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত : এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ স. মাসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে সালাম করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় করে ফিরে এসে সালাম করলো। তিনি উত্তরে বললেন, তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং নামায আদায় করো, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। লোকটি তৃতীয় বারে বললো, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যখন তুমি নামায আদায় করবে তখন ভালোভাবে অযু করে নিবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে এবং কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমার সমস্ত নামাযে এমনই করবে। (বুখারী : ৬২১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম-৭৭০, নাসাঈ-৮৮৭, আবূ দাউদ-৮৫৬, ইবনে

মাযা-১০৬০, তিরমিযী-৩০২ এবং জামেউল উসূল-৩৫৭৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স. এক সাহাবাকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে নামাযে করণীয় কাজগুলো একের পর এক ধারাবাহিক-ভাবে আদায় করার কথা বলেছেন। হাদীসের শব্দ ثُمَّ (অতঃপর) দ্বারা ধারাবাহিকতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

মানুষ চলার সম্ভাবনা থাকলে সুত্রা সামনে রেখে নামায পড়া

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ.

অনুবাদ : হযরত সাবরা ইবনে মা'বাদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন নামায আদায় করার সময় তীর দ্বারা হলেও সুতরা বানিয়ে নেয়। (ইবনে আবী শাইবা-২৮৭৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ-১৫৩৪০ নং হাদীসের আলোচনায়)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ (رواه مسلم فى بَابِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي-١/١٩٥)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, তাবুকের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে নামাযীর সামনের সুতরার পরিমাণের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাহলো হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায়। (মুসলিম : ৯৯৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (নাসাঈ-৭৪৭)

সারসংক্ষেপ : নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যেহেতু বড় ধরনের অন্যায় তাই নামাযীকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, সুতরাবিহীন নামাযে দাঁড়ানোর কারণে যেন কেউ এ অন্যায় করতে বাধ্য না হয়। আবূ দাউদ শরীফ ৬৮৯ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কেউ সুতরা না পেলে যেন লাঠি দাঁড় করে নেয় আর তা-ও না পেলে সামনে দিয়ে দাগ টেনে নেয়। এর বাইরে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তার কোন অপরাধ হবে না। সহীহ

সনদে বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মুসল্লীকে সুতরার কাছাকাছি দাঁড়াবে। (মুসনাদে আহমদ-১৬০৯০) আমাদেরকে এটাও অনুসরণ করা দরকার।

জ্ঞাতব্য : সুতরার পরিমাণের ব্যাপারে এ হাদীসে বর্ণিত হাওদার পেছনের লাঠির ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ দাউদ রহ. হযরত আতা ইবনে আবি রবাহ থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, آخِرَةُ الرَّحل: ذِراع فما فوقه 'হাওদার পিছনের খুটি'র পরিমাণ হলো এক হাত বা তার কিছু বেশি। (আবূ দাউদ : ৬৮৬)

সুতরাবিহীন মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করা

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে থাকে তখন কাউকে যেন তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে না দেয়। বরং কেউ যেতে চাইলে যেন যথাসম্ভব তাকে প্রতিহত করে। যদি সে মানতে না চায় তাহলে যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান। (মুসনাদে আহমদ-১১২৯৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীস-টি মুসলিমের শর্তে সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-১১২৯৯ নং হাদীসের আলোচনায়)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ، مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا»

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের কেউ তার নামাযী ভাইয়ের সামনে দিয়ে

আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করার অপরাধ জানতো তাহলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাও তার জন্য উত্তম ছিলো। (ইবনে মাযা-৯৪৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা মুনাবী রহ. বলেন, اسناده حسن হাদীসটি হাসান। (আত-তাইসীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৪) ইবনে হিব্বানের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিনও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তুহফাতুল মুহতাজ-৩৬৮ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং সুতরাবিহীন কোন মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন মুসল্লী সামনে সুতরা রেখে নামায পড়তে থাকলে তাঁর এবং সুতরার মাঝ দিয়েও অতিক্রম করা যাবে না। তবে কেউ নামাযরত ব্যক্তির ঠিক বরাবর সামনে থাকলে সে কোন একদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। কারণ এটাকে তখন আর অতিক্রম বলা হয় না; বরং বেরিয়ে যাওয়া বা সরে যাওয়া বলা হয়। কোন ব্যক্তি যদি খোলা ময়দান বা বড় মাসজিদে নামায পড়ে, তাহলে নামাযী সিজদার স্থানে তাকিয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবে যত দূর নজর যায় তার বাইরে দিয়ে অতিক্রম করাতে কোন দোষ নেই। এর পরিমাণ ধরা হয়েছে তিন কাতার। অর্থাৎ তিন কাতারের বাইরে দিয়ে অতিক্রম করা যায়।

ইমামের সুতরাই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَه قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, ইমামের সুতরাই তাঁর পেছনে অবস্থানরত মুক্তাদীগণের সুতরা। ইমাম আব্দুর রায্যাক বলেন, আমরা এটা গ্রহণ করি এবং মানুষের অবস্থানও এ মতানুযায়ী (আব্দুর রায্যাক-২৩১৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকূফ। এ হাদীসরে রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল উমরী মুসলিমের

রাবী এবং বিশিষ্ট আবেদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কারো কারো আপত্তি আছে। অবশ্য অন্যান্য বর্ণনার সমর্থনের কারণে এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের নিচে নয়। আল্লামা সাখাবী রহ. এ হাদীসের অর্থকে সহীহ বলেছেন। (আল মাকাছিদুল হাসানা-৬৭২ নং হাদীসের আলোচনায়) এ অর্থে আরো কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী এবং আবূ দাউদ রহ.সহ অনেক মুহাদ্দিস হযরত ইবনে ওমর রা.-এর হাদীসের হুবহু শব্দে শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের সুতরাই মুক্তাদীগণের সুতরা। সুতরাং ইমামের সামনে সুতরা থাকলে মুক্তাদীদের কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যেতে পারে।

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, যা নামাযের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন বিষয় নামাযে বৃদ্ধি করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। অথবা এমন কোন কিছু ছেড়ে দিলে যা নামাযের মধ্যে আবশ্যক (ওয়াজিব)। অথবা নামাযের কোন জরুরী কাজ করা বা না করার বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেয়ার পর তা পুনরায় আদায় করলে একই আমল দ্বিতীয়বার আদায় করার সন্দেহে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। তবে ফরয ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। আবূ দাউদ শরীফের ১০৩৮ নম্বর হাদীসে রসূল স. ইরশাদ করেছেন যে, 'প্রত্যেক ভুলের জন্য দুটি করে সিজদা রয়েছে'। হাদীসে বর্ণিত 'প্রত্যেক ভুল' কথাটা দ্বারা সব ধরনের ভুল উদ্দেশ্য, নাকি নির্দিষ্ট কোন শ্রেণির ভুল উদ্দেশ্য তার ব্যাখ্যা হিদায়া কিতাবে পেশকৃত সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার নীতিমালা দ্বারা স্পষ্ট হতে পারে। আল্লামা আবুল হাসান আল কুদূরী রহ. বলেন,

قَالَ: وَيَلْزَمُهُ السَّهْوُ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَجْدَةَ السَّهْوِ وَاجِبَةٌ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نَقْصٍ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ فَتَكُونُ وَاجِبَةً كَالدِّمَاءِ فِي الْحَجِّ وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ تَأْخِيرِهِ أَوْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ سَاهِيًا هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالزِّيَادَةِ

لِأَنَّهَا لَا تَعْرَى عَنْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ

অনুবাদ : সিজদায়ে সাহু তখন ওয়াজিব হয়, যখন মুসল্লী নামাযের মধ্যে তার করণীয় কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এমন কিছু বৃদ্ধি করে ফেলে যা প্রকৃত অর্থে উক্ত নামাযের কাজ নয়। (হিদায়া গ্রন্থকার এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন) এটা প্রমাণ করে যে, সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব। কেননা, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য। সুতরাং হজ্বের ক্ষতিপূরণে যেমন দম ওয়াজিব হবে, অনুরূপভাবে এটাও ওয়াজিব হবে। আর যখন প্রমাণিত হলো যে, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব, তখন এটা কেবল ভুলক্রমে ওয়াজিব পরিত্যাগ করা, ওয়াজিব আদায়ে দেরি করা অথবা কোন রোকন আদায়ে দেরি করার কারণে হয়ে থাকে। এটা হলো সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি। তবে কোন কিছু বৃদ্ধি করলেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। তার কারণ হলো কোন কিছু বৃদ্ধির দ্বারা হয়তো রোকন আদায়ে দেরি হয় অথবা ওয়াজিব ছুটে যায়। (হিদায়া : সিজদায়ে সাহু অধ্যায়)

হিদায়া কিতাবের এ বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, আবূ দাউদ শরীফের ১০৩৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত 'প্রত্যেক ভুলের জন্য দুটি করে সিজদা রয়েছে' দ্বারা যে কোন ভুল উদ্দেশ্য নয়। বরং ওয়াজিব ছুটে যাওয়া বা বৃদ্ধি করা অথবা ফরয আদায়ে বিলম্ব করা কিংবা ফরযের ধারাবাহিকতা ইবনেষ্ট হওয়ার মতো ভুল উদ্দেশ্য। এ জাতীয় ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে থাকে।

সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করা

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ التَّوَجُّهِ نَحْوَ

الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ–১/৫৭)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. নামায পড়লেন। রাবী ইবরাহীম রহ. বলেন, আমার জানা নেই, তিনি বেশি করেছেন বা কম করেছেন। সালাম ফেরানোর পরে বলা হলো: ইয়া রসূলাল্লাহ! নামাযের মধ্যে কি নতুন কিছু হয়েছে? তিনি বললেন, তা কী? তাঁরা বললেন, আপনি তো এরূপ এরূপ নামায আদায় করেছেন। রসূলুল্লাহ স. তখন দু'পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হলেন এবং আরো দুটি সিজদা করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, যদি নামায সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাকো, আমিও ভুল করি। সুতরাং আমি কখনো ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহে পড়লে সে যেন নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী নামায পুরো করে। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা আদায় করে। (বুখারী : ৩৯২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৭৬৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে সিজদায়ে সাহু করতে হবে সালামের পরে। অনুরূপ হাদীস মুসলিম শরীফ : **১১৬৮, ১১৭১** ও **১১৭২** নম্বরে বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সহীহ সনদে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়লেন। তাঁকে বলা হলো নামাযে কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? অতঃপর তিনি সালাম ফেরানোর পরে দুটি সিজদা করলেন। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী : ৩৯২) অনুরূপ আমল সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে, (মুসনাদে আহমদ : ১০৮৮৭) হযরত সা'দ ও হযরত আম্মার রা. থেকে (ইবনে আবী শাইবা : ৪৪৭৬) এবং হযরত আনাস রা. থেকে। (ইবনে আবী শাইবা : ৪৪৭০)

উপরিউক্ত সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলের ভিত্তিতে আমরা সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করে থাকি। এর বিপরীতে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু করার কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। সে সব হাদীসের ভিত্তিতে কেউ যদি সালামের পূর্বে

সিজদায়ে সাহু করে তাহলেও সিজদায়ে সাহু আদায় হয়ে যাবে।

সিজদায়ে সাহুর সালামের পরে তাশাহহুদ পড়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتِيَ السَّهْوِ-١/٩٠)

অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. তাদেরকে নামায পড়ালেন এবং ভুল করলেন, ফলে তিনি দুটি সিজদা করলেন। অতঃপর তাশাহহুদ পড়লেন তারপরে সালাম ফিরালেন। (তিরমিযী-৩৯৫, ইবনে খুযাইমা-১০৬২, আবূ দাউদ-১০৩৯, ইবনে হিব্বান-২৬৭০, মুসতাদরাকে হাকেম-১২০৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব। আর হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম-১২০৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৭৫৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে নির্দিষ্ট কিছু ভুলের মাশুল হিসেবে দুটি সিজদায়ে সাহু করতে হয় এবং উক্ত সিজদার পরে তাশাহহুদ পাঠ করে পুনরায় সালাম ফিরাতে হয়।

সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহহুদ পাঠের আমল সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে, (ইবনে আবী শাইবা-৪৪৯৩) হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে, (ইবনে আবী শাইবা-৪৪৯৪) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন রহ. থেকে (ইবনে আবী শাইবা-৪৪৯৫) এবং হযরত হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান ও হাকাম ইবনে উতায়বা রহ. থেকে। (ইবনে আবী শাইবা-৪৫০০)

জ্ঞাতব্য: সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি এই যে, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করে নামাযের সালাম কেবল এক দিকে ফিরানো। অতঃপর দুটি সিজদায়ে সাহু করে পুনরায় তাশাহহুদ পাঠ করে সালাম ফিরানো। দুরূদ এবং

দুআয়ে মাছুরা প্রথম সালামের আগেও পড়া যেতে পারে আবার শেষ সালামের আগেও পড়া যেতে পারে। তবে জামাতের নামাযের ক্ষেত্রে শেষ সালামের আগে দুরূদ এবং দুআ পড়া উত্তম হবে। যেন প্রথম সালাম স্বাভাবিকের চেয়ে আগে ফিরানোর কারণে মুসল্লীদের জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টা অনুধাবন করা সহজ হয়।

সিজদায়ে সাহুর জন্য সালাম এক দিকে ফিরানো

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَسْلِيم السَّهو وَالْجَنَازَةِ وَاحِد.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, সিজদায়ে সাহু ও জানাযার সালাম একটি। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৬১৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’। আব্দুল মালিক ইবনে ইয়াছ ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল মালিক ثقة নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব : ৪৬৬৬)

সারসংক্ষেপ : সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে তা আদায় করার যে নিয়ম আমাদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে তা হলো: শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে, দুরূদ ও দুআ মাছুরা বাদ রেখে এক দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা করা। এরপর তাশাহহুদ পড়ে দুরূদ ও দুআ শেষ করে পুনরায় সালাম ফিরানো।

প্রচলিত এ নিয়মের ব্যাপারে হানাফী ইমামগণের নিজেদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। যথা : (ক) যিনি সিজদায়ে সাহু করবেন তিনি কি শুধু তাশাহহুদ পড়ে সিজদায়ে সাহুর সালাম ফিরাবেন না কি দুরূদ ও দুআ মাছুরা শেষ করে সালাম ফিরাবেন? (খ) সালাম এক দিক ফিরাবেন না কি দুই দিক ফিরাবেন?

শুধু তাশাহহুদ পড়ে সিজদায়ে সাহুর সালাম ফিরানোর আমল করার কথা হিদায়াহ প্রণেতাসহ হানাফী মাযহাবের অনেক ইমাম বলেছেন এবং এটাকে তাঁরা সহীহ নিয়ম বলেছেন। কিন্তু সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব না হলে স্বাভাবিক নিয়মে সালাম ফিরাতে হয় দুরূদ এবং দুআ মাছুরা শেষ করে। এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু তাশাহহুদ পড়ে সিজদা করার যে আমল আমাদের মাঝে চালু আছে তার কারণ এই যে, হাদীসের মধ্যে দুআ

করতে বলা হয়েছে নামাযের শেষের দিকে তাশাহহুদ এবং দুরূদের পরে। (বুখারী-৭৯৫, নাসাঈ : ১২৮৭) যেহেতু সিজদায়ে সাহুর পরে আবার তাশাহহুদ রয়েছে এ কারণে সর্বশেষে গিয়ে দুরূদ এবং দুআ মাছুরা পড়লে ঐ সকল হাদীসের উপর পূর্ণ আমল হয়।

আরো একটি কারণ এই হতে পারে যে, ইমাম সাহেব তাশাহহুদ, দুরূদ এবং দুআ মাছুরা শেষ করে ডানে সালাম ফিরালে সিজদায়ে সাহুর জন্য তাকবীর বলার আগেই মাসবুক তার নামায পুরা করার জন্য উঠে যাবে; যদিও এটা ঠিক নয়। কিন্তু শুধু তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালে কারণ জানা না থাকলেও সকলে বুঝবে যে, সিজদায়ে সাহু করতে হবে । এটা নামায শেষ করার সালাম নয়, বরং সিজদায়ে সাহুর সালাম।

একদিকে সালাম ফিরানোর একটি হেকমত এটাও হতে পারে যে, ইমাম সাহেব উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে দিয়ে সিজদায়ে সাহুর তাকবীর বললে অনেক ব্যস্ত মাসবুক নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে, কেউ ছুন্নাত পড়তে দাঁড়িয়ে যাবে, আবার কেউ হয়তো বের হওয়া শুরু করবে। কিন্তু একদিকে সালাম ফিরিয়ে সিজদা করলে এমনটা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

জ্ঞাতব্য: উপরিউক্ত হেকমতগুলো জামাতের নামাযের জন্য প্রযোজ্য। কেউ একাকী নামায পড়লে দুরূদ এবং দুআ মাছুরা শেষ করে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে তারপরে সিজদায়ে সাহু করতে পারে।

ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ، فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: "وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا" أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا (مسند أحمد ط الرسالة ١٧/ ٢٩٣)

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দক যুদ্ধের দিন (কাফের কর্তৃক) আমাদেরকে বেশ কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে বিরত রাখা হলো। এমনকি মাগরিবের পরেও বেশ সময় কেটে গেলো। এ ঘটনাটি যুদ্ধের বিষয়ে যা নাজিল হয়েছে তথা সলাতুল খওফ-এর পূর্বের ঘটনা। যখন যুদ্ধ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। আর এটা আল্লাহর বাণী- যুদ্ধের বিষয়ে আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেনে। আল্লাহ তাআলা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। তখন রসূল স. হযরত বিলাল রা.কে নির্দেশ দিলে তিনি যোহরের ইকামাত দিলেন। অতঃপর রসূল স. তা এভাবে আদায় করলেন যেভাবে সময়মত আদায় করে থাকেন। অতঃপর আসরের ইকামাত দিলে তিনি তা এভাবে আদায় করলেন যেভাবে সময়মত আদায় করে থাকেন। অতঃপর মাগরিবের ইকামাত দিলে তিনি তা এভাবে আদায় করলেন যেভাবে সময়মত আদায় করে থাকেন। (মুসনাদে আহমদ-১১১৯৮, ইবনে আবী শাইবা-৪৮১৫, ৩৭৬৫৬, ৩৭৯৬৯, সহীহ ইবনে খুযাইমা-৯৯৬, ১৭০৩ ও সহীহ ইবনে হিব্বান-২৮৯০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাদীসটিকে অনেক মুহাদ্দিসীনে কিরাম সহীহ বলেছেন। তম্মধ্যে মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح على شرط مسلم হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। অনুরূপ বর্ণনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকেও নাসাঈ-৬৬৩, তিরমিযী : ১৭৯ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করেছেন এবং তার ধারাবাহিকতা ঠিক রেখেছেন এভাবেই কাযা নামাযসমূহ ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে। তবে যদি কেউ কাযা নামাযের কথা ভুলে গিয়ে পরবর্তী নামায আদায় করে নেয়, বা কারো কাযা নামাযের পরিমাণ এত বেশি হয়ে যায় যার ধারাবাহিকতা মনে রাখা সাধারণত সম্ভব হয় না অথবা সময় এত সংকীর্ণ হয় যে, কাযা আদায় করতে গেলে ওয়াক্তের নামাযও ছুটে যাবে। সেক্ষেত্রে আগে ওয়াক্তেরটা পড়ে নিয়ে পরে কাযা আদায় করতে হবে। তখন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী হবে না।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَسَّامٍ أَبُو

إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلاَةَ الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَامِ تَفَرَّدَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانِيُّ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, কেউ কোন নামাযের কথা ভুলে যাওয়ার পরে এমন সময় স্মরণ হলো যখন সে ইমামের পেছনে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযে রত, তাহলে সে ইমামের সঙ্গে নামায পড়বে। অতঃপর নামায শেষ করে ভুলে যাওয়া নামায আদায় করবে। তারপর ইমামের সঙ্গে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়বে। (ইমাম বায়হাকী বলেন,) কেবল আবু ইবরাহীম তুরজুমানী একাই এ হাদীসটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ হলো : এটা ইবনে উমারের নিজের মন্তব্য–যা মাউকূফ হাদীস। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৩৩৯৩, দারাকুতনী : ১৫৭৮ ও ১৫৭৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ ও মারফু'। ইমাম বায়হাকী এবং দারাকুতনী রহ. উভয়েই হাদীসটিকে মাউকূফ হিসেবে সহীহ বলেছেন। আর মারফু' হিসেবে আবু ইবরাহীম তুরজুমানীর একক বর্ণনা বলে অগ্রহণযোগ্য বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু হাদীসটি মাউকূফ হিসেবে সহীহ হওয়ার পাশাপাশি মারফু' হিসেবেও সহীহ। কারণ এটা একজন সত্যনিষ্ঠ রাবীর এমন অতিরিক্ত বর্ণনা যা অন্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর এ জাতীয় বর্ণনা মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য। (বিস্তারিত দেখুন- হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর লিখিত 'শরহু নুখবাতিল ফিকার' কিতাবের শায অধ্যায়ের পূর্বে) আর যদি মাউকূফ মেনে নেয়া হয় তাহলেও ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয় হওয়ার কারণে এটা হুকমী মারফু'। অতএব, সর্বাবস্থাতেই এটা দলীলযোগ্য।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাযা নামায আদায়ের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী। এমনকি ভুল করে আগে ওয়াক্তের নামায পড়ে ফেললেও সময় থাকলে পেছনের নামায কাযা করার পরে আবার ওয়াক্তের নামায পুনরায় পড়া জরুরী। ঐ ওয়াক্তের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সময় থাকার কারণে ইমামের সাথে আদায়কৃত ওয়াক্তের নামায পুনরায় পড়তে বলা হয়েছে। তবে যথেষ্ট পরিমাণ সময় না থাকলে তা পড়তে হবে না।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা أَقِيمُوا الصَّلَاةَ বাক্য দ্বারা বান্দার উপর নামায ফরয করেছেন। (ছূরা বাকারা-৪৩) উক্ত ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পন্থা হলো নামায আদায় করা। অপর এক নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ তাআলা ফরয নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিও বেঁধে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا নিশ্চয় মুমিনদের প্রতি নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা ফরয করা হয়েছে। (ছূরা নিছা : আয়াত-১০৩) সুতরাং বান্দাদের উপর নামায ফরয করা হয়েছে একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ দ্বারা। আর নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করা আবশ্যক করা হয়েছে আরেকটি স্বতন্ত্র নির্দেশ দ্বারা। সময়মত নামায আদায় করলে দুটি নির্দেশই একসাথে পালিত হয়। আর সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে আদায় করলে মূল ফরয আদায়ের দায়িত্ব পালিত হয়। তবে গাফিলাতির কারণে সময় পার করে আদায় করলে একটি নির্দেশ অমান্য করার অপরাধ হয়। এ কারণে সে নামায আদায়ও করতে হয় আবার অবহেলা করে দেরি করার কারণে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করতে হয়। কাযা নামায আদায় না করে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করলে নামায বিলম্ব করার অপরাধ থেকে অব্যাহতি পেলেও নামায আদায়ের মূল নির্দেশ পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরাম সারাদিনের রণক্লান্ত শরীর নিয়ে কষ্ট করে ছুটে যাওয়া ৩ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন। সময়মত নামায না পড়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুধু ক্ষমা প্রার্থনা যথেষ্ট হলে তাঁরা কষ্ট করে ৩ ওয়াক্ত নামায আদায় না করে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা চেয়েই দায়িত্ব হতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন। তাঁর চেয়ে বেশি দুআ কবুল হতে পারে দুনিয়াতে এমন আর কে আছে?

উমরী কাযা প্রসঙ্গ

অতীতের ছুটে যাওয়া নামাযকে সাধারণ মানুষ উমরী কাযা বলা হয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থে এ নামে কোন শব্দ কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার আরেক শ্রেণির মানুষ উমরী কাযার শব্দ হাদীসে না পাওয়ার অজুহাতে কাযা নামায আদায় করা লাগবে না বলে সমাজে অপপ্রচার চালাতে শুরু করেছে। কিন্তু দলীল হিসেবে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট কোন বাণী পেশ করতে না পেরে কিছু অবান্তর যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। অথচ রসূল স. ও সাহাবায়ে কিরাম কাযা নামায আদায় করেছেন মর্মে বুখারী ও তিরমিযী শরীফের হাদীস ইতিমধ্যেই আমরা পাঠকদের খেদমতে পেশ করেছি। অতএব, কারো অপপ্রচারে কান না দিয়ে নিজের আখেরাতকে কল্যাণময় করতে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায়ে সচেষ্ট থাকুন। অতীতের পুরাতন কাযা নামাযকে উমরী কাযা নাম না দিলেও সেগুলো তো ছুটে যাওয়া নামায। কেন সেগুলোর কাযা আদায় করা হবে না? কাযা পুরাতন হয়ে গেলে আদায় করার প্রয়োজন থাকে না এমন কোন দলীল আছে কি?

যানবাহনে নামাযের পদ্ধতি

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ.... فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ لاَ أُرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(رواه البخارى فى بَابِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا–٢/٦٥٠)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.কে সালাতুল খাওফ বা যুদ্ধের ভীতিকর পরিস্থিতির নামাযের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন... যদি ভয় অত্যাধিক হয় তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অথবা যানবাহনে আরোহন করে কিবলামুখী হয়ে বা না হয়ে (সম্ভবমতো) নামায আদায় করবে। (বুখারী : ৪১৭৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

পর্যালোচনা ও শিক্ষা : বুখারী শরীফের এ হাদীসটি صلاة الخوف বা ভীতিকর পরিস্থিতির নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত। তবুও এ থেকে কিছু দিকনির্দেশনা মিলবে। কেননা শত্রুর ভয় না হলেও গন্তব্যে পৌঁছতে না পারার আশঙ্কা, গাড়ী ছেড়ে দিলে পথে বিপদে পড়ার ভয় সবই এর সাথে যুক্ত আছে। অতএব, ভীতিকর পরিস্থিতির নামায থেকে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে। যানবাহনের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো যানবাহনে যদি ভেতরে থেকে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে যথানিয়মে নামায পড়ার কোন সুযোগ থাকে, তাহলে ভেতরে থেকে যথানিয়মে নামায আদায় করবে। আর যদি যানবাহনে ভেতরে থেকে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে যথানিয়মে নামায পড়ার কোন সুযোগ না থাকে, তাহলে প্রথমে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে যানবাহন থেকে নেমে যথানিয়মে নামায আদায় করতে। একান্তই নামার কোন সুযোগ না থাকলে বা নামলে গাড়ী চলে যাবে তখন গন্তব্যে পৌঁছতে বেগ পেতে হবে– এ ধরনের সমস্যা হলে সেক্ষেত্রে গাড়ির ভেতরে যেভাবে সম্ভব নামায পড়ে নিবে। এরপর গাড়ী থেকে নামার পরে সতর্কতামূলক উক্ত নামায আবার আদায় করে নিবে।

দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে মাসজিদে না আসা

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا. أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

(رواه البخارى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ–١/١١٨)

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের থেকে বা আমাদের মাসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজ ঘরে বসে থাকে। (বুখারী : ৮১৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৫২১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মাসজিদে আসা যাবে না। অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞা শুধু উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মুখের দুর্গন্ধে মানুষ ও ফেরেশতারা কষ্ট পায় এমন যে কোন জিনিসের ব্যাপারেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কারণ মূল উদ্দেশ্য হলো

মুসলমান এবং মসজিদের ফেরেশতা কষ্ট পায় এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকা। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে মুসলিম শরীফ-১১৩৪ নম্বর হাদীসে। সুতরাং বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, গুল বা এ জাতীয় কোন জিনিস ব্যবহার করা অথবা গুরুত্ব সহকারে মেসওয়াক ব্যবহার না করা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে যা মানুষের জন্য পীড়াদায়ক হয় সবই এ হুকুমের আওতাভুক্ত। রসূলুল্লাহ স.-এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কেউ এগুলো ব্যবহার করবে, আর মাসজিদ ছেড়ে দিবে। বরং উদ্দেশ্য হলো মাসজিদে নিয়মিত আসবে। আর যে সব জিনিসের দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় তা ছেড়ে দিবে।
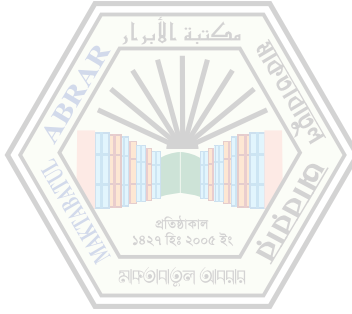
অধ্যায় ১৫ : জামাতের আহকাম

ফরয নামায জামাতে পড়া জরুরী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ. (رواه البخارى فى بابِ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ–١/٩٠)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, মুনাফিকদের জন্য ফজর ও ইশার নামাযের চেয়ে অধিক কষ্টকর নামায আর নেই। যদি তারা এ দুই নামাযের ফযীলত জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে উপস্থিত হতো। আমি ইচ্ছা করেছি যে, মুআজ্জিনকে ইকামাত দিতে বলি এবং কাউকে ইমামতি করতে বলি। অতঃপর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে যারা আযান শুনার পরও নামাযের জামাতে আসেনি তাদের উপর আগুন লাগিয়ে দেই। (বুখারী : ৬২৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮০৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক আযান শুনেও যারা মাসজিদে না যায় রসূল স. তাদের ঘর-বাড়ী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার ধমকি দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামায জামাতে আদায় করা একান্ত জরুরী।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রসূল স.-এর নিকট এসে মাসজিদে না গিয়ে বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি চাইলে রসূল স. তাকে অনুমতি দেননি। (মুসলিম-১৩৬১)

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِىَ الصَّلاَةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى يُؤَذَّنُ فِيهِ. (رواه مسلم فى بَابِ فضل الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها-١/١٣٢)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা আমাদেরকে দেখেছি প্রকাশ্য মুনাফিক এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা বাদে কেউ নামাযের জামাত থেকে পেছনে থাকতো না। অসুস্থ ব্যক্তি যদি দু'জনের মাঝে (তাদের উপর ভর করে) নামাযে আসতে পারতো তাহলে চলে আসতো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আরো বলেন, রসূল স. আমাদেরকে হিদায়াতের পথ শিক্ষা দিয়েছেন। আর উক্ত পথসমূহের মধ্যে একটি হলো যে মাসজিদে আযান হয় সেখানে নামায আদায় করা। (মুসলিম-১৩৬২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হিদায়েতের পথ হলো ফরয নামায জামাতে গিয়ে আদায় করা। অতএব, মারাত্মক সমস্যা ব্যতীত জামাত পরিত্যাগ করা যাবে না। হযরত আলী রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, মাসজিদের আযান শোনে এমন প্রতিবেশীর নামায মাসজিদ ব্যতীত হয় না। (আব্দুর রয্যাক-১৯১৫) হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনলো অথচ কোন ওযর ছাড়াই তাতে সাড়া দিল না তার নামায হলো না। (ইবনে মাযা-৭৯৩, সহীহ ইবনে হিব্বান-২০৬৪, দারাকুতনী-১৫৫৫)

ইমামের সাথে মুক্তাদী একজন হলেই জামাত হবে

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ لَنَا: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. (متفق عليه واللفظ لمسلم رواه فى بَابِ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ)

অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুআরিস রা. বলেন, আমি আর আমার আরেক সাথী রসূল স.-এর খেদমতে হাজির হলাম। যখন আমরা তাঁর নিকট থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম তিনি ইরশাদ করলেন, নামাযের সময় হলে তোমরা আযান দিবে এবং ইকামাত দিবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে নামায পড়াবে। (মুসলিম-১৪০৯, বুখারী : ৬২৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২৮২০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল স. মালেক ইবনে হুআই-রিস এবং তাঁর সাথীকে নিয়ে জামাতে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামাত হওয়ার জন্য ইমামের সাথে একজন হলেই যথেষ্ট। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন, কোন ব্যক্তি কি নেই যে, তার সঙ্গে নামায পড়ে তাঁকে (জামাতের নেকি) ছদকা দিবে। (আবূ দাউদ-৫৭৪, তিরমিযী-২২০) এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামাত হওয়ার জন্য ইমামের সাথে একজন হলেই যথেষ্ট। আরো প্রমাণিত হয় যে, এরকম ছোট জামাতেও জামাতের ছওয়াব পাওয়া যায়।

কাতার সোজা করা এবং গায়ে-গায়ে মিলে দাঁড়ানো

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ. (رواه ابو داود فى بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ–۹۷/۱)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা কাতার সোজা করো, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও, মধ্যবর্তী ফাঁকা বন্ধ করো এবং তোমরা তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। (আবূ দাউদ : ৬৬৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাকেম এবং ইবনে খুযাইমার বরাত দিয়ে বলেন, উক্ত হাদীসটি সহীহ।

(ফাতহুল বারী, অধ্যায় : কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৬৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাতার সোজা করা, গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ানো এবং কাতারের মাঝে ফাঁকা না রাখা নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হযরত আনাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কাতার সোজা করো এবং মিলে মিলে দাঁড়াও। কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকে দেখি। (বুখারী-৬৮৪)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ. ثَلاَثًا وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ. (رواه ابو داود فى بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ-١/٩٧)

অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. লোকদের দিকে ফিরে ৩বার বললেন, তোমরা কাতার সোজা করো। আল্লাহর কসম তোমরা হয় কাতার সোজা করবে, না হয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিলের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি করে দিবেন। হযরত নু'মান ইবনে বাশির রা. বলেন, আমি লোকদেরকে দেখেছি নিজের কাঁধ পার্শ্বস্থ ব্যক্তির কাঁধের সাথে, হাঁটু পার্শ্বস্থ ব্যক্তির হাঁটুর সাথে এবং পায়ের গিঠ সাথীর পায়ের গিঁঠের সাথে মিলাচ্ছে। (আবূ দাউদ-৬৬২)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এ হাদীসটিকে ইবনে খুযাইমা সহীহ বলেছেন। (ফাতহুল বারী, অধ্যায় : কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো)

ফায়দা : কাঁধের সঙ্গে কাঁধ, হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু এবং গিঁঠের সঙ্গে গিঁঠ মিলিয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রা.-এর মন্তব্য (আবূ দাউদ-৬৬২), বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর মন্তব্য (বুখারী-৬৮৯) এবং এ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেকে নামাযে নিজের দু'পায়ের মধ্যে অনেক ফাঁক করে অন্যের পায়ের সাথে লাগিয়ে দেয় এবং এটাকে রসূল স.-এর ছুন্নাত বলে প্রচার করে

থাকে। প্রকৃত অর্থে এটা সাহাবায়ে কিরামের আমলের শাব্দিক ও মৌখিক বিবরণ; রসূল স.-এর আমল বা নির্দেশ নয়। এ বিবরণে কাঁধের সাথে কাঁধ...মিলিয়ে দাঁড়ানোর যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কেউ কেউ তার অর্থ লাগিয়ে দেয়া করে থাকে। এ কারণে তারা নিজের দু'পায়ের মধ্যে অনেক ফাঁক করে অন্যের পায়ের সাথে পা লাগানোর চেষ্টা করে থাকে। অথচ মিলিয়ে দাঁড়ানোর উদ্দেশিত অর্থ এটা নয় এবং হাঁটুর ক্ষেত্রে এ অর্থ বাস্তবায়ন করাও সম্ভব নয়। বরং এ হাদীসে মিলানোর প্রকৃত অর্থ হলো কাতারের আঁকাবাঁকা দূর করতে প্রত্যেকের গিঠ, কাঁধ এবং হাঁটুর লাইন মিলানো বা বরাবর হয়ে দাঁড়ানো যেন আগে-পিছে না হয়। সাথে সাথে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দেয়া যেন কাতারের মাঝে ফাঁকা না থাকে। অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন বুখারী শরীফের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালনী রহ.। (ফাতহুল বারী, অধ্যায় : কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো)

অতএব, নিজের দু'পায়ের মধ্যে অনেক ফাঁক করে অন্যের পায়ের সাথে পা লাগানোর আমলকে রসূল স.-এর হাদীস বলে প্রচার করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। এমনকি সাহাবায়ে কিরামের আমলেরও এটা প্রকৃত রূপ নয়। বরং মুসল্লীদের মাঝের দূরত্ব ঘুচিয়ে খুব বেশি মিলে দাঁড়ানো এবং ভালোভাবে কাতার সোজা করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রূপক অর্থে উক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখুন "দু'পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক ফাঁকা রাখা" শিরোনামে।

সামনের কাতার পূর্ণ না করে পিছনে দাঁড়ানো নিষেধ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা সামনের কাতার পূর্ণ করো, অতঃপর পরবর্তী কাতারগুলো পূর্ণ করো। যদি কোন কাতার অসম্পূর্ণ থাকে তা যেন শেষ কাতার হয়। (মুসনাদে আহমদ-১৩৪৩৯, আবূ দাউদ : ৬৭১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীস-টি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-১৩৪৩৯ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু

তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৬৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে সামনের কাতার পূর্ণ করতে হবে। অতঃপর কাতার পূর্ণ হতে যতটুকু ঘাটতি থাকে তা যেন শেষের কাতারে থাকে। হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. আমাদের নিকট এসে বললেন,: তোমরা কি এমনভাবে কাতারবদ্ধ হবে না, যেভাবে ফেরেশতা-াগণ তাঁদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? আমরা বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! ফেরেশতাগণ তাঁদের রবের সামনে কিভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? উত্তরে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: তারা সামনের কাতারগুলো আগে পূর্ণ করে এবং গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ায়। (মুসলিম : ৮৫২)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ. (رواه مسلم فى بَابِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَإِقَامَتِهَا– ١/١٨١)

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. সাহাবাদের মধ্যে পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সামনে অগ্রসর হও এবং আমার অনুকরণ করো। আর যারা তোমাদের পেছনে আছে তারা তোমাদের অনুকরণ করবে। একদল লোক সর্বদা নামাযে পেছনে হটতে থাকবে। আর আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে (আপন রহমত থেকে) দূরে সরিয়ে দিবেন। (মুসলিম : ৮৬৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৭৯)

ব্যাখ্যা : "আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হটিয়ে দিবেন" এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন, **يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَنْ رَحْمَتِهِ أَوْ عَظِيمِ فَضْلِهِ وَرَفْعِ الْمَنْزِلَةِ وَعَنِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ** "আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আপন রহমত, মহা অনুগ্রহ, উঁচ্চ মর্যাদা, ইল্‌ম এবং এ জাতীয় জিনিস থেকে হটিয়ে দিবেন। (আল মিনহায)

একা এক কাতারে না দাঁড়ানো

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ زِيَادٌ حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ–١/٥٤)

অনুবাদ : হিলাল ইবনে ইয়াসাফ রহ. বলেন, আমরা রাক্কা নগরীতে থাকাবস্থায় হযরত যিয়াদ ইবনে আবুল জা'দ আমার হাত ধরে বনী আসাদের 'ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ' নামক এক শায়খের নিকট নিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি উক্ত শায়খকে শুনিয়ে আমাকে বললেন, এই শায়খ আমাকে বলেছেন, এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়ছিলো। রসূলুল্লাহ স. তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তিরমিযী : ২৩০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৭৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একা এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহ।

ফায়দা : সামনের কাতার পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর কেউ জামাতে হাজির হলে সে যদি এ ব্যাপারে আশাবাদী হয় যে, কেউ না কেউ এসেই যাবে, তাহলে সে অপেক্ষা না করে জামাতে শরিক হয়ে যাবে। আর তার এ আশা না থাকলে সামনের কাতার থেকে মাসআলা সম্পর্কে জানে এমন কাউকে টেনে পেছনের কাতারে এনে দু'জন এক কাতারে দাঁড়াবে। আর সামনের কাতারে এমন কেউ না থাকলে অপারগতা বশতঃ একাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে।

প্রথম কাতারের ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. (رواه مسلم فى بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَإِقَامَتِهَا–١/١٨١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. বলেন, পুরুষের জন্য উত্তম কাতার হলো প্রথম কতার। আর মহিলাদের জন্য উত্তম কাতার হলো শেষ কাতার। (মুসলিম-৮৬৯) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৬২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের জন্য সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়া অতি উত্তম। আর মহিলাদের জন্য জামাতের তুলনায় একা নামায উত্তম এবং ঘরের গভীর প্রকাষ্ঠে আরো বেশি উত্তম। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কোন মহিলা পুরুষদের সাথে এক জামাতে নামায আদায় করে, তাহলে তার জন্য প্রথমে আবশ্যক হলো পুরুষদের কাতার যেখানে শেষ হবে তার পরের কাতারে দাঁড়ানো। এমন কি মহিলাদের একাধিক কাতার থাকলে তাদের জন্য উত্তম কাতার হবে সর্বশেষ কাতার। পুরুষদের জন্য সামনের কাতার উত্তম হওয়ার ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যদি লোকেরা জানতো যে, আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে নামায আদায়ের কি ফযীলত অতঃপর লটারী করা ব্যতীত এ কাজে সুযোগ না পেত তাহলে মানুষ এর জন্য লটারী করতো। (বুখারী : ৫৮৮, পৃষ্ঠা :) হযরত ইরবায ইবনে সারিয়াহ রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. প্রথম কাতারের মুসল্লীদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন আর দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লীদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। (ইবনে মাযা-৯৯৬, মুসনাদে আহমদ-১৭১৪১)

বয়স্ক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইমামের নিকট দাঁড়াবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلاَثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ

(رواه مسلم فى بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَإِقَامَتِهَا–١/١٨١)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে বয়স্ক এবং জ্ঞানী লোকেরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাদের কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা দাঁড়াবে। তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন।

সাবধান! তোমরা (মাসজিদে) বাজারের মতো শোরগোল করবে না। (মুসলিম : ৮৫৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৫০)

পর্যালোচনা : বয়স্ক, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ লোকেরা ইমামের নিকট দাঁড়ানো উত্তম। এর একাধিক কারণ থাকতে পারে। যেমন, কাছে থেকে ইমামের নামায দেখে নামাযের সঠিক পদ্ধতি আয়ত্ব করা, ইমামের কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে অবশিষ্ট নামায পড়ানো ইত্যাদি।

ইমামের সাথে মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডানে দাঁড়াবে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (رواه البخارى فى بَابٍ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ.. –٩٧/١)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা বলেন, আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়েছি। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি পেছন দিক থেকে আমার মাথা ধরে আমাকে ডান পাশে নিয়ে এলেন। অতঃপর নামায পড়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। পরক্ষণে মুআজ্জিন এলে তিনি উঠে নামায পড়লেন কিন্তু অযু করলেন না। (বুখারী : ৬৯০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৫২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের সাথে মুক্তাদী মাত্র একজন হলে সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে।

একাধিক মুক্তাদী হলে তারা ইমামের পিছনে দাঁড়াবে

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ......ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِايدينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا

خَلْفَهُ (رواه مسلم فى بَابِ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ وَقِصَّةِ أَبِي الْيَسَرِ–٢/٤١٧)

অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে ছামিত রা. বলেন, আমি ও আমার পিতা এই মহল্লা তথা আনসারীদের মহল্লায় দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হলাম।...অতঃপর আমি এসে রসূলুল্লাহ স.-এর বাম পাশে নামাযে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে আমাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর জাব্বার ইবনে সখর এসে অযু করে রসূলুল্লাহ স.-এর বাম পাশে দাঁড়ালো। রসূলুল্লাহ স. আমাদের উভয়ের হাত ধরে পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। (মুসলিম : ৭২৪০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৮৯৩১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের সাথে মুক্তাদী একাধিক হলে তারা ইমামের বরাবর এক কাতার পেছনে দাঁড়াবে।

ইমামকে মাঝে রেখে উভয় দিকে সমসংখ্যক মুসল্লী দাঁড়াবে

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَسِّطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ . (رواه ابو داود فى بَابِ مَقَامِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ–١/٩٩)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন : তোমরা ইমামকে কাতারের মাঝে দাঁড় করাও এবং কাতারের মধ্যকার ফাঁকা বন্ধ কর। (আবূ দাউদ : ৬৮১)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। এ হাদীসে ইয়াহইয়া ইবনে বশীর এবং তার আম্মা অপরিচিত। তবে মুক্তাদী ইমামের উভয় দিকে সমানভাবে দাঁড়ানোর বিষয়টি বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং উম্মতের আমলও এ ব্যাপারে একই রকম। উপরন্তু ইমাম আবূ দাউদ যখন এ হাদীসের উপর কোন মন্তব্য করেননি, তখন এতটুকু প্রমাণ হয় যে, এ হাদীস আমলযোগ্য।

সারসংক্ষেপ : ইমামের উভয় প্রান্তে মুসল্লীর পরিমাণ সমান হওয়া উত্তম। এ নিয়ম অনুসরণ করলে ইমামের আওয়াজ মুক্তাদীগণ সমানভাবে শুনতে পারবে। কাতার সোজা হওয়াসহ অন্যান্য বিষয়ও ইমাম সমানভাবে

দেখতে পারবে।

পুরুষ, নারী ও শিশুদের কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতি

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلاَثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ

(رواه مسلم فى بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَإِقَامَتِهَا–١/١٨١)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে বয়স্ক এবং জ্ঞানী লোকেরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাদের কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা দাঁড়াবে। তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন। সাবধান! তোমরা (মাসজিদে) বাজারের মতো শোরগোল করবে না। (মুসলিম : ৮৫৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৫০)

সারসংক্ষেপ : বয়স্ক, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোকেরা ইমামের নিকট দাঁড়ানো উত্তম। বয়সের বিবেচনায় যারা আরো ছোট তারা এরপরে দাঁড়াবে। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকরা বয়সে আরো ছোট হওয়ায় তারপরে দাঁড়াবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. (رواه البخارى فى بَابٍ: الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا–١/١٠٠)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, একবার আমি ও একজন ইয়াতীম ছেলে আমাদের ঘরে রসূলুল্লাহ স.-এর পিছনে নামায আদায় করলাম। আর আমার আম্মা উম্মে সুলাইম রা. আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। (বুখারী : ৬৯১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৫৭)

সারসংক্ষেপ : এতিম হলো নাবালক শিশু। মেশকাত শরীফ-৩২৮১নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে কেউ এতিম থাকে না। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামাতের কাতারে মহিলাদের অবস্থান নাবালক শিশুদের পেছনে। এ বিষয়টি হযরত আবু মালেক আশআরী রা.

থেকে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, يَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ রসূল স. (নামাযের কাতারে) পুরুষদেরকে বালকদের সামনে রাখতেন। আর নারীদেরকে রাখতেন বালকদের পেছনে। (মুসনাদে আহমদ-২২৯১১)

জ্ঞাতব্য : প্রথম হাদীসে প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞনী ব্যক্তিদেরকে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসে আগে অপ্রাপ্তবয়স্ক এরপরে মহিলাদের দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ হয়েছে। আর অপর এক হাদীসে পুরুষের জন্য সামনের কাতার আর মহিলাদের জন্য পিছনের কাতার উত্তম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ, নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্করা এক সাথে নামায আদায় করলে প্রথমে পুরুষ, তারপর অপ্রাপ্তবয়স্করা, এরপর নারীরা কাতারে দাঁড়াবে। সাথে সাথে পুরুষদের একাধিক কাতার হলে প্রথমটি আর মহিলাদের একাধিক কাতার হলে পেছনেরটি বেশি উত্তম হবে।

মুক্তাদীগণ প্রত্যেকটি কাজ ইমামের পরে করবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا يَقُولُ « لاَ تُبَادِرُوا الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ».(رواه مسلم فى باب ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ–١/١٧٧)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা ইমামের চেয়ে আগে বেড়ে যেও না। ইমাম যখন তাকবীর বলেন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি وَلاَ الضَّالِّينَ বলবেন তোমরা آمِينَ বলবে। আর তিনি রুকু করলে তোমরা রুকু করবে। আর তিনি যখন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবেন তোমরা তখন اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। (মুসলিম-৮১৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৮২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদী প্রত্যেকটি কাজ ইমামের পরে করবে। এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে সহীহ সনদে হযরত

আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স. ইরশাদ করেন, **فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ** ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকু করবে এবং তোমাদের পূর্বে মাথা উঠাবে। (মুসলিম-৭৮৯)

এ হাদীস থেকে আরো বুঝে আসে যে, ইমামের পূর্বে কেউ তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করে দিলে ইমামের সাথে তার ইক্তিদাও সহীহ হবেনা আর নামাযও সহীহ হবেনা। হযরত সাওরী রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, **إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ** যদি কোন ব্যক্তি ইমামের পূর্বে তাকবীর বলে সে যেন পুনরায় তাকবীর বলে। যদি সে পুনরায় তাকবীর না বলে নামায আদায় করে ফেলে, তাহলে সে যেন নামায পুনরায় আদায় করে নেয়। (আব্দুর রাযযাক : ২৫৪৮) হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর ফতওয়া থেকেও পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের বহি.প্রকাশ ঘটেছে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৮০) বস্তুত আমি নামাযে যার ইক্তেদা করবো তার নামায এখনো শুরুই হয়নি তাহলে আমি কার ইক্তিদা করছি? তবে এ কথার অর্থ এটা নয় যে, ইমামের তাকবীরের পরে মুক্তাদী দেরি করে তাকবীর দিবে। বরং উত্তম হলো দেরি না করে ইমামের তাকবীরের পরপরই তাকবীর বলা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِنَّمَا جعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (رواه مسلم فى باب ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ– ١/١٧٧)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, ইমাম বানানো হয়েছে তাঁর অনুসরণের জন্য। তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলেব তিনি রুকু করলে তোমরাও রুকু করবে। তিনি **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বললে তোমরা **اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** বলবে। (মুসলিম-৮১৫)

সারসংক্ষেপ: এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদী প্রত্যেকটি কাজে ইমামের অনুসরণ করবে; তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। ইমাম রুকু-সিজদা করার বেশ কিছু সময় পরে মুক্তাদী রুকু-সিজদা করলে এটা বাহ্যিকভাবে কিছুটা হলেও বিরুদ্ধাচারণের মতো। অতএব দুই হাদীস

মিলে এটা প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদী প্রতিটি কাজ ইমামের পরে করবে তবে দেরী করবে না।

ইমাম নামাযে ভুল করলে তাঁকে সতর্ক করার পদ্ধতি

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পুরুষদের জন্য তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) এবং নারীদের জন্য তাসফীক (এক হাতের উপর অন্য হাত দ্বারা আঘাত করে শব্দ করা)। (বুখারী- ১১৩০)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল-৩৭১১)

حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ»

অনুবাদ : হযরত সাহাল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য তাসফিক। (বুখারী- ১১৩১)। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত আছে। (জামেউল উসূল-৩৭১২)

শিক্ষণীয় : হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম নামাযের মধ্যে কোন ধরনের ভুল করলে পুরুষ মুক্তাদীগণ সুবহানাল্লাহ বলে তাঁকে লুকমা দিবে অর্থাৎ সতর্ক করবে। আর নারী মুক্তাদীগণ এক হাতের উপর অন্য হাত দ্বারা আঘাত করতঃ আওয়াজ করে ইমাম সাহেবকে সতর্ক করবে। নামাযে যদি কোন কিছু আপতিত হয়, যেমন নামাযরত ব্যক্তির কাছে অনুমতি চাইলে অনুমতি প্রার্থীকে নামাযে থাকার বিষয়টি জানিয়ে দেয়া, ইমামকে (তার কিরাতের বিচ্যুতির ব্যাপারে) সতর্ক করা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষরা তাসবীহ তথা 'সুবহানাল্লাহ' পড়বে। আর মহিলারা ডান হাতের তালু বাম হাতের পৃষ্ঠ দেশের উপর সজোরে রাখবে। কিন্তু এক হাতের

তালুকে অপর হাতের তালুর উপর খেলা ও ক্রীড়াচ্ছলে সজোরে রাখবে না। খেলাচ্ছলে এরূপ করলে তা নামায পরিপন্থী কাজ হওয়াই নামায বাতিল হয়ে যাবে। দেখুন, শরহু মুসলিম লিল ইমাম নববী **১/১৭৯ পৃ.**।

পুরুষ মুক্তাদীগণ ইমাম সাহেবকে তাকবীর ধ্বনি দ্বারা সতর্ক করার যে, প্রচলন আমাদের সমাজে রয়েছে এটা পূর্বোক্ত হাদীসে ঘোষিত নিয়মের পরিপন্থী। অতএব, উলামায়ে কিরামের উচিত হবে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মূল ছুন্নাতে ফিরে আসার ব্যবস্থা করা।

উল্লেখ্য, নারীদের জামাতে শরীক হওয়া শরীয়তে পছন্দনীয় নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

ইমাম মুক্তাদীদের চেয়ে উঁচু জায়গায় একাকী দাঁড়াবেন না

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ، بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي

(رَوَاه أَبُوْ دَاودَ فِيْ بَابِ الْإِمَامِ يَقُوْمُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ–١/٨٨)

অনুবাদ : হযরত হুজাইফা রা. মাদায়েন শহরে একটি দোকানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করছিলেন। হযরত আবু মাসউদ রা. তাঁর জামা ধরে টান দিলেন। অতঃপর নামায শেষ করে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, তাঁদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হতো? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তুমি আমাকে টান দিয়েছো তখন আমার স্মরণ হয়েছে। (আবূ দাউদ : ৫৯৭)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **إسناده صحيح** হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ-৫৯৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম একাকী কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তা মাকরূহ হবে। তবে মাসজিদ বহুতলবিশিষ্ট হলে বা জায়গা উঁচু/নীচু হলে ইমামের সাথে ঐ স্তরে কিছু মুসল্লী থাকতে হবে। তাহলে আর মাকরূহ হবে না। উচ্চতার পরিমাণের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, মুক্তাদীদের স্থান থেকে ইমামের স্থান যদি এক হাত বা তার চেয়ে বেশি উঁচু হয় অথবা দেখা দৃষ্টিতে বেশি উঁচু মনে হয় তাহলে মাকরূহ হবে; অন্যথায় নয়। হযরত

ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, ইমাম তাঁর মুক্তাদীদের চেয়ে উঁচু স্থানে দাঁড়ানোকে তিনি অপছন্দ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা-৬৫৮৮) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৬৪৬)

ইমাম-মুক্তাদীর মাঝে বড় রাস্তা থাকলে ইক্তিদা সহীহ হবে না

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلاَةِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ، أَوْ نِسَاءٌ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে রাস্তা বা কোন নারী থাকা অপছন্দ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৬২১২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসটির রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ثقة নির্ভরযোগ্য রাবী। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ আছারটি কিতাবুল আছার লিমুহাম্মাদ-এর ১৫৫ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে রাস্তা থাকা অথবা ইমাম ও পুরুষ মুক্তাদীর মাঝে কোন মহিলা থাকা অপছন্দনীয় এবং ইক্তিদা শুদ্ধ না হওয়ার কারণ। এ বিষয়টি সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত শা'বী রহ. থেকে ইবনে আবী শাইবা-৬২১৩ নম্বরে। হযরত ওমর রা. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে ইক্তিদা করতে চায়, যদি ইমাম ও তার মাঝে নদী, রাস্তা বা দেয়াল থাকে তাহলে ইক্তিদা করবে না। (আব্দুর রায্যাক-৪৮৮০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُصَلِّي بِصَلاَةِ الإِمَامِ، وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ.

অনুবাদ : হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া রহ. বলেন, উরওয়া রহ. হুমায়েদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারেস-এর ঘরে থেকেই ইমামের ইক্তিদা করতেন। অথচ উক্ত ঘর ও মাসজিদের মাঝে একটা রাস্তা ছিলো। (ইবনে আবী শাইবা : ৬২২০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য রাবী।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে রাস্তা থাকলেও ইক্তিদা সহীহ হয়। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে এ হাদীসটি পূর্ববর্ণিত হাদীস দু'টির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তা নিরসন করতে রাস্তাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, ছোট রাস্তা এবং বড় রাস্তা। ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে বড় রাস্তা থাকলে ইক্তিদা সহীহ হবে না। আর ছোট রাস্তা থাকলে ইক্তিদা সহীহ হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (তাতারখানিয়া : ২/২৬৭)

জ্ঞাতব্য : ছোট রাস্তা এবং বড় রাস্তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন যে, ইমাম এবং মুক্তাদীগণের মাঝে যদি এমন রাস্তা থাকে যাতে গরুর গাড়ী চলাচল করতে পারে (আনুমানিক দুই কাতারের সমপরিমাণ জায়গা) তাহলে ইক্তিদা সহীহ হবে না।

ইমাম-মুক্তাদী ভিন্ন তলায় থাকলেও ইক্তিদা সহীহ হবে

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَهُوَ أَسْفَلُ.

অনুবাদ : হযরত ছালেহ বলেন, আমি আবু হুরায়রা রা.-এর সাথে মাসজিদের উপর তলায় ইমামের ইক্তিদা করেছি, যখন ইমাম নিচ তলায় ছিলেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৬২১৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাওকূফ। ছালেহ ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর সালেহ صدوق সত্যনিষ্ঠ। (তাকরীব-৩২০২) বার্ধক্যে সালেহ-এর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তবে তার থেকে ইবনে আবী জি'ব-এর বর্ণনা বার্ধক্যের পূর্বে হওয়ায় কোন সমস্যা নেই। এ কারণে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, **وَصَالِحٌ فِيهِ ضَعْفٌ لَكِنْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ فَاعْتُضِدَ** বর্ণনাকারী ছালেহ-এর মাঝে দুর্বলতা আছে। তবে সাঈদ ইবনে মানসূর হযরত আবু হুরায়রা থেকে ভিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করায় এ হাদীসের দৃঢ়তা বেড়েছে। (ফাতহুল বারী-১/৪৮৬ দারুল মা'রেফা মুদ্রিত) সুতরাং হাদীস-টির সনদ হাসান স্তরের নিচে নয়।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মাসজিদের যে কোন এক তলায় আর মুক্তাদী ভিন্ন তলায় থাকলেও ইক্তিদা সহীহ হবে। অবশ্য ইমামের সাথে কিছু মুসল্লী থাকতে হবে। অন্যথায় নামায

মাকরূহ হবে। এ বিষয়টি আরো বর্ণিত হয়েছে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. থেকে ইবনে আবী শাইবা-৬২১৭ নম্বরে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আল-মুহীতুল বুরহানী : ৫/৩১৭)

ইমাম যে অবস্থায় থাকে সেখান থেকেই মুক্তাদী শরিক হবে

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَيْخٍ لِلْأَنْصَارِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَمِعَ خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا؟» قَالَ: سُجُودًا، فَسَجَدْتُ، قَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ قَاعِدًا فَاقْعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا»

অনুবাদ : জনৈক আনসারী সাহাবা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এমন সময় মাসজিদে প্রবেশ করলো যখন রসূল স. নামাযে রত ছিলেন। রসূল স. তাঁর জুতোর শব্দ শুনলেন। তিনি নামায শেষে করে বললেন, তুমি আমাকে কি অবস্থায় পেয়েছিলে? সে বললো, আপনাকে সিজদা অবস্থায় পেয়ে আমিও সিজদা করেছি। রসূল স. বললেন, এভাবেই করবে। আর রুকু না পেলে সিজদা গণনা করবে না। আর যদি ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাও, তুমিও দাঁড়াবে। ইমামকে বসা পেলে তুমিও বসবে। ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে তুমিও রুকু করবে। ইমামকে সিজদা অবস্থায় পেলে তুমিও সিজদা করবে। আর ইমামকে বৈঠকে পেলে তুমিও বৈঠক করবে। (আব্দুর রায্যাক-৩৩৭৩, ইবনে আবী শাইবা-২৬১৬ ও ২৬১৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আল মাতালিবুল আলিয়া-৪৭৯ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেখান থেকেই নামাযে শরিক হতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৪৬৭) এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমরা সিজদারত অবস্থায় যদি তোমরা নামাযে উপস্থিত হও তাহলে সিজদা করবে (আবূ দাউদ : ৮৯২)

ইমামের সাথে রুকু পেলে রাকাত পাওয়া সাব্যস্ত হবে

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ (رواه البخارى فى بَابٍ: إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ–١٠٨/١)

অনুবাদ : হযরত আবু বাকরা রা. একবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এমন অবস্থায় পৌঁছালেন যে, রসূলুল্লাহ স. তখন রুকুতে ছিলেন। হযরত আবু বাকরা রা. কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকু করলেন। নামাযের পরে বিষয়টি রসূলুল্লাহ স.কে জানানো হলো। রসূলুল্লাহ স. আবু বাকরা রা.কে বললেন, আল্লাহ তাআলা (নামাযের প্রতি) তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে পুনরায় এমনটি আর করো না। (অর্থাৎ আগে কাতারে শামিল হও তারপর রুকু কর, বুখারী : ৭৪৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯০৫)

শিক্ষণীয় : হযরত আবু বকরা রা. রসূল স.-এর সঙ্গে রুকুতে গিয়ে শরিক হলেন অথচ তিনি তাঁকে ঐ রাকাত পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিলেন না। রসূল স.-এর এ নীরবতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের সঙ্গে রুকু পেলে রাকাত পাওয়া সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়টি সামনের হাদীসে নীতিমালা আকারে আসছে-

أنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. বলেন, ইমাম (রুকু থেকে) কোমর সোজা করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে শরিক হলো সে ঐ রাকাত পেয়ে গেলো। (সহীহ ইবনে খুযাইমা-১৫৯৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ আলবানী বলেন, **ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه** একদল সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা হাদীসটি শক্তিশালী হয়। (ইরওয়াউল গলীল-৪৯৬ নং হাদীসের আলোচনায়) এ হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে সকল বর্ণনায় **قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ**

الْإِمَامُ صُلْبَهُ। "ইমাম কোমর সোজা করার পূর্বে" বাক্যটি উল্লেখ না থাকায় এটা হাদীসের অংশ কিনা তা নিয়ে অনেকে সংসয় প্রকাশ করেছেন। তবে উপরিউক্ত বাক্যটি এ হাদীসে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ অন্যান্য হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা এটা প্রমাণিত।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوا، وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرُّكُوعُ.

অনুবাদ : জনৈক সাহাবা থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, তোমরা নামাযে এসে যদি দেখো যে, ইমাম রুকুতে আছে তাহলে তোমর-াও রুকু করো। আর যদি সিজদায় থাকে তাহলে তোমরা সিজদা করো। তবে সিজদার দ্বারা রাকাত গণনা করো না যদি তার সাথে রুকু না থাকে। (বায়হাকী-২৫৭৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। শায়খ আলবানী বলেন, قلت: وإسناده صحيح؛ إن كان الرجل الذي لم يسمَّ صحابيّاً، ولعله الراجح আব্দুল আজীজ ইবনে রুফাই যে ব্যক্তির নাম বলেননি তিনি যদি সাহাবা হন তাহলে হাদীসটির সনদ সহীহ। আর এটাই প্রবল যে, তিনি সাহাবা। (সহীহ আবূ দাউদ-৮৩২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুক্তাদী ইমামের সাথে রুকুতে শরিক হতে পারলে সে রাকাত পেয়ে যাবে। আর রুকু না পেলে রাকাত পাবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আল-ডবনায়াহ: ২/১৭৬, অধ্যায়: সুনানুস সলাত) এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. বলেন, قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ راكعا فكبر وَرَكَعَ وَأَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ ' অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বলেন, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলো অতঃপর তাকবীর বলে রুকু করলো এবং ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠানোর পূর্বে উভয় হাত দ্বারা হাটুদ্বয় ধরতে পারলো সে রাকাত পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি এ অবস্থায় রুকু পেলো না তার রাকাত ছুটে গেলো। (আত-তামহীদ- ৭/৭৩) অতঃপর এ মতামতকে তিনি

চার ইমামসহ আরো অনেক গবেষক ইমামদের মত বলে উল্লেখ করে এর সপক্ষে এক দল সাহাবায়ে কিরামের আছার বর্ণনা করেন। তিনি যাদের আছার তুলে ধরেছেন তন্মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর আছার সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে ইবনে আবী শাইবা-২৬৩৭ এবং আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-২৫৮৭ নম্বর হাদীসে। আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আল-ইস্তিজকার : ২/৩১৪) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (উমদাতুল কারী : ৬/৫৫) আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে ইবনে আবী শাইবা: ২৫৩৪ নম্বর হাদীসে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আল-মাতালিবুল আলিয়া: ৪/৮৩) আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৮, ২৩২৬ নম্বর হাদীসে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এটাকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার- ৬/২১৩) এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকে ইবনে আবী শাইবা-২৬৪৬ নম্বর হাদীসে। এ হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা, এ বিষয়টি এত ব্যাপক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কেউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

একাকী নামায পড়ার পরে জামাত পেলে শরিক হওয়া

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ، مِحْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

অনুবাদ : হযরত মিহজান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি এক মজলিসে

রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলেন। অতঃপর আযান দেয়া হলে রসূলুল্লাহ স. মজলিস থেকে উঠে নামায আদায় করে পুনরায় মজলিসে ফিরে এলেন। অথচ মিহজান রা. সেখানেই বসে থাকলেন; রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায আদায় করলেন না। তখন রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন, তুমি কি মুসলমান নও? তুমি লোকদের সাথে কেন নামায আদায় করলে না? তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমি মুসলমান। তবে আমি ঘরে নামায পড়ে এসেছি। তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি নামায পড়ে থাকলেও মাসজিদে হাজির হলে লোকদের সাথে নামায পড়বে। (মুয়াত্তা মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। বুস্‌র ইবনে মিহজান ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ রাবী। আর বুস্‌র صدوق সত্যনিষ্ঠ। (তাকরীব : ৭৫৩) হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৮৯১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৯২৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেউ একাকী নামায পড়ার পরে যদি কোন কারণে আবার ঐ নামাযের জামাতে উপস্থিত হয় তাহলে সে তাদের সাথে পুনরায় নামায পড়বে। (শামী : ২/৫৩) অবশ্য কোন্‌টি ফরয আর কোন্‌টি নফল হবে সে ব্যাপারে এ হাদীসে কিছু বলা হয়নি। হযরত আবু যর রা. থেকে মুসলিম : ১৩৪০, ১৩৪১ ও ১৩৪২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একাকী নামায আদায়ের পরে জামাতে শরিক হলে জামাতের নামাযটি হবে তার জন্য নফল। এ কথা থেকে আরো একটি মাসআলা বের হয় যে, যে সব নামাযের পরে রসূলুল্লাহ স. নফল পড়তে নিষেধ করেছেন সে সব ফরয নামাযের ক্ষেত্রে এ নিয়ম কার্যকর হবে না। অন্যথায় এ আমল উক্ত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে। সুতরাং ফজর এবং আছরের নামাযে এটা করা যাবে না। কেননা এ দুই নামাযের পরে নফল পড়া নিষেধ। যে সব হাদীসে এ দুই নামাযের পরে জামাতে শরিক হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায় সেগুলো হয়তো ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনা যখন ফজর এবং আছরের নামাযের পরে নফল পড়ার নিষেধাজ্ঞা জারী হয়নি। আর মাগরিবের নামাযের পরেও এটা করা যাবে না। কেননা নফল নামায বেজোড় পড়ার আমল প্রমাণিত নয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (মারাকিল ফালাহ: ১/২০৭, অধ্যায় : ইদরাকুল ফরীযা)

মাসবুকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের পদ্ধতি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. (رواه البخارى فى بَابِ ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا– ١/١٨٨)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যখন তোমরা ইকামাত শুনতে পাও তখন ভাবগাম্ভীর্যের সাথে শান্তভাবে নামাযের দিকে অগ্রসর হও। তাড়াহুড়ো করো না। অতঃপর যা পাও তা পড়ো আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করো। (বুখারীন : ৬০৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯০৩)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ائْتُوا الصَّلاَةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ. (رواه ابو داود فى بَابِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ– ١/٨٥)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা ধীরস্থিরতার সাথে নামাযে উপস্থিত হও। অতঃপর যা পাও তা (জামাতে) আদায় করো। আর যা ছুটে যায় তা (একাকী) আদায় করে নাও। (আবূ দাউদ : ৫৭৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীস-টির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-৮৯৬৪ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯০৩)

পর্যালোচনা : উল্লিখিত হাদীস দু'টির মধ্যে প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে ছুটে যাওয়া নামায পূর্ণ করতে। আর পূর্ণ করা বলা হয় এমন নামাযকে যা এখনো আদায় করা হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের সঙ্গে প্রাপ্ত নামায হলো শুরু নামায, আর যা ছুটে গেছে সেটা হলো শেষ নামায। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসে ছুটে যাওয়া নামায কাযা (আদায়) করতে বলা হয়েছে। আর কাযা বলা হয় এমন নামাযকে যা গত হয়ে গেছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের সঙ্গে প্রাপ্ত নামায হলো শেষ নামায আর যা ছুটে

গেছে সেটা হলো শুরু নামায। উভয় হাদীস সহীহ হওয়ায় আমলের ক্ষেত্রে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, ইমামের সঙ্গে প্রাপ্ত নামায বৈঠকের দিক দিয়ে শুরু নামায, আর কুরআন পাঠের দিক দিয়ে শেষ নামায। সুতরাং ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার সময় কুরআন পাঠ সে নিয়মে করতে হবে, নতুন নামায শুরু করলে যে নিয়মে পাঠ করতে হয়। আর বৈঠক করতে হবে এ নিয়মে যে, ইমামের সঙ্গে প্রাপ্ত রাকাতগুলো পড়া হয়ে গেছে এবং এর সাথে এখন যুক্ত হবে নতুন আদায়কৃত নামায।

এ মাসআলাটিকে আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারি। মনে করি, চার রাকাত নামাযের মধ্যে আমি এক রাকাত পেয়েছি। এবার দাঁড়িয়ে প্রথম দু'রাকাতে ফাতিহার সাথে ছূরা মিলাবো; যেমন শুরু নামাযে মিলানো হয়। আর বৈঠকের ক্ষেত্রে এক রাকাত পড়ে বসবো। কেননা ইমামের সাথে প্রাপ্ত এক রাকাত নামাযসহ এটা আমার দ্বিতীয় রাকাত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৯৭)

উল্লেখ্য, কোন কারণে ইমামের সিজদায়ে সাহুর প্রয়োজন দেখা দিলে ইমাম এবং তাঁর সঙ্গে যে মুক্তাদীগণ পূর্ণ নামায পেয়েছে তারা সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু করবে। কেননা তাদের নামায শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মাসবুক ব্যক্তি সালাম না ফিরিয়ে ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহুতে অংশ নিবে। কেননা সালাম ফিরাতে হয় নামাযের শেষে। (তিরমিযী : ৩) আর তার নামায এখনো শেষ হয়নি।

মহিলাদের জন্য ঘরে একাকী নামায পড়াই উত্তম

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ. (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالغَلَسِ- ١/١١٩)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যদি জানতেন যে, মহিলারা কী অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাইলের মহিলাদের মতো তাদেরকেও (মাসজিদে আসতে) নিষেধ করে দিতেন। রাবী বলেন, আমি হযরত আমরাহ রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম, বনী ইসরাইলের মহিলাদেরকে

কি নিষেধ করা হয়েছিলো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (বুখারী : ৮২৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৮৭৪৩)

সারসংক্ষেপ : হযরত আয়েশা রা.-এর সময়েই যদি মহিলাদের অবস্থা এমন পর্যায়ের হয়ে থাকে যা তিনি লক্ষ্য করে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বেঁচে থাকলে তাদেরকে মাসজিদে আসতে দিতেন না। তাহলে আমাদের এ যুগে রসূলুল্লাহ স. বেঁচে থাকলে মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়ার অনুমতি দিতেন কি? যারা সামাজিক অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তারা কোনক্রমে হ্যাঁ বলতে পারেন না। তবে যারা সামাজিক পরিস্থিতির কোন বিবেচনা না করে বা যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে হাদীসের শব্দ থেকে দলীল গ্রহণে তৎপর তারা হয়তো এ হাদীস থেকেও অনুমতি খুঁজে পাবেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "(رَوَاه ابُوْ داود فى بَابِ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ–١/٨٤)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মাসজিদসমূহে যাতায়াতে বাঁধা দিও না। তবে ঘরই তাদের জন্য সর্বোত্তম নামাযের স্থান। (আবূ দাউদ : ৫৬৭)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ 'হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন আর ইবনে খুযাইমা এটাকে সহীহ বলেছেন'। (ফাতহুল বারী : অন্ধকারে এবং রাতে মহিলাদের মাসজিদে গমন অধ্যায়) ইমাম নববী, শুআইব আরনাউত রহ.ও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا (بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ: يَعْنِىْ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.

ইরশাদ করেন, নারীর জন্য খাছ কামরায় নামায পড়া হুজরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর ঘরের নির্জন স্থানে নামায পড়া খাছ কামরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (আবূ দাউদ : ৫৭০, মুসতাদরাকে হাকেম : ৭৫৭, বায়হাকী : ৫৩৬১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম এবং ইমাম যাহাবী রহ. উভয়েই হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম ৫: ২৩৪৭ নং হাদীসের আলোচনায়, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান হলো তাদের ঘর। এ ইরশাদের দ্বারা রসূলুল্লাহ স. মহিলাদের মাসজিদে যেতে নিরুৎসাহিত করেছেন। এতদ্সত্ত্বেও যদি কোন মহিলা মাসজিদে যেতে চায় তাহলে স্বামীদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে বাঁধা দিও না। কিন্তু তাদেরকে মাসজিদে পাঠানো, নিয়ে যাওয়া বা মাসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায়ের জন্য মাসজিদে কোন ব্যবস্থা করার মতো কোন উৎসাহ বা ইঙ্গিত এ হাদীসে নেই। এ বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (حَدِيثُ أُمِّ حُمَيْدٍ)

অনুবাদ : হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী রা.-এর স্ত্রী উম্মে হুমায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ!

আমি আপনার সাথে (জামাতে) নামায পড়তে ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে নামায পড়তে ভালোবাস। তবে খাছ কামরায় নামায পড়া তোমার হুজরায় নামায থেকে উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায পড়া বাড়ীতে নামায পড়া থেকে উত্তম। আর বাড়ীতে নামায পড়া তোমার গোত্রের মাসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। আর তোমার গোত্রের মাসজিদে নামায পড়া আমার মাসজিদে (মাসজিদে নববীতে) নামায পড়া থেকে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাঁর নির্দেশে তাঁর জন্য ঘরের একেবারে ভেতরে এবং অন্ধকারে নামাযের জায়গা তৈরী করা হলো। আর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই নামায পড়তেন। (মুসনাদে আহমদ : ২৭০৯০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস দ্বারা সমর্থিত বলেছেন। (ফাতহুল বারী : অন্ধকার এবং রাতে মহিলাদের মাসজিদে গমন অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে মূলত মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান নির্ধারণের বিষয়ে একটি নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঐ নীতিমালায় উত্তম হওয়ার মানদণ্ড বা মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে নির্জনতাকে। অর্থাৎ নির্জনতা যত বেশি হবে মহিলাদের নামাযের জন্য সে স্থানটি তত বেশি উত্তম হবে। এমনকি নির্জনতার বিবেচনায় মাসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে নামায আদায়ের চেয়েও রসূলুল্লাহ স. অনেক গুণে উত্তম স্থান বলেছেন ঘরের খাছ কামরাকে। বিবেচক ব্যক্তিগণ অবশ্যই বিবেচনা করবেন যে, মাসজিদে নববীতে একটি নামায মাসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মাসজিদের হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম। (বুখারী : ১১১৭) আর রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে আদায়কৃত নামায দুনিয়ার যে কোন ইমামের পেছনে আদায়কৃত নামাযের চেয়ে কতগুণ উত্তম তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. হযরত উম্মে হুমায়েদ রা.কে বললেন, যে, এই মাসজিদে আমার পেছনে আদায়কৃত নামাযের তুলনায় বহুগুণে উত্তম তোমার নিজ ঘরের খাছ কামরার নামায। তাহলে বর্তমান বিশ্বের যে কোন মাসজিদে যে কোন ইমামের পেছনে আদায়কৃত নামাযের চেয়ে নিজ ঘরের খাছ কামরার আদায়কৃত নামায কত উত্তম হবে তা ভাষায় প্রকাশের নয়। এ ফযীলত ছেড়ে দিয়ে নারীদের মাসজিদমুখী হওয়া কোনক্রমেই সওয়াবের উদ্দেশ্যে হতে পারে না; বরং উদ্দেশ্য ভিন্ন

কিছু যা নামাযের দোহাই দিয়ে চরিতার্থ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ হাদীস দ্বারা হযরত ইবনে খুযাইমা রহ. তাঁর সহীহ ইবনে খুযাইমায় এ শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন যে, أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الرِّجَالِ دُونَ صَلَاةِ النِّسَاءِ নবী কারীম স.-এর বাণী : 'আমার মাসজিদে এক রাকাত নামায মাসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মাসজিদে হাজার রাকাত নামায অপেক্ষা উত্তম' দ্বারা উদ্দেশ্য পুরুষের নামায; নারীদের নয়।

মহিলাদের জন্য ঘরের নির্জন কামরার নামায মাসজিদের জামাতের নামাযের চেয়ে উত্তম হওয়ার ব্যাপারে আরো অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। নমুনা হিসেবে এখানে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান জানতে সাহাবায়ে কিরামের আমলও অনেক সহায়ক হবে। তাই এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য বা আমল নিম্নে পেশ করছি।

মহিলাদের মাসজিদে জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল ও অভিমত

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খত্তাব রা.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟–١٢٢/١)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর রা.-এর এক স্ত্রী ছিলেন। (তাঁর নাম ছিলো আতিকা) তিনি ফজর এবং ইশার নামাযে মাসজিদের জামাতে হাজির হতেন। তাঁকে বলা হলো-আপনি কেন মাসজিদে যান? অথচ আপনি জানেন যে, হযরত ওমর এটা অপছন্দ করতেন এবং আত্মমর্যাদাহানিকর মনে করতেন। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে নিষেধ করে দিতে তাঁকে কিসে বারণ করেছি-

লা? হযরত ইবনে ওমর বললেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাঁধা দিও না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণী তাঁকে বাঁধা দিয়েছিলো। (বুখারী : ৮৫৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইবনে আবী শাইবাও তাঁর মুসান্নাফ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৭৬৯০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমর রা. তাঁর স্ত্রীর মাসজিদে যাওয়া অপছন্দ করতেন। যদিও রসূলুল্লাহ স.-এর বাণীর কারণে তিনি স্ত্রীকে বাঁধা দিতে পারেননি। "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদ যেতে বাঁধা দিও না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর মর্মার্থ যারা তাঁর সংশ্রবে থেকে বুঝেছেন তাঁরা মহিলাদের মাসজিদে গমন অপছন্দ করতেন। আর সেই বাণী থেকেই আজ আমরা অনুমতি খুঁজে পাচ্ছি। হায় আফসুস! বিষয়টা কি হযরত ওমর রা. ভুল বুঝেছিলেন, না কি আমরা ভুল বুঝছি?

হযরত ইবনে মাসউদ রা.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ: رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ، يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُ: اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ (خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمِنْ كَلَامِهِ بَابٌ–١١)

অনুবাদ : হযরত আবু আমর শাইবানী রহ. বলেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে দেখেছি জুমুআর দিনে মহিলাদেরকে মাসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছেন এবং বলছেন, তোমরা ঘরে ফিরে যাও, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (তবারানী কাবীর : ৯৪৭৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাওকুফ। আল্লামা হাইসামী বলেন, رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২১১৯)

পর্যালোচনা : হযরত ইবনে মাসউদ রা. মৃত্যুবরণ করেন ৩২ হিজরী-তে, হযরত উসমান রা.-এর খিলাফাত আমলে। তাহলে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ কাজটি ঘটেছে খুলাফায়ে রাশেদার যুগে এবং সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপক উপস্থিতিতে জুমুআর মাসজিদে। "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাঁধা দিও না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ

বাণীর মর্মার্থ আজ আমরা যেভাবে বুঝার চেষ্টা করছি সাহাবায়ে কিরাম যদি সেভাবে বুঝতেন তাহলে খুলাফায়ে রাশেদার যুগে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপক উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে জুমুআর মাসজিদে হযরত ইবনে মাসউদ রা. কোনক্রমেই এমন করতে পারতেন না। সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে কোন বাঁধা বা প্রতিবাদ সৃষ্টি না হওয়াই প্রমাণ বহন করে যে, সাহাবায়ে কিরাম মহিলাদেরকে মাসজিদ থেকে বের করে দেয়া বা তাদেরকে মাসজিদে না আনার বিষয়ে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর সঙ্গে একমত ছিলেন। আর এটাই নারীদের মাসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য বা ইজমা।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: صَلَاتُكِ فِي مَخْدَعِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي بَيْتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ (مصنف ابن ابى شيبة: مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ: يعنى لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ)

অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন, কোন এক মহিলা হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে জুমুআর দিনে মাসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তোমার ঘরের নির্জন স্থানের নামায তোমার খাছ কামরার নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার খাছ কামরার নামায তোমার ঘরের নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার ঘরের নামায তোমার কওমের মাসজিদের নামায অপেক্ষা উত্তম। (ইবনে আবী শাইবা : ৭৬৯৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাওকুফ। আব্দুল আলা ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল আলা সত্যনিষ্ঠ তবে সন্দিহান হয়ে পড়েন। (তাকরীব : ৪১৫২) ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর বর্ণনাকে হাসান বলেছেন। (তিরমিযী-১৩২৮) হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী তাঁর বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন (মুসতাদরাকে হাকেম-৩৪৮৭)

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য ও আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মাসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায়ের চেয়ে মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান হলো নিজ গৃহের নির্জন কামরা।

নমুনা স্বরূপ কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো। এ ছাড়াও অনেক সাহাবায়ে কিরাম থেকে অনুরূপ মতামত বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসের প্রত্যেকটির মধ্যেই মহিলাদেরকে মাসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায় করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ঘরে আদায়কৃত নামাযকে মাসজিদে গিয়ে জামাতে আদায়কৃত নামায অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। এমনকি মাসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে আদায়কৃত নামাযের চেয়েও নিজ গৃহের অন্দরমহলে আদায়কৃত নামাযকে বেশি উত্তম বলা হয়েছে।

অতএব, মহিলারা যদি নামায আদায়ের মাধ্যমে অধিক সওয়াব অর্জন করার আশা করে তাহলে তাদের জন্য উত্তম হবে মাসজিদে পুরুষের জামাতে শরিক না হয়ে আপন ঘরের অভ্যন্তরে একাকী নামায আদায় করা।

এর বিপরীতে যেহেতু বেশ কিছু সহীহ হাদীসে মহিলাদেরকে মাসজিদে যেতে বাঁধা না দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে মাসজিদে নববীতে ব্যাপকহারে মহিলাদের জামাতে অংশগ্রহণের অজস্র প্রমাণও রয়েছে, সেহেতু উক্ত হাদীসগুলোতে নির্দেশিত আমলের বিষয়টি কেমন হবে তা নিয়ে জনসাধারণের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হতেই পারে। এ বিষয়টির সুরাহা করতে গেলে আমাদেরকে তিনটি দিক লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রথম লক্ষণীয় বিষয় : রসূলুল্লাহ স. বহু হাদীসে স্বামীদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর বান্দীদেরকে মাসজিদে যেতে বাঁধা দিও না অথবা বলেছেন যে, স্ত্রীগণ তোমাদের নিকট অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দিও। কিন্তু মহিলাদেরকে সম্বোধন করে কোথাও বলেছেন যে, তোমরা মাসজিদে যাও বা স্বামীদের থেকে যাওয়ার অনুমতি চাও এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। এমনকি উম্মে হুমায়েদ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট খাছ পরামর্শ নিতে আসলে রসূলুল্লাহ স. তাকে অনুমতি দেননি; বরং তাকে ঘরমুখী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমদ : ২৭০৯০) যদি মহিলাদের মাসজিদে উপস্থিতিই রসূলুল্লাহ স.-এর লক্ষ্য হতো তাহলে তাদেরকে নির্দেশ দিলেই যথেষ্ট হয়ে যেতো। এমনকি

রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ পেলে স্বামীদের অনুমতি গ্রহণেরও প্রশ্ন থাকতো না। এ সব কিছু গভীরভাবে পর্যক্ষেণ করলে বুঝা যায় যে, “আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাঁধা দিও না” রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণীর মর্মার্থ আজ আমরা যেভাবে বুঝার চেষ্টা করছি রসূলুল্লাহ স.-এর উদ্দেশ্য তা ছিলো না। বরং উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. লিখেছেন- **ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم " إذا استأذنت امرأة احدكم إلى المساجد فلا يمنعها " وبين ما حكم به جمهور الصحابة من منعهن، اذ المنهى الغيرة التى تنبعث من الأنفة دون خوف الفتنة ، والجائز ما فيه خوف الفتنة** “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস- “তোমাদের কারো স্ত্রী তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে নিষেধ করো না।” আর অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করা এ দুটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে বিরত রাখতে নিষেধ করার বিষয়টি ঐ সব পুরুষদের উদ্দেশ্যে ছিল যারা কেবল অহংকার ও আত্মগরিমার ভিত্তিতে নারীদেরকে মসজিদ থেকে দূরে রাখতেন; ফেৎনা ও গুনাহের আশংকার কারণে নয়। আর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা নিষেধ করেছেন তারা মূলত ফেৎনা ফাসাদের ভয়ে দ্বীনী গায়রতের ভিত্তিতে বলেছিলেন, আর এরূপ গায়রত বা আত্মসম্মানবোধ জায়েয।” এরপর তিনি আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য উল্লেখ করে ফেৎনার দিকে ঈঙ্গীত করেছেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা [রহমাতুল্লাহিল ওয়াছিয়া সংযুক্ত] খ. ৩ পৃ.৫৮১)

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় : “আল্লাহর বান্দীদেরকে মাসজিদে যেতে বাঁধা দিও না” অথবা “স্ত্রীগণ তোমাদের নিকট অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দিও” রসূলুল্লাহ স.-এর এ নির্দেশের ভাষা যদিও ব্যাপক; কোন স্থান বা কালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটা মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নববীর বৈশিষ্ট্য। হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে মুজামুল কাবীর লিত্তবারানী-৯৩৬০ এবং সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৫৩৬৪ নম্বরে একটি সহীহ মাওকুফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাদের জন্য ঘরের নির্জন কামরার নামাযই সর্বোত্তম। তবে মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নববীর নামায এর থেকে ব্যতিক্রম।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় : রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় নিম্নবর্ণিত কারণে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন ছিলো যা পরবর্তীতে আর থাকেনি। এ কারণে রসূলুল্লাহ স.-এর অফাতের পরে সাহাবায়ে কিরাম মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া অপছন্দ করতেন।

প্রথম কারণ : সে সময় মহিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন শরঈ আহকাম নাযিল হচ্ছিলো যা বুঝার জন্য মহিলাদের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিলো। তারা মাসজিদে উপস্থিত না হলে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল সরাসরি দেখার সুযোগ পেত না। অথচ এর প্রকৃত পদ্ধতি নারী মহলে তুলে ধরতে আমলগুলো মহিলাদের সরাসরি দেখার প্রয়োজন ছিলো। কেননা, রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী "আমাকে যেমন নামায পড়তে দেখো তোমরা তেমন নামায পড়ো" মৌলিকভাবে নারী-পুরুষ সবার জন্য তা প্রযোজ্য। (বুখারী : ৬০৩) এখন নবীও বেঁচে নেই আর নববী শিক্ষার কেন্দ্রও মাসজিদ নয়। বরং যারা জামাতে যায় তারা কেবল নামাযের জন্যই যায়। সুতরাং "আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাঁধা দিও না" রসূলুল্লাহ স.-এর এ বাণী তাঁর হায়াতের সাথে সীমাবদ্ধ। তাঁর অফাতের পরে আর কার্যকর নয়।

দ্বিতীয় কারণ : মুসলমানদের সংখ্যা তখন পর্যন্তও কম ছিলো যা অমুসলিমদের উপর প্রভাব বিস্তারের পর্যায়ের ছিলো না। অথচ কোন কাজে মানুষের ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ অন্যদেরকে সে দিকে আকৃষ্ট করে এবং অন্যদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে। মহিলাদের জামাতে অংশ গ্রহণ করে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রকাশও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো। উল্লিখিত কারণের বড় প্রমাণ উম্মে আতিয়াহ রা. থেকে বুখারী শরীফে বর্ণিত ৯২৮ নম্বর হাদীস। যে হাদীসে রসূলুল্লাহ স. হায়েযা মহিলাদেরকেও ঈদের জামাতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে এর কারণও বর্ণনা করেছেন যে, তারা যেন মুসলমানদের দুআ ও কল্যাণে শরিক হয়। অর্থাৎ ঈদের জামাতে তাদের উপস্থিতি নামাযের জন্য নয়। রসূলুল্লাহ স. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ইসলামকে শক্তিশালী এবং বিজয়ী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরে। আর এটাই ছিলো নবী পাঠনোর দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। (ছূরা ছফ : ৯) অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে অমুসলিমদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে নারীদেরকে মাসজিদ বা ঈদগাহে নেয়ার প্রয়োজন এখন আর অবশিষ্ট নেই। বরং সমঅধিকারের

নামে এখন যারা নারীদেরকে সব কাজে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছে তাদেরকে প্রতিহত করা ঈমানের দাবীতে পরিনত হয়েছে।

তৃতীয় কারণ : রসূলুল্লাহ স.-এর সংশ্রবের মাধ্যমে নারীদের রুচি-প্রকৃতি তৈরী করা এবং দ্বীনী জযবা বৃদ্ধি করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো। নারী জাতি স্বভাবতই দ্বীনী জযবা থেকে গাফেল। তাদের ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব তুলনামূলক কম থাকা সত্ত্বেও তারা অধিক সংখ্যায় জাহান্নামী হবে। (বুখারী-২৯৮) আর রসূলুল্লাহ স.-এর সংশ্রব ছিলো এমনই বরকতময় যে, সেখানে থেকে মনে হতো যেন জান্নাত-জাহান্নাম সামনে উপস্থিত। (মুসলিম শরীফ : ৬৭১৩) মহিলাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদেরকে দ্বীনের উপর উঠানো কষ্টসাধ্য ছিলো। কিন্তু মাসজিদে এলে একই সাথে সবাইকে পাওয়া যেতো, তাদেরকে প্রয়োজনীয় নছিহত করা যেতো। এর একটি বড় প্রমাণ হলো মহিলাদের দ্বীন শিক্ষার নিমিত্তে তাদের জন্য রসূলুল্লাহ স. একটি স্বতন্ত্র মজলিস কায়েম করেছিলেন। (বুখারী-৬৮১২) এখন নবীও বেঁচে নেই আর নববী শিক্ষাও মাসজিদ ভিত্তিক নেই যে নারীরা দ্বীন শিক্ষার জন্য মসজিদে যাবে; বরং যারা জামাতে যায় তারা শুধু নামাযের জন্যই যায়।

পূর্বোক্ত কারণগুলোর পাশাপাশি তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতি আর পরবর্তী পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে। যেমন-

এক. রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে নারী-পুরুষের ঈমানী চেতনা অত্যন্ত দৃঢ় ছিলো। সে যুগে মহিলাদের পর্দা ও সতীত্ব রক্ষার গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা তাঁদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিলো। সামাজিকভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছিলো খুবই জোরদার। কারো মধ্যে অপরাধের বাসনা সৃষ্টি হলেও সামাজিক প্রতিরোধের মুখে তা বাস্তবায়নের সাহস হতো না। অগত্যা গোপনে বা নির্জনে কারো দ্বারা কোন অপরাধ ঘটে গেলেও পরকালের শাস্তির ভয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে এসে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দাবি করতেন নিজেরাই। (বুখারী-৬৩৬৫) সামাজিক ও মানসিক এ অবস্থা আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছে কি? হযরত আয়েশা রা.-এর মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই সেই সোনালী সমাজ বহুলাংশে বিদায় নিয়েছিলো। (বুখারী : ৮২৭) তাহলে সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে কী করণীয় সে ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ তো আমাদের সামনেই রয়েছে।

দুই. নারীঘটিত যে কোন অঘটন প্রতিরোধে রসূলুল্লাহ স. অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। যেমন পুরুষদের সামনের কাতার আর নারীদের পেছনের কাতারকে উত্তম ঘোষণা দেয়া; যেন নারী-পুরুষ একে অপর থেকে বেশি দূরত্ব বজায় রাখতে উৎসাহী হয়। (মুসলিম : ৮৬৯) রসূলুল্লাহ স. এবং পুরুষ মুসল্লীরা সালাম ফিরিয়ে আপন জায়গায় বসে থাকতেন, মহিলারা আগে বের হয়ে ঘরে পৌঁছে যাওয়ার পরে রসূলুল্লাহ স. এবং পুরুষ মুসল্লী-রা বের হতেন যেন মাসজিদের দরজা বা রাস্তায় পরস্পরের সাথে সাক্ষাত কিংবা বাক্য বিনিময় না ঘটে। (বুখারী-৮২৪) মাসজিদে আসার ক্ষেত্রে খুশবুবিহীন সাধারণ কাপড়ে আসার প্রতি তাকীদ দেয়া যেন তার প্রতি পরপুরুষ আকৃষ্ট না হয়। (আবূ দাউদ : ৫৬৫) রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক মহিলাদের জন্য ভিন্ন দরজা নির্ধারণ করার বাসনা প্রকাশ এবং হযরত ইবনে ওমর রা. কর্তৃক মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ না করা (আবূ দাউদ : ৫৭১) এ সব প্রতিরোধ ব্যবস্থার কিয়দংশও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

উপরোল্লিখিত কারণগুলোর প্রতি যদি আমরা একে একে লক্ষ্য করি, তাহলে আমাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ যুগে নারীদেরকে মাসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহ দান কোনক্রমেই দ্বীনের স্বার্থে হতে পারে না। নারী উন্নয়নের শ্লোগানে মুখরিত আমাদের সমাজে বেহায়াপনা মহামারীর রূপ ধারণ করেছে এবং মহিলাদেরকে পর্দার আড়ালে রাখতে চাইলে তথাকথিত মানবাধিকারের পরিপন্থী হওয়ায় সুশীল সমাজের চক্ষুশূল হতে হচ্ছে। এতসব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও শুধু কয়েকটি হাদীসের শব্দ দেখে শরীয়াতের মিজায বুঝার চেষ্টা না করে যারা মহিলাদেরকে মাসজিদমুখী করতে তৎপর তাদের মূল উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

বাড়তি সওয়াবের প্রতি আগ্রহী হয়ে কেউ মাসজিদের জামাতে যেতে চাইলে তার উচিত পূর্ববর্ণিত উম্মে হুমায়েদের আমল অনুসরণ করে অন্দর মহলে নামায আদায় করা। কেননা পুরুষের জন্য জামাতে নামাযের যে পরিমাণ সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে নারীদের একাকী নামাযে সে পরিমাণ সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، حَدَّثَنِي

نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَفْضُلُ صَلَاتَهَا فِي الْجَمِيعِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি, মহিলাদের একাকী নামাযের ছওয়াব তার জামাতের নামাযের তুলনায় পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি পায়। (তারীখে আসফাহান : আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লামের জীবনী বর্ণনায়, রাবী নম্বর- ২৬৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে আহমদ ইবনে ইবরাহীম, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ এবং আবু আব্দুস সালাম ব্যতীত সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আহমদ ইবনে ইবরাহীমকে ইমাম যাহাবী রহ. الإِمَامُ، المُحَدِّثُ "ইমাম ও মুহাদ্দিস" বলে পরিচয় দিয়েছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : তবকা- ২০, রাবী নম্বর- ১৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদকে হাফেজ আবু নুআইম শায়খ বলে প্রশংসা করেছেন। তবে এটাও বলেছেন যে, فِيهِ لِينٌ "তাঁর মধ্যে কিছুটা শিথিলতা আছে"। (তারীখে আসফাহান: রাবী নম্বর- ২৬৭) আবু আব্দুস সালামের ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, وثقه ابن حبان و ابن شاهين "ইবনে হিব্বান এবং ইবনে শাহীন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন"। (তাহজীবুত তাহজীব : সালেহ ইবনে রুস্তমের জীবনী আলোচনায়) বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ আছে। কিন্তু এ হাদীসে তিনি স্পষ্ট حَدَّثَنِي শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং তাঁর তাদলীস এখানে ক্ষতিকর নয়। রাবীগণের কারো কারো মধ্যে যৎসামান্য দুর্বলতা থাকলেও হাদীস-টির বিষয়বস্তু সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। কারণ এ হাদীসে মহিলাদের একাকী নামাযকে জামাতের নামাযের তুলনায় পঁচিশ গুণ উত্তম বলা হয়েছে। আর একাধিক সহীহ হাদীসে মহিলাদের একাকী নামাযকে জামাতের নামাযের তুলনায় উত্তম বলা হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীসে বর্ণিত উত্তমতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষরা জামাতে যে ছওয়াব পায় নারীগণ সে সওয়াব পেতে চাইলে তার মাধ্যম হলো একাকী নামায আদায় করা। কারণ পুরুষের জামাতের সওয়াব আল্লাহ তাআলা মহিলাদের একাকী নামাযে রেখেছেন। মহিলাদের জামাতে নামায আদায়ের দলীল হিসেবে অনেক স্থুলদর্শী লোক হজ্জ-উমরা বা বাইতুল্লাহর নামাযের উদাহরণ পেশ করে বলেন যে, যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উলাম-

ায়ে কিরাম এবং মহামনীষীদের সামনে মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নববীতে নির্বিঘ্নে নারীরা নামায আদায় করছে তখন আমাদের দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মহিলারা কেন পারবে না? এ উক্তির জবাবে নিম্নে দুটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জ-উমরা এবং মাসজিদে হারাম বা মাসজিদে নববীর বিষয়টি অন্যান্য মাসজিদ থেকে একেবারে ভিন্ন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي مَكَانٍ خَيْرٌ لَهَا مِنْ بَيْتِهَا إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا امْرَأَةً تَخْرُجُ فِي مَنْقَلَيْهَا"يَعْنِي خُفَّيْهَا. (المعجم الكبير للطبرانى: خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمِنْ كَلَامِهِ ، والبيهقى فى بَاب خَيْرِ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মহিলাদের নামাযের সর্বোত্তম জায়গা হলো তার নিজ গৃহ। তবে তারা মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নববীতে যেতে পারে এবং (বৃদ্ধা মহিলা) নিকটবর্তী কোন স্থানে সাধারণ কাপড়ে নামাযের জন্য যেতে পারে। (তবারানী কাবীর : ৯৪৭২, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৫৩৬৪)

হাদীসটির স্তর: সহীহ, মাওকূফ। আলী ইবনে আব্দুল আজীজ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর আলী ইবনে আব্দুল আজীজ আল বাগাবী প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : তবকা-১৫, রাবী নম্বর-১৬৪) আল্লামা হাইসামী বলেন, হাদীসটি ইমাম তবারানী তাঁর মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ সকলেই সহীহ হাদীসের রাবী। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২১১৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের যে কোন মাসজিদের চেয়ে মহিলাদের নিজ গৃহের নির্জন কামরার নামায উত্তম। তবে মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নববীতে নামাযের জন্য যেতে পারে। এটা অন্যান্য মাসজিদের তুলনায় বেশি উত্তম।

উল্লেখ্য, এটাও সাধারণ নীতিমালা। অন্যথায় হযরত উম্মে হুমায়েদ রা. রসূল স.-এর নিকট খাছ পরামর্শ চাইলে তিনি তাঁকে মাসজিদে নববীর চেয়ে খাছ কামরার নামাযকে বহুগুণে উত্তম বলেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ يَحْلِفُ فَيَبْلُغُ بِالْيَمِينِ"مَا مِنْ مُصَلَّى الْمَرْأَةِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ بَيْتِهَا إِلا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلا امْرَأَةً يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ فَهِيَ فِي مَنْقَلَيْهَا قُلْتُ: مَا مَنْقَلَيْهَا؟ قَالَ:امْرَأَةٌ عَجُوزٌ قَدْ تَقَارَبَ خَطْوُهَا...(المعجم الكبير للطبراني: خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمِنْ كَلَامِهِ)

অনুবাদ : হযরত আবু আমর শাইবানী রহ. বলেন, আমি এই ঘরের মালিক (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.)-এর নিকট শুনেছি, তিনি মজবুত শপথ করে বলেন, মহিলাদের নামাযের সর্বোত্তম স্থান হলো তার নিজ গৃহ। তবে হজ্ব বা উমরার সময় কিংবা স্বামী গ্রহণের ভাবনা থেকে মুক্ত (অতি বৃদ্ধা) মহিলা সাধারণ কাপড়ে জামাতে যেতে পারে। আবু আমর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম: مَنْقَلَيْهَا শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন, বয়োবৃদ্ধা মহিলা, যার চলার কদম ছোট হয়ে গেছে। (তবারানী কাবীর : ৯৩৬১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম দাবারী ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের বর্ণনাকে আল্লামা উকাইলী সহীহ বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাঁকে সত্যনিষ্ঠ বলেছেন। (লিসানুল মীযান : ৯৯৫)

শিক্ষণীয় : এ দুটি সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের যে কোন মাসজিদের চেয়ে মহিলাদের নিজ গৃহের নির্জন কামরার নামায উত্তম। তবে হজ্ব এবং উমরার সময় বা অন্য সময় মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নববীতে মহিলাদের জামাতের নামাযে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। তবে এ বিধানটি উক্ত বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত। তার উপর তুলনা করে অন্য কোথাও এ বিধান জারী করা যাবে না।

উপরিউক্ত সকল বিষয়কে সামনে রেখে এবং মহিলাদের বাহিরে গমনের কারণে অহরহ ঘটতে থাকা ফেতনা-ফাসাদ অথবা এর সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের সিদ্ধান্ত এই যে, যুবতি নারীরা যে কোন নামাযের জামাতে যাওয়া মাকরূহে তাহরিমী। আর বৃদ্ধা নারীদের জন্য যোহর, আসর এবং জুমুআহ ব্যতীত অন্য নামাযের জামাতে শরিক হওয়ার অনুমতি আছে; যদিও সর্ব ক্ষেত্রে তাদের উত্তম নামায নিজ

গৃহের নির্জন কামরায়। (শামী : ১/৫৬৬)

মহিলাদের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنبَرِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, জুমুআর নামায হক, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জামাতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। তবে চার শ্রেণির মানুষের উপর ওয়াজিব নয়। ১. ক্রীতদাস, ২. নারী, ৩. শিশু ও ৪. অসুস্থ ব্যক্তি। হাকেম বলেন, এ হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১০৬২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. উভয়েই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাস, নারী, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তির উপর জুমুআর নামায ফরয নয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৫৪) আর ফরয না হওয়া সত্ত্বেও জুমুআর জামাতে তাদের উপস্থিতির বিধান "মহিলাদের জন্য ঘরে একাকী নামায পড়াই উত্তম" শিরোনামে দেখুন। হযরত তারিক ইবনে শিহাব রা. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, জুমুআর নামায হক, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জামাতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। তবে চার শ্রেণির উপর ওয়াজিব নয়। ১. ক্রীতদাস, ২. নারী, ৩. শিশু ও ৪. অসুস্থ ব্যক্তি। (আবূ দাউদ : ১০৬৭) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ-১০৬৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

মহিলাদের জন্য ঈদের নামায জরুরী নয়

হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. নারীর জন্য খাছ কামরায় নামায পড়া উত্তম বলেছেন। (আবূ দাউদ-৫৭০, মুসতাদরাকে হাকেম-৭৫৭, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৫৩৬১)

আর হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, নারীদের জন্য জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১০৬২) হাকেম এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর জুমুআ ও ঈদ উভয় নামাযের জন্যই জামাত শর্ত। সুতরাং যাদের জন্য জামাত জরুরী নয় তাদের জন্য জুমুআ ও ঈদ কোনট-াই ওয়াজিব নয়।

সহীহ হাদীস থেকে উদ্ভাবিত নীতিমালা আকারে পেশকৃত এ বিষয়টির বাস্তবতা এখন সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের হাতে গড়া বিশিষ্ট তাবিঈদের আমল দ্বারা পেশ করা হচ্ছে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ.

অনুবাদ : হযরত নাফে’ রহ বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. নিজ স্ত্রীদেরকে ঈদের জন্য বের হতে দিতেন না। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৮৪৫)

হাদীসটির স্তরঃ হাসান। আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের ثقة নির্ভরযোগ্য। (আল্ কাশেফ-২৬৫৯) শায়খ আলবানীও এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সিলসিলাতুল আসারিস সহীহা-৬৬১ নং হাদীসের আলোচন-ায়)

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে ওমর রা. নিজ স্ত্রীদেরকে ঈদের নামাযে পাঠাতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈদের জামাতে মহিলাদের না পাঠানোর আদর্শ রসূলুল্লাহ স. হতে গ্রহণ করেছেন। এটা পূর্বোক্ত নীতিমালার বাস্তব রূপ।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ

অনুবাদ : হযরত নাফে’ রহ থেকে বর্ণিত, তিনি নিজ স্ত্রীদেরকে ঈদের জন্য বের হতে দিতেন না। (আব্দুর রজ্জাক : ৫৭২৪)

হাদীসটির স্তরঃ হাসান। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে ওমর রা.-এর ইল্মের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছাত্র হযরত নাফে’ রহ. নিজ স্ত্রীদেরকে ঈদের নামাযে পাঠাতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈদের জামাতে মহিলাদের না পাঠানোর আদর্শ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. হতে গ্রহণ করেছেন। সহীহ সনদে অনুরূপ আমল বর্ণিত হয়েছে হযরত আয়েশা রা.সহ

সাহাবায়ে কিরাম থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী অভিজ্ঞ আলেম হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ. থেকে (ইবনে আবী শাইবা : ৫৮৪৬) শায়খ আলবানীও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সিলসিলাতুল আসারিস সহীহা-৬৬৩ নং হাদীসের আলোচনায়) সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার আপন ভাতিজা এবং সাহাবায়ে কিরামের ইল্‌মের ধারক মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ যারা 'ফুকাহায়ে সাবআহ' নামে পরিচিত তাঁদের অন্যতম সদস্য হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রহ. থেকে (ইবনে আবী শাইবা : ৫৮৪৭) শায়খ আলবানীও এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সিলসিলাতুল আসারিস সহীহা-৬৬৪ নং হাদীসের আলোচনায়) সাহাবায়ে কিরাম এবং অভিজ্ঞ ও শীর্ষ তাবিঈদের থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, মহিলাদের ঈদের নামাযে যাওয়া অপছন্দ করা হতো। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৮৪৪) শায়খ আলবানী এ হাদীসটিকেও সহীহ বলেছেন। (সিলসিলাতুল আসারিস সহীহা-৬৬২ নং হাদীসের আলোচনায়)

ফায়দা : সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত উপরিউক্ত নীতিমালা এবং বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, মহিলাদের জন্য ঈদের নামায জরুরী নয়। বরং কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ কর্তৃক যুবতীদের বিষয়ে কঠোর হওয়া থেকে বুঝে আসে যে, নারীঘটিত ফিতনার বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আর সে যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগে ফিতনার আশঙ্কা আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় পরবর্তী মুজতাহিদগণের অনেকে নারীদের ঈদগাহে যাওয়া অপছন্দ তথা মাকরূহ মনে করতেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর মন্তব্যে। সার্বিক বিবেচনায় হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর মতানুসারে ঈদের নামাযের জন্য নারীদের ঈদগাহে যাওয়াকে আমরা মাকরূহ মনে করি। অনুরূপ মন্তব্য হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আল্লামা সাইদালানী রহ.-এর থেকেও বর্ণনা করেছেন যে, মহিলাদের ঈদের নামাযে গমনের বিষয়টি সে যুগে অনুমোদিত ছিলো কিন্তু এখন তা মাকরূহ। কারণ মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। অনুরূপ মত হযরত আয়েশা রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (তালখীছুল হাবির : ৬৭৮ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (বাদায়েউস সানায়ে' : ১/২৭৫) ঈদের জরুরী না হওয়া সত্ত্বেও ঈদের জামাতে তাদের উপস্থিতির বিধান "মহিলাদের জন্য ঘরে একাকী নামায পড়াই উত্তম" শিরোনামে দেখুন।

এর বিপরীতে অনেকে মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশগ্রহণকে পুরুষের মতো জরুরী বা কমপক্ষে উত্তম মনে করে থাকেন। তারা যে সব সহীহ হাদীস দ্বারা এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করে থাকেন তার অন্যতম হাদীস হলো বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত উম্মে আতিয়ার হাদীস। উক্ত হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হলো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (رواه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ–١٣٢/١)

অনুবাদ : হযরত উম্মে আতিয়াহ রা. বলেন, ঈদের দিন আমাদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। এমনকি কুমারী নারীদেরকে তাদের অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী নারীদেরকেও। তারা পুরুষদের পেছনে থাকতো আর তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং দুআর সাথে দুআ করতো। তারা ঐ দিনের বরকত ও পবিত্রতা আশা করতো। (বুখারী : ৯২০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৪২৬৩) এ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২৩ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনায় এসেছে وَيَعْتَزِلنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى "ঋতুমতী নারীগণ ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে"। এ হাদীসটি বুখারী শরীফের ৯২৮ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় এসেছে فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ "তারা যেন কল্যাণকর কাজে এবং মুমিনদের দুআয় শরিক হয়"।

পর্যালোচনা : বুখারী শরীফের এ হাদীসে মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। তবে তার উদ্দেশ্য নামায পড়া নয়। ৯২৩ নম্বরে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى "ঋতুম-তী নারীগণ ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে"। অর্থাৎ মহিলাদের ঈদগাহে গমন যদি নামাযের জন্য হতো তাহলে ঋতুমতী নারীগণ ঈদগাহে যাবে কেন? তাদের তো নামায পড়াই বৈধ নয়। আবার হাদীসে তাদেরকে ঈদগাহ

থেকে দূরে থাকতেও বলা হয়েছে। বরং তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু যা পূর্ববর্তী ৯২৮ নম্বর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ। "তারা যেন কল্যাণকর কাজে এবং মুমিনদের দুআয় শরিক হয়"। অর্থাৎ তাদের ঈদগাহে গমন নামাযের জন্য নয়, বরং মুমিনদের দুআ এবং কল্যাণে অংশ নেয়ার জন্য। ইমাম তিরমিযী রহ. উম্মে আতিয়ার হাদীস বর্ণনা করার পরে এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মন্তব্য পেশ করেন যে,

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الخُرُوجِ إِلَى العِيدَيْنِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَرُوِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ اليَوْمَ الخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ، فَإِنْ أَبَتِ المَرْأَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ فَلْيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي أَطْمَارِهَا وَلَا تَتَزَيَّنْ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ كَذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الخُرُوجِ.

অনুবাদ : কিছু উলামায়ে কিরাম এ পথ অবলম্বন করেছেন এবং নারীদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। আবার কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম এটাকে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক থেকে বর্ণিত আছে যে, বর্তমান সময়ে আমি নারীদের ঈদগাহে গমন করা মাকরূহ মনে করি। একান্ত যদি মহিলা যেতেই চায় তাহলে তার স্বামী যেন তাকে সাজ-সজ্জা ব্যতীত সাধারণ কাপড়ে বের হওয়ার অনুমতি দেয়। যদি সে এভাবে বের হতে না চায় তাহলে স্বামী তাকে বাঁধা দেয়ার অধিকার রাখে। (তিরমিযী : ৫৪০ নং হাদীসের আলোচন-য়)

এখানে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হলো- হযরত উম্মে আতিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত যে হাদীসকে পুঁজি করে বর্তমান সমাজের কিছু মানুষ নারীদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেন বা উদ্বুদ্ধ করে থাকেন সে হাদীসের আলোকে ইমাম তিরমিযী এবং তার পূর্ব যুগের সাহাবা, তাবিঈ ও উলামায়ে কিরামের যে মতামত তুলে ধরেছেন তাতে নারীদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ বা উদ্বুদ্ধ করণের কোন মতামত নেই। বরং কেউ কেউ শর্তসাপেক্ষে যাওয়ার অবকাশ দিয়েছেন আর অনেকেই মাকরূহ বলে মন্তব্য করেছেন।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, হযরত আয়েশা রা. এবং হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. নারীদের অবস্থার প্রেক্ষিতে

তাদের ঈদগাহে গমন না করার যে মতামত দিয়েছেন তা ছিলো সেই সোনালী যুগের ঘটনা। বর্তমান পরিস্থিতি তাদের সামনে থাকলে তাদের মতামত কেমন হতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব, যারা সহীহ হাদীসের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যেতে তৎপর তারা যেন হাদীসের ভাষার পাশাপাশি হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বুঝার চেষ্টা করে। এ হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসের বর্ণনায় নারীদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে তাকীদ করা হয়েছে ঈদের নামায ব্যতীত তার আরো কী কী উদ্দেশ্য ছিলো সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 'মহিলাদের জন্য ঘরে একাকী নামায পড়াই উত্তম' শিরোনামে দেখা যেতে পারে।
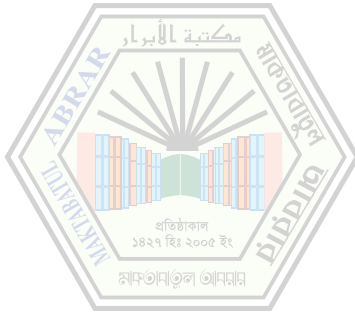
অধ্যায় ১৬ : ইমামতি

ইমামতির হকদার কে?

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ: مَكَانَ سِلْمًا سِنًّا، (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ باب مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ– **١/٢٣٦**)

অনুবাদ : হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: কওমের মধ্যে কুরআন পাঠে পারদর্শী ব্যক্তি তাদের ইমাম হবে। যদি তারা সকলে কুরআন পাঠে সমান পারদর্শী হয় তাহলে ছুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের ইমাম হবে। যদি তারা সকলে ছুন্নাহ সম্পর্কে সমান পারদর্শী হয় তাহলে সর্বাগ্রে হিজরতকারী ব্যক্তি ইমাম হবে। যদি হিজরতের দিক দিয়ে সকলে সমান হয় তাহলে আগে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি ইমাম হবে। কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ ইমামতি করবে না এবং কারো বাড়ীতে তার নিজস্ব বসার স্থানে অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ বসবে না। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আশায রহ.-এর অপর বর্ণনায় 'আগে ইসলাম গ্রহণকারী' শব্দের পরিবর্তে 'বয়সে বড়' কথাটি উল্লেখ রয়েছে। (মুসলিম শরীফ-১৪০৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮১৮)

শিক্ষণীয় : এ বর্ণনা অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার পাবে কুরআন পাঠে পারদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু রসূল স. মৃত্যুর পূর্বে

যখন খুব অসুস্থ ছিলেন তখন তাঁর স্থানে ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রা.কে যিনি ছুন্নাহ সম্পর্কে বড় আলেম ছিলেন। অথচ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বড় কারী হিসেবে খ্যাত ছিলেন উবাই ইবনে কাআব রা.। রসূল স. তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব না দিয়ে হযরত আবু বকর রা.কে দায়িত্ব দেয়া থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, রসূল স.-এর শেষ সিদ্ধান্ত ছিলো ছুন্নাহ সম্পর্কে যিনি বড় আলেম হবেন তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব দেয়া। তারপর কুরআন পাঠে পারদর্শী ব্যক্তি। এরপরে আগে হিজরতকারী ব্যক্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। অতঃপর আগে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি; যদি নতুন মুসলমান হয়। অন্যথায় যার বয়স বেশি সেই ইমামতির হকদার সাব্যস্ত হবে। (রদ্দুল মুহতার : ৪/২৩০)

জ্ঞাতব্য : কোন মসজিদে নিয়মিত ইমাম থাকলে সেখানে এ নীতিমালা কার্যকর নয়। বরং মসজিদের নিয়মিত ইমামই ইমামতির হকদার সাব্যস্ত হবে। আর কোন মসজিদে নির্ধারিত ইমাম না থাকলে সেখানে নামায পড়ানোর জন্য অথবা কোথাও ইমাম নিয়োগ করতে হলে সে ক্ষেত্রে এ নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার সাব্যস্ত করা হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৫৭) এ নীতিমালা লংঘন করে যদি তুলনামূলক কম যোগ্যকে নিয়োগ দেয়া হয় অথবা তাকে দিয়ে নামায পড়ানো হয় তাহলে নিয়োগদাতাগণ অপরাধী সাব্যস্ত হবে। (শামী : ১/৫৫৯) অবশ্য নামায সহীহ হওয়ার শর্ত-শরায়েত পূর্ণ থাকলে তার ইমামতিতে নামায সহীহ হয়ে যাবে।

নাবালকের ইমামতি জায়েয নয়

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللهمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ–١/٥١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, ইমাম হলেন জামিনদার আর মুআজ্জিন হলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আর মুআজ্জিনদেরকে ক্ষমা করুন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ বিষয়ে হযরত আয়েশা, সাহ্ল ইবনে সা'দ এবং উকবা ইবনে আমের রা. থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

(তিরমিযী : ২০৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **حديث صحيح** হাদীসটি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ ৭১৬৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কলম তুলে নেয়া হয়েছে তিন ধরনের ব্যক্তির উপর থেকে– ১. পাগল, যতক্ষণ সে সুস্থ না হয়, ২. নাবালক, যতক্ষণ সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয় এবং ৩. ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ সে জাগ্রত না হয়। (ইবনে মাযা-২০৪২) এ হাদীসটি তিরমিযী এবং আবূ দাউদ শরীফে সনদসহ আর বুখারী শরীফে সনদবিহীন বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের অনেক সনদ উল্লেখ করে বলেন, **وَهَذِهِ طُرُقٌ تَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ** "এ সনদগুলো একটির দ্বারা অপরটি শক্তিশালী হয়"। (ফাতহুল বারী, অধ্যায়: পাগল-পাগলীকে রজম করা হবে না)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাবালকের উপর শরীঅ-াতের কোন দায়-দায়িত্ব বর্তায় না। আর পূর্বের হাদীসে ইমামকে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ অর্পণ করা হয় বিধায় বলা হয়েছে যে, 'ইমাম জামিনদার'। নাবালককে ইমাম বানানো হলে দায়িত্বহীনকে দায়িত্বশীল বানানো আবশ্যক হয় যা পূর্বের হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

এ ছাড়াও রসূলুল্লাহ স. প্রাপ্তবয়স্ক দায়িত্বশীল মানুষদেরকে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে একাধিকবার এ কথা বলে নির্দেশ দিয়েছেন যে, **لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ** "তোমাদের ইমামতি করবে তোমাদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি বয়স্ক ব্যক্তি"। (বুখারী-৬০০) অন্য বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, **لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا** "তোমাদের মধ্যে যিনি তুলনামূলক বেশি বয়স্ক তিনি তোমাদের দু'জনের ইমামতি করবে"। (বুখারী-৬০২) এ থেকেও স্বাভাবিকভাবে এটাই বুঝে আসে যে, ইমামতির গুণাবলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইমাম তুলনামূলক বয়স্ক হওয়া। সুতরাং শুধু নাবালকরা জামাতে নামায আদায় করলে তাদের মধ্যে তুলনামূলক যে বেশি বয়সী সে নামায পড়াবে। আর শুধু প্রাপ্তবয়স্করা জামাতে নামায পড়লে তাদের মধ্যে যে তুলনামূলক বেশি বয়সী সে ইমামতি করবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক এবং নাবালক একত্রে জামাতে নামায আদায় করলে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ইমামতির অন্যান্য যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে তুলনামূলক যে বেশি বয়স্ক সে ইমামতি করবে।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ عُمَرَ بْنِ

عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَه أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِيْ سُوَيْدٍ أَقَامَه لِلنَّاسِ وَهُوَ غُلَامٌ بِالطَّائِفِ فِيْ شَهْرِ رَمْضَانَ يَؤُمُّهُمْ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلى عُمَرَ يُبَشِّرُه فَغَضِبَ عُمَرُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ مَا كَانَ نُوَلِّكَ أَنْ تُقَدِّمَ لِلنَّاسِ غُلَامًا لَم تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُوْدُ.

অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইবনে আবু সুআইদ রহ. আব্দুল আজীজ ইবনে ওমরকে তায়েফ নামক স্থানে রমাযান মাসে ইমাম বানালেন অথচ তখনও তিনি নাবালক। মুহাম্মাদ ইবনে আবু সুআইদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ.কে সুসংবাদ হিসেবে খবরটি জানালেন। (আপনার ছেলেকে ইমাম বানিয়েছি) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ.-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে মুহাম্মাদ ইবনে সুআইদকে পত্র লেখেন যে, আমি আপনাকে এ দায়িত্ব দেইনি যে, আপনি একজন নাবালক বাচ্চাকে ইমাম বানাবেন যার উপর শরীআতের হুদুদ বা দণ্ডবিধি আরোপিত হয়নি। (আব্দুর রাযযাক-৩৮৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ ইমাম এবং নির্ভরযোগ্য রাবী। সুতরাং হাদীসটির সনদ উঁচু মানের সহীহ।

পর্যালোচনা : খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. হাদীসের বড় ইমাম। সাথে সাথে ফকীহ ও মুজতাহিদ। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সুআইদকে শাসিয়ে পত্র দিলেন যে, একজন নাবালককে কেন ইমাম বানানো হলো। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নাবালকের ইমামতি গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ এবং আতা রহ. থেকে অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ফরয ও নফল কোন নামাযে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ইমামতি করবে না। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৫২৪)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ»

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে কোন বালক ইমামতি করবে না। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি আযান দিবে। (আব্দুর রায্যাক-৩৮৪৭, ১৮৭২, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৫৮৫৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী, মাওকুফ। ইবনে আবী ইয়াহইয়া

ব্যতীত এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইবনে আবী ইয়াহইয়াকে ইমাম শাফিঈ রহ. নির্ভরযোগ্য বললেও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। অতএব, এ সনদটি জঈফ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। (ফাতহুল বারী-২/১৮৫ দারুল মা'রেফা অনুদিত) তবে অন্যান্য হাদীস থেকে এ বিষয়টি সমর্থিত হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতার দিকটি প্রাধান্য পায়।

পর্যালোচনা : নাবালকের ইমামতি নিষিদ্ধের ব্যাপারে আরো অনেক সাহাবা ও তাবিঈগণের আছার বর্ণিত থাকায় এটা অন্য দলীলের সহযোগী হিসেবে চলতে পারে। ইমাম বায়হাকীও এ হাদীসটি বর্ণনা করে এটাকে মাউকূফ বলেছেন কিন্তু কোন ত্রুটি উল্লেখ করেননি। হযরত আতা রহ. থেকে সহীহ সনদে উল্লেখ আছে যে, নাবালক বাচ্চা ইমামতি করবে না। (আব্দুর রাযযাক-৩৮৪৫) এ হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। হাসান সনদে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে কোন বালক ইমামতি করবে না। (ইবনে আবী শাইবা-৩৫২৬) অনুরূপ মন্তব্য ইমাম শা'বী রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা-৩৫২৫)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল মারওয়াজী রহ. (মৃত্যু-২৯৪ হি.) তাঁর কিয়ামুল লাইল কিতাবে নাবালকের ইমামতির বিরুদ্ধে বেশ কিছু আছার বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী, ইবনে আব্বাস, আতা ইবনে আবী রবাহ, মুজাহিদ ইবনে জবর, ইবরাহীম নাখাঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ রহ.-এর নাম অন্যতম। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতও উল্লেখ করেন যে, তিনি এটাকে অপছন্দ করতেন। যদিও নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।

ফায়দা : উপরিউক্ত দলীলের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমামতির গুরু দায়িত্ব কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক পালন করতে পারে না এবং তার পেছনে ইক্তিদা করলে কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নামায হয় না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৫০)

এর বিপরীতে কিছু আলেম নাবালকের ইমামতি বৈধ বলে থাকেন। তাঁরা বুখারী শরীফের ৩৯৭১ নম্বর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। সে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আমর ইবনে সালামা রা.কে তাঁর

কওমের লোকেরা ইমাম বানিয়েছিলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয়/সাত বছর।

আমরা এ হাদীসটিকে নাবালকের ইমামতির দলীল হিসেবে গ্রহণ করি না। তাঁর পিতা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে মাত্র মুসলমান হয়ে আপন কওমে ফিরে এসে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আর তাঁর কওমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নামাযের জন্য উপস্থিত হন এবং ছয়/সাত বছরের বালক আমর ইবনে সালামাকে ইমাম বানান। তিনি তাঁর ছেলেকে ইমাম বানানোর দলীল হিসেবে রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, তোমাদের মধ্যে যে বেশি কুরআন জানে সে তোমাদের নামায পড়াবে। রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ শুনে কওমের লোকেরা অধিক কুরআন জানার কারণে ঐ নাবালকের উপর ইমামতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলো।

উক্ত হাদীসে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, যখন তিনি (ইমাম) সিজদা করতেন তখন নিতম্বের কাপড় সংকুচিত হয়ে নিতম্ব বের হয়ে যেতো। এ অবস্থা দেখে কওমের লোকেরা তাঁকে একটি জামা বানিয়ে দিয়েছিলো। তারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করায় সতর ঢাকা নামায সহীহ হওয়ার শর্ত তা-ও জানতো না। এছাড়াও নামাযের অনেক জরুরী মাসআলা তখনও পর্যন্ত তারা শিখতে পারেননি। যে কারণে নামাযের মধ্যে ইমামের নিতম্ব আবরণহীন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নামায চালিয়ে গেছেন নির্বিঘ্নে। ইমাম আহমদ রহ.-এর নিকট এ হাদীস পেশ করা হলে তিনি এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, **أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذ لَك** এ বিষয়ে রসূল স. অবগত ছিলেন না। অর্থাৎ এটা সাহাবার বিচ্ছিন্ন আমল। (ফাতহুল বারী-২/১৮৫) হযরত সাহল ইবনে সা’দ রা. থেকে মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত ৭৮৫ নম্বর হাদীস দ্বারাও কেউ কেউ দলীল পেশ করে থাকেন। উক্ত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি এক নাবালককে ইমাম বানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আপত্তি করা হলে তিনি দলীল হিসেবে রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ পেশ করেন যে, **إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَتَمَّ كَانَ لَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ، فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَ ذَلِكَ** "ইমাম যামিনদার। যদি সে নামায পূর্ণ করে তাহলে ইমাম-মুক্তাদী সকলেই সওয়াব পাবে। আর যদি ত্রুটি হয় তাহলে তার দায়ভার ইমামের উপর বর্তাবে। আর আমি এ দায়িত্ব কাঁধে নিতে চাই না"। হাকেম এবং

ইমাম ত্বাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

হযরত সাহল রা. যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করলেন সে হাদীসে নাবালককে ইমাম বানানোর কোন কথাই বিদ্যমান নেই। বরং 'ইমাম যামিনদার' শব্দের মধ্যে নাবালককে ইমাম না বানানোর বিষয়টিই পরিষ্কার যা এ অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সাহাবার আমল হওয়া সত্ত্বেও ইমামতির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ জাতীয় আমল থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় না। উপরন্তু ফকীহ সাহাবা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আমল এর বিপরীত রয়েছে। সাথে সাথে এটা অতি স্বাভাবিক কথা যে, যার প্রতি শরীআতের কোন দায়িত্ব এখনো বর্তায়নি সে নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতে অন্যদের কী প্রতিনিধিত্ব করবে? এ ছাড়া, উপরিউক্ত হাদীস দু'টির ভিত্তিতে নাবালকের ইমামতিকে বৈধ বলা হলে তা পূর্ববর্ণিত মারফু' হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের মতামত এবং শরীআতের বেশ কিছু মূলনীতির পরিপন্থী হবে। আবার বৈধ ও অবৈধের দ্বন্দ্ব হলে সর্বদা অবৈধের দিক প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ নিয়মের আওতায়ও নাবালককে ইমাম বানানো থেকে বেঁচে থাকা জরুরী; বিশেষ করে ফরয নামাযে।

ইমামের জন্য উত্তম হলো নামায দীর্ঘ না করা

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ–١٨٨/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন লোকদের ইমামতি করে তখন সে যেন নামায দীর্ঘ না করে। কেননা তাদের মধ্যে বাচ্চা, বৃদ্ধ, দুর্বল এবং অসুস্থ লোক থাকে। আর যখন একাকী নামায আদায় করবে তখন যেভাবে ইচ্ছা (লম্বা/সংক্ষিপ্ত) নামায আদায় করবে। (মুসলিম : ৯৩০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ এবং আবূ দাউদ শরীফে

বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৩৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স. ইমামকে নামায দীর্ঘ না করার কথা বলেছেন। সুতরাং ইমামের জন্য ছুন্নাত হলো নামায দীর্ঘ না। অবশ্য তা হতে হবে ছুন্নাত কিরাতের অনুসরণ করে। হযরত জাবের রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. ইশার নামাযে ছূরা বাকারা পড়ানোর কারণে রসূল স. তাঁকে খুব শাসিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তুমি ছূরা শামস, ছূরা আ'লা এবং এ জাতীয় ছূরা পাঠ করবে। (বুখারী : ৫৬৭৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল-৩৮৩২) এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ স. হযরত মুআয রা.কে নামায সংক্ষিপ্ত করার কথাও বলেছেন। আবার ইশার নামাযের ছুন্নাত কিরাতের অনুকরণও করতে বলেছেন। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৬৪)

ইমাম মেহরাবের বাইরে দাঁড়াবেন

أنبأ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ثنا مُطَيَّنٌ، ثنا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ، ثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتَّقُوا هَذِهِ الْمَذَابِحَ" يَعْنِي الْمَحَارِيبَ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রসূল স. ইরশাদ করেছেন, তোমরা এ সকল মাযাবিহ অর্থাৎ মেহরাবসমূহ বর্জন করো। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৪৩০৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা মুনাবী রহ. বলেন, رمز المصنف لحسنه লেখক অর্থাৎ আল্লামা সুয়ূতী রহ. হাদীসটির উপর হাসান হওয়ার সংকেত ব্যবহার করেছেন। (আল-ফাইজুল কাদীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৪, [আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া-মিসর হতে প্রকাশিত])

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: نا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمِحْرَابِ وَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَتِ الْكَنَائِسُ فَلَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ»

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

তিনি মেহরাবে নামায পড়া মাকরূহ মনে করতেন এবং বলতেন, এটা ছিলো খৃস্টানদের উপাসনালয়। সুতরাং তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে সাদৃশ্য রেখো না। (মুসনাদে বায্‌যার-১৫৭৭)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাওকূফ। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ হাদীসটির বর্ণনাকীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১৯৮২)

পর্যালোচনা : এ হাদীস এবং ইবনে আবী শাইবা-৪৭৩৪ নং হাদীসে মেহরাবের ভেতরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ানোর নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে খ্রিস্টানদের ইবাদাতের সাথে সাদৃশ্য হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ধর্মগুরুরা জনসাধারণের সাথে এক জায়গায় ইবাদাত করতো না। বরং তাদের ইবাদাতের জন্য ভিন্ন স্থান নির্ধারিত থাকতো। ফিক্‌হ-এর কিতাবে আরো একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, ইমাম মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ালে তাঁর আওয়াজ শুনতে মুক্তাদীগণের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। মাসজিদ ছোট হলে অথবা শব্দযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে আওয়াজ পৌছানো নিশ্চিত করা গেলেও খ্রিষ্টানদের ইবাদাতের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার বিষয় সর্বাবস্থাতেই বিদ্যমান থাকছে। সুতরাং ইমাম সাহেবের জন্য মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো বর্জন করা উচিত হবে।

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فَيَقُومُ عَنْ يَسَارِ الطَّاقِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ بِحِيَالِ الطَّاقِ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ إِذَا كَانَ مَقَامُهُ خَارِجًا مِنْهُ، وَسُجُودُهُ فِيهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অনুবাদ : মুহাম্মাদ বলেন, আবু হানিফা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ থেকে তিনি ইবরাহীম থেকে তিনি লোকদের ইমামতি করতেন এবং মেহরাবের বাম অথবা ডান পাশে দাড়াতেন। (ইমাম) মুহাম্মাদ বলেন, ইমাম মেহরাবের মধ্যে ঢুকে না পড়ে বরং মেহরাবের বাইরে দাঁড়িয়ে সিজদা মেহরাবের মধ্যে দিলে আমরা এটাকে মাকরূহ মনে করি না। আর এটাই আবু হানিফার রহ. এর মত। (কিতাবুল আছার লিমুহাম্মাদ-১০৩) মেহরাবের ভেতর দাঁড়িয়ে নামায পড়ানো মাকরূহ হওয়ার বিষয় সহীহ সনদে হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে আব্দুর রাযযাক-৩৮৯৯, ইবনে আবী শাইবা-৪৭৩৫ এবং হাসান সনদে হযরত

আবু খালেদ ওয়ালেবী রহ. থেকে ইবনে আবী শাইবা-৪৭৩৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে।

তায়াম্মুমকারীর পেছনে অযু/গোসলকারীর ইক্তিদা সহীহ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (رواه ابو داود فِيْ بَابِ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ)

অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আছ রা. বলেন, জাতুস সালাসিল যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। আমি আশঙ্কা করলাম যে, গোসল করলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। তাই তায়াম্মুম করলাম এবং সাথীদের ফজরের নামায পড়ালাম। সাথীগণ এ ঘটনা রসূলুল্লাহ স.কে জানিয়ে দিলে তিনি আমাকে বললেন, হে আমর! তুমি জুনুবী অবস্থায় সাথীদের নামায পড়িয়েছো? আমি তাঁকে গোসল না করার কারণ বর্ণনা করলাম এবং আরো বললাম যে, আমি আল্লাহর বাণী শুনেছি, তোমরা আত্মহত্যা করো না, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান। (ছূরা নিসা : ২৯) রসূলুল্লাহ স. এ কথা শুনে হাসলেন এবং তাঁকে কিছুই বললেন, না। (আবূ দাউদ : ৩৩৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ "হাদীসটির সনদ শক্তিশালী"। (ফাতহুল বারী, অধ্যায় : 'জুনুবী ব্যক্তি অসুস্থতার আশঙ্কা করলে') শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح "হাদীসটি সহীহ"। (আবূ দাউদ শরীফ : ৩৩৪ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : হযরত আমর ইবনুল আস রা. গোসলের পরিবর্তে

তায়াম্মুম করে ঐ সকল সাহাবায়ে কিরামের নামায পড়িয়েছিলেন যারা অযু/গোসল করে তাঁর পেছনে ইক্তিদা করেছিলেন। রসূল স. এটা জানার পরেও কোন প্রতিবাদ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুমকারীর পিছনে অযু/গোসলকারীর ইক্তিদা সহীহ। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৮৮)

বসে নামায আদায়কারীর পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তির ইক্তিদা সহীহ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ...فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (متفق عليه واللفظ للبخارى رواه فى باب: الرَّجُل يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূল স.-এর অসুস্থতা যখন বেড়ে গেলো। হযরত বিলাল রা. রসূল স.কে নামাযের খবর জানাতে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আবু বকরকে নামায পড়াতে বলো।...রসূল স. এসে আবু বকরের বাম পাশে বসলেন। হযরত আবু বকর রা. দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। আর রসূল স. বসে নামায পড়ছি-লেন। আবু বকর রা. রসূল স.-এর নামাযের ইক্তিদা করছিলেন আর অন্যরা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রা.-এর নামাযের অনুসরণ করছিলো। (সংক্ষে-পিত: বুখারী-৬৭৮, মুসলিম-৮২৬, ৮২৭ ও ৮২৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৬৪২০)

পর্যালোচনা ও শিক্ষা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় অসুস্থতার কারণে ইমাম বসে নামায পড়ালেও পেছনের সুস্থ মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করতে পারে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৮৮)

এর বিপরীতে বুখারী-মুসলিমের বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। আর ইমাম বসে নামায পড়লে তোমরাও সকলে বসে নামায পড়বে। (বুখারী-৬৫৫, মুসলিম-৮০৬) ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস রা. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করার পরে বলেন, قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আল্লামা হুমাইদী বলেন, ইমাম বসে নামায পড়লে তোমরাও বসে নামায পড়বে' এটা নবী কারীম স.-এর পূর্বেকার অসুস্থতার সময়ের কথা। পরবর্তীতে নবী কারীম স. নামায পড়েছেন বসে আর তাঁর পেছনের মুক্তাদীগণ পড়েছেন দাঁড়িয়ে। রসূল স. তাদেরকে বসতে বলেননি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ আমলই গ্রহণীয়। (বুখারী-৬৫৫) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বসে নামায পড়ালে তাঁর পেছনের সুস্থ মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে ইক্তিদা করবে। এ আমলটি রসূল স.-এর শেষ আমল এবং এটাই বহাল। আর বসে ইক্তিদা করার আমলটি পূর্বের যা রহিত হয়ে গেছে।

নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা অবৈধ

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أَيُعِيدُ–١/٨٥)

অনুবাদ : হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন, আমি বালাত নামক স্থানে হযরত ইবনে ওমর রা.-এর নিকট এলাম। তখন লোকেরা নামায পড়ছিলো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তাদের সাথে নামায পড়বেন না? তিনি বললেন, আমি নামায পড়েছি। আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি, তোমরা একই নামায একদিনে দু'বার পড়ো না। (আবূ দাউদ : ৫৭৯, নাসাঈ : ৮৬১, মুসনাদে আহমদ ৪৬৮৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম নববী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম : ২৩১৩ নং হাদীসের আলোচনায়) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একবার ফরয নামায পড়া হলে দ্বিতীয়বার সেই নামায পড়া বৈধ নয়। তবে একবার কোন নামায একাকী পড়ার পরে নফলের নিয়তে তাতে অংশগ্রহণ করা যায়।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ–١/١٣٠)

অনুবাদ : হযরত আবু যর রা. বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, তুমি কী করবে যখন তোমার উপর এমন সব আমীরের নেতৃত্ব চলবে যারা নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে দেরি করবে? অথবা বলেছেন নামাযের ওয়াক্ত ইবনেষ্ট করে দিবে? হযরত আবু যর রা. বললেন, আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? রসূলুল্লাহ স. বললেন, সময়মত নামায পড়ে নাও। যদি তাদের সঙ্গে নামায পাও তাহলে আবারও পড়ো। আর সেটা হবে তোমার জন্য নফল। (মুসলিম : ১৩৪০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৯৩১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ফরয নামায একবার পড়া হলে দ্বিতীয়বার তাতে নফল হিসেবে অংশগ্রহণ করা যায়; ফরয হিসেবে নয়। আর যে ফরয নামায দু'বার পড়ারই অনুমতি নেই সে নামাযে ইমামতি করার অনুমতি মেলে কী করে?

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللهمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ. (رَوَاه التِّرمِذِىْ فِىْ بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ–١/٥١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, ইমাম হলেন জামিনদার আর মুআজ্জিন হলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আর মুআজ্জিনদেরকে ক্ষমা করুন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ বিষয়ে হযরত আয়েশা, সাহাল ইবনে সা'দ এবং উকবা ইবনে আমের রা. থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (তিরমিযী : ২০৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح হাদীসটি সহীহ। (মুসনাদে আহমদ ৭১৬৯ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

পর্যালোচনা : এ হাদীসে রসূল স. ইমামকে জামিনদার বলেছেন। অর্থাৎ তিনি মুক্তাদীগণের নামাযের জামানত গ্রহণ করে থাকেন। আর এটা বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত যে, জামানত গ্রহণের জন্য জামিনদারকে জামানতের তুলনায় বেশি শক্তিশালী হতে হয়। দুর্বল কখনো সবলের জামানত গ্রহণ করতে পারে না। আর ইমাম নফল আদায়কারী হলে তিনি তার অবস্থার চেয়ে শক্তিশালী অর্থাৎ ফরয আদায়কারী মুক্তাদীর জামানত গ্রহণ করতে পারেন না। এ কারণে আমরা বলি যে, ইমাম নফল আদায়কারী হলে তার পেছনে কোন ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা বৈধ হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৭৯)

কোন কোন ইমাম অবশ্য নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা করা বৈধ বলে থাকেন এবং দলীল হিসেবে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর নিম্নবর্ণিত হাদীস পেশ করেন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ (رَوَاه الْبُخَارِىُّ فِىْ بَابِ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا–١/٩٨)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. বলেন, হযরত মুআয রা. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়তেন। অতঃপর নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে তাদেরকে নামায পড়াতেন। (বুখারী : ৬৭৬)। আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে হযরত মুআয রা. ইশার নামায পড়তেন আবার কওমে এসে ঐ নামাযের ইমামতি করতেন। (আবূ দাউদ : ৫৯৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে এটা পরিষ্কার যে, হযরত মুআয রা. রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে নামায পড়ে নিজ সম্প্রদায়ে এসে আবার ঐ নামায পড়াতেন। তবে এটা পরিষ্কার নয় যে, হযরত মুআয রা. রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে ফরয পড়তেন আর সম্প্রদায়ে এসে নফল পড়তেন। বরং পূর্ববর্ণিত সহীহ হাদীসে একই নামায এক দিনে দু'বার পড়ার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এটা পরিষ্কার হয় যে, হযরত মুআয রা. ইশার নামায একবারই পড়েছেন; যে নামাযে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের ইমামতি করেছেন। আর রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে পড়া নামায তাঁর নফল ছিলো। এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়া হলে মারফু' হাদীস এবং সাহাবার আমলের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। আর সঙ্গত কারণে নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা বৈধ হওয়ার দলীলও এ হাদীস দ্বারা চলে না। এ ব্যাখ্যার বিপরীতে যে সব হাদীসে বর্ণিত রয়েছে : هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ, وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ "হযরত মুআয রা. যে নামায তাঁর সম্প্রদায়ে গিয়ে পড়াতেন তা তাঁর জন্য ছিলো নফল, আর সম্প্রদায়ের জন্য ছিলো ফরয"। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৩, হাদীস নং-২৩৬০) এটা মূলত হযরত মুআয রা.-এর নিজের মন্তব্য নয়; বরং এটা অন্যদের ধারণাপ্রসূত মন্তব্য যা অপরের অন্তরের নিয়তের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু, আমর ইবনে দীনার সূত্রে আইয়ূব সিখতিয়ানী, (বুখারী : ৬৭৬) মানসুর ইবনে মু'তামির (মুসলিম : ৯২৬) এবং সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম : ৯২৪) কিন্তু তাঁদের কারো বর্ণনায় ঐ শব্দটি (هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ..) নেই। আবার যদি মেনেও নেয়া হয় যে, হযরত মুআয রা. ইশার ফরয নামায রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে পড়ে নিতেন, আর দ্বিতীয়বার ঐ একই নামাযের ইমামতি করতেন তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে, এটা রসূলুল্লাহ স. থেকে অনুমোদিত কি না? অনুমোদিত হওয়ার কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় বেশ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ স. হযরত

মুআয রা.কে বলেছেন, إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ "হয়তো আমার সাথে নামায পড়ো অথবা কওমের জন্য সহজ করো"। (মুসনাদে আহমদ : ২০৬৯৯, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৪, হাদীস নং-২৩৬২) মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীস-টিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, فَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لِمُعَاذٍ , يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ , إِمَّا الصَّلَاةَ مَعَهُ , أَوْ بِقَوْمِهِ , وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجْمَعُهَا "রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক মুআয রা.কে এ কথা বলায় এটাই বুঝায় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট তাঁর দুটি বিষয়ের যে কোন একটির অনুমতি রয়েছে। হয়তো রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়া। নয়তো তাঁর কওমের নামায পড়ানো। এ দু'টিকে একত্রিত করতে পারবে না। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৪)

এ হাদীস দ্বারা এটাই পরিষ্কার বুঝে আসে যে, হযরত মুআয রা. ইশার ফরয নামায রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে পড়ে দ্বিতীয়বার ঐ একই নামাযে ইমামতি করার অনুমতি রসূলুল্লাহ স. দেননি। তাহলে এটা কীভাবে ফরয নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দলীল হতে পারে? সর্বোপরি কথা হলো উপরিউক্ত দলীলের ভিত্তিতে যদি কারো নিকট এটা বৈধ মনে হয়, তাহলেও সতর্কতার চাহিদা হবে এ জাতীয় বিতর্কিত বিষয় থেকে ফরয নামাযকে বাঁচিয়ে রাখা।

অধ্যায় ১৭ : জুমুআর নামায

জুমুআর নামায ফরয

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর জিকিরের দিকে অগ্রসর হও। (ছূরা জুমুআহ : ৯)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াতে উল্লিখিত ذِكْرِ اللهِ শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, خُطْبَة الإِمَام وَالصَّلَاة مَعَه ইমামের খুৎবা এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করা হলো ذِكْرِ اللهِ বা আল্লাহর জিকির। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস) এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা জুমুআর দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে রসূল স.ও এ নির্দেশ পালনের তাকিদ দিয়েছে যা দ্বারা ফরয প্রমাণিত হয়।

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (رواه النسائى فى بَابِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمْعَةِ-١/١٥٤)

অনুবাদ : রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক সাবালক পুরুষের জন্য দ্বিপ্রহরে জুমুআর দিকে রওয়ানা করা ওয়াজিব। (নাসাঈ : ১৩৭৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, وإسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ।

(জামেউল উসূল-৩৯৪৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফের ৩৪২ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

পর্যালোচনা : কুরআন-হাদীসে ফরয এবং ওয়াজিব একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যদিও ফিকহে হানাফীতে এ দুই শব্দের মধ্যে পারিভাষিক ব্যবধান করা হয়। হাদীসের এ শব্দ থেকে কুরআনের উক্ত নির্দেশের দৃঢ়তা ও আবশ্যকতার সমর্থন মেলে। সব মিলে এটা প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর নামায ফরয। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/১৩৬)

ঈদ ও জুমুআ একদিনে হলে উভয় নামাযই পড়তে হবে

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ. (رواه مسلم فى فصل فى سورة الجمعة والمنافقين–١/١٨٧)

অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. উভয় ঈদ এবং জুমুআর নামাযে ছূরা আ'লা এবং ছূরা গশিয়াহ পড়তেন। জুমুআ এবং ঈদ এক দিনে হলেও তিনি ঐ ছূরা দুটি উভয় নামাযে পড়তেন। (মুসলিম-১৯০১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুয়াত্তা মালেক এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৯১)

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত সহীহ, মারফু' হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, জুমুআর দিন ঈদ হলেও রসূল স. জুমুআর নামায আদায় করতেন।

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عِيدُكُمْ هَذَا وَالْجُمُعَةُ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ , فَلَمَّا صَلَّى الْعِيدَ جَمَّعَ (رواه البيهقى فى السنن الكبرى)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স.-এর যুগে একবার দুই ঈদ অর্থাৎ জুমুআ এবং ঈদ একদিনে একত্রিত হলো। অতঃপর রসূল

স. ইরশাদ করলেন : তোমাদের ঈদ আর জুমুআ একত্রিত হয়েছে। আমরা অবশ্যই জুমুআ পড়বো। যে ব্যক্তি জুমুআ পড়তে চায় সে পড়ুক। অতঃপর ঈদের নামাযও পড়লেন এবং জুমুআর নামাযও পড়লেন। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৬২৮৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম-১০৬৪)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত দুটি সহীহ, মারফু' হাদীসের দ্বারা বুঝা গেলো যে, জুমুআর দিন ঈদ হলেও রসূল স. জুমুআর নামায ছাড়েননি। বরং দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, আমরা অবশ্যই জুমুআ পড়বো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর দিন ঈদ হলেও জুমুআর নামায পড়তে হয়।

তবে উপরিউক্ত হাদীসে রসূল স. ইরশাদ করেছেন যে, 'আমরা অবশ্যই জুমুআ পড়বো'। এখানে আমরা শব্দ রসূল স. দ্বারা কাদেরকে বুঝিয়েছেন আর কাদেরকে জুমুআর নামায না পড়ার অনুমতি দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক শ্রেণির মানুষ সাধারণ জনতাকে ব্যাপকভাবে জুমুআর নামায না পড়ার অনুমতি দেয়া শুরু করেছে। তাদের ভাষ্য এই যে, জুমুআর দিন ঈদ হলে জুমুআর নামায পড়া লাগে না। অথচ রসূল স. এ হাদীসে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, আমরা অবশ্যই জুমুআ পড়বো। অবশ্য যাদেরকে তিনি জুমুআর নামায না পড়ার অনুমতি দিলেন তারা কারা সে প্রশ্নের জবাবে অনুরূপ অর্থে বর্ণিত বুখারী শরীফের একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে। উক্ত বর্ণনায় হযরত উসমান রা. বলেন, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ "আওয়ালীবাসীদের মধ্যে থেকে যারা জুমুআর জন্য অপেক্ষা করতে চায় তারা যেন অপেক্ষা করে। আর যে ফিরে যেতে চায় আমি তাকে অনুমতি দিচ্ছি"। (বুখারী-৫১৭৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি ইমাম ত্বহাবী তাঁর মুশকিলুল আছার কিতাবে এবং ইমাম বায়হাকী তাঁর সুনানুল কুবরা কিতাবেও উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসের ভাষা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রসূল স. যাদেরকে জুমুআর নামায না পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন তারা মদীনা শহরের বাইরে অবস্থিত 'আওয়ালী' নামক গ্রাম্য অঞ্চলের বাসিন্দা যাদের উপর জুমুআ ও ঈদের নামায আদায়ের বিধান নেই। আওয়ালীর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় ঈদের নামাযে শরিক হওয়ার জন্য মদীনায় এসেছিলো তারা ঈদের নামায শেষ করে বাড়ীতে গিয়ে

আবার জুমুআর নামাযের জন্য মদীনায় আসতে চাইলে তাদের দিন কেটে যাবে শুধু যাওয়া আসা করতে করতে। অথচ তাদের উপর জুমুআর নামায জরুরী নয়। এ কারণে রসূল স. তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এ ঘোষণা দিয়েছেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ فِي كَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ لِبُعْدِ مَنَازِلِهِمْ عَنِ الْمَسْجِدِ হাদীসের শব্দ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي (আওয়ালীর বাসিন্দা) দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত উসমান রা. যাদেরকে জুমুআর নামায না পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন মদীনা থেকে দূরে বসবাস করার কারণে তাদের উপর এমনিতেই জুমুআর নামায জরুরী ছিলো না। (ফাতহুল বারী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়) আর রসূল স.-এর ভাষ্য 'إِنَّا مُجَمِّعُونَ আমরা অবশ্যই জুমুআ পড়বো' বলে মদীনা শহরে বসবাসরত ব্যক্তিদের অবস্থা বুঝিয়েছেন যে, যাদের উপর জুমুআর নামায অন্য সময় আবশ্যক ঈদের দিন জুমুআ হলেও তাদের জন্য তা আবশ্যক থাকবে। এ হাদীসের ঘোষণা হযরত উসমান রা.-এর নিজের তরফ থেকে হলেও ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের কথা বা কাজ বিধানগতভাবে রসূল স.-এর কথা ও কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধরে নেয়া হয় যে, এটা তিনি রসূল স. থেকে শুনে বলেছেন। রসূল স.-এর এ ঘোষণাকে পুঁজি করে মদীনায় বসবাসকারী কোন সাহাবা ঈদের দিনে জুমুআর নামায পড়েননি বলে কোন সহীহ হাদীসের বর্ণনা আমার সন্ধানে মেলেনি। শুধুমাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-এর আমল পাওয়া যায় যে, জুমুআর দিনে ঈদ হলে তিনি ঈদের নামায দেরি করে জুমুআর সাথে একত্রে দু'রাকাত আদায় করতেন। ভিন্নভাবে জুমুআর নামায পড়তেন না। আর হযরত ইবনে আব্বাস রা. নিজে এমনটা না করলেও এটাকে সমর্থন করেছেন বলে সহীহ হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে যেহেতু হযরত উসমান রা.-এর আমল রসূল স.-এর নির্দেশ ও আমলের অনুরূপ তাই আমরা ঐ আমলের বিপরী-তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা.-এর এ আমল গ্রহণ করতে পারি না। অতএব, যাদের উপর জুমুআর নামায অন্য সময় আবশ্যক ঈদের দিন জুমুআ হলেও তাদের জন্য তা আবশ্যক থাকবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : ২/১৪২০)

উল্লেখ্য, "গ্রাম্য অঞ্চলের বাসিন্দা; যাদের উপর জুমুআ ও ঈদের

নামায আদায়ের বিধান নেই” বলে ঐ সকল গ্রাম বুঝানো হয়ে থাকে যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বা তাদের প্রতিনিধি নেই এবং মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায় না। গভীর জঙ্গল বা পাহাড়ী এলাকা ছাড়া এ ধরনের গ্রামের অস্তিত্ব এখন খুঁজে পাওয়া দুস্কর। এ ধরনের গ্রাম্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য জুমুআ ও ঈদের নামায জরুরী না হওয়ার বিষয়ে দেখুন- আব্দুর রায্যাক-৫১৭৭, ইবনে আবি শাইবা : ৫১০০, ৫১০১ ও ৫১০৩ নম্বর হাদীসে।

মুসাফিরদের উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ (رواه البخارى فى بَابِ زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ–١/١١)

অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, এক ইহুদী এসে তাঁকে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে আপনারা একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন। আয়াতটি যদি আমাদের ইহুদীদের প্রতি অবতীর্ণ হতো তাহলে ঐ দিনটিকে আমরা ঈদ বানিয়ে নিতাম। হযরত ওমর রা. বললেন, সেটি কোন আয়াত? ইহুদী বললো, সেটা **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا** (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিআমত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ধর্ম হিসেবে আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম)। হযরত ওমর রা. বললেন, আমি সে দিনটি সম্পর্কে জানি। আর যে স্থানে সে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো তা-ও জানি। তখন রসূল স. জুমুআর দিনে আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান ছিলেন। (বুখারী-৪৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৫৯৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিদায় হজ্জে আরাফা-

তর দিনটি ছিলো জুমুআর দিন।

عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا (رواه البخارى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ-١/١٤٧)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা পুনরায় মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত রসূল স. দু'রাকাত করে নামায আদায় করছিলেন। বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কত দিন মক্কায় ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা দশ দিন ছিলাম। (বুখারী-১০২০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪০১৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিদায় হজ্জের পূর্ণ সময় রসূল স. মুসাফির ছিলেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «غَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ، وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ. (رواه ابو داود فى بَابِ الخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ-١/٢٦٥)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূল স. আরাফাতের দিন সকাল বেলা মিনা হতে ফজরের নামাযের পরে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আর তিনি আরাফাতে এসে নামিরা নামক স্থানে অবতরণ করলেন। নামিরা হলো আরাফাতের ময়দানে অবতরণকারী ইমামের অবস্থানস্থল। অতঃপর যোহরের নামাযের সময় হলে সূর্য ঢলার সাথে সাথে (নামাযের স্থানে) গেলেন এবং যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায়

করলেন। এরপরে মানুষের সামনে খুৎবা দিয়ে আরাফার অবস্থানস্থলে চলে গেলেন। (আবূ দাউদ-১৯১১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীস-টিকে হাসান বলেছেন। (আবূ দাউদ-১৯১১ এবং মুসনাদে আহমদ-৬১৩০ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত তিনটি হাদীসের সমন্বয়ে জানা গেলো যে, রসূল স. মুসাফির অবস্থায় আরাফার দিন শুক্রবার হওয়া সত্ত্বেও জুমুআর নামায পড়েননি। বরং তিনি যোহরের নামায আদায় করেছেন।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ. (رواه الْبُخَارِى فِىْ بَابٍ بَعْدَ بَابِ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا– ٢/٥٦٧)

অনুবাদ : হযরত নাফে’ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে ওমর রা.কে জুমুআর দিনে বলা হলো যে, বদরী সাহাবা সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সূর্য অনেক উপরে উঠে গিয়ে জুমুআর নামাযের সময় ঘনিয়ে আসার পরে তিনি সওয়ার হয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন এবং জুমুআর নামায পরিত্যাগ করে দিলেন। (বুখারী-৩৭০১)

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে ওমর রা.-এর আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের জন্য জুমুআর নামায জরুরী নয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, সফরে গেলে জুমুআ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় সফর বন্ধ করা আবশ্যক নয়। এ বিষয়ে হযরত উসামা ইবনে উমায়ের রা. থেকে সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, রসূল স. হুদায়বিয়ার সফরে জুমুআর দিন হালকা বৃষ্টির কারণে সাহাবায়ে কিরামকে ছাউনীতে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন যা জুমুআ হতে পারে না; বরং তা জোহর ছিলো। (আবূ দাউদ-১০৫৯)

ইমাম ইবনে খুযায়মা তাঁর সহীহ ইবনে খুযায়মায় এ হাদীসটিকে সফরে জুমুআর নামায পরিত্যাগ করা বৈধ শিরোনামে বর্ণনা করেছেন। (সহীহ ইবনে খুযায়মা-১৬৫৫ নং হাদীসের শিরোনাম) এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, উক্ত হাদীসটিতে জুমুআর নামায পরিত্যাগের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তার কারণ হলো রসূল স. ও সাহাবায়ে কিরামের সফরে থাকা।

জ্ঞাতব্য : মুসাফিরের জন্য জুমুআর নামায জরুরী না হওয়ার বিষয়টি

সুনানে বায়হাকী-৫৬৫৩, মু'জামে কাবীর লিত্ তবারানী-১২৫৭, দারাকুতনী-১৫৭৬ এবং দারাকুতনী-১৫৮২ নং হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। মুল্লা আলী কারী রহ. বলেন, وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ اهـ. وَلَا تَلْزَمُ مُسَافِرًا بِالِاتِّفَاقِ ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আযান শুনবে তাঁর উপর জুমুআর নামায জরুরী। তবে সর্বসম্মতভাবে মুসাফিরের জন্য জুমুআর নামায জরুরী নয়। (মিরকাত, অধ্যায় : জুমুআ) আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৫৩)

জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه البخارى فى بَابِ وَقْتِ الجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ–١/١٢٣)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. সূর্য ঢলে গেলে জুমুআর নামায আদায় করতেন। (বুখারী : ৮৫৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৫৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ (رواه البخارى فى بَابِ إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ–١/١٢٤)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. প্রচন্ড শীতের সময় জুমুআর নামায শুরু ওয়াক্তে আদায় করতেন। আর প্রচন্ড গরমের সময় ঠাণ্ডা করে আদায় করতেন। (বুখারী : ৮৬০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৬০)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. শীতের দিনে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই জুমুআর নামায আদায় করতেন। আর গরমের দিনে আরো একটু পরে গিয়ে সূর্যের তাপ কমে গেলে আদায় করতেন। অর্থাৎ যোহরের ও জুমুআর ওয়াক্ত একই ওয়াক্ত।

এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৪৭)

জুমুআর দিন গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা ছুন্নাত

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (رواه البخارى فى بَابٍ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ-١/١٢٤)

অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে। অতঃপর তেল বা সুগন্ধি ব্যবহার করে মাসজিদে যায়। আর দু'জনের মধ্যে ফাঁকা সৃষ্টি করে না এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যে পরিমাণ নামায পড়ার তৌফিক দেন সে তা পড়ে। অতঃপর ইমাম বের হয়ে এলে চুপ থাকে। তার এ জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী : ৮৬৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীস-টি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭১০৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে জুমুআর দিনে গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা ছুন্নাত ও ফযীলতপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/২৬৯) জুমুআর দিন গোসল করা জরুরী বলে যদিও কোন কোন ইমাম মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের শুরু যুগে সাহাবায়ে কিরামের আর্থিক দৈন্যতা ছিল চরমে। নিজেরা ক্ষেতে খামারে কাজ করতেন, মোটা কাপড় পরিধান করতেন এবং ঘর্মাক্ত শরীরে জুমার নামাযে আসতেন। ঘামের দুর্গন্ধে মানুষের কষ্ট হতো। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের অনটন দূর করে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। তাঁরা উন্নতমানের পাতলা কাপড় পরিধান করেন। কাজের মানুষে তাঁদের কাজ করে। তখন গোসল করার ঐ প্রয়োজন থাকেনি যা শুরু যুগে ছিলো। (তহাবী শরীফ-৭০৭) এ হাদীসের আলোকে বলা যেতে পারে যে, রসূল স.-এর বাণী الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ জুমুআর দিনের গোসল করা সকল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ওয়াজিব' (বুখারী-৮১৬) এটা ইসলামের

শুরু দিকের কথা। এর আরো একটি প্রমাণ মেলে، مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَة ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ যে ব্যক্তি সুন্দর রূপে অযু করে জুমুআর নামাযে যায় এবং চুপ করে মনোযে-াগ সহকারে (ইমামের খুৎবা) শোনে তার এই জুমুআ থেকে পরের জুমুআ এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম-১৮৬১) এ হাদীসে জুমুআর ফযীলত পাওয়ার জন্য তিনটি আমলের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে গোসলের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকেও বুঝা যায় যে, জুমুআর জন্য গোসল করা জরুরী নয়। তবে বুখারী : ৮৬৪ নং হাদীস থেকে গোসলের ফযীলত প্রমাণিত হয়েছে। অতএব এটা ছুন্নাত।

জুমুআর নামাযে আগে আগে উপস্থিত হওয়ার ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ (رواه البخارى فى بَاب الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ–١/١٢٧)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, জুমুআর দিন ফিরিশতাগণ মাসজিদের দরজায় অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। সর্বপ্রথম আগম-নকারী ব্যক্তি একটি উট কুরবানীকারী ব্যক্তির মতো, পরবর্তীগণ একটি গাভী কুরবানীকারীর মতো, এর পরের আগমনকারীরা ভেড়া কুরবানী কারীর মতো, তার পরবর্তীগণ মুরগী দানকারীর মতো এবং শেষে আগমন-কারীগণ ডিম দানকারীর মতো। অতঃপর যখন ইমাম সাহেব বের হন তখন ফিরিশতাগণ তাঁদের খাতা বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগের সাথে খুৎবা শুনতে থাকেন। (বুখারী : ৮৮২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭১০২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় জুমুআর দিন মসজিদে আগে

আগে উপস্থিত হওয়া উত্তম। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (তাহতাবী : ২/২৬৮)

জুমুআর নামাযের পূর্বে কমপক্ষে চার রাকাত নামায পড়া

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا.

অনুবাদ : আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে জুমুআর আগে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন। আর হযরত আলী রা. এসে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন জুমুআর পরে প্রথমে দু'রাকাত অতঃপর চার রাকাত পড়ার। (আব্দুর রাযযাক : ৫৫২৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী : ৯৪৩৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাওকুফ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, رُوَاته ثِقَات "এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (আদদিরায়াহ : জুমুআ অধ্যায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. জুমুআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর সাহাবায়ে কিরাম যে আমলের অনুসরণ করে থাকেন তা অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে করে থাকেন। এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের আমল বা মন্তব্যকে মারফু' তথা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বা মন্তব্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، ثُمَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি জুমুআর পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। আর এ চার রাকাতের মাঝে কোন সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর জুমুআ শেষে দু'রাকাত এবং তারপরে চার রাকাত পড়তেন। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৩, হাদীস নং-১৯৬৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাওকুফ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ

হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার: পৃষ্ঠা-৩৭৪, খণ্ড-৫)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. জুমুআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর সাহাবায়ে কিরাম যে আমলের অনুসরণ করে থাকেন তা অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে করে থাকেন। এ কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের আমল বা মন্তব্যকে মারফু' তথা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বা মন্তব্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) জুমুআর পূর্বে চার রাকাত আদায় করতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৪০৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। বুখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. ইবনে আবিদ দুনিয়ার লিখিত "কিতাবুল ঈদাইন"-এর বরাতে এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৩০)

ব্যাখ্যা : এ আছারে 'তাঁরা' শব্দটি দ্বারা সাহাবায়ে কিরামই উদ্দেশ্য। কারণ ইবরাহীম নাখাঈ বয়সের দিক দিয়ে মধ্যবর্তী স্তরের তাবিঈ ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপক উপস্থিতি ছিলো। সে যুগে কোন আমলের দলীল দিতে গেলে সাহাবায়ে কিরামের আমলকেই পেশ করা হতো। সুতরাং হাদীসটির অর্থ হলো : সাহাবায়ে কিরাম জুমুআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের আমল বা মন্তব্য মারফু' তথা রসূলুল্লাহ স.-এর আমল হিসেবে পরিগণিত।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ قَالَ: نا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

অনুবাদ : হযরত আলী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. জুমুআর পূর্বে চার রাকাত এবং জুমুআর পরে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর শেষ রাকাতে গিয়ে সালাম ফিরাতেন। (আল্ মু'জামুল আওসাত লিত্‌তবারানী: ১৬১৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. এটাকে উত্তম

সনদ বলেছেন। (তরহুত তাছরীব-৩/৪২) আল্লামা ইরাকীর বরাত দিয়ে মুল্লা আলী কারী রহ.ও এ হাদীসটির সনদকে উত্তম বলেছেন। (মিরকাত-১১৬৬ নং হাদীসের আলোচনা) ফতওয়া দারুল ইফতা আল মিসরিয়ার নবম খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীসটিকে হাসান বলা হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. জুমুআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়তেন। এ হাদীসটি যদিও সনদের দিক থেকে ততটা মজবুত নয়; কিন্তু সহীহ সনদে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. থেকে তাঁরা এটা দেখেছেন বা শুনেছেন।

أخبرنا يزيد بن هارون عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَافِيَةَ سَمِعَهَا وَهِيَ تَقُولُ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ صَلَّتْ أَرْبَعًا قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ وَصَلَّتِ الْجُمُعَةَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ.

অনুবাদ : ছাফিয়াহ রহ. বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত ছফিয়্যা রা.কে দেখেছি ইমাম মাসজিদে আসার পূর্বে তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন; অতঃপর ইমামের সাথে জুমুআর নামায দু'রাকাত আদায় করতেন। (তবাকাতে ইবনে সা'দ : রাবী নম্বর- ৪৭০১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ আলবানী বলেন, **روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية** ইবনে সাআদ তাঁর তবাকাত কিতাবে ছাফিয়াহ থেকে মুসলিমের শর্তে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছে। (আল আজবিবাতুন নাফেআহ, পৃষ্ঠা-৬১)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত মারফূ', মাউকূফ ও মাকতু' হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়া ছুন্নাত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১২) রসূলুল্লাহ স., সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণসহ সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম এর উপর আমল করতেন। এমনকি জুমুআর দিন খুৎবার পূর্বে আরো অধিক রাকাত নামায পড়ার প্রতি রসূলুল্লাহ স. উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম আমলও করেছেন যেমনটি বর্ণিত হয়েছে হযরত সালমান ফারসী রা. সূত্রে বুখারী: ৮৬৪ এবং হযরত ইবনে ওমর রা.-এর আমল থেকে মুসনাদে আহমদ-৫৮০৭ ও ইবনে আবী শাইবা: ৫৪০৩ নম্বর হাদীসে।

অতএব, যারা কবলাল জুমুআ শুধু দু'রাকাত বলে থাকেন তাদের

উচিত হবে পূর্ববর্ণিত হাদীসগুলোর আলোকে আরো চার রাকাত বাড়িয়ে বলা।

জুমুআর ওয়াক্তের শুরুতে ও খুৎবার পূর্বে আযান দেয়া

عَن السَّائِبِ بْن يَزِيدَ، يقُولُ إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما فلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رضى الله عنه وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. (رواه البخارى فى بَابِ التَّأْذِينِ عِنْدَ الخُطْبَةِ-١/١٢٥)

অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স., আবু বকর ও ওমর রা.-এর যামানায় জুমুআর দিনের প্রথম আযান ইমাম মিম্বারের উপর বসলে দেয়া হতো। অতঃপর উসমান রা.-এর সময় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি জুমুআর দিন তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। তখন যাওরা নামক স্থানে এ আযান দেয়া হতো। অতঃপর এটাই বহাল থাকে। (বুখারীঃ ৮৭০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৬৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উসমান রা.-এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত জুমুআর দিন খতীবের সামনে একবার আযান দেয়া হতো; যেটাকে আমরা বর্তমানে ছানী আযান বলে থাকি। অতঃপর হযরত উসমান রা.-এর যুগে এসে যখন মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলো তখন নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে মানুষকে ব্যাপকভাবে জানানোর জন্য তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ হযরত উসমান রা. এ আযানের প্রচলন ঘটালেন। এখন আমাদের জন্য উভয় আযানের অনুকরণ করা ছুন্নাত হবে। কেননা সহীহ হাদীসের বর্ণনায় রসূল স. আমাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদার ছুন্নাতের অনুকরণের নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাউদ-৪৫৫২, মুসনাদে আহমদ-১৭১৪৪ তিরমিযী-২৬৭৬ এবং ইবনে মাযা-৪২) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৮৪, ২/১৬১)

উল্লেখ্য, সে যুগে ইকামাতকে আযান বলে গণ্য করা হতো। তাই

হাদীসে এটাকে তৃতীয় আযান বলা হয়েছে। অন্যথায় আযান হতো দুটি আর ইকামাত একটি।

খুৎবা দাঁড়িয়ে দেয়া এবং দুই খুৎবার মাঝে বৈঠক করা ছুন্নাত

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِىْ بَابِ يخطب الخطبتين قائما ويجلس بينهما–١/٢٨٣)

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, রসূল স.-এর খুৎবা হতো দু'টি। দুই খুৎবার মাঝে তিনি বসতেন। খুৎবায় কুরআন পাঠ করতেন এবং মানুষদেরকে উপদেশ দিতেন। (মুসলিম-১৮৬৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৬৭)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ (رواه البخارى فى بَابِ الْخُطْبَةِ قَائِمًا–١/١٢٥)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন; যেমন তোমরা এখন করে থাকো। (বুখারী : ৮৭৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৬৮)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দু'টিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স. জুমুআর পূর্বে দাঁড়িয়ে দুটি খুৎবা দিতেন এবং দুই খুৎবার মাঝে বসতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর খুৎবা দাঁড়িয়ে দেয়া এবং দুই খুৎবার মাঝে বৈঠক করা ছুন্নাত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (তাতারখানিয়া : ২/৫৬৩, বাদায়েউস সানায়ে' : ২/২৭৬)

খুৎবার সময় সকলকে দেখা এবং নিজেকে সকলের সামনে প্রকাশ করা খুৎবার বিষয়বস্তু মানুষকে বুঝানোর জন্য সহায়ক হয়। এ কারণে

জুমুআ এবং ঈদ ছাড়াও অন্যান্য খুৎবা দাঁড়িয়ে দেয়া ছুন্নাত। বিবাহের খুৎবা, ইস্তিসকার খুৎবা ইত্যাদি সবই এ নিয়মের আওতাধীন। আর এটাই খুৎবার ছুন্নাত তরীকা যা উম্মত প্রজন্ম পরম্পরায় আজও আকড়ে আছে।

খুৎবা আরবী ভাষায় দেয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে অগ্রসর হও। (ছূরা জুমুআ : ৯)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ আয়াতে উল্লিখিত **ذكرالله** শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, **خطبة الإمام والصلاة** "আল্লাহর জিকির অর্থাৎ ইমামের খুৎবা ও নামায"। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর খুৎবা মূলত আল্লাহর জিকির, শুধু বক্তব্য বা ভাষণ নয়। আর আল্লাহর জিকিরের মধ্যে ভাষান্তর গ্রহণযোগ্য নয়। ছূরা হিজর-এর ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআনকে জিকির বলেছেন। কেউ ভাষান্তর করে এর অনুবাদ পড়লে এটাকে কুরআন বলা হবে না এবং নামাযে কুরআনের অনুবাদ পড়লে তার নামাযও হবে না। খুৎবার বিষয়টিও অনুরূপ। এ কারণে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র অনারব অঞ্চলে সম্প্রসারিত হলেও আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা দেয়ার কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেক অনারব সাহাবাও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কখনো মাতৃভাষায় খুৎবা দিয়েছেন এমন প্রমাণও মেলে না। এটা খোলাফায়ে রাশেদাসহ সমগ্র উম্মতে মুসলিমার আমলী ইজমা। অতএব, এর অনুকরণ করা একান্ত জরুরী।

'খুৎবা একটি ভাষণ, তাই এটা মাতৃভাষায় হওয়া উচিত' বলে যারা মন্তব্য করেন, তাদের উচিত রোম-পারস্যসহ অনারব ইসলামী বিশ্বে বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরামের কেউ উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দিয়েছেন মর্মে কোন প্রমাণ পেশ করা। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বরাবরই অপারগ।

তাদের পেশকৃত যুক্তির সবচেয়ে বড় খণ্ডন এই যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন মানব জাতির হিদায়াতের জন্য। (বাকারা : ১৮৫)

আর হিদায়াত গ্রহণের জন্য কুরআনের মূল বক্তব্য বুঝা একান্ত জরুরী যা অনুবাদ বুঝার মাধ্যমেই বেশি সহজ। এসত্ত্বেও কুরআনের অনুবাদ কুরআন হিসেবে স্বীকৃত নয়। হাদীসে নামাযের মধ্যে পড়ার জন্য যেসব দুআ ও তাসবীহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অনুবাদ করতে পারলে বুঝতে পারার কারণে তার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু সেগুলোর অনুবাদ পড়ার কথা আজ পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করেনি। সুতরাং খুৎবার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস ও উম্মতের আমলী ইজমা ছেড়ে দিয়ে মাতৃভাষায় তার অনুবাদের ব্যাপারে এ সব খোড়া যুক্তি পেশ করা কোনভাবেই গ্রহণযে-াগ্য নয়। প্রজন্ম পরম্পরায় উম্মতের মধ্যে যে আমলের প্রচলন রয়েছে এর বিপক্ষে যদি কুরআন-হাদীসের কোন স্পষ্ট বাণী না থাকে তাহলে এটা ইসলামের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কারণ এ উম্মত কোন ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ না হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। সাথে সাথে মুসলিম উম্মার মাঝে চলে আসা প্রত্যেকটি আমলকে সনদের বিবেচনায় গ্রহণ করতে চাইলে খুৎবার ভাষার আলোচনা ছেড়ে জুমুআবারের আলোচ-না আগে করা দরকার। সারা বিশ্বের মানুষ আজ জুমুআর নামাযের জন্য মাসজিদের দিকে ছুটছে। আজকের দিনটিই যে শুক্রবার এ ব্যাপারে কুরঅ-ানের আয়াত বা সহীহ সনদে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ স.-এর কোন হাদীস খুঁজে পাওয়া যাবে কি? জঈফ সনদই খোঁজার চেষ্টা করুন। যদিও অনেকের নিকট তা ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। সুতরাং প্রজন্ম পরম্পরায় উম্মতের মাঝে চলে আসা আমলই এর বড় প্রমাণ যে, খুৎবার ভাষা আরবী ব্যতীত ভিন্ন কিছু হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (তাতারখানিয়া : ২/৫৬২) অবশ্য মুসলিম উম্মাহকে প্রয়োজনীয় নসীহতের জন্য খুৎবার পূর্বে মাতৃ ভাষায় কিছু কথা বলা যেতে পারে। সেটাও মিম্বারে না হয়ে ভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে বা ভিন্ন চেয়ারে বসে দেয়া উত্তম হবে যাতে এটা খুৎবার সাথে সাদৃশ্য না হয়ে যায়।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অনেক আলেমের মুখে শুনেছি যে, ইল্‌মের দৈন্যদশা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। তাই আরবী ভাষায় খুৎবা দেয়ার মতো খতীবেরও অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ব্যাপকহারে। তাই নিজের মুর্খতা আড়াল করতেই নাকি এ মাসআলার উদ্ভব ঘটেছে!।

খুৎবার সময় চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনা

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাকো যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। (ছূরা আ'রাফ : ২০৪)

শিক্ষণীয় : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বলেন, এ আয়াত নামায ও খুৎবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে কাসীর: ২/২৮১, কুরতুবী : ৯/৪৩১)। অতএব, খুৎবা শোনা জরুরী এবং খুৎবা চলাকা-লীন যে কোন কাজ যা খুৎবা শোনায় বাধা সৃষ্টি করে তা বর্জন করা আবশ্যক।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا.

অনুবাদ : হযরত নুবাইশা হুজালী রা. রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখন কোন মুসলমান জুমুআর দিন গোসল করে অতঃপর মাসজিদে আসে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য বের না হয়ে থাকলে যতটুকু সম্ভব নামায পড়ে। আর ইমাম সাহেব বের হয়ে গিয়ে থাকলে বসে পড়ে এবং ইমাম সাহেব খুৎবা ও জুমুআ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনে এবং চুপ থাকে তাহলে যদি এ জুমুআয় তার সকল গুনাহ মাফ নাও হয় তবে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমদ : ২০৭২১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (মুসনাদে আহমদ-২০৭২১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুৎবা শুনা জরুরী এবং খুৎবা চলাকালীন যে কোন কাজ যা খুৎবা শোনায় ব্যাঘাত ঘটায় তা বর্জন করা আবশ্যক। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী: ২/১৫৯) মনোযে-

াগ সহকারে ইমামের খুৎবা শুনা এবং চুপ থাকার বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তম্মধ্যে বুখারী-৮৮৭, আবূ দাউদ-৩৪৫, তিরমিযী-৪৯৬ এবং নাসাঈ-১৪০৬ নম্বর হাদীস উল্লেখযোগ্য।

জুমুআর খুৎবা চলাকালীন নামায পড়ার বিধান

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا.

অনুবাদ : হযরত নুবাইশা হুজালী রা. রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখন কোন মুসলমান জুমুআর দিন গোসল করে অতঃপর মাসজিদে আসে এবং কাউকে কষ্ট না দেয়। ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য বের না হয়ে থাকলে যতটুকু সম্ভব নামায পড়ে। আর ইমাম সাহেব বের হয়ে গিয়ে থাকলে বসে পড়ে। ইমাম সাহেব তাঁর খুৎবা এবং জুমুআর নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনে এবং চুপ থাকে। তাহলে (তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়) একান্ত এ জুমুআয় তার সকল গুনাহ মাফ না হলেও পূর্ববর্তী জুমুআ পর্যন্ত কৃত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমদ : ২০৭২১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (মুসনাদে আহমদ-২০৭২১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব খুৎবা দেয়ার জন্য মাসজিদে আগমনের পর কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে নামায পড়বে না; বরং সরাসরি বসে পড়বে এবং মনোযোগের সাথে ইমামের খুৎবা শুনবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ

آذَيْتَ، وَآنَيْتَ.

অনুবাদ : হযরত আবু যাহরিয়া রহ. বলেন, জুমুআর দিনে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র রা.-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, রসূল স.-এর খুৎবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মানুষের গর্দান ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো। তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি বসে পড়ো। তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো এবং বিলম্ব করে ফেলেছো। (মুসনাদে আহমদ: ১৭৬৯৭, আবূ দাউদ: ১১১৮, নাসাঈ : ১৪০২, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫১, হাদীস নং-২১৫৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح على شرط مسلم "হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ : ১৭৬৯৭ নং হাদীসের আলোচনায়) এ হাদীসের ব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম যাহাবী রহ. (মুসতাদরাকে হাকেম : ১০৬১)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইমাম ত্বহাবী রহ. এ হাদীসের শেষাংশে আবু যাহরিয়ার একটি মন্তব্য বর্ণনা করেন যে, قَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِالْجُلُوسِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالصَّلَاةِ , "আবু যাহরিয়া রহ. বলেন, ইমাম বের হয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমরা কথা-বার্তা বলতাম। অতঃপর মুআবিয়া ইবনে সালেহকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কি দেখো না? রসূলুল্লাহ স. ঐ ব্যক্তিকে বসতে বললেন, কিন্তু নামায পড়তে বললেন, না"। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫১, হাদীস নং-২১৫৬)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব খুৎবা দেয়ার জন্য মাসজিদে আগমনের পরে কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে মানুষের গর্দান ডিঙ্গিয়ে সামনে যাবে না এবং নামাযও পড়বে না। বরং সরাসরি বসে পড়বে এবং মনোযোগের সাথে ইমামের খুৎবা শুনবে। এ বিষয়ে সহীহ সনদে রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ আরো বর্ণিত আছে বুখারী: ৮৬৪ নং হাদীসে।

حدثنا أبو شُعَيب، ثنا يحيى بن عبد الله البَابْلُتِّيُّ، ثنا أيُّوبَ بن نَهِيك، قال: سمعتُ عامرً الشَّعبيَّ يقول: سمعتُ ابنَ عمر يقول: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ والإِمَامُ عَلى المِنْبَرِ، فَلاَ صَلاَةَ

وَلاَ كَلاَمَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ» .

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি যে, ইমাম মেম্বারে থাকাবস্থায় যদি তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে তাহলে ইমাম খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে কোন নামায পড়বে না এবং কথাও বলবে না। (আল মু'জামুল কাবীর লিত্‌তবারানী-১৩৭০৮, অধ্যায় : মুসনাদে ইবনে ওমর)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আইয়ূব ইবনে নাহীক ব্যতীত সকলেই নির্ভরযোগ্য। আর ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ-এর নাম আল্লামা ইবনে হিব্বান রহ. নির্ভরযোগ্য রাবীদের তালিকা সম্বলিত "আছ ছিকাত" কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (আছ ছিকাত-১২২৫১) তবে তাঁর ব্যাপারে অধিকাংশ ইমামদের মন্তব্য এই যে, কোন বিষয় সে একাকী বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ হাদীসের বিষয়বস্তু অনেক হাদীস দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় গ্রহণযোগ্য। আইয়ূব ইবনে নাহীকের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, يخطىء وَكَانَ مولى سعد بن أبي وَقاص يعْتَبر بحَدِيثه من غير رِوَايَة أبي قَتَادَة الْحَرَّانِي عَنهُ "তিনি ভুল করেন। তিনি ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের আযাদকৃত গোলাম। আবু কতাদা হাররানী ব্যতীত তাঁর থেকে অন্যদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য"। (আছ ছিকাত : ৬৭২৮) আর এ বর্ণনাটি আবু কতাদা হাররানীর নয়। স্বতন্ত্র কোন বিষয়ে এ ধরনের রাবীর একক বর্ণনার উপর ভরসা করা যায় না। তবে অন্যান্য বর্ণনা এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা খুৎবার সময় নামায না পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় এটা হাসান লিগাইরিহীর মান রাখে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইমামের খুৎবা চলাকালীন কেউ মাসজিদে আসলে সে নামায পড়বে না।

খুৎবা চলাকালীন কেউ মাসজিদে এলে সে নামায পড়বে না– এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের অভিমত

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوا. فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ (رواه ابو داود فى بَابِ الْإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ-١/١٥٦)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. জুমুআর দিন খুৎবার জন্য মেম্বারের উপর উঠে বললেন, তোমরা বসে পড়। হযরত ইবনে মাসউদ রা. এ কথা শুনে দরজার উপরই বসে পড়লেন। (তিনি তখন ঐ পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন) রসূল স. বললেন, হে আব্দুল্লাহ! এদিকে এসো। (আবূ দাউদ : ১০৯১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ: ১০৯১ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, ইবনে মাসউদ রা. মাত্র মাসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখনই রসূলুল্লাহ স.-এর ঘোষণা শুনে বসে পড়লেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে বললেন, কিন্তু তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ার কথা বললেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম খুৎবা দেয়ার জন্য মেম্বারে ওঠার পরে আগমনকারী ব্যক্তি আর নামাযে দাঁড়াবে না। বরং ইমামের খুৎবা শুনতে আরম্ভ করবে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুবাদ : হযরত আলী রা., হযরত মুজাহিদ ও হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা জুমুআর দিনে ইমামের খুৎবার সময় নামায পড়া অপছন্দ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৫২১০)

হাদীসটির স্তর : হাসান ও সহীহ এবং মাওকুফ ও মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। শুধু হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনাকারী হারিসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মিশ্র মন্তব্য রয়েছে। অধিকাংশ ইমাম তাঁকে জঈফ বললেও কোন কোন ইমাম তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আর হারেস সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান বলেছেন। (তিরমিযী-২৭৩৬) সুতরাং হযরত আলী রা.-এর বর্ণনাটি হাসান-মাওকুফ। আর মুজাহিদ ও আতা রহ.-এর বর্ণনা সহীহ-মাকতু'।

শিক্ষণীয় : হযরত আলী রা., মুজাহিদ এবং আতা রহ.-এর অভিমত

এই যে, তাঁরা ইমামের খুৎবা চলাকালীন নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের আমলের ভিত্তি অবশ্যই রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ স. খুৎবার সময় নামায পড়াকে অপছন্দ করতেন।

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تَرَكْنَا الصَّلَاةَ.

অনুবাদ : হযরত সা'লাবা ইবনে আবী মালেক রা. বলেন, আমি হযরত ওমর ও উসমান রা.কে পেয়েছি। জুমুআর দিন যখন ইমাম বের হতেন তখন আমরা নামায পড়া বন্ধ করে দিতাম। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৩৩৯, মুয়াত্তা মালেক: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৮, অধ্যায়: জুমুআর দিন ইমামের খুৎবার সময় চুপ থাকা)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাওকুফ। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আল-মাতালিবুল আলিয়া- ৭১২ নং হাদীসের তাহকীকে)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো যে, সাহাবায়ে কিরামের আমল ছিলো ইমামের খুৎবা চলাকালীন নামায না পড়া। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন, **وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِنْصَاتِ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ يُحْتَجُّ بِهَا كَمَا احْتَجَّ بن شِهَابٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ خَبَرٌ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ لَا عَنْ رَأْيٍ اجْتَهَدَهُ** এটা প্রমাণ করে যে, খুৎবার সময় চুপ থাকার নির্দেশটি সাহাবার নিজের মত না। বরং এটা এমন ছুন্নাত যা দ্বারা দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। যেভাবে ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী দলীল দিয়েছেন। যেহেতু তাঁর কথা "মাসজিদের দিকে ইমামের বের হয়ে আসা নামাযকে বন্ধ করে দেয়। আর তাঁর কথা অন্যদের কথাকে বন্ধ করে দেয়" এটা একটি খবর যা তিনি জেনেছেন। এটা তাঁর গবেষণালব্ধ কোন মত নয়। (আল-ইস্তিযকার-২/২৪) সহীহ সনদে অনুরূপ হাদীস হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকেও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, **كُنَّا نُصَلِّي فِي زَمَنِ عُمَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَطَعْنَا الصَّلَاةَ** "আমরা হযরত ওমর রা.-এর যুগে জুমুআ-র দিনে নামায পড়তে থাকতাম। যখন তিনি বের হতেন এবং মেম্বারে

বসতেন আমরা নামায পড়া বন্ধ করে দিতাম”। (নাসবুর রায়াহ ও আদ্‌দিরায়াহ : জুমুআ অধ্যায়) এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম খুৎবার জন্য মেম্বারে বসলে আর কেউ নামায পড়বে না। হাসান সনদে অনুরূপ হাদীস হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উভয়ে ইমাম বের হওয়ার পরে নামায পড়া এবং কথা বলা মাকরূহ মনে করতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৩৪০)

খুৎবা চলাকালীন কেউ মাসজিদে এলে সে নামায পড়বে না– এ ব্যাপারে বিশিষ্ট তাবিঈগণের অভিমত

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، كَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. বলেন, ইমামের মাসজিদে আগমন অন্যদের নামায পড়াকে নিষিদ্ধ করে দেয়। আর তাঁর কথা বলা অন্যদের কথা বলাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। (আব্দুর রাযযাক : ৫৩৫১, ইবনে আবী শাইবা : ৫৩৪২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. ইমামের খুৎবা চলাকালীন মাসজিদে উপস্থিত হলে নামায পড়া মাকরূহ মনে করতেন। সহীহ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী রহ. থেকে-(মুয়াত্তা মালেক, অধ্যায়: জুমুআর দিন চুপ থাকা), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন রহ. থেকে-(ইবনে আবী শাইবা : ৫২১১), হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহ. থেকে-(ইবনে আবী শাইবা : ৫২১৩) এবং হযরত শা’বী রহ. থেকে-(ইবনে আবী শাইবা; ৫২১৯) নং হাদীসে। এ সকল তাবিঈগণ ইমামের খুৎবা চলাকালীন মাসজিদে উপস্থিত হলে নামায পড়তেন না বা পড়ার অনুমতি দিতেন না। বরং তাঁরা এটাকে মাকরূহ মনে করতেন।

আল্লামা ইবনে কুদামা মাকদেসী বলেন,

وَقَالَ شُرَيْحٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ،

وَأَبُو حَنِيفَةَ، يَجْلِسُ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّذِي جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ: اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنَيْتَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّ الرُّكُوعَ يَشْغَلُهُ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ، فَكُرِهَ، [مَسْأَلَةٌ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ]

অনুবাদ : "কাযী শুরাইহ, ইবনে ছীরীন, ইবরাহীম নাখাঈ, কতাদা, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সা'দ এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, (খুৎবা চলাকালীন কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে) সে বসে পড়বে, তার জন্য নামায পড়া মাকরূহ। কেননা খুৎবার সময় মানুষের গর্দান ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ বলেছিলেন যে, তুমি বসে যাও। তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো এবং দেরি করে ফেলেছো। হাদীসটি ইবনে মাযা রহ. বর্ণনা করেন। উপরন্তু এ সময় নামায পড়া মনোযোগের সাথে খুৎবা শুনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অতএব এটা মাকরূহ হবে। (আল্ মুগনী : 'ইমাম খুৎবারত অবস্থায় কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে' মাসআলায়)

শিক্ষণীয় : পূর্ববর্ণিত আয়াত, হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈ-গণের আছার এবং পরবর্তী ইমামগণের মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম খুৎবারত অবস্থায় কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে নামায পড়বে না, বরং চুপ করে বসে পড়বে এবং মনোযোগের সাথে ইমামের খুৎবা শুনবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৫৮)

কুরআনে কারীমের আয়াত, সহীহ সনদে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.এর হাদীস, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের আমল ও মতামতের দ্বারা এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, জুমুআর দিন খুৎবা চলাকালীন নামায পড়া যাবে না। আমরা এ বিধান বিশ্বাস করি এবং এ অনুযায়ী আমল করে থাকি।

এর বিপরীতে অনেক ইমাম বলে থাকেন যে, ইমামের খুৎবা চলাকা-লীন কেউ মাসজিদে উপস্থিত হলে সে দু'রাকাত নামায পড়বে। তাঁরা দলীল হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

(رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ– ١/١٢٧)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. মুসল্লীদের সামনে জুমুআর খুৎবা দিচ্ছিলেন এমন সময় (সুলাইক নামক) এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, হে অমুক! তুমি নামায পড়েছো? তিনি বললেন, না, পড়িনি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, ওঠো, দু'রাকাত নামায পড়ো। (বুখারী : ৮৮৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৪১২২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ فصل فى الخطبة والصلاة قصدا-١/٢٨٤)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. খুৎবা দিচ্ছিলেন। এ সময় বললেন, কেউ যদি এমন সময় জুমুআর নামাযে আসে যখন ইমাম খুৎবার জন্য বের হয়ে আসছেন তবে সে যেন দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়। (মুসলিম : ১৮৯৫)

পর্যালোচনা : উপরিউক্ত হাদীস দুটি সহীহ সনদে বর্ণিত। এ সহীহ হাদীসের কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে, খুৎবার সময় কেউ মাসজিদে এলে তাকে দু'রাকাত নামায পড়তে হবে এটা রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ। তবে এটা এখনো আমলযোগ্য বহাল ছুন্নাত কিনা সে বিষয়ে উম্মতের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নবর্ণিত কারণে আমরা এ নির্দেশকে রহিত মনে করি।

প্রথম কারণ : এ হাদীসগুলো মৌলিকভাবে ছূরা আ'রাফের ২০৪ নম্বর আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের পরিপন্থী। কেননা, বিশিষ্ট সাহাবা ও তাবিঈদের ব্যাপক মত বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াতে নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ এবং ইমামের খুৎবার সময় শ্রোতাদেরকে চুপ থেকে মনোযোগের সাথে শ্রবণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. প্রায় ৩৮টি হাদীস বর্ণনা করে বলেন,

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: أُمِرُوا بِاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَأْتَمُّ بِهِ يَسْمَعُهُ، وَفِي الْخُطْبَةِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا وَإِجْمَاعُ الْجَمِيعِ عَلَى

أَنَّ مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ الْإِمَامِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، الِاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ لَهَا.

অনুবাদ : আবু জাফর তাবারী বলেন, এ ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক কথা তাদেরটি যারা বলেন যে, ইমাম যখন নামাযে কুরআন পাঠ করবেন তখন মুক্তাদীগণকে মনোযোগের সাথে শুনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইমামের পেছনে যারা ইক্তিদা করেছে তারা ইমামের কুরআন পাঠ শুনবে। এ আয়াতটি খুৎবার ব্যাপারেও অবতীর্ণ হয়েছে। এ মতটিকে আমি এ কারণে সর্বাধিক সঠিক বলেছি, যেহেতু রসূলুল্লাহ স. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে : واذا قرأ الإمام فانصتوا "ইমাম যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাক"। আর সবার ঐকমত্য বিদ্যমান রয়েছে যে, যাদের প্রতি জুমুআর নামায জরুরী তাদের মধ্যে যারা খুৎবা শুনবে তাদের দায়িত্ব নীরব থাকা এবং মনোযোগের সাথে শুনা। (তাফসীরে তাবারী: ছূরা আ'রাফ, ২০৪ নম্বর আয়াতের তাফসীরে)

পর্যালোচনা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম তাবারী রহ. উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্য বর্ণনা করলেন যে, ছূরা আ'রাফের ২০৪ নম্বর আয়াত খুৎবার ব্যাপারেও নাযিল হয়েছে যেমন নাযিল হয়েছে নামাযে ইমামের কুরআন পাঠের ব্যাপারে। সুতরাং মনোযোগের সাথে খুৎবা শুনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন যে কোন কাজে অংশ নেয়ার অর্থই হলো উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছূরা আ'রাফের ২০৪ নম্বর আয়াতের বিধান লংঘন করা। আর খুৎবার সময় নামায পড়া উক্ত কাজের অন্যতম। সুতরাং উক্ত আয়াতের কারণে আমাদের বলতেই হচ্ছে যে, এ হাদীসগুলো হয়তো রহিত অথবা এর ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা আছে যা এ হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

দ্বিতীয় কারণ : রসূলুল্লাহ স.-এর ঘনিষ্ঠ ও বর্ষিয়ান সাহাবাগণ খুৎবার সময় নামায পড়ার আমল ব্যাপকহারে বর্জন করেছেন– যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁদের নিকট অবশ্যই কোন প্রমাণ বিদ্যমান ছিলো যার ভিত্তিতে তাঁরা এ আমল বর্জন করেছেন। তাঁদের নিকট এমন কোন প্রমাণ না থাকলে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণ এত ব্যাপকহারে রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ অমান্য করবেন এটা কল্পনাও করা যায় না।

তৃতীয় কারণ : খুৎবা শুনা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং ওয়াজিব।

আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশের প্রতি খেয়াল না করে রসূলুল্লাহ স. ভিন্ন কোন হুকুম জারী করবেন তা কোনক্রমেই হতে পারে না। তাই রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক খুৎবার সময় নামায পড়ার নির্দেশটি হতে পারে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বা বিশেষ কোন ক্ষেত্রের জন্য জারী করা হয়েছিল যা পরে আর কার্যকর থাকেনি। এর প্রমাণ হিসেবে ত্বহাবী শরীফ থেকে একটি সহীহ হাদীস পেশ করছি।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ»، فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ الْآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا»، فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: «خُذْ ثَوْبَكَ». (رواه النسائى فى بابِ حَثِّ الْإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَتِهِ–١/١٥٨)

অনুবাদ : হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. খুৎবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করলো। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি নামায পড়েছো? সে বললো, না। তিনি তাকে দু'রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং লোকদেরকে ছদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। লোকেরা কাপড় ফেলতে আরম্ভ করলো। রসূল স. সেখান থেকে তাকে দুটি কাপড় দিলেন। পরবর্তী জুমুআয় লোকটি আবারও রসূল স.-এর খুৎবারত অবস্থায় উপস্থিত হলো। তিনি লোকদেরকে ছদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন ঐ লোকটিও তার দুটি কাপড় থেকে একটি দান করে দিলেন। অতঃপর রসূল স. ইরশাদ করলেন, লোকটি গত জুমুআয় জীর্ণশীণ অবস্থায় এসেছিলো। আমি মানুষদেরকে

ছদকা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। লোকেরা কাপড় দান করেছিলো। সেখান থেকে তাকে দুটি কাপড় দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম। লোকটি এখন আবার এসেছে। আমি মানুষকে ছদকার নির্দেশ দিয়েছি। ঐ লোকটিও তার একটি কাপড় দান করে দিয়েছে। অতঃপর রসূল স. তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি তোমার কাপড় নিয়ে নাও। (নাসাঈ-১৪১১, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫০ ও ২৫১, হাদীস নং-২১৫৫, মুসনাদে আহমদ-১১১৯৭, আবূ দাউদ-১৬৭৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ **ثقة** "নির্ভরযোগ্য"। (তাকরীব-৬৮০৫) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার : পৃষ্ঠা-২৫, খণ্ড-৬, ওজারাতুল আওকাফ, কাতার হতে প্রকাশিত) আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده قوي হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। (মুসনাদে আহমদ-১১১৯৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

পর্যালোচনা : এ হাদীসের মধ্যে দুটি ব্যতিক্রমী বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। এক. খুৎবার মধ্যে আগত ব্যক্তির সাথে কথা বলা। তাঁকে কাছে ডাকতে থাকা, নামায পড়তে বলা এবং তার নামায শেষে সাহাবায়ে কিরামকে সদকার নির্দেশ দেয়া। দুই. সাহাবায়ে কিরামের কাপড় দান করা এবং এ দানকৃত কাপড় থেকে তাকে দুটি কাপড় গ্রহণের নির্দেশ দেয়া। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জুমুআর মাসজিদে কেউ দান করার মতো অতিরিক্ত কাপড় নিয়ে আসে না, বরং রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক সদকার নির্দেশ দানের পরে তাঁরা বাড়িতে গিয়ে কাপড় এনে দিয়েছেন– এটাই হওয়ার কথা।

হাদীসে বিদ্যমান এ দুটি বিষয় জানার পরে ভেবে দেখুন! যারা খুৎবা চলাকালীন নামায পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন তারা উক্ত খুৎবায় আরো যা ঘটেছিলো সেগুলোরও অনুমতি দেন কি? খুৎবার মধ্যে কথা বলা, সদকার নির্দেশ দেয়া, সদকা গ্রহণ করা, হাঁটা-চলা, বাড়ি যাওয়াসহ সব কাজের অনুমতি এখনো খুৎবার মধ্যে বহাল আছে কি? পূর্ববর্ণিত আয়াত ও হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এগুলোর অনুমতি নেই। তাহলে নামাযের বিষয়টিও কি এ তালিকাভুক্ত হতে পারে না? উপরন্তু যখন বেশ কিছু দলীল এর পক্ষে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা

বলতে পারি যে, খুৎবা চলাকালীন নামায পড়ার বিধান প্রথমে ছিলো পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, এখনো এ আমল চলতে পারে তাহলে ত্বহাবী শরীফ থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীসের আলোকে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কোন বিশেষ কারণে যদি খতীব তাঁর খুৎবা বন্ধ রেখে কাউকে দিয়ে নামায পড়ান তাহলে পড়াতে পারেন। এ হাদীসে যেমন ঐ লোকটির দুরাবস্থা মানুষের সামনে দেখিয়ে সবাইকে সদকা দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রসূল স. তাঁকে দিয়ে নামায পড়িয়েছিলেন।

অতএব, উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা খুৎবা চলাল কালীন নামায পড়ার আমলকে রহিত এবং মাকরূহ মনে করি।

জুমুআর পর চার রাকাত পড়া ছুন্নাত আর ছয় রাকাত উত্তম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ فصل فى استحباب اربع ركعات او الركعتين بعد الجمعة–۱/۲۸۸)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যদি জুমুআর পর নামায আদায় করতে চায় তাহলে সে যেন চার রাকাত আদায় করে। (মুসলিম-১৯১১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১২৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. জুমুআর পরে চার রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا

অনুবাদ : আবু আব্দুর রহমান রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে জুমুআর আগে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন। আর হযরত আলী রা. এসে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন জুমুআর পরে প্রথমে দু'রাকাত অতঃপর চার রাকাত পড়ার। (আব্দুর রাজ্জাক: ৫৫২৫, তবারানী কাবীর : ৯৪৩৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাওকূফ। হাফেজ ইবনে হাজার আস্‌কালানী রহ. বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (আদ্‌দিরায়াহ : জুমুআ অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী রা. ছয় রাকাত পড়তেন। পূর্বের হাদীসে রসূল স.-এর নির্দেশ আর এ হাদীসে খলীফায়ে রাশেদের আমল বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং রসূল স.-এর কথা মতে ৪ রাকাত পড়া ছুন্নাত। আর খলিফায়ে রাশেদের কথার কারণে আর দু'রাকাত বৃদ্ধি করা উত্তম।

حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، ثُمَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি জুমুআ-ার পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। আর এ চার রাকাতের মাঝে কোন সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর জুমুআ শেষে দু'রাকাত এবং তারপরে চার রাকাত পড়তেন। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৩, হাদীস নং-১৯৬৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাওকুফ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার: পৃষ্ঠা-৩৭৪, খণ্ড-৫, ওজারাতুল আওকাফ, কাতার হতে প্রকাশিত) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ.ও বলেন, وسنده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ-১১৩০ নং হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. জুমুআর পরে প্রথমে দুই এবং পরে চার মোট ছয় রাকাত নামায পড়তেন। আর সাহাবায়ে কিরাম যে আমলের অনুকরণ করে থাকেন তা অবশ্যই রসূল স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে করে থাকেন। হানাফী মাযহাবে এর অনুকরণ করা হয়ে থাকে। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : ২/১৩২৭) হযরত আলী রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. জুমুআর পূর্বে চার রাকাত এবং জুমুআর পরে চার রাকাত নামায পড়তেন। আর শেষ রাকাতে গিয়ে সালাম ফিরাতেন। (আল্ মু'জামুল আওসাত লিত্‌তবারানী : ১৬১৭) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১২)

ফায়দা : আমরা জুমুআর পরে প্রথমে চার তারপরে দু'রাকাত আদায় করে থাকি। অথচ সাহাবায়ে কিরামের আমলে পাওয়া যায় প্রথমে দুই এবং পরে চার রাকাত। এর কারণ এটা হতে পারে যে, হযরত ওমর রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি কোন (ফরয) নামাযের পরে সমসংখ্যক (ছুন্নাত বা নফল) নামায আদায় করা অপছন্দ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৬০৫১) এর মূল উদ্দেশ্য ফরয থেকে নফলকে পৃথক রাখা। আর হযরত আবু রিমছা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, **لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِمْ فَصْلٌ** আহলে কিতাব এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের নামাযের মধ্যে (ফরয ও নফলে) কোন পার্থক্য ছিলো না। (মুসতাদরাকে হাকেম-৯৯৬) হাকেম রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যেহেতু জুমুআর নামায দু'রাকাত সেহেতু প্রথমে চার রাকাত পড়া হলে রাকাত সংখ্যার দিক দিয়ে ফরয ও নফলে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। অবশ্য ফরয ও নফলের মাঝে সামান্য দেরি করার দ্বারাও পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যায় ১৮ : ঈদের নামায

মুসলমানদের বার্ষিক ঈদ মাত্র দু'টি

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ–١/١٦١)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. মদীনাতে এসে দেখলেন যে, তারা দুটি দিনে আনন্দ উদযাপন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দুটি দিন কীসের? তারা বললো, আমরা এ দুটি দিনে জাহেলী যুগে আনন্দ উদযাপন করতাম। তখন রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এ দুটি দিনকে অন্য দুটি উত্তম দিনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। একটি হলো ঈদুল ফিতর ও অপরটি ঈদুল আযহা। (আবূ দাউদ : ১১৩৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (আবূ দাউদ: ১১৩৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৬৮৬২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জাহেলী যুগের দুটি আনন্দের দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকেও দুটি আনন্দের দিন তথা ঈদের দিন দান করেছেন। সুতরাং বাৎসরিক ঈদ দু'টির পরিবর্তে তিনটি হলে অতিরিক্তটি ইসলাম বহির্ভূত ঈদ হবে। অনেকে ঈদে মিলাদু-

ন্নবী নামে আরো একটি ঈদ পালন করে থাকে। কুরআন ও হাদীসে এ নামে কোন ঈদের অস্তিত্ব নেই।

সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ঈদ পালনের বিধান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ** তিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। (ছূরা জুমুআহ-২)। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলে কারীম স. নিজেও উম্মি তথা নিরক্ষর ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন তারাও নিরক্ষর ছিলো। আবার রসূলুল্লাহ স. নিজে বলেন, **إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ** আমরা উম্মি উম্মত, হিসাব-কিতাব জানি না। (বুখারী-১৭৯২)। অথাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা এষ্ট্রোনোমি অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা-এর সূক্ষ ম্যারপ্যাঁচে না পড়ে চাক্ষুশ দর্শনের ভিত্তিতে চাঁদ দেখে রোজা রাখি। বর্তমান যুগের আধুনিক প্রযুক্তির কোন কিছুই সে যুগে বিদ্যমান ছিলো না। আর প্রযুক্তি শিখানো বা এ শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেয়ার জন্যও তিনি প্রেরিত হননি। বরং তিনি নিজে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, **أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ** "তোমাদের দুনিয়ার (উন্নতি/অবনতির) বিষয় তোমরা ভালো বুঝো"। (মুসলিম-৫৯১৬)। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا** আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। (ছূরা সাবা-২৮)। এ আয়াতের ভাষ্য মতে মুহাম্মাদ স.কে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানুষের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, প্রযুক্তি ব্যবহারকারী- বর্জনকারী সব শ্রেণীর মানুষই ছিলো, আছে এবং থাকবে। তাই শরীআতের কোন বিধি-বিধানের ভিত্তি প্রযুক্তির উপরে নয়। বরং সকল বিধি-বিধানের ভিত্তিই হলো ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর। নামাযের সময় নির্ধারণ, সাহরীর শেষ সময় এবং ইফতারের সময় নির্ধারণসহ সকল বিধি-বিধানের ভিত্তিই হলো ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর। এ ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটেনি রোজা বা ঈদের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রেও। তাই রসূলুল্লাহ স. বলেন, **لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ** তোমরা চাঁদ না দেখে রোজা রেখো না এবং চাঁদ না দেখে রোজা ছেড়ো না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে মাসের গণনা (৩০ দিন) পূর্ণ করো। (বুখারী-১৭৮৫)। রসূলুল্লাহ স.-এর এ হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মেঘের কারণে চাঁদ

দেখতে না পারলে ধরে নাও যে, মাস ৩০ দিনে হচ্ছে। চাঁদের জন্ম হিসাব করা, মেঘ অতিক্রম করতে উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করা বা সম্ভব হলে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করাসহ কোন কিছু না বলে তিনি সরাসরি বলে দিলেন যে, মাসের গণনা ৩০ দিন পূর্ণ করে নাও। তিনি অন্য কোন সম্ভাবনাকে আমলে নেননি। অথচ হতে পারে যে, আকাশে চাঁদ ঠিকই উঠেছিলো কিন্তু মেঘের কারণে তা দৃষ্টিগোচর হয়নি।

রসূলুল্লাহ স. এ হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, চাঁদ না দেখে রোজা রাখা যাবে না। বরং চাঁদ দেখেই রোজা রাখতে হবে। এখন চাঁদ দেখা হতে পারে সরাসরি অথবা বিধানগতভাবে। সরাসরি চাঁদ দেখার অর্থ স্পষ্ট। আর বিধানগতভাবে চাঁদ দেখার ব্যাখ্যা হলো কোন ব্যক্তির অবস্থান এমন যায়গায় হওয়া যেখান থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলে চাঁদ দেখা যেতো। কিন্তু হয়তো আকাশ মেঘলা ছিলো অথবা সে ইচ্ছা করে দেখেনি কিংবা লোকটি অন্ধ তাই দেখতে পারেনি। এ সকল ক্ষেত্রে বিধানগতভাবে সে চাঁদ দেখেছে বলে ধরে নেয়া হবে।

উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতেই যদি চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হয় তাহলে বুখারী-১৭৮৫ নং হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর ঘোষণা মোতাবেক তার রোজা রাখা বা ছাড়ার কোন সুযোগ নেই। কোন ব্যক্তির অবস্থান যদি এমন স্থানে থাকে যে স্থানের আকাশ মেঘমুক্ত ছিলো এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ চেষ্টা করে চাঁদ দেখতে পারেনি তাহলে সে স্থানের মানুষের চাঁদ দেখা সরাসরিও প্রমাণিত হয় না। আর বিধানগতভাবেও প্রমাণিত হয় না। এমন স্থানে যদি কেউ রমাযানের রোজা রাখে বা ছাড়ে তাহলে সে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে বুখারী-১৭৮৫ নং হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলো।

হ্যাঁ, কোন রাষ্ট্রের পরিধি যদি পূর্ব-পশ্চিমে এত দীর্ঘ হয় যে, তার পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলেও পূর্ব প্রান্তে দেখা যায় না। তাহলে সাধারণ মুসলমানদের প্রতিনিধি মুসলিম শাসকবর্গের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে চাঁদ উঠা প্রমাণিত হওয়ায় তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করলে ঐ সরকারের অধীনে বসবাসকারী সকলের জন্য বিধানগতভাবে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে বলে কোন কোন আলেম মত দিয়েছেন। তাদের মতে অমুসলিম রাষ্ট্রে উলামায়ে কিরামের পক্ষ থেকে চাঁদ দেখার ঘোষণা রাষ্ট্রীয় ঘোষণার মান রাখে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এটা মানা যেতে পারে। কেননা রোজা ও ঈদ পালন

একটি সম্মিলিত ইবাদাত। তাই এটা পালনে একই রাষ্ট্রের মানুষ দুই বা ততাধিক ভাগে বিভক্ত হওয়া শরীআতের চাহিদার পরিপন্থী। (তিরমিযী-৬৯৫ ও ৮০০, আবূ দাউদ-২৩১৮)

শরঈ ভিত্তিতে সংবাদ পৌঁছা এবং রাষ্ট্রীয় ঘোষণা হওয়ার শর্ত না মেনে শুধু টেলিফোন, মুঠোফোন বা টেলিভিশনের ঘোষণা শুনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোজা বা ঈদ পালনের সিদ্ধান্ত কুরআন-হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। আর উম্মতের কোন নির্ভরযোগ্য আলেমও দেননি। এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে রসূল স.-এর ইরশাদ, সাহাবায়ে কিরামের অবস্থান, তাবিঈগণের মতামত এবং মুসলিম উম্মাহ'র মহামনীষীদের মন্তব্য ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হচ্ছে:

চাঁদের তারিখ ভিন্ন হওয়ার দলীল

عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم فى بَابِ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ–١/٣٤٨)

অনুবাদ : হযরত কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত, উম্মুল ফজল ডবনতে হারেস (হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আম্মা) তাঁকে হযরত মুআবিয়া রা.-এর দরবারে শামে পাঠালেন। তিনি বলেন, আমি শামে গিয়ে আমার প্রয়োজন মিটালাম। আমি শামে থাকতেই জুমুআর রাতে রমজানের চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদীনায় আসলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করে অবশেষে চাঁদ দেখার

ব্যাপারে বললেন, যে, কবে চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, জুমুআর রাতে দেখেছি। তিনি আবার বললেন, তুমি নিজে দেখেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি নিজে দেখেছি এবং অন্য মানুষেও দেখেছে। হযরত মুআবিয়া নিজেও রোজা রেখেছেন এবং অন্যরাও রোজা রেখেছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমরাতো দেখেছি শনিবার রাতে। তাই আমরা ঈদের চাঁদ দেখা বা ৩০ রোজা পূর্ণ করা পর্যন্ত রোজা রাখতে থাকবো। কুরাইব রহ. বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে বললাম, হযরত মুআবিয়া রা.-এর চাঁদ দেখা এবং রোজা রাখা কি যথেষ্ট হবে না? তিনি বললেন, না যথেষ্ট হবে না। রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসলিম, হাদীস নং-২৩৯৯, মুসনাদে আহমদ- ২৭৮৯; জামে তিরমিযী-৬৯১; সুনানে আবী দাউদ-২৩২৬, সুনানে নাসাঈ : ২১১৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা-১৯১৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসের বর্ণনা শেষে বলেন, **حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ** ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **إسناده صحيح** হাদীসটির সনদ সহীহ। (মুসনাদে আহমদ, ২৭৮৯ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাম এবং মদীনার মধ্যে যে পরিমাণ দুরত্ব রয়েছে এই পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি দুরত্ব হলে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য কার্যকর হবে না। বরং দুরবর্তী প্রত্যেক শহরবাসীদের জন্য আপন আপন চাঁদ দেখা কার্যকর হবে। এ হাদীসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসীনে কিরাম নিজ নিজ কিতাবে যে শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন তা থেকে কিঞ্চিত আপনাদের খেদমতে পেশ করছি।

ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. তাঁর কিতাব সহীহ ইবনে খুযাইমায় এ শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন যে, **بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ صِيَامُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِمْ لَا رُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ** অধ্যায়: প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী রমাযানের রোজা রাখা আবশ্যক হওয়ার দলীল, অন্য শহরবাসীদের দেখা অনুযায়ী নয়।

আর মুসলিম শরীফের টিকায় ইমাম নববী রহ. এই শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন যে, **بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ** অধ্যায় : প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা

গ্রহণযোগ্য। কোন এক শহরের চাঁদ দেখা তার থেকে দুরবর্তী শহরের জন্য কার্যকর হবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর কিতাবে উক্ত হাদীসের জন্য এ শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন যে, بَابُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُم অধ্যায় : প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য। ইমাম তিরমিযী রহ. এ শিরোনামের অধীনে পূর্বে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এ হাদীসের চাহিদা আর উম্মতের আমল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে যে, প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য। ইমাম নাসাঈ রহ. এ হাদীসের শিরোনাম এভাবে দাঁড় করিয়েছেন যে, اخْتِلَافُ أَهْلِ الْآفَاقِ فِي الرُّؤْيَةِ অধ্যায়: 'চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা'।

রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের পরে ইসলামী খিলাফাতের অনেক বিস্তৃতি ঘটেছিলো। মদীনা এবং শামের মধ্যে চাঁদের উদয়স্থলের যে ভিন্নতা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এটা স্বাভাবিক নিয়মে হয়তো এর পূর্বেও অনেকবার ঘটেছিলো। চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা মেনে নেয়া হলে প্রত্যেকে যার যার অঞ্চলে চাঁদ দেখে রোজা রাখবে, ঈদ করবে। এ ক্ষেত্রে সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে চাঁদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে তা প্রচার করার কোন দায়িত্ব মুসলিম জনসাধারণ বা তাদের খলিফার উপর বর্তায় না। আর যদি চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা স্বীকার না করা হয় তাহলে মুসলিম জনসাধারণ এবং তাদের খলিফার উপর অবশ্যই এ দায়িত্ব বর্তাবে। বিশেষ করে শেষ তিন খলিফা তথা হযরত ওমর, উসমান এবং হযরত আলী রা.-এর খিলাফত আমলে ইসলামী খিলাফতের যে বিস্তার ঘটেছিলো সে ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য ছিলো। কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে এমন কোন প্রমাণ মেলেনি যে, চাঁদের সংবাদ সংগ্রহ করা বা বিতরণ করা মুসলিম উম্মাহ'র উপর আরো একটি ফরযে কিফায়াহ দায়িত্ব বলে কুরআন-হাদীসের কোথাও ঘোষিত হয়েছে। এমনও কোন প্রমাণ মেলেনি যে, খুলাফায়ে রাশেদার যুগে তাঁরা চাঁদের সংবাদ সংগ্রহ করে তা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বিশেষত উমরে ছানী খ্যাত খলিফায়ে রাশেদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ.-এর খিলাফত আমলে ইসলামী খিলাফাত স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তার লাভ

করেছিলো। এ ক্ষেত্রে স্পেনের বাসিন্দাদের চাঁদ দেখা আর সমরকন্দের বাসিন্দাদের ঐ চাঁদ না দেখার বিষয়টি অতি বাস্তব। একজন মুসলিম খলিফার একই রাষ্ট্রে পশ্চিম দিকে রমাযানের রোজা চলছে, আর পূর্ব প্রান্তে দিনের বেলায় পানাহার চলছে। আবার এক দিকে ঈদের আনন্দ চলছে, অপর দিকে রোজা চলছে। সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ঈদ পালনের প্রবক্তাগণের দৃষ্টিতে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে খলিফায়ে রাশেদগণ কি করেছেন? নাকি কিছুই করেননি? করে থাকলে প্রমাণ কোথায়? আর না করে থাকলে কেন করেননি? হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুআবিয়া রা. রাষ্ট্রীয়ভাবে এর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। খুলাফায়ে রাশেদা বা তাঁদের কেউ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলেও তাঁরা কী করতে পারতেন? যে যুগে খবর পোঁছানোর সবচেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা ঘোড় সাওয়ারের মাধ্যমে পোঁছানো, সে যুগে স্পেন থেকে চীনে রাতারাতি সংবাদ পোঁছানোর কল্পনা করা যেতো কি? কোন কারণে যদি টেলিফোন-মোবাইলের নেটওয়ার্কে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে প্রযুক্তিভক্তরা রোজা ও ঈদের কী ব্যবস্থা নিবেন? খোলা আকাশে চাঁদ দেখার ম্যানুয়াল ব্যবস্থা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন ব্যবস্থা থাকবে কি? সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ঈদ পালন করার যুক্তিগুলোর পরিস্থিতি তখন যা হবে ইসলামকে ডিজিটালায়নের স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে এখন ঐ ব্যবস্থা মেনে নেয়া উত্তম নয় কি? যাতে ইসলামের নিয়ম কানুনগুলো সর্ব যুগে সর্ব শ্রেণীর মানুষের বোধগম্য থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীস ও অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে যে সকল মহামনীষী-গণ চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতার বিষয়ে মতামত দিয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে যুগশ্রেষ্ঠ কয়েক জন ইমামের অভিমত পেশ করা হচ্ছে–

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন,

قَالَ أَبُو عُمَرَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَذْهَبُ لِأَنَّ فِيهِ أَثَرًا مَرْفُوعًا وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ تَلْزَمُ بِهِ الْحُجَّةُ وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبٍ كَبِيرٍ لا مخالف له (من الصحابة) وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَمَعَ هَذَا إِنَّ النَّظَرَ يَدُلُّ عَلَيْهِ عِنْدِي لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُكَلَّفُونَ عِلْمَ مَا غَابَ عَنْهُمْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِمْ وَلَوْ كُلِّفُوا ذَلِكَ لَضَاقَ عَلَيْهِمْ.

অনুবাদ : মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম এবং যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও

মুহাদ্দিস হযরত আবু ওমর ইবনু আব্দিল বার রহ. বলেন, আমি প্রথম মত অবলম্বন করি। অর্থাৎ প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা কার্যকর হবে। যেহেতু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর আছার বর্ণিত রয়েছে। আর সেটা হাসান হাদীস যা দ্বারা দলীল গ্রহণ আবশ্যক হয়। সাথে সাথে এটা একজন মহা ব্যক্তিত্ব তথা ইবনে আব্বাসের কথা এবং সাহাবাদের মধ্যে কেউ তার বিরোধী নেই। আর এটা ফকীহ তাবিঈগণের একটি দলেরও মত। উপরন্তু আমার দৃষ্টিতে যুক্তির চাহিদাও এটাই। যেহেতু ভিন্ন শহরে দৃষ্টির আড়ালে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা যায় না। আর করলেও তা তাদের জন্য সংকীর্ণতার কারণ হবে। (আত্ তামহীদ, নাফে' সূত্রে বর্ণিত চল্লিশতম হাদীসের আলোচনায়) তিনি আরো বলেন,

وروي عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ قَوْمٍ رُؤْيَتُهُمْ وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وإليه ذهب إبن المبارك وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ وَطَائِفَةٌ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, 'প্রত্যেক কওমের জন্য তাদের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য'। আর এটিই ইকরিমা, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালিম ইবনে আব্দুল্লাহর বক্তব্য। ইবনুল মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ.সহ একটি জামাতের মাযহাবও এটিই। (আল্ ইসতিযকার ১০/২৯)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে আব্দুল বার রহ.-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্যমতে রসূলে কারীম স.-এর নির্দেশ, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর নিজের মতামত, তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র এবং উঁচু মানের মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত ইকরিমা রহ., আবু বকর সিদ্দীক রা-এর পৌত্র ও সাহাবায়ে কিরামের ইল্মের ধারক মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ যারা 'ফুকাহায়ে সাবআহ' নামে পরিচিত তাঁদের অন্যতম সদস্য কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর ছেলে ও মদীনায় অবস্থিত 'ফুকাহায়ে সাবআহ'র আরেক সদস্য হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রহ.-এর মতামত এ কথারই সমর্থন করে যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে তা সমগ্র বিশ্বের জন্য কার্যকর হবে না। বরং দুর-দুরান্তে অবস্থিত প্রত্যেক শহরের জন্য স্বতন্ত্র চাঁদ দেখা কার্যকর হবে।

ইমাম নববী রহ.

(بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ) فِيهِ حَدِيثُ كُرَيْبٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ لِلتَّرْجَمَةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَعُمُّ النَّاسَ بَلْ تَخْتَصُّ بِمَنْ قَرُبَ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ (شرح النبوى على مسلم)

অনুবাদ : শাফেঈ মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম এবং যুগশ্রেষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসের উপর প্রথমে এ শিরোনাম দাঁড় করান যে, প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য। কোন এক শহরের চাঁদ দেখা তার থেকে দূরবর্তী শহরের জন্য কার্যকর হবে না। এরপরে তিনি বলেন, এ মাসআলার ব্যাপারে কুরাইব রহ. সূত্রে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসটি স্পষ্ট দলীল। আমাদের ইমামগণের নিকট কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে তা সারা দুনিয়ার জন্য ব্যাপকহারে ধর্তব্য নয়। বরং চাঁদ দেখার স্থান থেকে কসরের দুরত্বের চেয়ে নিকটে যারা বসবাস করে তাদের ক্ষেত্রে এ চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হবে। (ইমাম নববীর লিখিত মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল মিনহাজে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়)

সারসংক্ষেপ : ইমাম নববী রহ.-এর কথা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে তা সমগ্র বিশ্বের জন্য কার্যকর হবে না। বরং দুর-দুরান্তে অবস্থিত প্রত্যেক শহরের জন্য স্বতন্ত্র চাঁদ দেখা কার্যকর হবে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا لِأَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث بن عَبَّاس مَا يشْهد لَهُ وَحَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَإِسْحَاقَ وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَحْكِ سِوَاهُ وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهًا لِلشَّافِعِيَّةِ.

অনুবাদ : শাফেঈ মাযহাবের আরো একজন বিশিষ্ট আলেম এবং যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, চাঁদ দেখার মাসআলা নিয়ে উলামায়ে কিরাম কয়েক মাযহাবে বিভক্ত

হয়েছেন। তম্মধ্যে একটি এই যে, প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা কার্যকর হবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস এরই সাক্ষ্য বহন করে। হযরত ইবনুল মুনযির রহ. ইকরিমা, কাসেম, সালেম এবং ইসহাক রহ. থেকে এ মতই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী রহ. এটাকেই উলামায়ে কিরামের মতামত বলে উল্লেখ করেছেন; এর বিপরীতে কিছুই বলেননি। আল্লামা মা-ওরদী রহ. এটাকে শাফেঈ মাযহাবের একটি মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর পরে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ ব্যাপারে দ্বিতীয় মতটি পেশ করেন-

ثَانِيهَا مُقَابِلُهُ إِذَا رُؤِيَ بِبَلْدَةٍ لَزِمَ أَهْلَ الْبِلَادِ كُلِّهَا وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْمَالِكِيَّة لَكِن حكى بن عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ وَقَالَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَةُ فِيمَا بعُدَ مِنَ الْبِلَادِ كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدَلُسِ (فَتْحُ الْبَارِئْ)

অনুবাদ : আর অপর মতটি হলো, কোন এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে তা সমগ্র বিশ্বের জন্য কার্যকর বলে ধরা হবে। মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত এটা। তবে মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম হযরত ইবনু আব্দিল বার রহ. এ মতের বিপরীতে ইজমা তথা সকলের ঐকমত্য বর্ণনা করে বলেন, খুরাসান এবং স্পেনের মতো দুরবর্তী শহরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য কার্যকর না হওয়ার উপর সকলে একমত হয়েছে। (ফাতহুল বারী, চাঁদ দেখা অধ্যায়)

আল্লামা কুরতুবী রহ.

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَلِمَةُ تَصْرِيحٍ بِرَفْعِ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَمْرِهِ. فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ إِذَا تَبَاعَدَتْ كَتَبَاعُدِ الشَّامِ مِنْ الْحِجَازِ فَالْوَاجِبُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ تَعْمَلَ عَلَى رُؤْيَتِهِ دُونَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ، وَإِنْ ثَبَتَ ذلك عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، مَا لَمْ يَحْمِلِ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ حَمِلَ فَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ. (تفسير القرطبی: فی قوله ولتكملوا العدة الخ.)

অনুবাদ : মালেকী মাযহাবের আরো একজন বিশিষ্ট আলেম এবং যুগশ্রেষ্ট ফকীহ ও মুফাস্‌সির, তাফসীরে কুরতুবীর লেখক আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ শামসুদ্দীন কুরতুবী রহ. (মৃত্যু-৬৭১ হি.)

ছূরা বাকারার আয়াত ولتكملوا العدة الخ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের উলামাগণ বলেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন' স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, হযরত ইবনে আব্বাস যা করেছেন বা বলেছেন তা রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশেই করেছেন। সুতরাং এটা দলীল যে, দুটি শহর যদি শাম ও হিজাজের মত দুরত্বে অবস্থিত হয় তাহলে প্রত্যেক শহরবাসী যার যার চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করবে। অন্য শহরের চাঁদ দেখা তাদের জন্য কার্যকর হবে না। এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রধানের নিকট প্রমাণিত হলেও না। যতক্ষণ তিনি জনগণের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দেন। হ্যাঁ তিনি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে তাঁর বিরোধিতা করা জনসাধারণের জন্য বৈধ হবে না। (তাফসীরে কুরতুবী, ছূরা বাকারার আয়াত ولتكملوا العدة الخ এর ব্যাখ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা কুরতুবী রহ.-এর কথা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে তা সমগ্র বিশ্বের জন্য কার্যকর হবে না। এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রধানের নিকট প্রমাণিত হলেও না। যতক্ষণ তিনি জনসাধারণকে রোজা রাখা এবং ঈদ পালনের নির্দেশ না দেন। বরং দুর-দুরান্তে অবস্থিত প্রত্যেক শহরের জন্য স্বতন্ত্র চাঁদ দেখা কার্যকর হবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রহ.

وقال حجة الإسلام الغزالي: وإذا رؤي الهلال ببلدة ولم ير بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على الكل وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب.

অনুবাদ : ইমাম গাযালী আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ রহ. (মৃত্যু-৫০৫ হি.) বলেন, যদি কোন এক শহরে চাঁদ দেখা যায় আর অন্য শহরে না দেখা যায় এবং এ দুই শহরের মাঝের দুরত্ব দুই মারহালা (দু'দি-নের রাস্তা অর্থাৎ ৩২ মাইল) এর চেয়ে কম হয় তাহলে যে শহরে চাঁদ দেখা যায়নি তাদেরও রোজা রাখতে হবে। আর যদি ঐ দুই শহরের মাঝে দুরত্ব এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে প্রত্যেক শহরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান কার্যকর হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শহরে স্বতন্ত্রভাবে চাঁদ দেখতে হবে। (এহইয়াউ উলূমিদ্বীন : ১/২৩২, সওম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ)

ইবনে তাইমিয়া রহ.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا،

অনুবাদ : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল উছাই-মীন বলেন, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু-৭২৮ হি.) বলেন, আকাশের অবস্থা সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তাদের ঐকমত্য যে, চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য ঘটে। যদি দুই শহরের উদয়স্থল অভিন্ন হয় তাহলে এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে অন্য শহরে রোজা রাখা জরুরী হবে। আর উদয়স্থল ভিন্ন হলে এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে অন্য শহরে রোজা রাখা জরুরী হবে না। (আশ্ শারহুল মুমতি' আলা ঝাদিল মুসতাকনী')

القول الثالث: أن رؤية أهل المشرق رؤية لأهل المغرب ولا عكس والسبب أنه إذا رؤي في المشرق لزم أن يُرى في المغرب ولابد؛ وذلك لأنه لا يغيب عن أهل المشرق قبل أن يغيب عن أهل المغرب وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره

অনুবাদ : শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে জাবরীন বলেন, পূর্ব দিগন্তের মানুষরা চাঁদ দেখলে পশ্চিম দিগন্তের মানুষের জন্য তা কার্যকর হবে। তবে এর বিপরীতে পশ্চিম দিগন্তের মানুষ চাঁদ দেখলে পূর্ব দিগন্তের মানুষের জন্য কার্যকর হবে না। আর তার কারণ এই যে, পূর্ব দিগন্তে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়া জরুরী। যেহেতু পূর্ব দিগন্তে চাঁদ ডোবার পূর্বে পশ্চিম দিগন্তে ডুবতে পারে না। এ মতই গ্রহণ করেছেন শায়খ ইবনে তাইমিয়া এবং অন্যান্যরা। (আবুত তুরাব সায়্যিদ ইবনে হুসাইন কর্তৃক লিখিত নিদাউর রয়্যান কিতাবে : ৩৩৪/৩)

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল্ উছাইমীন রহ.

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের অন্যতম সদস্য, হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম ও মুফতি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল্ উছাইমীন এ মাসআলার ব্যাপারে চারটি মত উল্লেখ করেন। তম্মধ্যে দ্বিতীয় মতটি হলো চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হবে। এ কারণে এক শহর থেকে আরেক শহরের দুরত্ব যদি এই পরিমাণ হয় যাতে চাঁদের উদয়স্থলের ব্যবধান হয়ে থাকে তাহলে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য

শহরের জন্য কার্যকর হবে না। এ মতের পক্ষে তিনি শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর উক্তি তুলে ধরে বলেন,

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا، واستدلوا بالنص والقياس.

অনুবাদ : শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আকাশের অবস্থা সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তাদের ঐকমত্য যে, চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য ঘটে থাকে। যদি দুই শহরের উদয়স্থল অভিন্ন হয় তাহলে এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে অন্য শহরে রোজা রাখা জরুরী হবে। আর উদয়স্থল ভিন্ন হলে এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে অন্য শহরে রোজা রাখা জরুরী হবে না। অতঃপর শায়খ উছাইমীন বলেন,

أما النص فهو: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. قوله صلّى الله عليه وسلّم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فعلل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة، ولا حكماً. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريباً إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

অনুবাদ : এ মতের অনুসারীগণ কুরআন-হাদীসের বাণী এবং যুক্তি দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। কুরআনের বাণী হিসেবে ছূরা বাকারার আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমাযান মাস দেখে অর্থাৎ চাঁদ দেখে সে রোজা রাখবে। সুতরাং চাঁদ প্রত্যক্ষকারী-দের সাথে যাদের উদয়স্থলের মিল নেই তারা চাঁদ দেখেছে এটা কোনভাবেই বলা যায় না। বাস্তবতার দিক দিয়েও না। বিধি-বিধানের দিক দিয়েও না। অথচ আল্লাহ তাআলা রোজা ফরয করেছেন তাদের উপর যারা

চাঁদ দেখেছে। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী- صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো। এখানে চাঁদ দেখাকে রোজা ফরয হওয়ার কারণ বানানো হয়েছে । সুতরাং চাঁদ প্রত্যক্ষকারীদের সাথে যাদের উদয়স্থলের মিল নেই তারা চাঁদ দেখেছে এটা কোনভাবেই বলা যায় না। বাস্তবতার দিক দিয়েও না। বিধি-বিধানের দিক দিয়েও না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসও এর আরেকটি দলীল। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মুল ফজল ডবনতে হারেস (হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আম্মা) কুরাইব রহ.কে হযরত মুআবিয়াহ রা.-এর দরবারে শামে পাঠালেন। তিনি মাসের শেষ দিকে মদীনায় আসলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে চাঁদ দেখার বিষয় জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি জুমুআর রাতে দেখেছি। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমরা শনিবারে দেখেছি। আমরা চাঁদ দেখা বা ৩০ রোজা পূর্ণ করা পর্যন্ত রোজা রাখতে থাকবো। কুরাইব রহ. বলেন, হযরত মুআবিয়া রা.-এর চাঁদ দেখা এবং রোজা রাখা কি যথেষ্ট হবে না? তিনি বললেন, না যথেষ্ট হবে না। রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন। শায়খ উছাইমীন রহ. আরো বলেন,

وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} ، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة.

অনুবাদ : এ মতের পক্ষে যৌক্তিক দিক এই যে, দিনের সময় ব্যবধানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভিন্নতা কুরআন- হাদীসের বাণী এবং মুসলমানদের ঐকমত্য সবকিছু দ্বারাই প্রমাণিত। সুতরাং পূর্ব দিগন্তে বসবাসরতদের জন্য সুবহে সাদেক হলে যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ "রাতের আধার থেকে দিনের আলো পার্থক্য হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো" দ্বারা

পশ্চিম দিগন্তে বসবাসকারীদের জন্য পানাহার বর্জনের আবশ্যকীয়তা আসে না। আবার পূর্ব দিগন্তে বসবাসরতদের সূর্য ডুবে গেলে পশ্চিম দিগন্তে বসবাসকারীদের জন্য ইফতার করা বৈধ হয় না। দৈনন্দিন হিসেবের ব্যাপারে মুসলমানদের এই পার্থক্যের মতো মাসিক হিসেবেও রোজা রাখা বা না রাখার পার্থক্য ঘটবে। এটা স্পষ্ট যুক্তির কথা এবং দলীলের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই অগ্রগণ্য মত। সব শেষে তিনি বলেন,

قال أهل العلم: إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا؛ لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخراً عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى؛ لأن سير القمر بطيء. وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ الجواب: لا؛ لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر.

অনুবাদ : উলামায়ে কিরাম বলেন, পূর্ব দিগন্তে বসবাসরত মানুষেরা চাঁদ দেখলে ঐ বরাবর পশ্চিম দিগন্তে বসবাসকারীদের জন্য রোজা রাখা জরুরী হবে। কেননা তাদের উদয়স্থল একই। আবার সূর্যের চেয়ে চাঁদের গতি কম হওয়ায় পূর্ব দিগন্তে সূর্য ডোবার পরে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিম দিকে তা অবশ্যই দেখা দিবে। তবে পশ্চিম দিকে বসবাসকারীগণ চাঁদ দেখলে পূর্ব দিকে বসবাসরত মানুষের জন্য রোজা রাখা জরুরী কী না? এর জবাব হলো-জরুরী না। যেহেতু দুরত্ব বেশি হওয়ার কারণে অনেক সময় চাঁদ বিলম্বে দেখা দেয়। (আশ্ শারহুল মুমতি' আলা ঝাদিল মুসতান্‌কি')

সারসংক্ষেপ : শায়খ উছাইমীনের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তিনি চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য স্বীকার করেন এবং বিশ্বের যে কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে সারা দুনিয়ার মানুষ সে অনুযায়ী রোজা রাখবে এ মতকে প্রাধান্য দেন না। বরং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য তাদের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হওয়াকে তিনি কুরআন-হাদীসের বাণী এবং যুক্তির দিক দিয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর পরে তিনি তৃতীয় আরেকটি মত প্রকাশ করে বলেন,

القول الثالث: أن الناس تبع للإمام فإذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم

الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها، أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق.

অনুবাদ : তৃতীয় মত এই যে, মানুষ রাষ্ট্রপ্রধানের অনুসারী। সুতরাং তিনি রোজা রাখলে মানুষ রোজা রাখবে আর তিনি রোজা ছেড়ে দিলে মানুষ রোজা ছেড়ে দিবে। যদি বিশ্বের সমগ্র মুসলমান এক খিলাফাতের অধীনে থাকে আর ঐ খলিফার অধীনস্ত কোন শহরে মানুষ চাঁদ দেখে এবং সে ভিত্তিতে খলিফা ফায়সালা ঘোষণা করেন তাহলে পূর্ব-পশ্চিমে যারাই তাঁর রাষ্ট্রে বসবাস করে তাদের সকলের জন্য রোজা রাখা বা ছাড়ার বিধান প্রযোজ্য হবে। যেন একই রাষ্ট্রের মানুষ মতবিরোধে জড়িয়ে না পড়ে এবং সে মতবিরোধ ঝগড়া-বিবাদের কারণ না হয়। সর্বশেষে তিনি এই বলে পরিসমাপ্তি টানেন যে,

وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي.

(الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين)

অনুবাদ : মানুষের এখনকার আমল এই যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট চাঁদ প্রমাণিত হলে তাঁর অধীনে বসবাসকারী সকলের জন্য রোজা রাখা বা না রাখার বিধান প্রযোজ্য হবে। (এক রাষ্ট্রের ভেতর) ঐক্য রক্ষার স্বার্থে এটা শক্তিশালী মত। (আশ্ শারহুল মুমতি' আলা ঝাদিল মুসতান্‌কি')

শায়খ আব্দুল আজীজ ইবনে বায রহ.

وقال العلامة عبد العزيز بن باز: وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه. (مجموع فتاوى للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المتوفى: ١٤٢٠هـ)

অনুবাদ : হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম, সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি এবং স্থায়ী ফতওয়া বোর্ড "আল লাযনাতুত দায়েমাহ..."-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, শায়খ আব্দুল আজীজ ইবনে বায রহ. প্রথমে নিজের

মতামত পেশ করেন, অতঃপর বলেন, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের একটি সিদ্ধান্ত এ মর্মে প্রকাশিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস এবং ঐ অর্থে বর্ণিত আরো যা আছে তার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখাই গ্রহণযোগ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে জাবরীন রহ.

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله: (عضو في اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.) إذا رؤي الهلال في المملكة مثلاً، هل يجب على أهل البلاد الأخرى الصيام أم أنه يعتبر لكل أهل بلدة رؤيتهم؟ فأجاب: هذه مسألة خلافية. القول الأول: أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم أهل البلاد الأخرى أن يصوموا...

অনুবাদ : সৌদি আরবের স্থায়ী ফতওয়া বোর্ড "আল লাযনাতুত দায়েমাহ.."-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে জাবরীন রহ. (মৃত্যু-১৪৩০) এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোন এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে অন্য শহরবাসীদের জন্য রোজা রাখা জরুরী হবে নাকি প্রত্যেক শহরের জন্য ভিন্নভাবে চাঁদ দেখতে হবে? জবাবে তিনি বলেন, এ মাসআলাটি বিরোধপূর্ণ। প্রথম মত হলো-কোন এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে অন্য শহরবাসীদের জন্য রোজা রাখা জরুরী হবে।

القول الثاني: أن لكل أهل بلدة رؤيتهم. وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماء منهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وألّف في ذلك رسالة أيدها كذلك بالأحاديث. ومن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول قصة كريب ....ففي هذا الحديث: أن ابن عباس جعل لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم وأن كلاًّ منهم يصوم إذا أهلّ عليه الهلال.

অনুবাদ : আর দ্বিতীয় মতটি হলো-প্রত্যেক শহরবাসীদের জন্য ভিন্নভাবে চাঁদ দেখতে হবে। কিছু উলামায়ে কিরাম এ মত গ্রহণ করেছেন। তম্মধ্যে শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে হুমায়েদ রহ. অন্যতম। তিনি এ ব্যাপারে একটি পুস্তিকাও প্রণয়ন করেছেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি বিভিন্ন হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তম্মধ্যে একটি হলো হযরত ইবনে আব্বাস রা.

থেকে বর্ণিত হাদীস। ঐ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, শাম দেশের জন্য তাদের চাঁদ দেখা কার্যকর। আর মদীনাবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখা কার্যকর। আর প্রত্যেকেই রোজা রাখবে যখন তারা চাঁদ দেখবে। তিনি আরো বলেন,

القول الثالث: أن رؤية أهل المشرق رؤية لأهل المغرب ولا عكس؛ والسبب أنه إذا رؤي في المشرق لزم أن يُرى في المغرب ولابد؛ وذلك لأنه لا يغيب عن أهل المشرق قبل أن يغيب عن أهل المغرب. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره.

অনুবাদ : আর তৃতীয় মতটি হলো-পূর্ব দিগন্তের মানুষরা চাঁদ দেখলে পশ্চিম দিগন্তের মানুষের জন্য তা কার্যকর হবে। তবে এর বিপরীতে পশ্চিম দিগন্তের মানুষ চাঁদ দেখলে পূর্ব দিগন্তের মানুষের জন্য কার্যকর হবে না। আর তার কারণ এই যে, পূর্ব দিগন্তে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়া জরুরী। যেহেতু পূর্ব দিগন্তে চাঁদ ডোবার পূর্বে পশ্চিম দিগন্তে ডুবতে পারে না। এ মতই গ্রহণ করেছেন শায়খ ইবনে তাইমিয়া এবং অন্যান্যরা। তিনি সবশেষে বলেন,

والراجح: القول الثاني: وهو أن لكل أهل بلدة رؤيتهم إذا كان هناك مسافة بين البلدتين يمكن أن يُرى في البلدة الأخرى. وهذا ما عليه العمل.

অনুবাদ : এ ব্যাপারে প্রাধান্য পাবে দ্বিতীয় মতটি। অর্থাৎ যদি দুই শহরের মধ্যে এতটা দুরত্ব থাকে যে, এক শহরে চাঁদ না দেখা গেলেও অন্য শহরে দেখা যেতে পারে তাহলে প্রত্যেক শহরবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখা কার্যকর হবে। আর এর উপরই মানুষের আমল রয়েছে। (আবুত তুরাব সায়্যিদ ইবনে হুসাইন কর্তৃক লিখিত নিদাউর রয়্যান কিতাবে : ৩৩৪/৩)

এ মাসআলায় হানাফী মাযহাবের অবস্থান

এ মাসআলার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও পূর্বোক্ত মহামনী-ষীগণের অনুরূপ। অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং নিকটবর্তী শহরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য কার্যকর। তবে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন হয়ে থাকে এমন দূরত্বে অবস্থিত শহরগুলোর ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য কার্যকর হবে না। বরং প্রত্যেক শহরে স্বতন্ত্রভাবে চাঁদ দেখতে হবে।

'চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় সুতরাং পশ্চিমের চাঁদ দেখা

পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়’ এ কথাগুলো হানাফী মাযহাবের মূল তিন ইমাম তথা আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কারো থেকেই বর্ণিত নয়। জাহিরুর রিওয়ায়েত তথা ইমাম মুহাম্মাদের লিখিত ছয়টি কিতাব যা হানাফী মাযহাবের মূল হিসেবে খ্যাত এর কোন কিতাবে এ মতটি উল্লেখ নেই। তবে ঐ ছয় কিতাব ব্যতীত হানাফী মাযহাবের নাদির তথা দুর্লভ বর্ণনায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে যে শহরের অধিবাসী-রা উনত্রিশ রোযা রেখেছেন তারা একটি রোযা কাযা করবেন। এ মাসআল-ার ভিত্তিতে পরবর্তী কিছু ইমাম বলতে আরম্ভ করেছেন যে, হানাফী মাযহাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। অথচ হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী নির্ভরযোগ্য ফকীহগণ এ মাসআলার এমন অর্থ করেননি। বরং তাঁরা বুঝেছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে কার্যকর; দূরের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়। দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অনুসরণীয় নয়। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতীত হানাফী মাযহাবের মূল মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিলো সে সকল গ্রন্থেও এ মাসআলা বর্ণিত হয়নি। হানাফী মাযহাবের পরবর্তী কোন কোন কিতাবে যদিও খুলাসা ও খানিয়ার বরাতে এ মাসআলা লিখিত আছে, তবে এগুলোর লেখকগণ সকলেই দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য কার্যকর না হওয়ার মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন।

অতএব, উদয়স্থলের ব্যবধান ঘটতে পারে এমন দুরত্বে অবস্থিত প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য তাদের নিজেস্ব চাঁদ দেখা কার্যকর হবে।

মুসাফিরের উপর ঈদের নামায জরুরী নয়

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ

অনুবাদ : হযরত ইমাম যুহরী রহ. বলেন, মুসাফিরের জন্য ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নামায জরুরী নয়। তবে তারা শহরে বা গ্রামে থাকলে তাদের সাথে নামাযে শরিক হতে পারে। (আব্দুর রাযযাক : ৫৭২০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু’। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-

মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : ইমাম যুহরী রহ. (মৃত্যু ১২৫ হি.) অনেক সাহাবায়ে কিরামকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছেন এবং তাঁদের আমল দেখেছেন। যদিও তিনি এখানে তাঁদের উদ্ধৃতি পেশ করেননি।

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَضْحَى وَلَا فِطْرٌ وَلَا جُمُعَةٌ.

অনুবাদ : হযরত মাকহুল রহ. বলেন, মুসাফিরের জন্য ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং জুমুআ'র নামায কোনটাই নেই। (ইবনে আবী শাইবা-৫১৩৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : হযরত মাকহুল রহ. (মৃত্যু-১০০ হি.) সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, فقيه الشام তিনি ছিলেন শামের ফকীহ। তিনি অনেক সাহাবায়ে কিরামকে পেয়েছেন এবং তাঁদের আমল দেখেছেন। সুতরাং হযরত মাকহুল রহ.-এর ফতোয়ার অর্থই হলো-তিনি সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য বা আমল থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এ ছাড়া মক্কা বিজয়ের বছর রমাযানের দু'দিন অতিবাহিত হলে রসূল স. সাহাবায়ে কিরামকে অভিযানে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (মুসনাদে আহমদ-১১৮২৬) আর ১২ দিন সফরের পরে তাঁরা ১৩ই রমাযান সকালে মক্কায় গিয়ে পৌঁছলেন। (দালাইলুন্ নুবুওয়াত লিলবায়হাকী, অধ্যায়: রসূল স.-এর মক্কা অভিযান) ১৯ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন (বুখারী-৩৯৬৮) এবং শাওয়াল মাসের শুরু দিকে বা রমাযানের শেষ দিকে হুনাইন অভিযানে মক্কা ছেড়েছেন। (ফাতহুল বারী, অধ্যায়: মক্কা অভিযান)

এ সকল বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অষ্টম হিজরী ১লা শাওয়াল রসূল স. মক্কায় বা হুনাইনের পথে ছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি ঈদুল ফিতরের নামায পড়েছেন এমন কোন বর্ণনা কোন হাদীসের কিতাব বা ইতিহ-াসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের জন্য ঈদের নামায জরুরী নয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৬৫)

ঈদের নামাযের পূর্বে গোসল করা

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

অনুবাদ : হযরত যাজান থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত আলী

রা.-এর নিকট গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি উত্তরে বললেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করতে হয়। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৮২২, আব্দুর রায্‌যাক-৫৭৫১)

হাদীসটির স্তরঃ সহীহ, মাওকূফ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-১৬৭২০ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : খলীফায়ে রাশেদের ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিন গোসল করা মুস্তাহাব।

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

অনুবাদ : হযরত নাফে' রহ. বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. উভয় ঈদের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। (মুয়াত্তা মালেক: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাওকূফ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-১৬৭২০ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : সাহাবার আমল সম্বলিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে গোসল করতে হয়।

قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا اغْتَسَلْتَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَا بَأْسَ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, যদি তুমি জুমুআ এবং দুই ঈদে গোসল করো তাহলে তা-ই উত্তম। আর যদি না করো তাতে কোন দোষ নেই। (কিতাবুল আছার লিমুহাম্মাদ-৬৯)

ঈদের নামাযে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ، أَوْ فِي يَوْمِ أَضْحَى، خَرَجَ فِي ثَوْبِ قُطْنٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ يَمْشِي.

অনুবাদ : হযরত ঝির ইবনে হুবাইশ রহ. বলেন, হযরত ওমর রা. ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন সুতি কাপড় গায়ে জড়িয়ে হেঁটে হেঁটে বের হয়ে গেলেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৬৫৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-

মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : খলীফায়ে রাশেদের আমল সম্বলিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া ছুন্নাত।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّكُوبَ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. উভয় ঈদের দিন এবং জুমুআর দিন সওয়ার হয়ে যাওয়া অপছন্দ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৬৫৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : বিশিষ্ট তাবিঈ ও মুজতাহিদ ইমাম হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া ছুন্নাত। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়ার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৬৫১) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৬৮)

ঈদুল ফিতিরে কিছু খেয়ে যাওয়া ছুন্নাত ঈদুল আযহায় নয়

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَنْبَأَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ، وَثنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، قَالُوا: ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَ ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহের দিকে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিনে নামায আদায় করে ফিরে আসার পূর্বে কিছু খেতেন না। (মুসতাদরাকে হাকেম-১০৮৮,

তিরমিযী : ৫৪২, ইবনে মাযা-১৭৫৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম-১০৮৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে যাওয়া ছুন্নাত। আর ঈদুল আযহার দিন নামায থেকে ফিরে এসে খাওয়া ছুন্নাত। হযরত আনাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. ঈদুল ফিতরের দিনে বেজোড় সংখ্যায় খেয়ে ঈদগাহের দিকে রওনা হতেন। (বুখারী-৯০৫) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৬৮)

ঈদের নামাযে এক রাস্তায় যাওয়া ও ভিন্ন রাস্তায় আসা উত্তম

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ (رواه البخارى فى بَابِ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدِ–١/١٣٤)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ঈদের দিনে (যাওয়া ও আসার) রাস্তা ভিন্ন করতেন। (বুখারী-৯৩৪)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদগাহে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং ভিন্ন রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা ছুন্নাত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৬৯) হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে অনুরূপ হাদীস আরো বর্ণিত হয়েছে মুসতাদরাকে হাকেম : ১০৯৯, ইবনে হিব্বান-২৮১৫, তিরমিযী-৫৪১ এবং ইবনে মাযা-১৩০১ নম্বরে। ছুন্নাত আদায় ছাড়াও এ আমলের একটা ভিন্ন ফায়দা হলো- বেশি মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া। অবশ্য অনেক গবেষক আলেম বলেন, এ আমলটি কেবল রসূল স.ই করতেন, অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম করতেন বলে প্রমাণ মেলে না। সুতরাং এটা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য যা জনসাধারণের জন্য অনুকরনীয় নয়। এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলে থাকেন যে, নেতাদেরকে দেখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ জনতার ভীড় সৃষ্টি হয় যা রাস্তায় নির্বিঘ্নে চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি করে আবার নেতাদের নিরাপত্তার জন্যও হুমকি সৃষ্টি করে। তাই নামায শেষে ভিন্ন পথে চলে গেলে উভয় সমস্যা থেকেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ কারণে অনেক উলামায়ে কিরাম

এটা নেতাদের ছুন্নাত বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ঈদের নামাযে যাওয়া আসার পথে তাকবীর বলা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْعِيدِ، وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ الْإِمَامُ

অনুবাদ : হযরত নাফে’ রহ. বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. সকালে ঈদগাহে যেতেন এবং ইমামের আগমন পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে থাকতেন। (ইবনে আবী শাইবা-৫৬৬৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। ইমাম বায়হাকী বলেন, وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. مَوْقُوفٌ এ হাদীসটি সহীহ, মাউকূফ। (বায়হাকী, সুনানে কুবরা-৬১২৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযে যাওয়ার পথে তাকবীর বলা ছুন্নাত। এ হাদীসে উচ্চস্বরে তাকবীর বলার আমল বর্ণিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ রহ. বলেন, উভয় ঈদে যাতায়াতের পথেই উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন যে, তাকবীর হলো জিকির। আর জিকিরের মূল হলো নীরবে বলা। এ হিসেবে উভয় ঈদের যাতায়াত পথে নীরবে তাকবীর পড়া উচিত। তবে কুরবানীর দিনগুলোতে তাকবীর বলার নির্দেশ ছূরা বাকারা-২০৩ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। সুতরাং ঈদুল আযহায় যাতায়াতের সময় উচ্চস্বরে তাকবীর পড়বে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৭০) ঈদগাহে যাতায়াতের পথে তাকবীর বলার আমল আরো বর্ণিত হয়েছে সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে-(ইবনে আবী শাইবা-৫৬৬৯), আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে- (ইবনে আবী শাইবা-৫৬৬৯) এবং ইমাম যুহরী সূত্রে তাঁর সময়ের লোকদের আমল। (ইবনে আবী শাইবা-৫৬৭৫)

ঈদের নামাযের ওয়াক্ত

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ:

إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (رواه ابو داود فى بَابِ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ–١٦١/١ ورواه ابن ماجة)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রা. যিনি রসূল স.-এর সাহাবা তিনি মানুষের সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন বের হলেন এবং ইমাম সাহেবের নামায দেরিতে পড়ার প্রতিবাদ করলেন। অতঃপর বললেন, আমরা এ সময়ের মধ্যে নামায পড়া শেষ করে ফেলতাম, আর তখন ছিল ইশরাক নামাযের ওয়াক্ত। (আবূ দাউদ-১১৩৫, ইবনে মাযা-১৩১৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম নববী রহ. বলেন, رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. হাদীসটি আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা এমন সনদে বর্ণনা করেছেন যা মুসলিমের শর্তে সহীহ। (খুলাছাতুল আহকাম-২৯১৪ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূর্য কিছু দূর উপরে উঠলে ঈদের নামাযের সময় হয় যা সাধারণত ইশরাক নামাযের সময়। আর সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়া পর্যন্ত থাকে । অতএব, ডবনা কারণে বেশি দেরি না করা। অবশ্য বিশেষ কোন কারণ থাকলে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত তথা সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার অল্প পূর্ব পর্যন্ত দেরি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে হযরত মুয়াবিয়া থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে দিনের শুরুতে ঈদের নামায পড়েছেন। (নাসাঈ : ১৫৯৪, আবূ দাউদ-১০৭০) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৭১, ১৭২)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ)

অনুবাদ : আনসারী সাহাবায়ে কিরাম বলেন, শাওয়ালের চাঁদ আমাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে গেলো। ফলে আমরা রোজা অবস্থায় সকাল

যাপন করলাম। দিনের শেষ ভাগে এক সাওয়ারী দল এসে রসূল স.-এর নিকট সাক্ষ্য দিলো যে, তারা গত রাতে চাঁদ দেখেছে। রসূল স. সাহাবায়ে কিরামকে রোজা ভাঙ্গার এবং পরদিন সকালে ঈদের নামাযে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। (ইবনে মাযা-১৬৫৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম দারাকুতনী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (দারাকুতনী-২২০৩) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এটাকে উত্তম সনদ বলেছেন। (ইবনে মাযা-১৬৫৩ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দিনের অর্ধেক পার হওয়ার পরে চাঁদ দেখার সিদ্ধান্ত হলে রোজা ছেড়ে দিতে হবে আর ঐ দিন ঈদের নামাযের সময় না থাকার কারণে পরের দিন সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পূর্বে ঈদের নামায আদায় করবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৭৬)

ঈদের নামাযে আযান-ইকামাত নেই

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ (رواه مسلم فى كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ–١/٢٨٩)

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর পিছনে আযান ও ইকামাত ব্যতীত ঈদের নামায পড়েছি। তা এক দু'বার নয় বরং বহুবার পড়েছি। (মুসলিম : ১৯২৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। (জামে-উল উসূল-৪২৩৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযে আযান-ইকামাত নেই। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (বাদায়েউস সানায়ে': ১/১৫২)

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ، الْمَعْنَى قَرِيبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ، يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى

الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ (رَوَاه ابُوْ دَاود فِيْ بَابِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ–١٦٣/١)

অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনুল আস রহ. হযরত আবু মুসা আশআরী ও হযরত হুজাইফা রা.কে জিজ্ঞেস করলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. দুই ঈদের নামাযে কতবার তাকবীর দিতেন? জবাবে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বললেন, জানাযার তাকবীরের মতো ৪ বার তাকবীর দিতেন। তখন হুজাইফা রা. বললেন, আবু মুসা সত্য বলেছেন। আবু মুসা রা. আরো বললেন, আমি বসরা থাকাবস্থায় এভাবেই তাকবীর বলতাম। বর্ণনাকারী আবু আয়েশা রহ. বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল আস-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (আবূ দাউদ : ১১৫৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেনে। (আবূ দাউদ-১১৫৩ নং হাদীসের আলোচনায়)

কিছু ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ হাদীসে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. ঈদের নামাযে চার-চার তাকবীরের কথা বলেছেন। এর ব্যাখ্যা আব্দুর রাযযাক : ৫৬৮৭ নং হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম রাকাতের কিরাতের পূর্বে তাকবীর চারটি। (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীর হবে তিনটি) আর দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পরে তাকবীর চারটি তার শেষ তাকবীরে রুকু করবে। (অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি) তাহলে দু'রাকাত নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর মোট ছয়টি। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, রসূল স. ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলতেন। আমরা এভাবেই ঈদের নামায পড়ে থাকি।

অনুরূপ অর্থে চার তাকবীর সম্বলিত আরো বেশ কিছু হাদীস সহীহ বা হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَانَا، قَالَا: ثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ الْقَاسِمَ، أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى بِنَا، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ, وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, وَالْوَضِينُ وَالْقَاسِمُ كُلُّهُمْ أَهْلُ رِوَايَةٍ, مَعْرُوفُونَ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ

অনুবাদ : হযরত কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান রহ. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কোন এক সাহাবা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে ঈদের দিনে নামায পড়ালেন। তাতে ৪বার অতঃপর ৪বার তাকবীর বললেন,। নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করে হাতের অপর ৪ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, তোমরা ভুলে যেও না, এটা জানাযার তাকবীরের মতো। ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, এ হাদীসের সনদ হাসান। আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে হামযা, ওয়াযীন ইবনে আতা এবং কাসেম সকলেই বর্ণনায় পারদর্শী এবং সহীহ বর্ণনা পেশ করায় পরিচিত। (ত্বহাবী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭১, হাদীস নং-৭২৭৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, এ হাদীসের সনদ হাসান। বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, **وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات**. হাদীসটির সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (নুখাবুল আফকার : ১৬/৪৪২)

পর্যালোচনা : এ সহীহ হাদীসটি বর্ণনান্তে ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যার বিষয়টি যদি সনদের দৃঢ়তা দিয়ে ফায়সালা করতে হয় তাহলে এ হাদীসটি গ্রহণ করা বেশি উত্তম হবে।

ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর এ মন্তব্যের কারণ এই যে, তাঁর অনুসন্ধানে ঈদের নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে রসূল স. থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সনদের বিবেচনায় এর চেয়ে দৃঢ় হাদীস নেই। যদিও একক সনদে এটা উঁচু মানের সহীহ নয়। তবুও সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের ব্যাপক আমল এর অনুকুলে থাকায় এ হাদীসের দৃঢ়তাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ইমাম আহমদ রহ. অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, "ঈদের নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীস নেই"। (নাসবুর রায়াহ : ঈদের নামায অধ্যায়) হয়তো তিনি এ মন্তব্য দ্বারা একক

সনদে বর্ণিত উঁচু মানের সহীহ হাদীস উদ্দেশ্য নিয়েছেন, এ হাদীসটির একক সনদ সে মানে পৌঁছেনি।

চার তাকবীরের ব্যাখ্যা প্রথম হাদীসের সারসংক্ষেপে দেখুন।

এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের আমল

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বসেছিলেন। তাঁর কাছে হযরত হুজাইফা ও আবু মুসা আশআরী রা. উপস্থিত ছিলেন। সাঈদ ইবনুল আছ তাঁদের দু'জনকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে নামাযের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাঁদের একজন অপরজনকে দেখিয়ে বলতেছিলেন যে, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করো। আবার অপরজন বলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করো। পরে হযরত হুজাইফা বললেন, এ বিষয়টি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করুন। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ৪ বার তাকবীর দিয়ে কুরআন পাঠ করবে। তাকবীর বলে রুকু করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে কুরআন পড়ে ৪ বার তাকবীর বলবে। (আব্দুর রাযযাক : ৫৬৮৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, **رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد صَحِيح** "আব্দুর রাযযাক ইবনে মাসউদ থেকে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন"। (আদ্‌দিরায়াহ : হাদীস নম্বর-২৮৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসের বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ রা. স্পষ্ট বলেছেন যে, প্রথম রাকাতের কিরাতের পূর্বে তাকবীর চারটি। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীর হবে তিনটি। আর দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পরে তাকবীর চারটি তার শেষ তাকবীরে রুকু করবে। তাহলে

অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। দু'রাকাত নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর মোট ছয়টি। আমরা এভাবেই ঈদের নামায পড়ে থাকি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بن الْمَرْزُبَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، قَالَ: أَرْسَلَ الْوَلِيدُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا عِيدُ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ الصَّلاةُ؟ فَقَالُوا: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:"يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْكَعُ فَتِلْكَ خَمْسٌ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِي آخِرِهِنَّ فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيدَيْنِ فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

অনুবাদ : কুরদুস ইবনে আব্বাস রহ. বলেন, হযরত ওয়ালিদ ইশার নামাযের পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুজাইফা, আবু মাসউদ এবং হযরত আবু মুসা আশআরী রা.-এর নিকট লোক পাঠালেন। প্রেরিত দূত তাঁদের নিকট গিয়ে বললো, এটা মুসলমানদের ঈদ। আপনারা বলে দিন যে, নামাযের পদ্ধতি কেমন হবে? তাঁরা সবাই বললেন, হযরত আবু আব্দুর রহমান অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করুন। জবাবে হযরত ইবনে মাসউদ বলেন, ঈদের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে ৪ বার তাকবীর বলে ছূরা ফাতিহা ও মুফাছছল থেকে অপর একটি ছূরা পড়বে এবং পুনরায় তাকবীর বলে রুকু করবে। এ হলো মোট ৫টি তাকবীর। এরপর দাঁড়িয়ে ছূরা ফাতিহা ও মুফাছ্ছাল থেকে অপর একটি ছূরা পড়বে। অতঃপর ৪ বার তাকবীর বলবে যার শেষ তাকবীরে রুকু করবে। এ হলো সর্বমোট ৯টি তাকবীর। তিনি এ কথা বলার পরে তাদের কেউই এর প্রতিবাদ করেননি। (আল্ মু'জামুল কাবীর লিত্তবারানী-৯৪০০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। আল্লামা হাইসামী বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য"। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৩২৪৭) হযরত ইবনে হাযাম এ হাদীসটির সনদকে উঁচু মানের সহীহ বলেছেন। (মুহাল্লা : ঈদের নামায অধ্যায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ঈদের নামাযে দাঁড়িয়ে ৪ বার তাকবীর বলে ছূরা ফাতিহা ও মুফাছ্ছল থেকে অপর একটি ছূরা পড়বে এবং পুনরায় তাকবীর বলে রুকু করবে। এ হলো মোট ৫টি তাকবীর। তাকবীরে তাহরীমা এবং রুকুর তাকবীর ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। এরপর দাঁড়িয়ে ছূরা ফাতিহা ও মুফাছ্ছাল থেকে অপর একটি ছূরা পড়বে। অতঃপর ৪ বার তাকবীর বলবে যার শেষ তাকবীরে রুকু করবে। এর মধ্যে রুকুর তাকবীর ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি। এ হলো সর্বমোট ৯টি তাকবীর যার মধ্যে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত ছয়টি। অন্য চারটি এমন তাকবীর যা সকল নামাযে দেয়া হয়ে থাকে। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামও এটা সমর্থন করেন। আমরা এভাবেই ঈদের নামায পড়ে থাকি।

অনুরূপ অর্থে নয় তাকবীর সম্বলিত আরো বেশ কিছু হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً .

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে দেখেছি, তিনি বসরায় ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর দিলেন এবং উভয় রাকাতের কিরাতকে মিলালেন। আমি মুগীরা ইবনে শু'বা রা.কেও অনুরূপ করতে দেখেছি। অতঃপর আমি খালিদ হাজ্জাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে আব্বাস রা. নয় তাকবীর কীভাবে দিলেন? তিনি আমাকে (পূর্ববর্ণিত) মা'মার ও সাওরীর মাধ্যমে আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিলেন। (আব্দুর রাযযাক: ৫৬৮৯) অর্থাৎ নিয়মিত তাকবীর ব্যতীত অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বললেন,।

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (আদ্দিরায়াহ : ২৮৬ নম্বর হাদীস-এর আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক ৯ তাকবীরের ব্যাখ্যা হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আল্ মু'জামুল কাবীর লিত্তব-ারানী-এর ৯৪০০ নম্বর হাদীসের সারসংক্ষেপে দেখুন। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

এ ব্যাখ্যা মতে নয় তাকবীরের হাদীস সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস রা. থেকে-(ইবনে আবী শাইবা : ৫৭৬০)। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন-(নুখাবুল আফকার : পৃষ্ঠা-৪৫৪, খণ্ড-১৬)। আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. থেকে-(ইবনে আবী শাইবা : ৫৭৫৬)। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। এ সকল হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

এ ব্যাপারে বিশিষ্ট তাবিঈনে কিরামের আমল

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বর্ণনা করেন যে, হযরত আসওয়াদ এবং মাসরূক রহ. ঈদের নামাযে ৯টি তাকবীর দিতেন। (ত্বহাবী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৩, হাদীস নং-৭২৯৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকারঃ খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪৫৮)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি। এ বিষয়ে সহীহ সনদে ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রগণ (যারা প্রবীণ তাবিঈ) ঈদের নামাযে নয় তাকবীর দিতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৭৬১) হযরত হাসান বসরী রহ. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, নামাযের তাকবীরসহ তিনি ঈদের নামাযে ৯টি তাকবীর দিতেন। (ত্বহাবীঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৩, হাদীস নং-৭২৯৫) আল্লামা আইনী এটাকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকারঃ খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪৫৯) ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, (অতিরিক্ত তাকবীরসহ) ঈদের

নামাযের তাকবীর ৯টি। (ত্বহাবী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৩, হাদীস নং-৭২৯৬) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এটাকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার : পৃষ্ঠা-৪৫৯, খণ্ড-১৬) এ ব্যাপারে সহীহ সনদে হযরত ইবনে ছীরীন রহ. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদের তাকবীরের ব্যাপারে যা বলেছেন তা হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তাকবীরের অনুরূপ। (ত্বহাবী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৩, হাদীস নং-৭২৯৮) আল্লামা আইনী এটাকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার : পৃষ্ঠা-৪৫৯, খণ্ড-১৬) সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে ইমাম শা'বী ও মুসাইয়াব ইবনে রাফে' রহ. থেকে। (ইবনে আবী শাইবা : ৫৭৭৪) হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। এ সকল হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا رَوْحٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ أَبَا عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: «ثَلَاثًا ثَلَاثًا ,سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ.

অনুবাদ : হযরত হামঝা ইবনে হাবীব বলেন, আমি ইমাম শা'বী রহ. থেকে শুনেছি যে, নামাযের তাকবীর ব্যতীত তিনটি করে (মোট ছয়টি) তাকবীর দিতে হবে। (ত্বহাবী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৩, হাদীস নং-৭২৯৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার: পৃষ্ঠা-৪৫৯, খণ্ড-১৬)

ফায়দা : অতিরিক্ত ছয় তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার দলীল হিসেবে হাসান ও সহীহ সনদে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ও তাঁর বাণী, (আবূ দাউদ : ১১৫৩, ত্বহাবী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭১, হাদীস নং-৭২৭৩) সহীহ সনদে বর্ণিত জলীলুল কদর সাহাবায়ে কিরামের আমল ও মন্তব্য (আব্দুর রাযযাক : ৫৬৮৭ ও ৫৬৮৯, তবারানী: ৯৪০০ এবং ইবনে আবী শাইবা: ৫৭৫৬ ও ৫৭৬০) এবং সহীহ সনদে বর্ণিত বিশিষ্ট তাবিঈদের আমল ও মন্তব্য (ইবনে আবী শাইবা : ৫৭৬১, ৫৭৬৫ ও ৫৭৭৪)-এর ভিত্তিতে আমরা অতিরিক্ত ৬ তাকবী-রের সাথে ঈদের নামায আদায় করে থাকি এবং এটাকে উত্তম বলে বিশ্বাস করি।

এর বিপরীতে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায আদায় করার কথাও হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত ৫৩৬ নম্বর হাদীসকে ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান বলার পাশাপাশি এ মন্তব্য করেন

যে, وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ হাদীসটি এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস-সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের বিশ্লেষন মতে ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান এবং এ অধ্যায়ের মধ্যে সর্বোত্তম বলে মন্তব্য করা যথার্থ নয়। কারণ এ হাদীসের সনদে কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাঁর ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, **منكر الحديث** "তাঁর হাদীস অগ্রহণযোগ্য"। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, **ضعيف الحديث** "তাঁর হাদীস জঈফ"। আবূ দাউদ বলেন, **كان أحد الكذابين** "তিনি মিথ্যাবাদীদের একজন"। ইমাম দারাকুতনী বলেন, **متروك الحديث** "তাঁর হাদীস পরিত্যাক্ত"। (তাহজীবুত তাহজীব ও তাহজীবুল কামাল থেকে সংগৃহীত)। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, **ضعيف: أفرط من نسبه إلى الكذب** "তিনি জঈফ, যারা তাঁকে মিথ্যার দিকে সম্বোধন করেছে তারা বাড়াবাড়ি করেছে"। (তাকরীব : ৬৩০৮)। সুতরাং এমন রাবীর বর্ণিত হাদীস কীভাবে হাসান স্তরে উন্নীত এবং সর্বোত্তম হয়? এ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী রহ. নিজে তাঁর ইলালুল কুবরায় বলেন, ইমাম বুখারী রহ.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এটাকে জঈফ বলেছেন। (আল ইলালুল কাবীর: ঈদের নামাযের তাকবীর অধ্যায়) ইমাম দারাকুতনী রহ. এটাকে মুজতরাব বলেছেন। (ইলালুদ দারাকুতনী : ৩৪৫৮)

১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীস আরো বর্ণিত আছে আবূ দাউদ : **১১৪৯** ও **১১৫০** নম্বরে। এ দুটি হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআহ। তিনি যদিও মুসলিমের রাবী কিন্তু তাঁর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, **كان ضعيفا لا يحتج بحديثه** "তিনি জঈফ, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়"। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন, **ليس بثقة** "তিনি নির্ভরযোগ্য নন"। ইবনে আবী হাতেম বলেন, **سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقي و ابن لهيعة: أيهما أحب إليك ؟ فقالا: جميعا ضعيفان** "আমি আমার পিতা আবু হাতিমকে এবং আবু যুরআকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআহ এবং ইফরিকী এ দুজনের মধ্যে আপনার নিকট কে প্রিয়? তাঁরা বললেন, দুজনই জঈফ"। (তাহজীবুল কামাল ও তাহজীবুত তাহজীব থেকে সংগৃহীত) ইমাম তাহাবী বলেন, **قلت: العمل على تضعيف حديثه** "তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো তাঁর

হাদীসকে জঈফ গণনা করা"। (আল কাশেফ : ২৯৩৪) অবশ্য আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব রহ. ইবনে লাহিআ থেকে যা বর্ণনা করেন তা অন্যদের বর্ণনার চেয়ে তুলনামূলক বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু উক্ত বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআ নিঃসঙ্গ হওয়ায় সে প্রাধান্যের দিকটিও দুর্বল হয়ে গেছে। হাকেম এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. বলেন, تفرد به ابن لهيعة "হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআ একাই বর্ণনা করেছেন"। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১১০৮ নম্বর হাদীস ও ইমাম ঐাহাবীর তালখীছে)

১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীস আরো বর্ণিত আছে আবূ দাউদ : ১১৫১ ও ১১৫২ নম্বর হাদীসে। এ দুটি হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তায়েফী। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে কিছু মুহাদ্দিসীনে কিরামের আপত্তিও রয়েছে। عن ابن معين : ضعيف "হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন, তিনি জঈফ"। আবু হাতিম বলেন, ليس بقوى ، لين الحديث "তিনি শক্তিশালী নন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নরম"। ইমাম নাসাঈ বলেন, ليس بذاك القوى و يكتب حديثه "তিনি তেমন মজবুত নন। তবে তাঁর হাদীস লেখার যোগ্য"।

উপরিউক্ত তথ্যের দ্বারা ইবনে লাহিআ বা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তায়েফী রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা দেখানো উদ্দেশ্য যে, ইবনে লাহিআ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তায়েফীর মাধ্যমে বর্ণিত ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীসের তুলনায় পূর্ববর্ণিত ৬ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার হাদীস তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী। এ কারণে আমরা ৬ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার আমলকে উত্তম মনে করি। তবে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার আমলকেও বৈধ মনে করি। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (২/১৭২)

প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে সামান্য দেরি করা

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, দুই তাকবীরের মাঝে একটি শব্দ বলা পরিমাণ সময় দেরি করবে। (আব্দুর রাযযাক : ৫৬৯৭ আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী-৯৫২৩)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকূফ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসের সনদকে শক্তিশালী বলেছেন। (তালখীছুল হাবীর-২/১৭৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর প্রদানের সময় প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে সামান্য সময় অপেক্ষা করতে হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (২/১৭৫)

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরের সময় হাত উঠানো

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ "

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তাকবীর বলতেন। হাত দুটি আবার সেভাবে রেখেই রুকু করতেন। পুনরায় রুকু থেকে ওঠার ইচ্ছা করলে উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর سمع الله لمن حمده বলতেন। আর সিজদাতে (যাওয়ার সময়) হাত উঠাতেন না। তবে রুকুর পূর্বের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাতেন। এভাবে নামায শেষ হতো। (আবূ দাউদ-৭২২, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৬১৮৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح হাদীসটি সহীহ। (আবূ দাউদ-৭২২ নং হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে ওমর রা. রুকুর পূর্বে প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করতেন। সুতরাং ঈদের নামাযে রুকুর পূর্বে প্রতি তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করতে হবে। আমরা এ হাদীসের উপর যথারীতি আমল করে থাকি। আর এ হাদীসে রুকুর কথা উল্লেখ থাকার কারণে জানাযার নামাযকে এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম মনে করি। তাই জানাযার নামাযের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করি না। ঈদ ও জানাযা ব্যতীত বাকী সব নামাযে রুকুর পূর্বে সব

তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করার আমলকে আমরা ছুন্নাত বলে স্বীকার করি। তবে সহীহ হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর আমল, হযরত ওমর, ইবনে ওমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ রা.সহ জলীলুল কদর সাহাবাদের আমলের অনুকরণে শুধু তাকবীরে তাহরীমাতে হাত উত্তোলন করে থাকি এবং এটাকে তুলনামূলক উত্তম বলে বিশ্বাস করি। ঈদের নামাযের আমলের বিপরীতে যেহেতু কোন হাদীস নজরে পড়েনা এবং উম্মতের আমলেও কোন মতবিরোধ দেখা যায় না সেহেতু এটাকে আমরা নির্দিধায় ছুন্নাত হিসেবে বিশ্বাসও করি, আমলও করি।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ اللَّخْمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ.

অনুবাদ : আবু যুরআহ রহ. বলেন, হযরত ওমর রা. উভয় ঈদের প্রতি তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতেন। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৬১৯০)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। এ হাদীসের আলোচনায় ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, وَهَذَا مُنْقَطِعٌ এটা সনদ বিচ্ছিন্ন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতে হয়। হাদীসটি জঈফ হওয়া সত্ত্বেও এটা উক্ত আমলের দলীল হতে পারে। কারণ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করার আমল মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর লিখিত 'আন নুকাত আলা ইবনে সালাহ' ১ম খণ্ডের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. তাঁর লিখিত কিতাব 'আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনে সালাহ, ১ম খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, জঈফ হাদীস যদি উম্মত গ্রহণ করে নেয় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে সেটা আমলযোগ্য বিবেচিত হবে।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةَ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا

অনুবাদ : হযরত ইবনে জুরাইয রহ. বলেন, আমি হযরত আতা রহ.কে বললাম, ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরে কি ইমাম হাত উঠাবে? উত্তরে

তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি উঠাবেন এবং লোকেরাও উঠাবে। (আব্দুর রাজ্জাক : ৫৬৯৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত সকল হাদীস ও আছার থেকে থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরের সময় ইমাম এবং তাঁর পিছনের মুক্তাদীগণ সকলেই হাত উত্তোলন করবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৭৪)

ঈদের নামাযে কিরাতের পরিমাণ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا.

অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রা.বলেন, রসূলুল্লাহ স. জুমুআ ও ঈদের নামাযে ছূরা আ'লা এবং গাশিয়া পড়তেন। কখনো কখনো ঈদ এবং জুমুআ একই দিনে হতো তখন উভয় নামাযেই তিনি এ ছূরা দুটি পড়তেন। (তিরমিযী-৫৩৩, আবূ দাউদ-১১২২, ইবনে মাযা-১২১৮, নাসাঈ-১৪২৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ-১১২২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয় ঈদের নামাযে ছূরা আ'লা এবং গাশিয়া বা এ পরিমাণ দীর্ঘ ছূরা পড়া ছুন্নাত। হযরত ওমর রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবু ওয়াকেদ লাইসীকে জিজ্ঞেস করলেন, রসূল স. ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরে কি কিরাত পড়তেন? জবাবে হযরত আবু ওয়াকেদ রা. বলেন, রসূল স. উভয় ঈদে ছূরায়ে কফ এবং ছূরায়ে ক্বমার পাঠ করতেন। (মুসলিম-১৯৩২) এ হাদীসে একটু বড় ধরনের ছূরা পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ দুইয়ের সমন্বয়

এভাবে হতে পারে যে, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ঈদের নামাযের কিরাত খাটো বা লম্বা করা যেতে পারে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (বাদায়েউস সানায়ে' : ১/২৬৯)

ঈদের নামাযের পরে খুৎবা দেয়া ছুন্নাত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ (رواه البخارى فى بَابِ الخُطْبَةِ بَعْدَ العِيدِ–١/١٣١)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূল স. হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রা. সকলেই উভয় ঈদের নামায খুৎবার পূর্বে পড়তেন। (বুখারী-৯১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৩৯)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ قَالَ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ (رواه النسائى فى **التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْجُلُوسِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ**–١/١٧٨)

অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ঈদের নামায আদায়ের পর ইরশাদ করলেন, যে ফিরে যেতে চায় সে যাক, আর যে খুৎবা শুনার জন্য থাকতে চায় সে থাকুক। (নাসাঈ : ১৫৭২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (ইবনে মাযা-১২৯০ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ-১১৫৫ এবং ইবনে মাযা-১২৯০ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৪৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের খুৎবা নামাযের পরে দেয়া ছুন্নাত। আরো প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযের খুৎবা ওয়াজিব নয় এবং খুৎবার সময় সকল মুসল্লীর উপস্থিতিও জরুরী নয়। কারো কোন তাড়া থাকলে সে চলে যেতে পারে। এটাই হানাফী মাযহাবের

মত। (শামী : ২/১৭৫) তবে খুৎবার সময় যারা উপস্থিত থাকবে তাদের জন্য খুৎবা শুনা ওয়াজিব। (শামী : ২/১৫৯)

ঈদের নামাযে দুটি খুৎবা এবং মাঝে একটি বৈঠক হবে

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ (رواه البخارى فى بَابِ الخُطْبَةِ قَائِمًا–١/١٢٥)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন; যেমনটি তোমরা এখন করে থাকো। (বুখারী : ৮৭৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৯৬৮)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. দুটি খুৎবা দিতেন এবং দুই খুৎবার মাঝে বসতেন। আর এটাই খুৎবার ছুন্নাত তরীকা যা উম্মত প্রজন্ম পরম্পরায় আজও অক্ষত রেখেছে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (বাদায়েউস সানায়ে' : ১/২৭৬)

অধ্যায় ১৯ : তারাবীহ

জামাতের সাথে তারাবীহ আদায়ের ফযীলত

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَقَالَ " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ " ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلاَثٌ مِنَ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلاَحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه الترمذى فى بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ–١/١٦٦)

অনুবাদ : হযরত আবু যর রা. বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে রোযা রাখলাম। রমাযান মাসের সাত দিন বাকী থাকা পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ'র নামায পড়ালেন না। অবশেষে মাসের ৭ দিন বাকী থাকাবস্থায় অর্থাৎ ২৩ রমাযানের রাতে আমাদেরকে নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নামায পড়ালেন। অতঃপর মাসের অবশিষ্ট ৬ রাতের ষষ্ঠ রাতে অর্থাৎ চব্বিশ রমাযানের রাতে আমাদেরকে নামায পড়ালেন না। অতঃপর মাসের অবশিষ্ট ৫ রাতের পঞ্চম রাতে অর্থাৎ ২৫ রমাযানের রাতে আমাদেরকে নিয়ে আধা রাত পর্যন্ত নামায পড়ালেন। আমরা বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যদি রাতের অবশিষ্ট সময়টাও আমাদেরকে দান করতেন! রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি

ইমামের সাথে জামাত শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করে তাকে সারা রাত নামায পড়ার ছওয়াব দেয়া হয়। অতঃপর মাসের ৩ রাত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে আর নামায পড়ালেন না। তারপর মাসের অবশিষ্ট তিন রাতের তৃতীয় রাতে অর্থাৎ ২৭ রমাযানের রাতে আবার আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন এবং নিজের স্ত্রী- পরিজনদেরকেও ডেকে তুললেন। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নামায আদায় করলেন যে, আমরা সাহরী ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করলাম। (তিরমিযী : ৮০৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। আর শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীস-টিকে সহীহ বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ-২১৫১০ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২২০)

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, **يُرِيدُ: مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لَا مِمَّا مَضَى مِنْهُ، وَكَانَ الشَّهْرُ الَّذِي خَاطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهَذَا الْخِطَّابِ فِيهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ** রসূল স. সপ্তম ও পঞ্চম রাত দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন ঐ মাসের অবশিষ্ট রাতগুলো। আর তিনি সাহাবাদেরকে যে মাসের কথা বলেছিলেন সে মাসটি ছিলো ২৯ দিনে। (সহীহ ইবনে হিব্বান-২৫৪৭) এ হিসেবে সপ্তম রাত অর্থ ২৩ রমাযানের রাত। পঞ্চম রাত অর্থ ২৫ রমাযানের রাত। আর তৃতীয় রাত অর্থ ২৭ রমাযানের রাত।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামাতে তারাবীহ'র নামায পড়লে পূর্ণ রাত নামায পড়ার ছওয়াব পাওয়া যায়। তবে এ জন্য ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে। ইমামের নামায শেষ হওয়ার পূর্বে মুক্তাদী চলে গেলে তার জন্য এ ছওয়াবের অঙ্গীকার কার্যকর হবে না। এ হাদীসের ভাষ্যমতে রসূল স. তারাবীহর নামায মাত্র তিনদিন জামাতের সাথে আদায় করেছিলেন। আর উম্মতের মধ্যে তারাবীহর নামায নিয়মত-ান্ত্রিকভাবে একই জামাতের অধীনে শুরু হয়েছে হযরত ওমর রা.-এর খিলাফাত আমলে। তিনি হযরত উবাই ইবনে কাআ'ব রা.-এর ইমামতিতে জামাত কায়েম করে দিয়েছিলেন। (বুখারী-১৮৮৩-এর সারসংক্ষেপ) আর এ আমলের অনুকরণে হানাফী মাযহাব মতে তারাবীহ'র জামাত ছুন্নাত আলাল কিফায়াহ। (শামী : ২/৪৫)

উল্লেখ্য, বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত ওমর রা. নিজে তারাবীহ'র নামায জামাতে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন যদিও তিনি নিজে সে জামাতে শরিক হননি। জামাত কেমন চলছে তা দেখতে তিনি মাসজিদে এসেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহ'র নামাযের জামাতে অংশ গ্রহণ করা উত্তম। যদিও তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তির জন্য মুক্তাদী হয়ে কুরআন শুনার পরিবর্তে নিজে নামাযে তিলাওয়াত করার সুযোগ আছে। বরং কেউ কেউ এটাকে উত্তমও বলেছেন। এ বিষয়ে আরো দেখুন ইবনে আবী শাইবা-৭৭৯৭, ত্বহাবী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৩, হাদীস নং-২০৬৪ ও ২০৬৯।

তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাত

'তারাবীহ' শব্দটি আরবী শব্দ। এটা تَرْوِيْحَةٌ (তারবীহাতুন) এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বিশ্রাম নেয়া। তারাবীহ'র নামায অতি দীর্ঘ হওয়ায় প্রতি চার রাকাত পরপর কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার চার রাকাত পড়া হয়। এ হিসেবে ২০ রাকাত নামাযে পাঁচটি বিশ্রাম হয়। অনেকগুলো বিশ্রামের সমন্বয় ঘটায় এ নামাযকে তারাবীহ'র নামায বলা হয়। আর শরীআতের পরিভাষায় রমাযান মাসের রাতের অতিরিক্ত নামাযকে তারাবীহ বলা হয়। এ কারণে তারাবীহ'র নামাযকে হাদীসের কিতাবে 'কিয়ামু শাহরি রমাযান' বা 'রমাযানের রাতের নামায' নামে শিরোনাম দেয়া হয়ে থাকে। আর যে নামায সারা বছর রাতে পড়া হয়ে থাকে তাকে তাহাজ্জুদ (ছূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯) বা কিয়ামুল লাইল বলা হয়। (ছূরা মুযযাম্মিল : ২)

রসূলুল্লাহ স.-এর তারাবীহ'র রাকাত

রসূলুল্লাহ স. কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামায সারা বছর পড়তেন। আর কিয়ামু শাহরি রমাযান বা তারাবীহ'র নামায রমাযান মাসে পড়তেন। তবে সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স. মাত্র তিন দিন তারাবীহ'র নামায জামাতে পড়েছেন। (বুখারী : ১০৬২, তিরমিযী : ৮০৪) রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যক্তিগত রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল-এর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। কিন্তু কিয়ামু শাহরি রমাযান অর্থাৎ তারাবীহ'র নামায যে তিন দিন তিনি জামাতে আদায় করেছেন ঐ তিন দিনের রাকাত সংখ্যা কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত

হয়নি। অনেকে রসূলুল্লাহ স.-এর সারা বছর রাতে আদায়কৃত নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ্যা দিয়ে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা নির্ণয়ে দলীল দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। অথচ ইনসাফের দাবী অনুযায়ী তা দ্বারা তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা নির্ণয়ে দলীল দেয়া চলে না। কারণ রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল-এর রাকাতের পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত এর মধ্য থেকে যে কোন একটিকে তারাবীহ'র রাকাত হিসেবে চিহ্নিত করা কোনক্রমেই যথার্থ হবে না। এ ব্যাপারে একটি বিশ্লেষণ এ আলোচনার শেষাংশে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

রসূলুল্লাহ স.-এর তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যার সুনির্দিষ্ট বিবরণ কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া না যাওয়ায় শরীয়াতের অন্যতম দলীল আমলী তাওয়াতুর বা প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার পাশাপাশি একটি গ্রহণযোগ্য হাদীস পেশ করা হলো; যদিও সনদের বিবেচনায় হাদীস-টি জঈফ।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. রমাযান মাসে ২০ রাকাত নামায পড়তেন এবং বিতির পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৭৪, তবারানী কাবীর : ১২১০২, তবারানী আওসাত : ৭৯৮, আততামহীদ লি-ইবনি আব্দিল বার : ৮/১১৫, আল ইসতিজকার : ২২২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। এ হাদীসের একজন রাবী ইবরাহীম ইবনে উসমান জঈফ হওয়ার কারণে হাদীসটি জঈফ। ইমামগণের মতে জঈফ হাদীস মুসলিম উম্মাহ'র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আমলের অনুকূলে হলে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الْقَبُوْلِ الَّتِي لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا شَيْخُنَا أَنْ يَتَّفِقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَدْلُوْلِ حَدِيْثٍ فَإِنَّه يُقْبَلُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِه قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئمَةِ الأَصُوْلِ

অনুবাদ : হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরো একটি গুণ যা আমাদের শায়খ রহ. বর্ণনা করেননি, তাহলো উলামায়ে কিরাম উক্ত হাদীসের চাহিদা মাফিক আমল করার প্রতি সম্মত হওয়া। তাহলে উক্ত হাদীস গ্রহণ করা হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হবে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আরো বলেন, এ নীতির স্বীকৃতি দিয়েছেন হাদীসের নীতিনির্ধারক একদল ইমাম। (আন নুকাত আলা ইবনে সালাহ : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯৪) আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী রহ.ও আন্ নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনে সালাহ কিতাবের ১ম খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় অনুরূপ মন্তব্য করেন।

সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে রসূলুল্লাহ স. ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়েছেন বলে ইবরাহীম ইবনে উসমান রহ. এর বর্ণিত উক্ত হাদীসের সনদ জঈফ হলেও উম্মত ব্যাপকভাবে গ্রহণের কারণে তা রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নাত হিসেবে গ্রহণের উপযুক্ত। ৮ রাকাত তারাবীহ'র প্রবক্তাগণের কেউ কেউ এ হাদীসটিকে জাল বলে অপপ্রচার করে থাকে। তাদের অভিযোগ হলো ইবরাহীম ইবনে উসমান মিথ্যাবাদী। অথচ এ অভিযোগ সঠিক নয়। রিজাল শাস্ত্রের অনেক ইমাম তাঁকে জঈফ বললেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা বা হাদীস জালিয়াতির অভিযোগ করেননি। বরং হযরত ইবনে আদী রহ. বলেন, "তিনি জঈফ তবে তাঁর কিছু ভালো হাদীসও রয়েছে"। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেন, "তাঁর সময় তাঁর চেয়ে বেশি ইনসাফের বিচার কেউ করেনি"।

শুধুমাত্র ইমাম শু'বা রহ. সিফফীন যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর দেয়া একটি তথ্যকে ভুল সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, كَذَبَ واللهِ "আল্লাহর কসম, সে মিথ্যা বলেছে"। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো : কোন তথ্য বর্ণনা করতে ভুল করা আর মিথ্যা বলা এক বিষয় নয়। ইমাম শু'বার উদ্দেশ্য হয়তো তাঁকে মিথ্যার দোষে দোষারোপ করা; এ কথা বলা যে, তিনি তথ্য বর্ণনা করতে ভুল করেছেন। আর আরবীতে এবং হাদীস ভাণ্ডারে كذب শব্দটি خطأ এর অর্থে ব্যবহার হওয়ার বহু নযীর রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বুখারী শরীফের একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন! খায়বারের যুদ্ধে হযরত আমের ইবনে আকওয়া রা. নিজের তরবারীর আঘাতে শহীদ হন। উসাইদ ইবনে হুযাইর রা.সহ আরো কয়েকজন সাহাবা এটাকে আত্মহত্যা বললে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট অভিযোগ করেন। জবাবে রসূলুল্লাহ স. বললেন, كَذَبَ مَنْ قَالَهُ "যারা এটা বলেছে

তারা মিথ্যা বলেছে"। (বুখারী : ৩৮৮২) নিঃসন্দেহে এটা দ্বারা রসূল স.-এর উদ্দেশ্য তাঁদের মন্তব্যকে ভুল সাব্যস্ত করা। ঐ সকল সাহাবায়ে কিরামকে মিথ্যাবাদী বলা নয়। অন্যথায় বুখারী-মুসলিমসহ সকল হাদীসের কিতাবে তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসকে জাল বলা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে কি?

বস্তুত হাদীসের পারিভাষিক শব্দ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা না বুঝে বা নিজের মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে না বুঝার ভান করে কোন রাবী বা হাদীসের বিরুদ্ধে এহেন মন্তব্য করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

এ সব বক্তব্য দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে রসূলুল্লাহ স. ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়েছেন বলে ইবরাহীম ইবনে উসমান রহ. এর বর্ণিত উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আর এটা আমাদের মূল দলীলও নয়। এ আলোচনার উদ্দেশ্য কেবল বিষয়টির হাকীকত ও দালিলীক ভিত্তি পাঠকের খেদমতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা। সাথে সাথে ঐ সব মানুষের মুখোশ উন্মোচন করা যারা মুখে বলে সহীহ হাদীসের কথা, আর আড়ালে কাজ করে অন্য কোন মিশন বাস্তবায়নের।

সাহাবা রা. যুগের তারাবীহ

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَإِنْ كَانُوا لَيَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ مِنَ الْقُرْآنِ.

অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন, তাঁরা হযরত ওমর রা.-এর যামানায় রমাযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায আদায় করতেন। আর তাঁরা কুরআন থেকে দু'শত আয়াতবিশিষ্ট ছূরা তিলাওয়াত করতেন। (মুসনাদে আলী ইবনুল জাআদ-২৮২৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আরব বিশ্বের বিশিষ্ট আলেম শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আদ দুআইশ রহ. (মৃত্যু-১৪০৯ হি.) বলেন, وهذا إسناد رجاله ثقات "এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য"। (তাম্বীহুল কারী লিতাক-বিয়াতি মা জ'আফাহুল আলবানী : ৩২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجُوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ بِالدَّامِغَانِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ

بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً قَالَ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে খুছইফা রহ. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা হযরত ওমর রা.-এর যামানায় রমাযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায আদায় করতেন। রাবী বলেন, তাঁরা দুইশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। হযরত উসমান রা.-এর যুগে তাঁরা দীর্ঘ দাঁড়ানোর কারণে লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতে-ন। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৪২৮৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত ২০ রাকাত তারাবীহ'র এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যেমন-

এক. ইমাম নববী রহ.। তিনি বলেন, رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "ইমাম বায়হাকী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন" (শরহুল মুহাজ্জাব : ৩/৫২৭, খুলাছাতুল আহকাম : ১৯৬১ নং হাদীসের আলোচনায়)

দুই. আল্লামা ওয়ালিউদ্দীন ইরাকী রহ.। তিনি বলেন, وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ "সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকীতে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে সহীহ সনদে (২০ রাকাত তারাবীহ'র কথা) বর্ণিত আছে"। (তরহুত তাছরীব ফী শরহিত তাকরীব : তারাবীহ'র রাকাত শিরোনামে)

তিন. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.। তিনি বলেন, رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد □صَحِيح عَن السَّائِب بن يزِيد الصَّحَابِيِّ "ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে সহীহ সনদে (২০ রাকাত তারাবীহ'র কথা) বর্ণনা করেছেন"। (উমদাতুল কারী : রাতের নামায অধ্যায়)

চার. আল্লামা শিহাবুদ্দীন কসতলানী রহ.। তিনি বলেন, **وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح كما قال ابن العراقي في شرح التقريب** “সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকীতে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত রয়েছে যেমনটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইরাকী তাঁর তরহুত তাছরীব ফী শরহিত তাকরীব নামক কিতাবে। (ইরশাদুস সারী : তারাবীহ অধ্যায়)

পাঁচ. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আদ দুআইশ রহ.। তিনি বলেন, **وهذا إسناد رجاله ثقات** “এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (তাম্বীহুল কারী লিতাকবিয়াতি মা জ’আফাহুল আলবানী : ৩২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী রহ. আরো একটি সহীহ সনদে মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৫৪০৯)

ইমাম নববী রহ. খুলাছাতুল আহকাম কিতাবে, আল্লামা যাইলাঈ নাসবুর রায়াহ কিতাবে এবং মুল্লা আলী কারী রহ. মিরকাত কিতাবে এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইয়াজীদ ইবনে খুছায়ফা সূত্রে বর্ণিত ২০ রাকাতের হাদীসের সনদের উপর পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিস আপত্তি তোলেননি। আর পরবর্তী মুহাদ্দিস-গণের অনেকের থেকে হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে জোরালো সমর্থন রয়েছে। সদ্য কয়েক দশক থেকে শায়খ নাসীব রেফাঈ, শায়খ আলবানী এবং তাদের কতিপয় অনুসারী উম্মতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ দলীলের উপর ভিত্তিশীল আমল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২০ রাকাত তারাবীহ’র সহীহ হাদীসের উপর আপত্তি তুলতে শুরু করেছে। এমনকি অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ২০ রাকাত তারাবীহ’র আমল থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে সরলমনা মানুষদেরকে সহীহ হাদীসের প্রতি আহবানের নামে সে দিকে ডাকতে শুরু করেছে। ইসলামের প্রকৃত রূপ সংরক্ষণ এবং উম্মতের ঐক্য অটুট রাখতে এহেন কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসা একান্ত জরুরী।

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ রা. ছাড়াও হযরত ওমর রা.-এর কায়েমকৃত ২০ রাকাত তারাবীহ’র হাদীস হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. থেকে। (আল আহাদীসুল মুখতারাহ লিজিয়াউদ্দীন:-১১৬১, মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী’র বরাতে কানযুল উম্মাল:-২৩৪৭১)

مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ، بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান রহ. বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে মানুষ বিশ রাকাত নামায আদায় করতেন। (মুয়াত্তা মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭১, অধ্যায় : কিয়ামে রমাযান)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, وفي سنده انقطاع، فإن يزيد ابن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقول: لكن جاء الحديث من طريق آخر موصول صحيح এ হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে রুমান ওমর রা.কে পাননি। আমি বলি, হাদীসটির এ সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকলেও ভিন্নভাবে সহীহ মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২২৪ নং হাদীসের আলোচনায়)

ফায়দা : হযরত ওমর রা.-এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র বিষয়টি বহুল প্রচলিত। সাথে সাথে পূর্ববর্ণিত বহু সহীহ হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি সমর্থিত। আর বহুল প্রচলিত কোন বিষয় বর্ণনা করতে নির্দিষ্ট সনদ বা সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: هَذَا جِبْرِيلُ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ "বদর যুদ্ধের দিন নবী কারীম স. বললেন, এই তো জিবরাঈল, তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন"। (বুখারী : ৩৭০৫) বদর যুদ্ধের ময়দানের সংবাদ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করলেন। অথচ ইবনে আব্বাস রা.-এর নিজের ভাষ্য হলো: তখন তিনি অতি অল্প বয়স্ক ছিলেন এবং মায়ের সাথে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। (বুখারী : ৪২৩৩) তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. অবশ্যই এ ঘটনাটি কারো মাধ্যমে শুনেছেন কিন্তু তার নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলে বা ঘটনা প্রসিদ্ধ হলে তখন নির্দিষ্ট কোন মাধ্যম উল্লেখ করা আবশ্যক নয়—যার প্রচলন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো।

২০ রাকাত তারাবীহ'র আমল বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে রুমান রহ. কোন জঈফ বা মিথ্যাবাদী রাবী নন। এমনকি তিনি মুদাল্লিসও নন। তাঁর দ্বীনদারী ও ন্যায়নিষ্ঠতা এবং স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেছেন ইমাম বুখারী-মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিসগণ। সাথে সাথে হযরত ওমর রা.-এর

যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ'র কথা একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যা একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে ইয়াযীদ ইবনে রুমানের মতো নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা কেন গ্রহণ করা হবে না? সনদ বিচ্ছিন্নতার দোহাই দিয়ে এ হাদীসকে অস্বীকার করা হচ্ছে, অথচ নির্ভরযোগ্য রাবীর মুরসাল বর্ণনার সমার্থক হাদীস পাওয়া গেলে উক্ত মুরসাল হাদীসকে চার ইমামসহ বহু ইমাম সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। সনদ বিচ্ছিন্নতার অজুহাতে শায়খ আলবানী তাঁর সলাতুত তারাবীহ নামক গ্রন্থে হাদীসটিকে জঈফ বলেছেন। আর পূর্বোক্ত নীতিমালার আলোকে শায়খ আলবানীর মন্তব্যকে খণ্ডন করে আরবের বিশিষ্ট শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আদ দুআইশ রহ. বলেন, **أقول: في تضعيفه القيام بعشرين ركعة نظر فإنه ورد من روايات يقوي بعضها بعضًا ويدل على أن له أصلاً** "আলবানী কর্তৃক এ হাদীসকে জঈফ বলে মন্তব্য করার ব্যাপারে আমার শক্ত আপত্তি আছে। কারণ ২০ রাকাত তারাবীহ'র বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যা পরস্পর একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। আর এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আমলটির ভিত্তি রয়েছে"। (তাম্বীহুল কারী লিতাকবিয়াতি মা জ'আফাহুল আলবানী: ৩২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

এ নীতির আলোকেই আমরা হযরত সুলাইমান আ'মাশ থেকে বর্ণিত হাদীস 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ২০ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতির পড়াতেন' (কিয়ামুল লাইল লিলমারওয়াযী), আব্দুল আজীজ ইবনে রুফাই'র হাদীস 'হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. মদীনায় রমাযান মাসে মানুষদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতির পড়াতেন' (ইবনে আবী শাইবা : ৭৭৬৬) এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারীর হাদীস 'হযরত ওমর রা. এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে ২০ রাকাত নামায পড়াতে' (ইবনে আবী শাইবা : ৭৭৬৪)-এর দ্বারা দলীল পেশ করে থাকি। অথচ শায়খ আলবানী ও তার অনুসারীগণ এগুলোকে সনদ বিচ্ছিন্নতার অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। উল্লেখ্য, এ হাদীসসমূহের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ

অনুবাদ : হযরত আতা রহ. বলেন, আমি লোকদেরকে বিতিরসহ ২৩ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছি। (ইবনে আবী শাইবা : ৭৭৭০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আদ দুআইশ বলেন, **إسناد صحيح على شرط مسلم** এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। (তাম্বীহুল কারী লিতাকবিয়াতি মা জ'আফাহুল আলবানী: ৩২ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. শতাধিক সাহাবায়ে কিরামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে দ্বীন শিখেছেন। সুতরাং হযরত আতা রহ. যে সব মানুষদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তে দেখেছেন তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কিরাম এবং প্রবীণ তাবিঈগণ। তাদের আমল ২০ রাকাত তারাবীহ মানেই সাহাবায়ে কিরা-মের সোনালী সমাজের তারাবীহ।

তাবিঈ যুগের তারাবীহ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّي بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيَقْرَأُ بِحَمْدِ الْمَلَائِكَةِ فِي رَكْعَةٍ.

অনুবাদ : হযরত নাফে' ইবনে ওমর রহ. বলেন, হযরত ইবনে আবী মুলাইকা রমাযান মাসে আমাদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়াতেন এবং এক রাকাতে ফিরিশতাদের প্রশংসা অর্থাৎ ছূরা ফাতির পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাবিঈদের যুগে তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত পড়া হতো। অনুরূপ হাদীস সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে হযরত আলী ইবনে রবীআহ রহ. থেকে, (ইবনে আবী শাইবা : ৭৬৭২) হযরত আবুল বাখতারী রহ. থেকে, (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৮) হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ. থেকে, (আব্দুর রাযযাক: ৭৭৪৯) হাসান সনদে হারিস ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে (ইবনে আবী শাইবা: ৭৭৬৭) এবং হযরত সুআইদ ইবনে গাফালা রহ. থেকে। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী: ৪২৯০)

শতাব্দী ভিত্তিক তারাবীহ'র ইতিহাস

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! রসূল স.-এর তারাবীহ, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈ-গণের তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা বর্ণনার পরে এবার আপনাদের খেদমতে মুসলিম উম্মাহ'র ১৪'শ বছরের তারাবীহ'র শতাব্দী ভিত্তিক অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস তুলে ধরছি।

দ্বিতীয় শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ খ্যাত ব্যক্তিত্ব ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মন্তব্য

وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ.

অনুবাদ : ইমাম শাফেঈ রহ. এর ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও সহযোগী আল্লামা ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া আল মুযানী রহ. (মৃত্যু- ২৬৪) ইমাম শাফেঈ রহ.-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, আমার নিকট প্রিয় হলো বিশ রাকাত পড়া। কেননা, এটা হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে এবং মক্কাবাসী-দের আমলও অনুরূপ। আর তাঁরা বিতির পড়তেন তিন রাকাত"। (মুখত-ছারুল মুযানী : নফল ও তারাবীহ'র নামায অধ্যায়)

তৃতীয় শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী (মৃত্যু- ২৭৯ হি.)-এর মন্তব্য–

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

অনুবাদ : হযরত আবু যর রা.-এর সূত্রে ৮০৪ নম্বর হাসান-সহীহ হাদীসটি বর্ণনার পরে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হযরত ওমর ও আলী রা.সহ প্রমুখ সাহাবার বর্ণনা অনুযায়ী অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও ইমাম শাফেঈ রহ.-এর অভিমতও এটাই। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, আমাদের মক্কা নগরীতে এমনই ২০ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছি"। (তিরমিযী : ৮০৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

চতুর্থ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইমাম কাইরওয়ানী রহ. (মৃত্যু- ৩৮৬ হি.)-এর মন্তব্য–

وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُوْمُوْنَ فِيْهِ فِيْ الْمَسَاجِدِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوْتِرُوْنَ بِثَلَاثٍ.

অনুবাদ : ইমাম আবু মুহাম্মাদ কাইরওয়ানী রহ. বলেন, সালাফে সালেহীন তথা নেককার পূর্বসূরীগণ তারাবীহ'র নামায ২০ রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর তিন রাকাত বিতির পড়তেন"। (আর রিসালা : রোযা অধ্যায়)

পঞ্চম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর প্রখ্যাত আলেম ইবনু আব্দিল বার (মৃত্যু-৪৬৩ হি.)-এর মন্তব্য–

استحب جماعة من العلماء والسلف الصالح بالمدينة عشرين ركعة والوتر

অনুবাদ : উলামায়ে কিরাম এবং পূর্বসূরীদের একদল মদীনায় ২০ রাকাত তারাবীহ এবং বিতির পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। (আল কাফী ফি ফিকহি আহলিল মদীনা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৬)

ষষ্ঠ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম কাসানী রহ. (মৃত্যু- ৫৮৭ হি.)-এর মন্তব্য–

وَأَمَّا قَدْرُهَا فَعِشْرُونَ رَكْعَةً فِي عَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ، فِي خَمْسِ تَرْوِيحَاتٍ كُلُّ تَسْلِيمَتَيْنِ تَرْوِيحَةٌ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلٍ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً وَفِي قَوْلٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ رَكْعَةً وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ.

অনুবাদ : (আল্লামা আবু বকর আল কাসানী রহ. বলেন,) তারাবীহ'র নামাযের পরিমাণ হলো দশ সালামে পাঁচ বিরতিতে বিশ রাকাত। প্রতি দুই সালামে (চার রাকাতে) একটি করে বিরতি। এটাই ব্যাপক সংখ্যক উলামায়ে কিরামের মত। ইমাম মালেক রহ. বলেন, ৩৬ রাকাত, ভিন্ন মতে ২৬ রাকাত। আর ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মতটিই বিশুদ্ধ মত। (বাদায়েউস সানায়ে, পরিচ্ছেদ: তারাবীহ'র নামাযের পরিমাণ)

সপ্তম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বালী রহ. (মৃত্যু- ৬২০ হি.)-এর মন্তব্য–

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ، رَحِمَهُ اللهُ فِيهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ: سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ.

অনুবাদ : ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বালী রহ. বলেন, ইমাম আহমদ রহ.-এর নিকট তারাবীহ'র রাকাতের ব্যাপারে উত্তম হলো ২০ রাকাত আদায় করা। আর এ মতই পোষণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী, আবু হানিফা এবং শাফেঈ রহ.। (আলমুগনী : পরিচ্ছেদ-১০৯৫)

এ শতাব্দীর আরো একজন ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু- ৬৭৬ হি.)-এর মন্তব্য–

مَذْهَبُنَا أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ غَيْرَ الْوِتْرِ وَذَلِكَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ وَالتَّرْوِيحَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

অনুবাদ : ইমাম নববী রহ. বলেন, তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে আমাদের মাযহাব হলো-বিতির ব্যতীত দশ সালামে বিশ রাকাত। আর তা হবে পাঁচটি বিশ্রামের মাধ্যমে। আর দুই সালামে চার রাকাতে হয় এক বিশ্রাম। এটা আমাদের মাযহাব এবং এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীগণ, ইমাম আহমদ, দাউদ জাহেরী এবং অন্যান্যরা। (শরহুল মুহাজ্জাব : কিয়ামু রমাযান অধ্যায়)

অষ্টম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু-৭২৮ হি.)-এর মন্তব্য–

الْقِيَامُ بِعِشْرِينَ ،. هُوَ الْأَفْضَلُ ، وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ.

অনুবাদ : ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া উত্তম। কেননা অধিকাংশ মুসলমান এটাই আমল করে। (ফতওয়া ইবনে তাইমিয়া : সিফাতুস সলাত অধ্যায়)

নবম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ওয়ালীউদ্দীন ইরাকী রহ. (মৃত্যু-৮২৬ হি.)-এর মন্তব্য–

وَلَمَّا وَلِيَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ إِمَامَةَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَحَيَا سُنَّتَهُمْ الْقَدِيمَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَكَانَ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً عَلَى الْمُعْتَادِ ثُمَّ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ بِستَّ عَشرَةَ رَكْعَةً فَيَخْتِمُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَهُ فَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى الْآنَ.

অনুবাদ : আমার পিতা যাইনুদ্দীন ইরাকী যখন মদীনার মাসজিদের ইমাম হলেন তখন অধিকাংশ মানুষের আমলের অনুসরণ (২০ রাকাত তারাবীহ পড়া)-এর সাথে সাথে মদীনাবাসীদের পুরনো ছুন্নাত (৩৬ রাকাত তারাবীহ)-এর আমলও যিন্দা করলেন। সুতরাং তিনি শুরু রাতে নিয়ম অনুযায়ী ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন। অতঃপর শেষ রাতে ১৬ রাকাত পড়তেন। আর জামাতের সাথে রমাযানে কুরআন খতম করতেন দু'বার। মদীনাতে এ আমলই (২০ রাকাত তারাবীহ এবং ১৬ রাকাত কিয়ামুল লাইল) চালু ছিলো এবং এখনো চালু রয়েছে। (তরহুত তাছরীব ফী শরহিত তাকরীব : তারাবীহ'র রাকাত শিরোনামে)

দশম শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম শিহাবুদ্দীন কসতল্লানী রহ. (মৃত্যু- ৯২৩ হি.)-এর মন্তব–

وَالْمَعْرُوْفُ وَهُوَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ أَنَّه عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ

অনুবাদ : ইমাম শিহাবুদ্দীন কসতল্লানী রহ. বলেন, তারাবীহ'র বিষয়ে প্রসিদ্ধ আমল সেটাই যেটা উম্মত ব্যাপকহারে আঁকড়ে ধরেছে। আর তা হলো ১০ সালামে ২০ রাকাত পড়া। (কসতল্লানী : কিয়ামুল্লাইল-এর ফযীলত অধ্যায়)

এ শতাব্দীর আরো একজন ফকীহ ইবনে নুজাইম রহ. (মৃত্যু- ৯৭০ হি.)-এর মন্তব্য–

وَقَوْلُهُ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيَانٌ لِكَمِّيَّتِهَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلَاثٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَعَلَيْهِ عَمِلَ النَّاسُ شَرْقًا وَغَرْبًا الكتاب:

অনুবাদ : কানযুদ্দাক্বায়েক কিতাবের লেখকের কথা 'বিশ রাকাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-তারাবীহ'র রাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা। আর এ বিশ রাকাত হলো ব্যাপক সংখ্যক উম্মতের মতামত। কেননা মুয়াত্তা মালেকে হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর রা.-এর যুগে মানুষ বিশ রাকাত তারাবীহ'র নামায পড়তো। আর পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র মানুষের আমল এটাই। অর্থাৎ বিশ রাকাত তারাবীহ'র নামায আদায় করা। (বাহরুর রায়েক : তারাবীহ অধ্যায়)

একাদশ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম শামসুদ্দীন রমালী রহ. (মৃত্যু- ১০০৪ হি.)-এর মন্তব্য–

وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً.

অনুবাদ : আল্লামা শামসুদ্দীন রমালী রহ. বলেন, রমাযানের প্রতি রাতে দশ সালামে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তে হবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, তারা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে রমাযান মাসে ২০ রাকাত পড়তেন। (নিহায়াতুল মুহতাজ : জামাতে আদায়যোগ্য নফল অধ্যায়)

দ্বাদশ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইমাম শিহাবুদ্দীন আযহারী রহ.(মৃত্যু-১১২৬ হি.)-এর মন্তব্য–

(وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ) وَهُمْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (يَقُومُونَ فِيهِ) فِي زَمَنِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبِأَمْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (فِي الْمَسَاجِدِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً) وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ الْآنَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ.

অনুবাদ : আল্লামা আযহারী বলেন, সালফে সালেহীন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে তাঁর নির্দেশে ২০ রাকাত আদায় করতেন। যেমনটি পূর্বে চলে গেছে। আর এটা ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর মনোনীত মত। এর উপরই বর্তমান যুগে সব শহরে আমল বিদ্যমান রয়েছে। (আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী : রমাযানে তারাবীহ'র নামাযের বিধান অধ্যায়)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর তারাবীহ

এ শতাব্দীর ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যু-১২৫২ হি.)-এর মন্তব্য–

(قَوْلُهُ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرْقًا وَغَرْبًا.

অনুবাদ : আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. প্রথমে দুররে মুখতারের কথা বর্ণনা করে বলেন, তারাবীহ ২০ রাকাত। অতঃপর এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা গণমানুষের মত এবং পূর্ব-পশ্চিম সব অঞ্চলের মানুষ সেই আমলের উপরই রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার : আলোচনা: তারাবীহ'র নামায)

চতুর্দশ শতাব্দীর তারাবীহ

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃত্যু- ১৩৫৩ হি.)-এর মন্তব্য–

وَلْيُعْلَمْ أَنَّ التَّرَاوِيْحَ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ تُرْوٰى بِخَمْسِ صِفَاتٍ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا ثَابِتَةٌ بِالْأَسَانِيْدِ الْقَوِيَّةِ...أَمَّا الْأُوْلٰى وَالثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ فَمَذْكُوْرَةٌ فِيْ مُوَطَّأ مَالِكٍ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلٰى عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অনুবাদ : হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, জেনে রাখা উচিত যে, হযরত ওমর রা.-এর যুগে তারাবীহ'র নামাযের পাঁচটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে চার প্রকার মজবুত সনদ দ্বারা প্রমাণিত।... প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ প্রকার (১১, ১৩ ও ২১ রাকাত) মুয়াত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে আমল স্থির হয়েছে ২০ রাকাতের উপর। (আরফুশ শাযী : কিয়ামু শাহরি রমাযান অধ্যায়)

সারসংক্ষেপ : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, হযরত ওমর রা.-এর যুগে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা বিভিন্ন থাকলেও আমল স্থির হয়েছে ২০ রাকাতের উপর।

নোট : মনে রাখা দরকার যে, হাদীসের সনদ বলা হয় বর্ণনাকারী ব্যক্তিদেরকে। সে হিসেবে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. তারাবী-হ'র নামাযের রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে ২০ রাকাতের হাদীসের পাশাপাশি ১১, ১৩ ও ২১ রাকাতের যে তিনটি হাদীসের সনদকে মজবুত বলেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সকল হাদীসের বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনার বিষয়ে মজবুত। তবে এ সকল বর্ণনা সংখ্যাগরিষ্ঠ রাবীর বর্ণনার সাথে

সাংঘর্ষিক হওয়ায় শায বা অপ্রবল বর্ণনারূপে পরিগণিত। উসূলে হাদীসের নিয়ম অনুযায়ী এরূপ বর্ণনা সহীহ নয়।

আর ২০ রাকাতের উপর আমল স্থির হয়েছে বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলকে ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বলে বিশ্বাস করেন। আর বাস্তবতাও তা-ই। উম্মতের ১৪শ বছরের আমল তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সারসংক্ষেপ : এ পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দীর কমপক্ষে একজন বিশিষ্ট আলেমের মন্তব্য পেশ করা হয়েছে। কেউ কেউ আপন যুগের প্রসিদ্ধ আমল অনুযায়ী ২০ রাকাত তারাবীহকে গণমানুষের আমলের কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার অনেকে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আমাদের যুগে এ আমল পৃথিবীব্যাপী চালু রয়েছে। এ কথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে প্রজন্ম পরম্পরায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই প্রচলিত ছিলো।

পঞ্চদশ শতাব্দীর তারাবীহ

সবশেষে আমাদের এ যুগ তথা পঞ্চদশ শতাব্দীর চিত্রও এই যে, বিশেষ কিছু মাসজিদ বা নামাযের স্থানে পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণার কিছু মানুষ ব্যতীত সারা বিশ্বে ২০ রাকাত তারাবীহ'র আমলই গণমানুষের আমল হিসেবে চিহ্নিত। অতএব, সাহাবায়ে কিরামের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে আজ ১৪শ বছর যাবৎ যে আমল উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান যার সনদও মজবুত সে আমল ছেড়ে দিয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ'র দিকে মানুষকে ডাকা উম্মতের মধ্যে নতুন করে বিভ্রান্তি ও ফিতনা ছড়ানো ব্যতীত অন্য কিছুই হতে পারে না।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায নয়

তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা অনেকে তারাবীহ'র দলীল দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু আসলে দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ স.-এর তাহাজ্জুদ নামাযের চিত্র কেমন ছিলো সে ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে যা থেকে বুঝা যাবে যে, তারাবীহ আর তাহাজ্জুদ কখনই এক নামায নয়।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. (বিতিরসহ) ৭

রাকাত, ৯ রাকাত এবং ১১ রাকাত নামায পড়তেন (বুখারী : ১০৭৩) হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : রসূলুল্লাহ স. রমাযান ও রমাযানের বাইরে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি প্রথমে ৪ রাকাত তারপরে ৪ রাকাত তারপরে ৩ রাকাত পড়তেন । (বুখারী শরীফ : ১০৮১) হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. রাতে ১১ রাকাত নামায পড়তেন যার মধ্যে বিতিরের এক রাকাত ছিলো। (মুসলিম-১৫৯০) হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ স. দু'রাকাত করে ১২ রাকাত পড়েছেন তারপরে বিতির পড়েছেন। (বুখারী : ১৮৩)

এ হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা সব সময় একই রকম থাকতো না। বরং ৪ থেকে ১২ পর্যন্ত ওঠা-নামা করতো। তাহলে তারাবীহ'র নামায ৮ রাকাতই তা এ হাদীস দ্বারা কিভাবে স্থির হতে পারে? ৮ রাকাত তারাবীহ'র দাবীদারদের সবচেয়ে মজবুত হাদীস বুখারী শরীফে বর্ণিত ১০৮১ নম্বর হাদীস যা উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. রমাযান ও রমাযানের বাইরে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না। এ হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. প্রথমে পড়তেন ৪ রাকাত তারপরে ৪ রাকাত তারপরে ৩ রাকাত। অথচ ৮ রাকাত তারাবীহ'র দাবীদারগণ পড়ে থাকে দু'রাকাত করে। দলীল আর আমলে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি? রসূলুল্লাহ স. তারাবী-হ'র নামায তিনদিন জামাতের সাথে পড়ে এ কথা বলে জামাতে পড়া পরিত্যাগ করলেন যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমাদের উপর তারাবীহ ফরয হয়ে যেতে পারে। (বুখারী : ১০৬২) তাহাজ্জুদ নামায ইসলামের শুরুতে জরুরী থাকলেও তার আবশ্যকতা শেষ হয়ে গেছে অল্প পরেই। একবার রহিত হওয়ার পরে তা পুনরায় ফরয হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই অবান্তর। ছূরা মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা., হযরত ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান বসরী, এবং কতাদা রহ.সহ অনেক সাহাবা ও তাবিঈন এ মত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদের আবশ্যকীয়তা রহিত করা হয়। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে মুজাহিদ, তাফসীরে ইবনে কাসীর) অসুস্থতা, উপার্জনের তাগাদা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাসহ যে সকল কারণে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাহাজ্জুদ রহিত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সে কারণগুলো উম্মতের মধ্যে দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত নামায

পুনরায় ফরয হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা কিছুতেই বাস্তবসম্মত হতে পারে না। সুতরাং তারাবীহ আর তাহাজ্জুদ কোনক্রমেই এক নামায নয়। অতএব, তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাত সংখ্যা দিয়ে তারাবীহ'র দলীল দেয়া স্থূলদর্শিতার পরিচয় যা চৌদ্দশ বছরে উম্মত মেনে নেয়নি, এখনো নেবে না।

তারাবীহ'র জামাতে ২০ রাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ রসূলুল্লাহ স. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত না থাকলেও বলতে হবে যে, হযরত ওমর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর ছুন্নতেরই অনুসরণ করেছেন। এর সমর্থনে রয়েছে হযরত উসমান ও আলী রা.সহ সাহাবাগণের আমল এবং তাবিঈদের একটি বড় দলের আমল। আরো রয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস যে, রসূলুল্লাহ স. মাসজিদে নববীতে জামাতের সাথে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন। হাদীসটির সনদ জঈফ হলেও উম্মতের ব্যাপক আমলের কারণে সেটা গ্রহণযোগ্য। (ইবনে আবী শাইবা : ৭৭৭৪) তাছাড়া নামাযের রাকাত সংখ্যা তো ইজতেহাদী বা কিয়াসী বিষয় নয়। এটা ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়। আর এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে না শুনে বা তাঁকে না দেখে নিজেরা কোন মন্তব্য করে দিবেন তা কীভাবে সম্ভব?

৮ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষে পেশকৃত হাদীসের জবাব

হযরত ওমর রা.-এর কায়েমকৃত তারাবীহ'র জামাতের নামায ৮ রাকাত (বিতিরসহ ১১ রাকাত) ছিলো বলেও একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অনেকে সেটাকে রসূলুল্লাহ স.-এর আমলের অনুরূপ বলে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ :

مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيماً الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সূত্রে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেন, হযরত ওমর রা. উবাই ইবনে কাআব এবং তামীমে দারী রা.কে নির্দেশ দিলেন মানুষদেরকে এগারো রাকাত নামায পড়াতে। (মুয়াত্তা মালেক: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭১, অধ্যায় : কিয়ামে রমাযান)

হাদীসটির স্তর : শায। এ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযে-

াগ্য। তবে এ হাদীসটি আরো অনেক সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সে সকল বর্ণনার সাথে এ বর্ণনায় উল্লিখিত রাকাত সংখ্যার বৈপরীত্য থাকায় এ হাদীসটি শায বা দলবিচ্ছিন্ন আপত্তিকর বর্ণনা।

জবাব : হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম মালেক রহ. নিজে এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। উপরন্তু এ হাদীসের উপর মৌলিকভাবে দুটি আপত্তি রয়েছে। এক. উক্ত বর্ণনার সনদের রাবীগণ যদিও নির্ভরযোগ্য কিন্তু হযরত ওমর রা.-এর তারাবী'র রাকাত সংখ্যা ২০ বলে যে সব হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার সনদ সহীহ হওয়ার পাশাপাশি সংখ্যায়ও অনেক বেশি।

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজীদ রা. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর দু'জন ছাত্র। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ এবং ইয়াজিদ ইবনে খুছায়ফা। তম্মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের ছাত্রগণ রাকাত সংখ্যা বিভিন্ন বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ থেকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কত্তান বর্ণনা করেন **১১** রাকাত। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৭৭৫৩) ইমাম মালেক বর্ণনা করেন **১১** রাকাত। (মুয়াত্তা মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭১, অধ্যায়: কিয়ামে রমাযান) আব্দুল আজীজ ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন **১১** রাকাত। (সুনানে সাঈদ ইবনে মানছুর) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন **১৩** রাকাত। (কিয়ামুল লাইল লিলমারওয়াঝী) দাউদ ইবনে কয়েস এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেন **২১** রাকাত। (আব্দুর রাযযাক : ৭৭৩০)

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কত্তান, ইমাম মালেক ও আব্দুল আজীজ ইবনে মুহাম্মাদের বর্ণনায় **১১** রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে মিল থাকলেও মূল ধারা ভাষ্যের বর্ণনায় রয়েছে বিস্তর ফারাক। যা বর্ণনাটি শায হওয়ার বিষয়ে আরেকটি দিককে উন্মোচিত করে। বিস্তারিত জানতে দেখুন হাবীবুর রহমান আযমীকৃত রাকাতে তারাবীহ পৃ.২০॥

এর বিপরীতে হযরত ইয়াজীদ ইবনে খুছায়ফার ছাত্রগণ তাঁর থেকে সর্বসম্মতভাবে ২০ রাকাতই বর্ণনা করেছেন। ইয়াজীদ ইবনে খুছায়ফা থেকে ইবনু আবি জিব বর্ণনা করেন ২০ রাকাত। (মুসনাদের ইবনুল জাআদ-২৮২৫, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৪২৮৮, ফাযায়েলুল আওকাত লিলবায়হাকী-১২৭) মুহাম্মাদ ইবনে জাফর বর্ণনা করেন ২০ রাকাত। (সুনানে ছুগরা লিলবায়হাকী-৮২১, মারেফাতুস সুনানি ওয়াল আছার লিলবায়হ-

াকী-৫৪০৯)

যেহেতু মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের পাঁচ শাগরিদ সায়েবের বর্ণনাকে পাঁচভাবে বর্ণনা করেছেন অতএব মাযহাবগত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ না করে বরং ইনসাফের দাবী হলো ইয়াজীদ ইবনে খুছায়ফার ২০ রাকাত সম্বলিত ঐকমত্যপূর্ণ বর্ণনাকে গ্রহণ করা। আর মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের মুখতা-লাফ ফীহ ও সন্দেহযুক্ত রিওয়ায়েতকে বর্জন করা। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো সহীহ হাদীস মানার দাবীদার আমাদের কিছু ভাইয়েরা এর বিপরীত কাজটি করে ইতেদালের প্রাচীর চূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজীদ ইবনে খুছায়ফা এ হাদীসটিকে যথাযথভাবে স্মরণ রাখতে পেরেছেন। এ কারণে তাঁর থেকে যে সকল ছাত্ররা বর্ণনা করেছেন তাঁদের বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটেনি। সাথে সাথে হযরত ওমর রা. ছাড়াও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন এবং উম্মতের ব্যাপক আমলের সাথে এ বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ হাদীসটিকে যথাযথভাবে স্মরণে রাখতে পারেননি। এ কারণে তাঁর থেকে যে সকল ছাত্ররা বর্ণনা করেছেন তাঁদের বর্ণনার মধ্যে রাকাত সংখ্যার পার্থক্য ঘটেছে। আবার হযরত ওমর রা. ছাড়াও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন এবং উম্মতের ব্যাপক আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে।

ইয়াজীদ ইবনে খুছায়ফার বর্ননা এবং উম্মতের ব্যাপক আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সূত্রে বর্ণিত ১১ রাকাতের হাদীস-টিকে অনেক মুহাদ্দিস শায বা অপ্রবল বলেছেন। আর এ কারণেই হয়তো আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. ১১ রাকাতের বর্ণনা পেশ করে তার ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ ভালো জানেন তবে আমার নিকট এটাই প্রবল যে, ১১ রাকাতের বর্ণনাটি ভুল। (আল ইস্তিযকার)

দুই. আবার ৮ রাকাত তারাবীহ'র ঐ আমলটি রসূলুল্লাহ স.-এর আমলের অনুরূপ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযের অনুরূপ বলে বুঝানো হচ্ছে তাঁর রাতের নামায অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল। আর তাঁর রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা (বিতিরসহ) ১১ রাকাত নির্ধারিত নয়। বরং হযরত আয়েশা রা. থেকে বুখারী শরীফ ১০৭৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স.-এর রাতের নামায কখনো ৭ রাকাত, কখনো ৯ রাকাত আবার কখনো ১১ রাকাত হতো।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বুখারী শরীফ ১৮৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে বিতির ব্যতীত ১২ রাকাত। এর সাথে তিন রাকাত বিতির যুক্ত হলে মোট হবে ১৫ রাকাত। হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা থেকে আরো জানা যায় যে, রমাযান এবং রমাযানের বাইরে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল একই রকম ছিলো। কিন্তু শুধু সহীহ হাদীসই নয় বরং বুখারীর হাদীসে যেখানে রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা সংক্রান্ত চারটি বর্ণনা রয়েছে সেখানে শুধু ৮ রাকাতের বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ স.-এর তারাবীহ'র নামাযের আমল বলে প্রচার করা বুখারী শরীফে বর্ণিত এ সংক্রান্ত অন্যান্য সহীহ হাদীসগুলোকে অজ্ঞাত কারণে আড়াল করা বা অস্বীকার করা হবে। উপরিউক্ত হাদীসগুলোসহ আরো যে সব সহীহ হাদীসের কথা বলে উম্মতকে ৮ রাকাত তারাবীহ'র দিকে ডাকা হচ্ছে উক্ত সহীহ হাদীসগুলো উম্মতের মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁরা বারবার ঐ সব সনদের প্রতি লক্ষ্য করেও এটাকে আমলে গ্রহণ করেননি। বরং এর বিপরীতে ২০ রাকাতের হাদীসকে আমলে গ্রহণ করেছেন।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি হাদীস দ্বারাও ৮ রাকাত তারাবীহ'র পক্ষ অবলম্বনকারীগণ দলীল পেশ করে থাকে। এবার উক্ত দলীল ও তার বিশ্লেষণ পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরছি।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ.

অনুবাদ : হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. রমাযানের এক রাতে আমাদেরকে নিয়ে ৮ রাকাত নামায এবং বিতির পড়লেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান-২৪০৯, মুসনাদে আবু ইয়া'লা-১৮০২, আল্ মু'জামুছ ছগীর লিত তবারানী-৫২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা-১০৭০ এবং মুখতাছার কিয়ামুল লাইল-১১৮ পৃষ্ঠা)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। এ হাদীসের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন হলেন হযরত ঈসা ইবনে জারিয়াহ। তিনি জঈফ হওয়ার কারণে হাদীসটির সনদ জঈফ। রিজাল শাস্ত্রের ইমাম হযরত ইবনে মাঈন বলেন, عنده مناكير তাঁর

হাদীসের অসমর্থিত বর্ণনা রয়েছে। অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ইমাম নাসাঈ রহ.ও। ইমাম নাসাঈ রহ. আরো বলেন, متروك ঈসা ইবনে জারিয়াহ পরিত্যক্ত। হযরত ইবনে আদী বলেন, أحاديثه غير محفوظة তাঁর হাদীসগুলো অসংরক্ষিত। তবে আবু ঝুরআহ বলেন যে, সমস্যা নেই। (সহীহ ইবনে হিব্বানের ২৪০৯ নং হাদীসের আলোচনায়) মুসনাদে আবু ইয়া'লা-এর তাহকীকে শায়খ হুসাইন বলেন, হাদীসটির সনদ জঈফ। (মুসনাদে আবু ইয়া'লা-১৮০২ নং হাদীসের তাহকীকে)

এর বিপরীতে সহীহ ইবনে খুযাইমা-১০৭০ নং হাদীসের তাহকীকে শায়খ মুস্তফা আ'জমী ঈসা ইবনে জারিয়ার হাদীস বর্ণনায় দৃঢ়তা না থাকার কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও হাদীসটিকে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। এটা হতে পারে ৮ রাকাত তারাবীহর অন্যতম দাবীদার শায়খ আলবানীর সাথে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠতা বা দলগত ও সালাফী মাসলাকগত পক্ষপাতপ্রবণতার ফসল। অন্যথায় রিজাল শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ইমামগণের বিপরীতে তিনি এ মন্তব্য করতে পারতেন না। আলোচিত অত্যন্ত জঈফ পর্যায়ের রাবী হযরত ঈসা ইবনে জারিয়া রহ. সূত্রে বর্ণিত আরো একটি হাদীস হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟ قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي، قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

অনুবাদ : হযরত যাবের রা. বলেন যে, রমাযান মাসে হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. এসে রসূলুল্লাহ স.কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আজ রাতে আমার থেকে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন কি সে ঘটনা? জবাবে তিনি বললেন, আমার ঘরের মহিলারা আমার নিকট এ মর্মে আবেদন করলো যে, আমরা কুরআন পড়তে পারি না। সুতরাং তোমার পেছনে (তারাবীহ'র) নামায পড়তে চাই। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি তাদেরকে নিয়ে ৮ রাকাত (তারাবীহ) এবং বিতির নামায পড়েছি। এ কথার পরে রসূলুল্লাহ স. চুপ থাকলেন যা সম্মতির মতো। (মুসনাদে আবু ইয়া'লা-১৮০১ এবং মুখতাছার কিয়ামুল

লাইল-১১৮ পৃষ্ঠা)

হাদীসটির স্তর : জঈফ। এ হাদীসের রাবী হযরত ঈসা ইবনে জারিয়া জঈফ হওয়ায় হাদীসটি জঈফ। মুসনাদে আবু ইয়া'লা-১৮০১ নং হাদীসের তাহকীকে শায়খ হুসাইন বলেন, **إسناده ضعيف** হাদীসটির সনদ জঈফ।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে তারাবীহ'র নামায ৮ রাকাত হওয়ার বিষয়টি যদিও স্পষ্ট হলেও হাদীসটি সনদের বিবেচনায়ও সহীহ নয়। আবার তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে হাদীসের ব্যাপক বর্ণনা এবং উম্মতের চৌদ্দশ বছরের আমলের সাথেও সাংঘর্ষিক।

ভাবতে অবাক লাগে! সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অমান্য করা বা উম্মতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে ছিটকে পড়াকেও যারা তোয়াক্কা করে না তারা কেন জঈফ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে? রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি অজস্র ভালবাসা ও মহব্বতই যদি এর কারণ হয় তাহলে রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি যে সকল হাদীসের সম্বন্ধ নিশ্চিত সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো পালন করুন। অন্যথায় রসূলুল্লাহ স.কে প্রাণাধিক মহব্বতকারী সাহবায়ে কিরাম ও তাদের অনুগামীদের মূল শ্রোতধারায় ফিরে আসুন। এটাই হাদীসের উপর আমল করার ছুন্নাত সম্মত পদ্ধতি। সাথে সাথে উম্মতের ঐক্য অটুট রাখার অন্যতম উপায়।

কিন্তু এসব কিছু থেকে মুখ ঘুরিয়ে চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত চলে আসা ২০ রাকাত তারাবীহ'র অবিচ্ছিন্ন ধারায় ফাটল ধরিয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ'র ধারণা প্রচার করে সর্বপ্রথম পুস্তিকা রচনা করেন 'শায়খ নাসীব রিফাঈ'। তৎকালীন আরব বিশ্বের উলামায়ে কিরাম তার উক্ত নবসৃষ্ট মতাদর্শ কলমযুদ্ধের মাধ্যমে জোরালোভাবে খণ্ডনও করেন। কিন্তু অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী তখনকার হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কিরামের পথ অনুসরণ না করে উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী 'শায়খ নাসীব রিফাঈ'র পক্ষ সমর্থন করেছেন। এমনকি ১৩৭৭ হিজরী সনে 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে একটি পুস্তক রচনা করে শায়খ রিফাঈ'র মতাদর্শকে প্রাধান্য দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকা'র আমীদুত তা'লীম, উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব তাঁর রচিত "সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা" বইটির ৮ম পৃষ্ঠায় এ ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, "বইটি তার ভ্রান্তি-বিচ্যুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইমামগণের প্রতি বিদ্রোহ-বিদ্বেষের খোলা দলীল। সাথে সাথে ইল্‌মে

উসূলে হাদীস ও যর্‌হ-তা'দীল বিষয়ে তার অপরিপক্কতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ছাড়া ইল্‌মে উসূলে ফিকহের মধ্যে তার দৈন্যদশাও বইটিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যা সত্যিই মর্মান্তিক।"

এ সব কিছু থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে যদি রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামায দিয়েই তারাবীহ'র দলীল দিতে হয় তাহলে বলে ফেলুন! তারাবীহ'র নামায ৪ রাকাত থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত যে কোন সংখ্যায় পড়া যায়। অন্যথায় হযরত ওমর রা.-এর ২০ রাকাতের আমল দ্বারা দলীল গ্রহণ করুন যার সনদ সহীহ, সংখ্যায় বেশি এবং তা একদল তাবিঈ ও উম্মতের চৌদ্দশ বছরের ধারাবাহিক আমল। সাথে সাথে এর অনুকূলে রয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর জামাতে আদায়কৃত তারাবীহ'র নামাযের রাকাত সংখ্যার সমর্থনও। হাদীসটির সনদ জঈফ হলেও উম্মতে মুহাম্মাদী ব্যাপকভাবে উক্ত আমলটি গ্রহণ করেছে যা হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি বড় প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত ছুন্নাত বুঝার, ছুন্নাত সম্মত পদ্ধতিতে হাদীস মান্য করার এবং উম্মতের ঐক্য অটুট রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন।
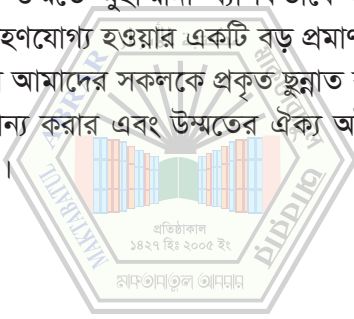
অধ্যায় ২০ : বিতির

বিতিরের নামায আদায় করা জরুরী

রসূল স. সর্বদা বিতির নামায আদায় করতেন। কখনো তিনি এ নামায ছেড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদেরকেও বিতির পড়ার জন্য তাকিদ করতেন।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ. (رواه ابو داود فى بَابِ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ–١/٢٠٠)

অনুবাদ : হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. বলেন, হে আহলে কুরআন! তোমরা বিতির পড়ো। আল্লাহ তাআ'লা বেজোড়, তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন (আবূ দাউদ-১৪১৬, মুসনাদে আহমদ-৮৭৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **صحيح لغيره** হাদীসটির সহীহ লিগাইরিহী। (আবূ দাউদ-১৪১৬ নং হাদীসের এর আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : রসূল স. এ হাদীসে বিতির পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতির পড়া ওয়াজিব। হযরত বুরাইদা ইবনে হুসাইব রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে যে, রসূল স. ইরশাদ করেন, বিতির হক তথা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি বিতির পড়লো না সে আমার দলভুক্ত নয়। (আবূ দাউদ-১৪১৯) হাকেম আবু আব্দুল্লাহ বলেন, **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ** এ হাদীসটি সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম-১১৪৬, ১১৪৭) হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে আরো একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. বলেন, মাগরিবের নামায হলো দিনের বিতির। সুতরাং তোমরা রাতের বিতিরও পড়ো। (মুসনাদে আহমদ-৪৮৪৭) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, এ হাদীসের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী-মুসলিমের রাবী। (মুসনাদে আহমদ-৪৮৪৭)। এসব কিছুর আলোকে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এই যে, বিতির নামায ওয়াজিব। (বায়েউস সানায়ে' : ১/২৭১)

রসূলুল্লাহ স. কখন বিতির পড়তেন

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (رواه مسلم فى بَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ–١/٢٥٥)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূল স. রাতের সকল অংশেই বিতির পড়তেন শুরুতে মাঝে এবং শেষে। শেষ জীবনে গিয়ে সাহরীর সময় বিতির পড়া স্থির হয়েছে। (মুসলিম-১৬১১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১৫২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. রাতের যে কোন অংশে বিতির পড়তেন। তবে তাঁর জীবনের সর্বশেষ শেষ আমল ছিলো শেষ রাতে বিতির পড়া। সুতরাং শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গা নিশ্চিত হলে তখন বিতির পড়া তুলনামূলক বেশি উত্তম হবে। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল স. বলেন, أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ "যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, শেষ রাতে উঠতে পারবে না, সে যেন শুরু রাতে বিতির পড়ে তারপরে ঘুমায়। আর যে ব্যক্তি রাতে উঠার দৃঢ়তা রাখে সে যেন শেষ রাতে বিতির পড়ে"। (মুসলিম-১৬৪০) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৬৯)

রাতে পঠিত নামাযের শেষ নামায বিতির হওয়া উত্তম

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا (رواه البخارى فى بَابٍ: لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا–١/١٣٦)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের রাতের সর্বশেষ নামায হিসেবে বিতির নামায আদায় করো। (বুখারী : ৯৪৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১৩৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি শেষ রাতে নামাযের জন্য না ওঠে, তাহলে শুরু রাতের নামাযের শেষ নামায পড়বে বিতির। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে নামাযের জন্য ওঠে, সে তখনকার নামাযের শেষ নামায বানাবে বিতিরকে। এটা উত্তম পদ্ধতির বিবরণ। অতএব বিতির পড়া হয়ে গেলেও অন্য নামায পড়া যাবে। হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. তেরো রাকাত নামায পড়তেন। প্রথমে আট রাকাত পড়তেন তারপরে বিতির পড়তেন অতঃপর বসে দু'রাকাত নামায পড়তেন। (মুসলিম-১৫৯৭) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৩৬৯)

বিতির নামায তিন রাকাত

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا كَبِرَ، صَارَ إِلَى تِسْعٍ: وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. রাতে আট রাকাত নামায পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতির পড়তেন। অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়তেন। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন নামায নয়, ছয় এবং তিন রাকাতে এসে দাঁড়ালো। (মুসনাদে আহমদ : ২৭১৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, هذا إسناد على شرط مسلم "হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ: ২৭১৪ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির নামায ছিলো তিন রাকাত। হযরত আয়েশা রা. রসূল স.-এর রাতের নামাযের সংখ্যা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি রাতে ১৩ রাকাত নামায পড়তেন। প্রথমে আট রাকাত

পড়তেন, শেষে বসে বসে দু'রাকাত পড়তেন এবং মাঝে বিতির পড়তেন। (মুসলিম-১৫৯৭) শুরুর আট এবং শেষের দু'রাকাত মিলে হয় দশ রাকাত। এখন বিতিরের নামায তিন রাকাত মানা হলেই কেবল হাদীসে বর্ণিত ১৩ রাকাতের সংখ্যা ঠিক থাকে। অন্যথায় নয়।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ছূরা আ'লা, কাফিরুন ও ছূরা ইখলাস দ্বারা তিন রাকাত বিতির পড়তেন। (মুসনাদে আহমদ : ২৭২০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/ মুসলিমের রাবী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **حديث صحيح** "হাদীসটি সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ : ২৭২০ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির নামায ছিলো তিন রাকাত। এ ছাড়াও তিন রাকাত বিতিরের বিষয় সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে হযরত আয়েশা রা. থেকে, (আবূ দাউদ : ১৩৬২, মুসতাদরাকে হাকেম : ১১৪০) আবু দাউদের হাদীসকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. সহীহ বলেছেন। আর মুসতাদরাকের হাদীসকে হাকেম বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (নাসবুর রায়াহ : ১০১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়) সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. থেকে-(নাসাঈ : ১৭০২)। জামেউল উসূল-৪১৪৭ নং হাদীসের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত এটাকে সহীহ বলেছেন। সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে হযরত ওমর রা. থেকে-(ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৫ ও ২০৬, হাদীস নং-১৭৪২)। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আদ-দিরায়াহ বিতির অধ্যায়) সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে। (ত্বহাবীঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৬, হাদীস নং-১৭৪৫) ইমাম বায়হাকী রহ. এটাকে সহীহ বলেছেন। (আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকীঃ

৪৮১২) সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস রা. থেকে। (ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৬, হাদীস নং-১৭৪৭) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী এটাকে সহীহ বলেছেন। (আদ-দিরায়াহ: বিতির অধ্যায়)

উপরন্তু, সাহাবায়ে কিরামের ইল্‌মের ধারক মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ যারা 'ফুকাহায়ে সাবআহ' নামে পরিচিত তাঁদের সকলের সিদ্ধান্তও এটা যে, বিতির তিন রাকাত এবং সালাম দিতে হবে তৃতীয় রাকাতে গিয়ে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن أَبِي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة فِي مشيخة سواهُم أهل فقه وَصَلَاح أَن الْوتر ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ "ইমাম ত্বহাবী রহ. তাঁর 'মাশীখা'তে অর্থাৎ আরবী অক্ষরের ধারাবাহিকতা অনুসারে নিজ শায়খদের নামের তালিকা সম্বলিত কিতাবে ফুকাহায়ে সাবআহসহ অন্যান্য ফকীহ ও শায়খদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিতির তিন রাকাত এবং সালাম দিতে হবে তৃতীয় রাকাতে গিয়ে"। (আদ্ দিরায়াহ, ২৪২ নং হাদীসের আলোচনায়) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/৫)

এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে বিতির নামায এক রাকাত পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন বুখারী শরীফের নিম্নবর্ণিত হাদীসটি লক্ষ্য করুন :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ–١٣٥/١)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, রাতের নামায দু'রাকাত করে। অতঃপর তোমাদের কেউ ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলে এক রাকাত নামায পড়ে নিবে যা তার আদায়কৃত নামাযকে বিতির বানিয়ে দিবে। (বুখারী : ৯৩৭) শাব্দিক

কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৪২০৪)

পর্যালোচনা : উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'এক রাকাত দ্বারা আদায়কৃত নামাযকে বেজোড় করে দিবে'। এ হাদীস দ্বারা শুধু এক রাকাত বিতির পড়ার দলীল গ্রহণ করা আদৌ সঙ্গত নয়। কেননা এক রাকাত বিতির পড়ার কথা যে সকল হাদীসে বলা হয়েছে সে সকল হাদীসে উক্ত এক রাকাতের আগে আর কোন নামায না পড়ে শুধু এক রাকাত বিতির পড়তে হবে বলে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বরং সব হাদীসেই উক্ত এক রাকাতের আগে কোন না কোন নামাযের কথা বলা হয়েছে। আর সে নামাযকে উক্ত এক রাকাত দ্বারা বেজোড় বানাতে বলা হয়েছে। সুতরাং প্রথমে কোন নামায না পড়ে শুধু এক রাকাত বিতির পড়া প্রমাণবিহীন একটি আমল। এর দলীল হিসেবে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি দেখুন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ سَعْدًا يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، قَالَ: «مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ قَطُّ»

অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. এক রাকাত বিতির পড়েন। হযরত ইবনে মাসউদ বললেন, এক রাকাত কখনোই যথেষ্ট হবে না। (আল মু'জামুল কাবীর লিততবারানী-৯৪২২, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ-২৬৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকূফ। আল্লামা হাইসামী বলেন, إِسْنَادُهُ حَسَنٌ হাদীসটির সনদ হাসান। অবশ্য তিনি একটি আপত্তিও করেন যে, وَحُصَيْنٌ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ হাদীসটির বর্ণনাকারী হুসাইন হযরত ইবনে মাসউদের সাক্ষাৎ পাননি। অর্থাৎ হাদীসটি সনদবিচ্ছিন্ন। কিন্তু আল্লামা হাইসামীর অভিযোগ এ কারণে ক্ষতিকর নয় যে, মুয়াত্তা মুহাম্মাদের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, বর্ণনাকারী হুসাইন এ হাদীসটি ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর বর্ণনা সহীহ। বিস্তারিত দেখুন তাহজীবুত তাহজীব কিতাবে হযরত ইবরাহীম নাখাঈর জীবনী আলোচনায়।

পর্যালোচনা : এক রাকাত বিতির পড়ার হাদীসের যে জবাব পূর্বে তুলে

ধরা হয়েছে তাতে পঠিত নামাযকে এক রাকাত দ্বারা বেজোড় বানানোর কথা বলা হয়েছে। শুধু এক রাকাত পড়তে বলা হয়নি। হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর এ হাদীসটি উক্ত জবাবের স্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং এক রাকাত বিতির পড়ার হাদীসসমূহের এমন ব্যাখ্যা না করা উচিত যে, বিতির নামায শুধু এক রাকাত। বরং সাহাবায়ে কিরামের আমল সামনে রেখে এ ব্যাখ্যা করাই সমীচীন হবে যে, দু'রাকাত নামাযের সাথে আরো এক রাকাত মিলিত করে বেজোড় করে দেয়া অর্থাৎ তিন রাকাত পড়া।

বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করতে হবে

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, মাগরিবের নামায হলো দিনের বিতির। সুতরাং তোমরা রাতের বিতিরও পড়ো। (মুসনাদে আহমদ : ৪৮৪৭)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, رجاله ثقات رجال الشيخين. "এ হাদীসের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য, বুখারী-মুসলিমের রাবী"। (মুসনাদে আহমদ : ৪৮৪৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত এ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের নামায হলো দিনের বিতির। আর বিতির নামায হলো রাতের বিতির। আর দিনের বিতির মাগরিবের নামাযে যেহেতু দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক আছে। সুতরাং বিতির নামাযের দ্বিতীয় রাকাতেও বৈঠক থাকার কথা। হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, বিতির তিন রাকাত; দিনের বিতির তথা মাগরিবের নামাযের মতো। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৫ ও ২০৬, হাদীস নং-১৭৪৫) ইমাম বায়হাকী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আস-সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী: ৪৮১২)

عَنْ زُرَارَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، ... قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ

وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ–٢٥٥/١)

অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে হিশাম রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.কে বললাম: হে উম্মুল মুমিনীন, আমাকে রসূলুল্লাহ স.-এর বিতির সম্পর্কে বলুন। জবাবে হযরত আয়েশা রা বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর মিসওয়াক ও অযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা তাঁকে রাতে ঘুম থেকে উঠাতেন। তারপর তিনি মিসওয়াক করতেন, অযু করতেন এবং নয় রাকাত নামায পড়তেন আর অষ্টম রাকাত ছাড়া বসতেন না। অতঃপর এ বৈঠকে আল্লাহর জিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে ডাকতেন। এরপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে যেতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে নবম রাকাত পড়ে বসতেন এবং এ বৈঠকে আল্লাহর জিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে ডাকতেন। এরপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। (সংক্ষেপিত : মুসলিম : ১৬১২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত আছে। (জামেউল উসূল : ৪১৯৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. বিতিরের যে রাকাতে সালাম ফিরাতেন তার পূর্বের রাকাতে বসতেন– যা তিন রাকাত বিতিরের দ্বিতীয় রাকাত হয়।

ফায়দা : অষ্টম রাকাতের পূর্বে রসূলুল্লাহ স. বসতেন না মর্মে রসূলুল্লাহ স.এর নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো, তার প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হলে বুখারী শরীফের ৯৩৭ নম্বরে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীস "রাতের নামায দু'রাকাত করে"-এর সাথে সাংঘর্ষিক, হযরত আয়েশা রা. থেকে মুসনাদে আহমাদের ২৪৯২১ নম্বরে বর্ণিত সহীহ হাদীস "রসূল স. প্রতি দু'রাকাতে বসতেন"-এর সাংঘর্ষিক এবং মুসলিম শরীফে

বর্ণিত وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ রসূল স. প্রতি দু'রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন হাদীসটির সাথেও সাংঘর্ষিক। এ সব হাদীসের কারণে মুহাদ্দিসীনে কিরাম উপরিউক্ত হাদীসের এমন অর্থ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. অষ্টম রাকাতের পূর্বে এমন বৈঠক করেননি যে বৈঠকে সালাম নেই। বরং তিনি প্রতি দু'রাকাতে বৈঠক করেছেন এবং সালামও ফিরিয়েছেন। কেবল অষ্টম রাকাতে গিয়ে শুধু বৈঠক করেছেন অথচ সালাম ফিরাননি। (ফাতহুল মুলহিম : রাতের নামায অধ্যায়)

এ ব্যাখ্যা মোতাবেক দু'রাকাত করে ছয় রাকাত পড়েছেন। অতঃপর নতুন তাহরীমার মাধ্যমে শুরু করা তিন রাকাত বিতির শুরু করে তার দ্বিতীয় রাকাতে বসেছেন যা মোট নামাযের অষ্টম রাকাত। তিনি এ রাকাতে সালাম ফিরাননি। বিতিরের তৃতীয় আর মোট নামাযের নবম রাকাতে গিয়ে সালাম ফিরিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. তিন রাকাত বিতির পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করতেন, কিন্তু সালাম ফিরাতেন না। তৃতীয় তথা শেষ রাকাতে গিয়ে সালাম ফিরাতেন।

এ বর্ণনাটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনা দ্বারা আমাদের এ ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ সঠিক সাব্যস্ত হয়। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلَاثٍ-١/١٩١)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। (নাসাঈ : ১৭০১)

হাদীসটির স্তর: সহীহ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. এ হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১১৩৯)

পর্যালোচনা : উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলিম শরীফ থেকে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসের সাথে এ হাদীসের কোন বিরোধ নেই।

দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না শব্দই প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক আছে। তা না হলে বৈঠকবিহীন সালামের কথা আসবে কিভাবে? এসব কিছু থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিতিরের দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (আলমগিরী : ১/৭১)

উল্লিখিত হাদীসগুলোর বিপরীতে ইমাম দারাকুতনী রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন : لَا تُوْتِرُوا بِثَلَاثٍ, أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ , أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ "তোমরা তিন রাকাত দ্বারা বিতির পড়বে না। বরং পাঁচ বা সাত রাকাত দ্বারা বিতির পড়বে এবং মাগরিবের সাথে মিলিয়ে ফেলবে না"। (দারাকুতনী : ১৬৫০)

এ হাদীস দ্বারা মূলত তিন রাকাত বিতির বর্জন করার কথা বলা হয়নি। কেননা তিন রাকাত বিতিরের দলীল তো অসংখ্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বরং এখানে শুধু তিন রাকাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ মাগরিবের নামায যেমন তিন রাকাত পড়া হয়, তার পূর্বে কোন নফল নামায সাধারণত পড়া হয় না। বিতির নামাযকে তোমরা এমন বানিও না যে, শুধু তিন রাকাত নামায পড়লে, আর তার পূর্বে কোন নফল নামায পড়লে না। হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীসের এ অর্থ করা না হলে তিন রাকাত বিতিরের আমল সম্বলিত অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্জন করা আবশ্যক হবে যা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়া হলে সব ধরনের সহীহ হাদীসই আমলে এসে যাবে। কোন সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করতে হবে না।

বিতিরের তিন রাকাতের মাঝে কোন সালাম নেই

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ يَعْنِي بَعْدَ

التَّسْلِيمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ ذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي الْوِتْرِ–١/١٩١)

অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিতিরের ১ম রাকাতে ছূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে ছূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে ছূরা ইখলাস পড়তেন। আর শুধু শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন। সালামের পরে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ দুআটি তিনবার বলতেন। (নাসাঈ : ১৭০৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (উমদাতুল কারী-৭/৫)

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিতির নামায ৩ রাকাত পড়তেন। আর সালাম ফিরাতেন একেবারে শেষে গিয়ে। আর এটা হযরত ওমর রা.-এর বিতির ছিলো। মদীনাবাসী তাঁর থেকে এটাই গ্রহণ করেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১১৪০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম যাইলাঈ বলেন, হাকেম এ হাদীসটি বর্ণনা করে এটাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। (নাসবুর রায়াহ : ১০১ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, রসূল স., আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর এবং মদীনাবাসীদের বিতির ছিলো তিন রাকাত। আর তাঁরা সালাম ফিরাতেন তৃতীয় রাকাতে গিয়ে। এ তিন রাকাতের মাঝে কোন সালাম ফিরাতেন না। সহীহ সনদে অনুরূপ হাদীস হযরত আয়েশা রা. থেকেও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. বিতিরের দ্বিতীয়

রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। (নাসাঈ : ১৬৯৮) হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এবং ইমাম ঐাহাবী রহ. এ হাদীসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১১৩৯)

এর বিপরীতে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে উঠে আর এক রাকাত পড়ার আমলও বর্ণিত আছে। (বুখারী : ৯৩৭) কিন্তু অধিক সংখ্যক সহীহ হাদীসের বিবরণ এবং সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ব্যাপক প্রচলনের কারণে আমরা দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক এবং শেষ রাকাতে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে তিন রাকাত বিতির পড়ার আমল গ্রহণ করে থাকি। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/৮)

বিতির নামাযে সর্বদা রুকুর পূর্বে দুআয়ে কুনূত পড়া

عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ. فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ. قُلْتُ فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ، قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا. (رواه البخارى فى بَابِ غَزْوَةِ الرَّجِيعِ، وَرِعْلٍ، وَذَكْوَانَ... -٢/٥٨٧)

অনুবাদ : আসিমুল আহওয়াল রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস রা.কে নামাযে দুআয়ে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,: হ্যাঁ (নামাযে দুআয়ে কুনূত পড়বে)। আমি বললাম: রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন,: রুকুর আগে। আমি বললাম: অমুক আমাকে আপনার সম্পর্কে খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেছেন রুকুর পরে। তিনি বললেন,: সে সে মারাত্মক ভ্রমের শিকার হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. রুকুর পরে মাত্র এক মাস দুআয়ে কুনূত পড়েছেন। (বুখারী : ৩৭৯৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে। (জামেউল উসূল: ৩৫৩১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনায় হযরত আনাস বললেন, যে, কুনূত পড়তে হবে রুকুর পূর্বে। প্রশ্নকারী রুকুর পরে পড়ার কথা বললে তিনি জবাব দিলেন যে, রসূলুল্লাহ স. রুকুর পরে কুনূত পড়েছেন মাত্র এক মাস।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রুকুর পূর্বে কুনূত পড়ার আমলটি রসূলুল্লাহ স.-এর স্থায়ী এবং সার্বক্ষণিক আমল। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/৬)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتِ: اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (رَوَاه النَّسَائِىْ فِىْ بَابِ الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ–١/١٩٥)

অনুবাদ : হযরত হাসান রা. বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ স. কিছু বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি বিতির নামাযে পড়ে থাকি। বাক্যগুলো এই : اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (নাসাঈ : ১৭৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ : ১৭১৮ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৫৪১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে কুনূত পড়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামাযে দুআয়ে কুনূত পড়তে হয় এবং তা সর্বদা পড়তে হয়। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীস বর্ণনান্তে বলেন, "উলামায়ে কিরাম বিতিরের কুনূতের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. মনে করেন: বিতির সারা বছর পড়তে হবে এবং তা রুকুর পূর্বে পড়তে হবে। এটা কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরামের মত। আর এ মতই পোষণ করে থাকেন সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং কুফাবাসীগণ।

বিতিরে দুআয়ে কুনূতের আগে তাকবীর বলে হাত উঠানো

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বিতিরের শেষ রাকাতে ছূরা ইখলাস পড়তেন। অতঃপর উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং রুকুর পূর্বে দুআয়ে কুনূত পড়তেন। ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসের পূর্বে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত এ হাদীসগুলো সবই সহীহ। (জুযউ রফইল ইয়াদাইন : ৯৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাউকূফ। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর 'জুযউ রফইল ইয়াদাইন' কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করে এটাকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বিতির নামাযের দুআয়ে কুনূতের সময় হাত উঠাতেন। (ইবনে আবী শাইবা : ৭০২৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। শুধু লাইস ইবনে আবী সুলাইম মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে তাঁর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তবে এ হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করে সেটাকে সহীহ বলেছেন। (জুযউ রফইল ইয়াদাইন : ৯৬) আর সহীহ-জঈফ চেনার ক্ষেত্রে তাঁর উঁচু মানের পারদর্শিতা রয়েছে। সুতরাং হাদীসটি হাসান স্তরের নিচে নয়। ইবনে আবী শাইবা ভিন্ন আরেকটি সনদেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (হাদীস নম্বর- ৭০২৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিতিরের কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলে হাত উঠাতে হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/৬)

দুআয়ে কুনূতের স্বরূপ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتِ: اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ "(رَوَاه النَّسَائِىْ فِىْ بَابِ الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ–١/١٩٥)

অনুবাদ : হযরত হাসান রা. বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ স. কিছু বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি বিতির নামাযে পড়ে থাকি। বাক্যগুলো এই : اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (নাসাঈ : ১৭৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য"। (মুসনাদে আহমদ : ১৭১৮ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩৫৪১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনা মতে হযরত হাসান রা. বিতির নামাযে পূর্বোক্ত দুআটি পড়তেন যা রসূলুল্লাহ স. তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, বিতিরের কুনূতে ঐ দুআটি পড়া উত্তম হবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُوتِ: اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অনুবাদ : আবু আব্দুর রহমান রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

মাসউদ রা. আমাদেরকে এ দুআয়ে কুনূত পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন : اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ (ইবনে আবী শাইবা: ৬৯৬৫, ৩০৩২৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত ওমর রা. থেকে প্রায় অনুরূপ শব্দে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সেটাকে সহীহ বলেছেন। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৩১৪৩)

সারসংক্ষেপ : মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৭১০৪ নম্বর হাদীসে وَنُثْنِي عَلَيْكَ -এর পূর্বে وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ এবং আব্দুর রাযযাক : ৪৯৭৮ নম্বর হাদীসে وَلاَ نَكْفُرُكَ -এর পূর্বে ونشكرك শব্দটি অতিরিক্ত আছে। সব মিলে ঐ দুআটির পূর্ণরূপ প্রমাণিত হয় যা আমরা বিতিরে দুআয়ে কুনূত হিসেবে পড়ে থাকি। তা এই যে, اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ সুতরাং এ দুআটি বিতিরের কুনূত হিসেবে পড়া যেতে পারে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, তুমি বিতির নামাযে এই দুআ পড়ো: اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُ.. (ইবনে আবী শাইবা : ৬৯৬৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের ثقةٌ "নির্ভরযোগ্য" রাবী এবং হাদীসটির সনদ সহীহ।

শিক্ষণীয় : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. সাহাবায়ে কিরামের ছাত্র। তাঁর এ সিদ্ধান্ত মানেই সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষা। অতএব, বিতির নামাযে এ দুআটি দুআয়ে কুনূত হিসেবে পড়া যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য : কুনূতের জন্য বিভিন্ন প্রকার দুআ হাদীসে বর্ণিত আছে। এ কারণে যে কোন দুআ পড়লেই কুনূতের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর 'মাবসুত' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, قلت: فهل فيه دعاء

لا قال موقت "আবু সুলাইমান যাওযাজানী রহ. বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম, বিতিরের নামাযে কি কোন নির্ধারিত দুআ আছে? তিনি বললেন, না, কোন নির্ধারিত দুআ নেই"। (আল মাবসুত) হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকেও অনুরূপ মন্তব্য ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর কিতাবুল আছারে বর্ণিত আছে।

হযরত ইবরাহীম নাখাঈ এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর উক্তি অনুযায়ী বিতির নামাযে কোন দুআ নির্ধারিত নেই, বরং যে কোন দুআ পড়ারই সুযোগ রয়েছে। অবশ্য হানাফী মাযহাবের কোন কোন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ নামে যে মাশহুর দুআ প্রসিদ্ধ রয়েছে তা পড়া উত্তম হবে। কিন্তু সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মনে হয় যে, রসূলুল্লাহ স. হযরত হাসান রা.কে যে দুআ পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন সেটা তুলনামূলক বেশি উত্তম হবে। কেননা সনদের বিবেচনায় উক্ত হাদীসটি সহীহ। আবার দুআটি 'রসূলুল্লাহ স. নিজে শিক্ষা দিয়েছেন' কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আর মাশহুর কুনূত 'কুনূতে নাযিলার' ভাষার সাথেও এর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

রমাযানে বিতির নামায জামাতে পড়া উত্তম

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَكَانَ أُبَيٌّ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ "

অনুবাদ : হযরত সয়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর রা. উবাই ইবনে কাআ'ব ও তামীমে দারী রা.-এর ইমামতিতে মানুষকে একত্রিত করলেন আর হযরত উবাই রা. তিন রাকাত বিতির পড়াতেন। (আব্দুর রাযযাক : ৭৭২৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। ইমরান ইবনে মুসা ব্যতীত হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইমরান ইবনে মুসা ثقة নির্ভরযোগ্য। (আল কাশেফ : ৪২৭৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উবাই ইবনে কাআ'ব ও তামীমে দারী রা. রমাযান মাসে বিতির নামায জামাতে পড়াতেন। সতরাং

রমাযান মাসে বিতির নামায জামাতে পড়া উত্তম।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

অনুবাদ : হযরত আতা রহ. বলেন, আমি লোকদেরকে বিতিরসহ ২৩ রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছি। (ইবনে আবী শাইবা : ৭৭৭০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আদ দুআইশ রহ. বলেন, وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। (তাম্বীহুল কারী লিতাকবিয়াতে মা জআ্যাফাহুল আলবানী, ৩২ নং হাদীসের আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : হযরত আতা ইবনে আবি রবাহ রহ. শতাধিক সাহাবায়ে কিরামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে দ্বীন শিখেছেন। সুতরাং হযরত আতা রহ. যে সকল মানুষদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ'র সাথে ঐ জামাতে তিন রাকাত বিতির পড়তে দেখেছেন তাঁরা সাহাবায়ে কিরাম এবং জ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ। তাদের আমল ছিলো বিতির নামায তারাবীহ'র সাথে জামাতে আদায় করা। অবশ্য কেউ যদি জামাতে না গিয়ে একাকী তারাবীহ পড়ে তাহলে সে বিতিরও একাকী পড়তে পারে। তারাবীহ এবং বিতির উভয়টিই রমাযান মাসে জামাতে পড়া উত্তম হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৫২)

অধ্যায় ২১ : সফরের বিধান

সফরে কসর করা আবশ্যক

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتِ الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ. (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ–١/١٤٨)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, সর্বপ্রথম নামায দু'রাকাত করে ফরয হয়। পরবর্তীতে সফরে নামায সেভাবেই বহাল রয়েছে। আর মুকিম অবস্থার নামায (চার রাকাত) পূর্ণ করা হয়েছে। (সংক্ষেপিত : বুখারী-১০২৯, মুসলিম-১৪৪৩, ১৪৪৪ ও ১৪৪৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৩২৩৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সফরের হালাতে দু'রাকাতই পূর্ণ নামায। সুতরাং সফরে চার রাকাত পড়ার কোন সুযোগ নেই, বরং নামায কসর করে দু'রাকাত পড়াই আবশ্যক। কেননা, পূর্ণ হওয়ার পরে বাড়তি করার কোন সুযোগ থাকে না।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ، قَالَ: صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاه أحمد والنَّسَائِيْ فِيْ بَابِ عَدَدُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

অনুবাদ : হযরত ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর যবানে ঘোষিত হয়েছে সফরের নামায দু'রাকাত, ঈদুল আযহা দু'রাকাত, ঈদুল ফিতর দু'রাকাত, এবং জুমুআর নামায দু'রাকাত। এটা কসর নয়, বরং পূর্ণ নামায। (মুসনাদে আহমদ-২৫৭, নাসাঈ : ১৫৬৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح হাদীসটি সহীহ'। (মুসনাদে আহমদ : ২৫৭ নম্বর হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের নামায দু'রাকাত। তিনি এ বর্ণনায় চার রাকাত পড়ার কোন সুযোগের কথা বর্ণনা না করে সরাসরি বলেছেন যে,

মুসাফিরের নামায দু'রাকাত। এটা রসূলুল্লাহ স.-এর স্থিরকৃত সিদ্ধান্ত। সফরে কসরই মূল বিধান মর্মে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর যবানে ফরয করেছেন নিজ অঞ্চলে চার রাকাত, সফরে দু'রাকাত। (মুসলিম : ১৪৪৮) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১২৩)

কোন কোন ইমাম এটাকে 'ছাড়' বলে মন্তব্য করত পূর্ণ চার রাকাত পড়া উত্তম বলেছেন। দলীল হিসেবে সে সকল বর্ণনা পেশ করেছেন যে সকল বর্ণনায় সফরে কসর করাকে صَدَقَةٌ (ছদকা) বা رُخْصَة (ছাড়) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে মুসলিম শরীফ: ১৪৪৬ নম্বর হাদীসে। এ সকল হাদীসের জবাবে আমরা বলি যে, আল্লাহ তাআলার 'ছদকা' বা 'ছাড়' বান্দার জন্য বড় ধরনের নিআমত যা প্রত্যাখ্যানের কোন সুযোগ নেই। উপরন্তু রসূলুল্লাহ স.কে কোন ব্যাপারে সুযোগ দেয়া হলে তিনি সর্বদা সহজটা গ্রহণ করতেন। (বুখারী-৩৩০৮)

কসরের জন্য সফরের দূরত্ব

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ (رواه مالك فى باب مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ–٥١)

অনুবাদ : হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. জাতুন নুসুব নামক স্থানের দিকে গেলেন। তিনি তাঁর এ পরিমাণ সফরে কসর করলেন। হযরত মালেক রহ. বলেন, মদীনা ও জাতুন নুসুব নামক স্থানের মাঝে দূরত্ব হলো চার বারীদ অর্থাৎ ৪৮ মাইল। (মুয়াত্তা মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৪, ইবনে আবী শাইবা : ৮২২০) ১২ মাইল= ১ বারীদ। অতএব চার বারীদ =৪৮ মাইল।

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح. হাদীসটির সনদ সহীহ। (জামেউল উসূল-৪০১২ নং হাদীসের তাহকীকে)

পর্যালোচনা : ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, كُلُّ بَرِيدٍ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا এক বারীদের পরিমাণ ১২ মাইল। (আল-মাবসূত লিস্ সারাখসী)

সুতরাং চার বারীদে ৪৮ মাইল হয়। কিলোমিটারের হিসেবে ৭৭ কিলোমিটারের কিছু বেশি। অনুরূপ বর্ণনা সহীহ সনদে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকেও বর্ণিত আছে। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৫৩৯৭) ইমাম নববী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম : ২৫৫১)

আমাদের হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি শরঈ মাইলের হিসেবে ৪৮ মাইল বা তার বেশি দূরত্ব অতিক্রমের নিয়তে সফর শুরু করে নিজ এলাকা পরিত্যাগ করলে সে কসর করা শুরু করবে। তবে আমাদের মূল ভিত্তি দূরত্বের উপর নয়। বরং রসূল স. কর্তৃক মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা তিন দিন ঘোষণা করা এবং মাহরামবিহীন কোন নারীকে তিন দিনের বেশি পথ সফরের অনুমতি না দেয়া থেকে আমরা দলীল গ্রহণ করে থাকি যে, তিন দিনের পথ অতিক্রমে শরীআতের বিধি-বিধান পরিবর্তন হয়। সুতরাং কসরের বিধান আবশ্যক হবে তিন দিনের পথ অতিক্রমের নিয়তে নিজ এলাকা পরিত্যাগ করার কারণে। আর প্রতি দিন একজন মানুষ পায়ে হেঁটে বা উটে সফর করে সাধারণতঃ কত মাইল অতিক্রম করতে পারে তা নিয়ে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের তিনটি মতামত যথা : ২১ মাইল, ১৮ মাইল এবং ১৫ মাইল ফতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮ এবং ১৫ মাইলকে ফতওয়ার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। (শামী : ২/১২৩) অবশ্য উপরিউক্ত আছারের আলোকে পরবর্তী যুগের উলামায়ে কিরাম দৈনিক ১৬ মাইল হিসেবে ৪৮ মাইলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্রচলিত ইংরেজি মাইলের হিসেবে সাধারণত উলামায়ে কিরাম ৪৮ মাইলে প্রায় সোয়া ৭৭ কিলোমিটার হয় বলে ফতওয়া প্রদান করে থাকেন। কিন্তু ফতওয়ার কিতাবসমূহে মাইল বলতে শরঈ মাইল উদ্দেশ্য বলে স্পষ্ট মন্তব্য বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ্য ইংরেজি মাইল হয় ১৭৬০ গজে। কিন্তু শরঈ মাইল হয় ২০০০ গজে। (শামী : ২/১২৩) ২০০০ গজে ৭২০০০ ইঞ্চি। আর প্রতি ৩৯.৩৭ ইঞ্চিতে ১ মিটার। সুতরাং ৪৮ শরঈ মাইলে(48×2000×36÷39.37÷1000wgt)=৮৭.৭৮ কিলোমিটার। অতএব ৮৭.৭৮ কিলোমিটার বা ততধিক দূরত্ব অতিক্রমের নিয়তে নিজ শহর ত্যাগ করলে সে কসর করা শুরু করবে। এমনই মত পেশ করেছেন আহসানুল ফতওয়ার লেখক মুফতি রশীদ আহমদ রহ. (আহসানুল ফতওয়া: ৪/৯৫) এবং এর কাছাকাছি মত পেশ করেছেন মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী দামাত বারাকাতুহুম। (তুহফাতুল কারী: ৩/৪২১)

এক স্থানে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত হলে মুকিম হবে না

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، سَرَّحَ ظَهْرَهُ، وَصَلَّى أَرْبَعًا

অনুবাদ : হযরত মুজাহিদ বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. পনেরো দিন ইকামাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নিজের পিঠকে সফরের বোঝা থেকে মুক্ত করতেন এবং নামায পুরা পড়তেন। (ইবনে আবী শাইবা-৮৩০১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারীর রাবী। সুতরাং হাদীসটি বুখারীর শর্তে সহীহ।

শিক্ষণীয় : হযরত ইবনে ওমর রা.-এর ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, ১৫ দিন পর্যন্ত কোন স্থানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলে সে ব্যক্তি মুকিম হয়ে যাবে এবং পূর্ণ নামায পড়তে হবে। আর অবস্থান কাল যদি এর চেয়ে কম হয় তাহলে সে মুসাফির থাকবে। হযরত ইবনে ওমর রা. দ্বীন শিখেছেন রসূল স.-এর নিকট থেকে। সুতরাং ইবনে ওমর রা.-এর ফতওয়া মানে পরোক্ষভাবে এটা রসূল স.-এর ফতওয়া। সহীহ সনদে অনুরূপ ফতওয়া হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. থেকে-(ইবনে আবী শাইবা-৮২১৮) এবং হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. থেকে-(ইবনে আবী শাইবা-৮২২০) নং হাদীসে বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: أَتَيْتُ سَالِمًا أَسْأَلُهُ وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: " كَانَ إِذَا صَدَرَ الظُّهْرُ وَقَالَ: نَحْنُ مَاكِثُونَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِذَا قَالَ الْيَوْمَ وَغَدًا أَخَّرَ وَإِنْ مَكَثَ عِشْرِينَ لَيْلَةً

অনুবাদ : হযরত ইবনে আবী নাযীহ রহ. বলেন, আমি হযরত সালেমের নিকট জিজ্ঞেস করতে আসলাম। তিনি তখন মাসজিদের দরজার নিকট ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. সফরে কেমন করতেন? তিনি বললেন, যদি যোহর শুরু হয়ে যেতো আর তিনি বলতেন আমরা অবস্থান করবো তাহলে নামায পুরা করতেন। আর যদি বলতেন যে, আজ/কাল চলে যাবো তাহলে কসর করতেন। যদিও এমন সিদ্ধান্তহীনভাবে বিশ রাত্র অবস্থান করেন। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৯ ও ২৮০, হাদীস নং-২৪২৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার: পৃষ্ঠা-৩৬১, খণ্ড-৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সফরে কতদিন থাকা হবে সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে এ অবস্থায় যতদিনই অতিবাহিত হোক কসর করে যেতে হবে। (শামী : ২/১২৬) মনে রাখতে হবে, স্থির সিদ্ধান্তের মূল হলো মানুষের অন্তর। সুতরাং অন্তরে যদি কোন সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে থাকে তাহলে তা মুখে প্রকাশ করা হোক আর না হোক মনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামায কসর বা পুরা করতে হবে।

ফায়দা : এ ব্যাপারে রসূল স. থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কারণে সাহাবা এবং তাবিঈদের ব্যাপক মতামতের ভিত্তিতে আমরা এ আমল গ্রহণ করেছি। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১২৫)

সফরের নিয়তে নিজ অঞ্চল পরিত্যাগ করলে কসর শুরু হবে

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا

(رواه البخارى فى بَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلاَلِ–۱/۲۰۹)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, রসূল স. যোহরের নামায মদীনাতে আদায় করলেন চার রাকাত আর আসর আদায় করলেন জুল হুলাইফায় দু'রাকাত এবং আমি শুনলাম সাহাবায়ে কিরাম (হজ্ব এবং উমরার তালবিয়াহ) উভয়টি উচ্চ আওয়াজে পড়তেছেন। (বুখারী-১৪৫৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : মদীনা শহরের বাইরেই জুল হুলাইফা অবস্থিত। রসূল স. হজ্বের সফরে রওনা হয়ে মদীনা শহরের বাইরে গিয়ে কসর নামায পড়তে শুরু করলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সফরের নিয়তে নিজ শহরের সীমানা পার হলেই কসর শুরু হবে। এটাই হানাফী মাহাবের মত। (শামী : ২/১২১)

কারো আবাসন শহরের বাইরে হলে যে সীমানার মধ্যে তার সামাজিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ থাকে বা দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণে যতটুকু এলাকা জুড়ে সে সচরাচর চলাফেরা করে থাকে সেটা তার নিজ এলাকা হিসেবে গণ্য হবে। সফরের নিয়তে এ এলাকা ছেড়ে বাইরে গেলে তার কসরের বিধান শুরু হবে। এমনিভাবে সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ এলাকায় ঢুকে পড়লে সে নামায পুরা পড়া শুরু করবে।

عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ

فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا (رواه البخارى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ-١/١٤٧)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা পুনরায় মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত রসূল স. দু'রাকাত করে নামায আদায় করছিলেন। বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কত দিন মক্কায় ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা দশ দিন ছিলাম। (বুখারী-১০২০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪০১৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সফর শেষে পুনরায় মদীনায় প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত রসূল স. কসর পড়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সফর শেষে পুনরায় নিজ শহরে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত কসর করতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১২৪)

সফরে ছুন্নাত নামাযের ব্যাপারে ছাড় রয়েছে

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (رواه البخارى فى بَابِ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا-١/١٤٩)

অনুবাদ : হযরত হাফস ইবনে আসেম বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. রসূল স.-এর সঙ্গে সফর করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমি রসূল স.-এর সাথে রয়েছি। আমি তাঁকে সফরে নফল পড়তে দেখিনি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"। (বুখারী : ১০৩৮) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪০৪৭)

শিক্ষণীয় : এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. সফরে ফরযের অতিরিক্ত কোন নামায পড়তেন না। সুতরাং সফরে ছুন্নাত না পড়াতে কোন দোষ নেই। অনুরূপ হাদীস হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে মুসলিম-১৪৫২ ও ১৪৫৩ এবং মুসনাদে আহমদ:

৪৬৭৫ নম্বরে। মুসনাদে আহমাদের হাদীসকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বুখারীর শর্তে সহীহ বলেছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ-١/١٢٣)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূল স.-এর সঙ্গে সফরে আমি যোহরের নামায পড়েছি দু'রাকাত এবং তারপরে দু'রাকাত। (তিরমিযী-৫৫১)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ** হাদীসটি হাসান।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফরে ফরযের আগে এবং পরে ছুন্নাত বা অন্য কোন নফল নামায পড়ার আমলও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে চালু ছিলো। অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত আছে। (ইবনে মাযা-১০৭২) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ ছাড়া হযরত ইবনে আবী শাইবা রহ. তাঁর মুসান্নাফ কিতাবে সাহাবায়ে কিরামের অনেকের আমল এর পক্ষে বর্ণনা করেছেন। তম্মধ্যে হযরত ওমর, আবু যর, ইবনে আব্বাস, আলী এবং হযরত আয়েশা রা. অন্যতম। (ইবনে আবী শাইবা, অধ্যায়: যারা সফরে নফল পড়ে) ইমামগণ উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, সফরে তাড়াহুড়া না থাকলে ছুন্নাত নামায পড়া উত্তম আর তাড়াহুড়া থাকলে না পড়াতে দোষ নেই। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৩১)

ফজরের ছুন্নাত সফরেও পড়তে হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ (رواه مسلم فى بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ،

وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا–١٣٨/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে কোন এক সফরে শেষ রাতে যাত্রা বিরতি দিয়ে বিশ্রাম নিলাম। আর ঘুম থেকে জাগলাম সূর্য উঠার পরে। অতঃপর নবী করিম স. ইরশাদ করলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ সোয়ারীর মাথা ধরবে। অর্থাৎ এখান থেকে চলে যাবে। এটা এমন স্থান যেখানে আমাদের নিকট শয়তান উপস্থিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা তা-ই করলাম। অতঃপর রসূল স. পানি চাইলেন এবং অযু করলেন। তারপর দুটি সিজদা করলেন। হযরত ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম বলেন, তিনি দু'রাকাত নামায পড়লেন। অতঃপর ইকামাত হলো এবং তিনি ফজরের নামায পড়লেন। (মুসলিম : ১৪৩৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩২৪৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. সফরেও ফজরের ছুন্নাত পড়েছেন। হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, রসূল স. সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায়, সফর বা মুকীম অবস্থায় এবং উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে যা ছাড়তেন না, তা-হলো ফজরের পূর্বের দু'রাকাত। (ইবনে আবী শাইবা-৩৯২৯) ইবনে ওমর রা.-এর ব্যাপারে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরেও ফজরের পূর্বের দু'রাকাত ছাড়তেন না। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১৩১)

মুসাফির মুকীমের পিছনে পূর্ণ নামায পড়বে

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلاَتِهِ (رواه مالك فى باب صَلاَة الْمُسَافِرِ مَا لَمْ يُجْمِعْ مكْثاً–٥٢)

অনুবাদ : হযরত নাফে' বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. মক্কায় দশ দিন অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি নামায কসর করছিলেন। তবে ইমামের সাথে পড়লে তাঁর মতো (পূর্ণ নামায) পড়তেন। (মুয়াত্তা মালেক: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী এবং হাদীসটি উঁচু মানের সহীহ। জামেউল উসূল-৪০১৮ নং হাদীসের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত বলেন, **إسناده صحيح**. হাদীসটির সনদ সহীহ। অনুরূপ সহীহ সনদে ইবনে

আবী শাইবাতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা : ১৪১৭০)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "(رواه احمد)

অনুবাদ : হযরত মুসা ইবনে সালামা রহ. বলেন, আমরা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সাথে মক্কায় ছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমরা যখন (নামাযে) আপনাদের সাথে থাকি তখন চার রাকাত পড়ি। আর যখন আমাদের তাবুতে ফিরে যাই তখন দু'রাকাত পড়ি। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, এটা আবুল কাসেম স.-এর ছুন্নাত। (মুসনাদে আহমদ-১৮৬২)

হাদীসটির স্তর : হাসান। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده حسن হাদীসটির সনদ হাসান। (মুসনাদে আহমদ-১৮৬২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসাফির যদি মুকিম তথা মহল্লাবাসীর পেছনে নামায পড়ে তাহলে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। আর একাকী বা অন্য কোন মুসাফিরের পেছনে পড়লে কসর নামায পড়তে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ أَكْمَلَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, মুসাফির মুকীমের পিছনে নামায পড়লে পুরা নামায পড়বে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমরা এ মতই গ্রহণ করি। মুসাফির মুকীমের পিছনে নামায পড়লে তার উপর মুকীমের নামায তথা চার রাকাত পড়া আবশ্যক। আর এটাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত। (কিতাবুল আছার, হাদীস নং-১৯০)

ইমাম মুসাফির হলেও পিছনের মুকিমরা পূর্ণ নামায পড়বে

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَقَمْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَأَقَامَ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً

لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لأَهْلِ الْبَلَدِ: صَلُّوا أَرْبَعًا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মক্কাতে ছিলাম। তিনি সেখানে আঠারো রাত অবস্থান করেছিলেন। আর তখন তিনি দু'রাকাত করে নামায পড়তেন।

অতঃপর শহরবাসীকে বলতেন, তোমরা চার রাকাত পড়ো; কেননা আমরা মুসাফির। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৮৮০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. বিভিন্ন হাদীসের সমর্থনের কারণে এটাকে হাসান বলেছেন। এমনটিই বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার রহ.। (নাইলুল আওতার : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসাফির ইমামের পেছনে মুকিম মুসল্লী নামায আদায় করলে মুসাফিরের কসর নামায শেষ হওয়ার পর মুকিম তার বাকী নামায পূর্ণ করবে।

مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ (رواه مالك في باب صَلاَةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَاماً، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ– ٥٢)

অনুবাদ : হযরত ওমর রা. যখন মক্কায় আসতেন তখন মক্কাবাসীকে নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর বলতেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ করে নাও; কেননা আমরা মুসাফির। (মুয়াত্তা মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৭, আব্দুর রাজ্জাক-৪৩৬৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। ইমাম নববী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (শরহুল মুহাজ্জাব, খন্ড : ৮ম, পৃষ্ঠা: ৯২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুসাফির ইমামের পেছনে মুকিম মুসল্লী নামায আদায় করলে মুসাফিরের কসর নামায শেষ হওয়ার পর মুকিম তার বাকী নামায পূর্ণ করবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (বাদায়েউস সানায়ে' : ১/১০১)

অধ্যায় ২২ : নফল নামায

নফল নামায বাড়িতে পড়া উত্তম

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ (رواه البخارى فى بَابِ صَلاَةِ اللَّيْلِ–١/١٠١)

অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. বলেন, রমাযান মাসে রসূলুল্লাহ স. (মাসজিদে) একটি ছোট কামরা তৈরী করলেন। রাবী বলেন, মনে হয় তিনি তা চাটাই দিয়ে তৈরি করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত নামায আদায় করলেন। কিছু সাহাবাও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলেন। অতঃপর যখন তিনি তাদের ব্যাপারে জানতে পারলেন তখন উক্ত ছোট কামরায় বসে থাকলেন। পরে তিনি বের হয়ে বললেন,: আমি তোমাদের কার্যকলাপ বুঝতে পেরেছি। হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের ঘরেই নামায আদায় করো। কেননা ফরয নামায ব্যতীত মানুষের সর্বোত্তম নামায হলো তার ঘরে পড়া নামায। (বুখারী : ৬৯৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২১৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয ব্যতীত যে কোন নামাযই ঘরে পড়া উত্তম। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/২২) সহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার ঘর মাসজিদের কত নিকটে। এতদ্সত্ত্বেও আমার নিকট মাসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে ঘরে নামায আদায় করা উত্তম। তবে ফরয

নামায হলে ভিন্ন কথা। (ইবনে মাযা-১৩৭৮) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অবশ্য ফরযের পরের ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ না পড়ে বের হয়ে গেলে যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে, উক্ত নামায হয়তো আর পড়া হবে না তাহলে মাসজিদ থেকে ছুন্নাত পড়ে বের হবে।

দৈনন্দিন ১২ রাকাত ছুন্নাতে মুআক্কাদা পড়ার ফযীলত

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ.. ١/٩٤)

অনুবাদ : হযরত উম্মে হাবীবা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকাত নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। যোহরের পূর্বে ৪ রাকাত, যোহরের পরে ২ রাকাত, মাগরিবের পরে ২ রাকাত, ইশার পরে ২ রাকাত এবং ফজরের পূর্বে ২ রাকাত। (তিরমিযী : ৪১৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭০৬২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দৈনন্দিন ছুন্নাতে মুআক্কাদা বা গুরুত্বপূর্ণ ছুন্নাত হলো ১২ রাকাত। যোহরের পূর্বের ৪ রাকাত ছুন্নাতের স্থলে রসূলুল্লাহ স. কখনো কখনো ২ রাকাতও পড়তেন। সে হিসেবে দৈনন্দিন ছুন্নাতে মুআক্কাদা ১০ রাকাত হয়। (বুখারী : ১১১০) এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১২, ১৩)

ফরযের জায়গা থেকে সরে গিয়ে ছুন্নাত বা নফল পড়া

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. (رواه مسلم فى فصل فى استحباب اربع ركعات او ركعتين بعد الجمعة–١/٢٨٨)

অনুবাদ : ওমর ইবনে আতা ইবনে আবুল খুয়ার রহ. থেকে বর্ণিত, নাফে’ ইবনে জুবায়ের রহ. তাঁকে সায়েব ইবনে উখতে নামিরের নিকট ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন যা হযরত মুআ’বিয়া রা. তাঁর নামাযের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন। আমি তাঁর সাথে (মাসজিদের মধ্যস্থিত) মাকছূরা নামক স্থানে নামায আদায় করলাম। যখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরালেন, আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং আমার জায়গায় নামায পড়লাম। তিনি এসে আমাকে খবর পাঠালেন এবং বললেন, তুমি আর এরূপ করবে না। যখন তুমি জুমুআর নামায আদায় করো তখন বের না হয়ে বা কথা না বলে কোন নামায পড়বে না। কেননা রসূল স. আমাদেরকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে যেন মিলিয়ে না ফেলি, যতক্ষণ আমরা কথা না বলি বা সেখান থেকে বের না হই। (মুসলিম-১৯১৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১২৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের জায়গা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে বা সামান্য দেরি করে ছুন্নাত পড়া উচিত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৩১) অনুরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে ওমর রা. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। (আব্দুর রাযযাক : ৩৯১৫) তবে ছুন্নাতে মুআক্কাদা আদায়ে দেরির পরিমাণ বেশি হলে সেটা মাকরূহ হবে। (মুসলিম : ১২১৩)

ফরয শেষে ছুন্নাত আদায়ে বেশি দেরি না করা

عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (رواه البخارى فى بَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ– ١/١١٦)

অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা.-এর কাতিব ওয়াররাদ বলেন, মুগীরা ইবনে শু'বা রা. আমাকে দিয়ে হযরত মুআবিয়া রা.-এর নিকট একখানা পত্র লেখালেন যে, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দুআটি পড়তেন যে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (বুখারী : ৮০৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৯২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে উক্ত দুআটি পড়তেন। সুতরাং ছুন্নাত নামাযে দাঁড়াতেন দুআ পড়ার পরে। অতএব, ফরয ও ছুন্নাতের মাঝে এতটুকু পরিমাণ দেরি করায় কোন ক্ষতি নেই।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللهمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. (رواه مسلم فى بَابِ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ– ١/٢١٨)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. নামাযে সালাম ফিরানোর পর اللهمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ বলার চেয়ে বেশি সময় বসতেন না। (মুসলিম : ১২১৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৫৭৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের পর ছুন্নাত আদায়ে এতটুকু দেরি করা যাবে, যতটুকু সময় হাদীসে বর্ণিত দুআ পড়তে লাগে। উপরিউক্ত দুটি দুআ ছাড়াও হাদীসে আরো অনেক দুআর কথা বর্ণিত আছে যা থেকে রসূল স. ফরযের পরে যে কোনটা পড়তেন। অতএব, ফরযের পরে ছুন্নাত শুরু করতে এতটুকু দেরি করা যায় উপরিউক্ত যে কোন দুআ বা তার সমপরিমাণ কোন দুআ পড়তে যতটুকু সময় লাগে। এর চেয়ে বেশি সময় দেরি করা ছুন্নাতের খেলাফ হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ১/৫৩০)

ফরয নামাযের পরে যে সকল দুআ-দুরূদ এবং তাসবীহ-তাহলীল পড়ার ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা বাহ্যিকভাবে এ হাদীসের পরিপন্থী। উভয় শ্রেণীর হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় হতে পারে যে, যে সকল ফরয নামাযের পরে ছুন্নাত নেই সে সকল নামাযের পরেই তা পাঠ করবে। আর যে সকল ফরয নামাযের পরে ছুন্নাত আছে সে সকল নামাযের পরে প্রথমে ছুন্নাত পড়ে নিয়ে তারপর উক্ত দুআ-দুরূদ পাঠ করবে। কেননা দুআ-দুরূদ পড়ার হাদীসসমূহে বর্ণিত دُبُرُ الصَّلَاةِ অর্থাৎ নামাযের পরে শব্দের মধ্যে সময় নির্দিষ্ট করা নেই। বরং এ শব্দটি অনির্দিষ্ট সময় বুঝায়। তাই এর মাঝে খানিকটা দেরি করার অবকাশ রয়েছে। ছুন্নতের পরে দুআ-দুরূদ পড়লেও উক্ত হাদীসসমূহের উপর আমল পরিত্যাগ হবে না। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, রসূল স. ফরযের পরে اللهمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ দুআ'র চেয়ে বেশি দেরি করতেন না। আর দুআ-দুরূদ পাঠ করতে এর চেয়ে বেশি সময় পার হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং উপরিউক্ত পদ্ধতিতে উভয় শ্রেণীর হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে আমল করা উত্তম হবে।

উল্লেখ্য, যে সকল ফরয নামাযের পরে ছুন্নাত রয়েছে সে সকল নামাযের পরে একাকী বা সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করলে তা এতটা সংক্ষিপ্ত করা উচিত যাতে ছুন্নাত নামায আদায় করতে হাদীসে বর্ণিত সময়ের চেয়ে দেরি না হয়।

ফজরের জামাত শুরু হয়ে গেলে ছুন্নাত পড়ার বিধান

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ

رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا (رَوَاه مُسْلِمٌ فِيْ بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ– ٢٤٧/١)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ফজরের নামাযে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে মাসজিদের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত (ছুন্নাত) নামায আদায় করলো। এরপরে রসূল স.-এর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করলো। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করে বললেন, হে অমুক! তোমার ফরয নামায হিসেবে তুমি কোনটা গণনা করলে? তোমার একাকী নামায, না আমাদের সাথের নামায? (মুসলিম : ১৫২৪) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাযা এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল : ৪০৯২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাযের ইকামাত শুরু হলে আর ছুন্নাত পড়া যাবে না। এমনকি মাসজিদের কোণেও নয়। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, قَوْلُه (فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ) إلخ: ظَاهِرُه يَرُدُّ عَلى مَنْ أجَازَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فِيْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فَالْأحْوَطُ الإِجْتِنَابُ مِنْه "এ হাদীসটি বাহ্যিকভাবে তাদের মতামত প্রত্যাখ্যান করে যারা মাসজিদের কোণে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত পড়ে নেয়ার অনুমতি দেয়। সুতরাং এর থেকে বেঁচে থাকাই সতর্কতার দাবী"। (ফাতহুল মুলহিম : ৪/৪৫২) হযরত মালেক ইবনে বুহাইনা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ফজরের জামাত দাঁড়িয়ে গেলো। মুআজ্জিন ইকামাত দেয়া অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখে ইরশাদ করলেন : أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا তুমি কি ফজরের নামায ৪ রাকাত পড়বে? (মুসলিম : ১৫২৩) হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মুআজ্জিন যখন ইকামাত দিচ্ছেন তখন রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে ফজরের ছুন্নাত পড়তে দেখে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, এটা আরো আগে পড়তে পারতে না? (আল মু'জামুছ ছগীর লিততবারানী-১৪৬) আল্লামা হাইসামী বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয

যাওয়ায়েদ : ২৩৯৪) হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গেলে ফরয ব্যতীত কোন নামায নেই। (মুসলিম : ১৫১৭, ১৫১৮ ও ১৫১৯) উল্লিখিত ৪টি হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ফজরের জামাত দাঁড়িয়ে গেলে আর ছুন্নাত পড়া যাবে না। বরং ছুটে যাওয়া ছুন্নাত সূর্য ওঠার পরে আদায় করতে হবে বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী : ৪২৩)

এর বিপরীতে কোন কোন সাহাবায়ে কিরামের আমল এরূপ পাওয়া যায় যে, তাঁরা জামাত দাঁড়ানোর পরে এলে মাসজিদের কোণে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু'রাকাত নামায আদায় করে জামাতে শরিক হতেন। এ মর্মে কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَفَهْدٌ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ بَيْتِهِ فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ.

অনুবাদ : হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কাআ'ব বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. ঘর থেকে বের হলেন। ততক্ষণে ফজরের জামাত দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি মাসজিদে প্রবেশের পূর্বে রাস্তায় দু'রাকাত নামায পড়ে নিলেন। অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করে মানুষের সাথে ফজরের নামায পড়লেন। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৬, হাদীস নং-২২০২)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ, এ হাদীস-টিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার: পৃষ্ঠা-৮১, খণ্ড-৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের জামাত শুরু হয়ে গেলে হযরত ইবনে ওমর রা. ছুন্নাত পড়েছেন। যদিও সেটা মাসজিদের ভেতরে নয়। এ থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, "ফরযের জামাত শুরু হয়ে গেলে ফরয ব্যতীত কোন নামায নেই" রসূল স.-এর এ বাণীটি হয়তো মাসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মাসজিদের বাইরে কেউ কোন নামায পড়লে এ হাদীসে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা

হয়নি।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মুসা থেকে বর্ণিত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এমন সময় মাসজিদে আসলেন যখন ইমাম ফজরের নামায পড়ছিলেন। তখন তিনি একটি খুঁটির পাশে গিয়ে দু'রাকাত ছুন্নাত নামায পড়লেন। এর আগে তিনি ছুন্নাত পড়েননি। (আল্ মু'জামুল কাবীর লিত্ তবারানী : ৯২৭৯, ত্বহাবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৫, হাদীস নং-২১৯৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ, এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার : পৃষ্ঠা-৭৬, খণ্ড-৬)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে বুঝে আসে যে, ফজরের জামাত শুরু হয়ে গেলেও খুঁটির আড়ালে বা কোন কোণায় সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়া যেতে পারে। তবে জামাতের কাতারের মধ্যে বা কাতারের নিকটে পড়া মাকরূহে তাহরিমী। অবশ্য এ আমলটি বহ্যিকভাবে পূর্ববর্ণিত মারফু' হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু দারদা রা. এবং হযরত আবু উসমান নাহদী রহ. থেকেও সহীহ সনদে ত্বহাবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, ফজরের জামাত শুরু হয়ে গেলেও তাঁরা সংক্ষেপে দু'রাকাত ছুন্নাত আদায় করে জামাতে শরিক হতেন। হতে পারে যে, ফজরের ছুন্নাত অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণে اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (ফরয নামায শুরু হলে অন্য কোন নামায নেই) রসূল স.-এর এ হাদীসের বিধান থেকে তাঁরা ফজরের ছুন্নাতকে ভিন্ন ও ব্যতিক্রম মনে করতেন। অবশ্য এ মর্মে একটি হাদীসও বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীসে রসূল স. ইরশাদ করেন- اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتى الصبح ফরয নামায শুরু হলে অন্য কোন নামায নেই, তবে ফজরের দু'রাকাতের বিষয় এ থেকে ব্যতিক্রম। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৪২২৬) এ হাদীসটি যদিও সনদের বিবেচনায় জঈফ, এতদ্বসত্ত্বেও সহীহ সনদে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরামের আমল এর পক্ষে

থাকায় মনে হয় তাঁরা এ হাদীসকে আমলে নিয়েছেন; যদিও আমাদের পর্যন্ত হাদীসটি সহীহ্ সনদে পৌঁছায়নি। সনদের বিবেচনায় জঈফ কোন হাদীসের পক্ষে সাহাবায়ে কিরামের আমল বিদ্যমান থাকলে উক্ত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের আমল হিদায়া কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে-

وَمَنْ انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : إِنْ خَشَى أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ وَيُدْرِكَ الْأُخْرَى يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ (وَإِنْ خَشى فَوْتَهُمَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ) لِأَنَّ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ وَالْوَعِيدَ بِالتَّرْكِ أَلْزَمُ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে এমন অবস্থায় উপস্থিত হলো যে, সে ফজরের ছুন্নাত পড়েনি। যদি সে আশঙ্কা করে যে, ছুন্নাত পড়লে তার এক রাকাত ছুটে যাবে আর এক রাকাত পাবে, তাহলে মাসজিদের দরজার নিকট দাঁড়িয়ে ছুন্নাত পড়ে নিবে। এরপর জামাতে অংশগ্রহণ করবে। কেননা সে এভাবে উভয় ফযীলতকে একত্রে গ্রহণের সুযোগ পেলো। আর যদি শেষ রাকাতও ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে ইমামের সাথে জামাতে শরিক হয়ে যাবে। কেননা জামাতের সওয়াব বেশি এবং জামাত তরকের ধমকিও গুরুতর। (হিদায়া : ১/১৫২)

একটি বিশ্লেষণ

ফজরের জামাত শুরু হয়ে গেলেও আগে ছুন্নাত পড়ে জামাতে শরিক হওয়ার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের পক্ষে সাহাবায়ে কিরামের যে আমল পেশ করা হয়েছে, তার কোনটির মধ্যেও এ কথা উল্লেখ নেই যে, তাঁরা এক রাকাত ছুটে গেলেও আগে ছুন্নাত পড়তেন। তখনকার ফজরের নামাযে যে ধরনের লম্বা কিরাত পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে বরং এটিই অনুমিত হয় যে, জামাত শুরু হওয়ার সাথে সাথে কেউ মাসজিদে এলে প্রথম রাকাতের রুকুর পূর্বে কয়েকবার ছুন্নাত পড়তে পারবে। এ কারণে তার রাকাত ছুটবে না। ‘যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেলো সে

নামায পেলো’ হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া হয়ে থাকে যে, জামাতের এক রাকাত ছুটে গেলেও আগে ছুন্নাত পড়ে নিবে। অথচ উপরোল্লিখিত ৪টি সহীহ মারফু’ হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, জামাত শুরু হয়ে গেলে কেউ নতুন করে ছুন্নাত পড়তে দাঁড়াবে না। ছুন্নাত পড়ার কারণে ইচ্ছে করে রাকাত ছাড়ার কোন সুযোগ উক্ত হাদীসগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং ‘এক রাকাত পেলে নামায পাবে’ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: কেউ পূর্ণ জামাত ধরার চেষ্টা করে যদি মাসজিদে এসে পূর্ণ জামাত ধরতে না পারে তবুও তিনি জামাতের সওয়াব পেয়ে যাবেন।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. ফাতহুল মুলহিমে এ সংক্রান্ত আলোচনায় বলেন, **وليعلم أن أداء ركعتى الفجر بشرط وجدان الركعة من المكتوبة في زاوية من المسجد ليس هو أصل مذهبنا بل هو من تخريجات الأصحاب** “জেনে রাখা উচিত, ফজরের ফরয নামায এক রাকাত পাওয়ার শর্তে মাসজিদের কোণে দাঁড়িয়ে দু’রাকাত ছুন্নাত পড়ে নেয়ার যে মত হানাফী মাযহাবে রয়েছে, এটা আমাদের মূল মাযহাব নয়; বরং মাযহাবের পরবর্তী ইমামদের ইজতিহাদ”। (ফাতহুল মুলহিম : ৪/৪৪৮) অতএব, উপরোল্লিখিত মারফু’ হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, হযরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: যদি কেউ ঘর থেকে ছুন্নাত পড়ে না আসে তাহলে জামাত শুরু হওয়ার আগে এসে ছুন্নাত পড়া। ইবনে ওমর রা.-এর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: যদি জামাত দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকে তাহলে মাসজিদের বাইরে বা বারান্দা যদি মাসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে ছুন্নাত পড়ে নেয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস এবং মালেক ইবনে বুহাইনা রা.-এর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো : যদি জামাত শুরু হয়ে যায় আর মাসজিদের বাইরে ছুন্নাত পড়ার কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে ছুন্নাত পড়বে না। যেহেতু ফরযের জামাত শুরু হয়ে গেলে ছুন্নাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। (মুসলিম : ১৫১৭, ১৫১৮ ও ১৫১৯) বরং সূর্য ওঠার পরে ছুন্নাত পড়ে নিবে। (তিরমিযী : ৪২৩) হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো : ফজরের জামাত শুরু হয়ে যাওয়ার পরে যদি মাসজিদের বাইরে ছুন্নাত পড়ার ভালো ব্যবস্থা না থাকে, আর সে ছুন্নাত ছাড়তেও না চায় তাহলে খুঁটির আড়ালে বা মাসজিদের কোণায় সংক্ষিপ্তভাবে পড়তে পারে।

অবশ্য এ কারণে জামাতের নামাযের কোন রাকাত ছাড়তে পারবে না। এ মর্মে হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. থেকে একটি ফতওয়া সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ رَكَعْتُهُمَا قَالَ فَارْكَعْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا.

অনুবাদ : হযরত ইবনে জুরাইয বলেন, আমি হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি এমন সময় মাসজিদে এলাম যখন ইমাম নামাযরত; অথচ আমি ছুন্নাত দু'রাকাত পড়িনি। (এমতাবস্থায় আমি কী করব?) তিনি বললেন, ইমাম যে রাকাতে আছে উক্ত রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে পড়ে নাও। (আব্দুর রাযযাক : ৪০০৯)। অনুরূপ মন্তব্য ইমাম মালেক রহ. থেকেও বর্ণিত আছে; অবশ্য তিনি এটাও মসজিদের বাইরে পড়তে বলেন। (নাইলুল আওতার, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা : ১০২) হাদীসের ক্ষেত্র চিহ্নিত করার ব্যাপারে পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসরণ করা হলে মারফু' হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। সাথে সাথে মুসল্লীদের সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পাবে। মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী দামাত বারাকাতুহুম অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর এ মত পোষণ করেছেন যে, জামাত শুরু হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের চত্বর, বারান্দা বা জামাতের স্থানের বাইরে ছুন্নাত পড়ার মত কোন জায়গা না পাওয়া গেলে ছুন্নাত না পড়েই জামাতে শরীক হবে। (তুহফাতুর কারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা : ৫২৪)

ফজরের ছুন্নাত ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পরে পড়া

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ (رواه الترمذى بَاب مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ–٩٦/١)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজরের দু'রাকাত ছুন্নাত পড়তে পারেনি সে যেন তা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করে নেয়। (তিরমিযী : ৪২৩)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসটিকে বুখারীর শর্তে সহীহ বলেছেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান : ২৪৭২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ফরযের পূর্বের ছুন্নাত ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পরে (মাকরূহ সময় পার হয়ে গেলে) তা আদায় করা মুস্তাহাব। (বাদায়েউস সানায়ে' : ১/২৮৭)

এর বিপরীতে তিরমিযী শরীফের ৪২২ নম্বর হাদীসে সূর্যোদয়ের পূর্বে ছুন্নাত পড়ার অনুমতি সম্বলিত একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী রহ. নিজে উক্ত হাদীসটিকে منقطع তথা সনদবিচ্ছিন্ন বলে মন্তব্য করেছেন যা দলীলযোগ্য নয়। হযরত আতা রহ. থেকেও অনুমতির একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা : ৬৫০২ নম্বরে) কিন্তু সে হাদীসের সনদ মুরসাল। আর মুরসাল হাদীস আমাদের নিকট দলীলযোগ্য হলেও মারফু' মুত্তাসিল হাদীসের মুকাবিলায় অপ্রবল হওয়ায় সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যে সকল কর্মব্যস্ত মানুষ মাসজিদ থেকে একবার বের হয়ে গেলে আর ফিরে এসে নামায পড়তে পারবে না, কোন কোন ইমামের মতে তাদের জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে ছুন্নাত পড়ার অনুমতি আছে।

যোহরের পূর্বে চার রাকাত ছুন্নাত এক সালামে পড়া

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مِنْجَابَ، عَنْ قَرْثَعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ، تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ (رواه ابو داود فى بَابِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا–١٨٠/١)

অনুবাদ : হযরত আবু আইয়ূব রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. ইরশাদ করেন, যোহরের পূর্বে চার রাকাত যার মাঝে কোন সালাম নেই, তা দ্বারা

আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। (আবূ দাউদ-১২৭০, ইবনে মাযা-১১৫৭, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৩, হাদীস নং-১৯৬৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ.

অনুবাদ : ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন, তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণ) যোহরের পূর্বের চার রাকাতের মাঝে সালাম ফিরাতেন না। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৩, হাদীস নং-১৯৭১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন, وهذا إسناد صحيح এ হাদীসটির সনদ সহীহ। (নুখাবুল আফকার : পৃষ্ঠা-৩৮১, খণ্ড-৫)

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যোহরের পূর্বে চার রাকাত যার মাঝে কোন সালাম নেই। তবে তাশাহহুদ আছে। (ইবনে আবী শাইবা-৫৯৪৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। আর ইবনে মাসউদ রা. থেকে ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-এর সরাসরি শ্রবণ প্রমাণিত না থাকায় হাদীসটি মুরসাল। অবশ্য ইবরাহীম নাখাঈর মুরসাল সহীহ বলে রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। বরং তার মুরসাল হাদীস মুসনাদ হাদীসের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। (বিস্তারিত দেখুন তাহজীবুত তাহজীব, ইবরাহীম নাখাঈর জীবনী আলোচনায়)

সারসংক্ষেপ : এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যোহরের পূর্বের চার রাকাত ছুন্নাত এক সালামে পড়তে হয়। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/১২)

তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ ও ফযীলত

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ،

ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاه

অনুবাদ : হযরত আবু উমামা বাহেলী রা. বলেন, রসূল স. ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য রাতের নামায তথা তাহাজ্জুদ পড়া আবশ্যক। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী ভালো মানুষের অভ্যাস। তোমাদের রবের নিকট ঘনিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যম। এটা খারাবী মিটিয়ে দেয় এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখে। (মুসতাদরাকে হাকেম-১১৫৬, তিরমিযী-৩৫৪৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ হাদীসটিকে বুখারীর শর্তে সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ ও ফযীলত উভয়টিই প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে আবূ দাউদ-১৩০৭ এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে আবূ দাউদ-১৪৫১ নম্বর হাদীসে।

তাহাজ্জুদের উত্তম ওয়াক্ত

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الدَّائِمُ. قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. (رواه البخارى فى بَابِ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ–١٥٢/١)

অনুবাদ : হযরত মাসরুক রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট কোন আমল বেশি পছন্দনীয় ছিলো? উত্তরে তিনি বললেন, স্থায়ীভাবে কৃত আমল। আমি পুনরায় বললাম, তিনি কখন (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠতেন? তিনি বললেন, মোরগের ডাক শুনে উঠতেন। (বুখারী : ১০৬৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ

এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১৮৮)

শিক্ষণীয় : মোরগ ডাকে শেষ রাতে। অতএব, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য শেষ রাতে উঠতেন। সহীহ সনদে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে রাতের শেষ প্রহরে উঠার কথাও বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী : ১০৭৯) ইশার নামায পড়ে সাথে সাথে শুয়ে পড়া ছুন্নাত। এর উপর আমল করলে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ পর্যন্ত একজন সুস্থ মানুষের যতটুকু ঘুম প্রয়োজন তা পূরণ হয়ে যায় এবং তৃপ্তিসহকারে তাহাজ্জুদের আমলও করা যায়। এর বিপরীতে ঘুমাতে দেরি করলে বা আরো বেশি আগে উঠে গেলে ঘুমের চাহিদা অপূর্ণ থাকতে পারে যাতে শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত নিয়মে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশই তাহাজ্জুদের উত্তম ওয়াক্ত। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/২৫) অবশ্য কোন কারণে শেষ রাতে উঠা সম্ভব হবে না এমন ধারনা হলে ইশার নামাযের পর (ছুন্নাত আদায় করে বিতিরের আগে বা পর) দু/চার রাকাত পড়ে নিলে সেটাও তাহাজ্জুদ হিসেবে গণ্য হবে। (তবারানী কাবীর-৭৮৭, মাযমাউজ যাওয়ায়েদ-৩৫২৫)

রসূলুল্লাহ স. এর তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাত সংখ্যা

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ. فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ. (رواه البخارى فى بَابٍ: كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟..-١٥٣/١)

অনুবাদ : হযরত মাসরুক রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ফজরের ২ রাকাত ব্যতীত ৭, ৯ বা ১১ রাকাত। (বুখারী : ১০৭৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১৯৮)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. বিতির ব্যতীত কখনো ৪ রাকাত, কখনো ৬ রাকাত আবার কখনো ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ

পড়তেন। হযরত আয়েশা রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. রমাযান এবং রমাযানের বাইরে ১১ রাকাতের উপরে বাড়াতেন না। প্রথমে চার রাকাত, পুনরায় চার, এরপরে তিন রাকাত পড়তেন। (বুখারী-১০৮১)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. (رواه مسلم فى بَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ-١/٢٥٤)

অনুবাদ : হযরত আবু সালামা রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.কে রসূল স.-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূল স. ১৩ রাকাত নামায পড়তেন। প্রথমে ৮ রাকাত পড়তেন, অতঃপর বিতির পড়তেন তারপরে বসে বসে দু'রাকাত পড়তেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে রুকু করতেন। অতঃপর ফজরের নামাযের আযান ও ইকামাতের মাঝে দু'রাকাত নামায পড়তেন। (মুসলিম-১৫৯৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪১৯৮)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর তিন রাকাত বিতির পড়তেন।

জ্ঞাতব্য : রসূল স.-এর রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে ১১ রাকাত, (বুখারী : ১০৭৩ ও ১০৮১) ১৩ রাকাত, (মুসলিম-১৫৯৩) হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ যুহানী থেকে বিতিরের পূর্বেই ১২ রাকাত। (বুখারী : ১৮৩, মুসলিম-১৬৭৬ ও ১৬৭৭) এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সব কিছু থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স.-এর রাতে আদায়কৃত নামাযের কোন নির্ধারিত রাকাত ছিলো না। বরং সময়-সুযোগ, মনের চাহিদা ও শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী যখন যেমন সম্ভব হতো তখন তেমন করতেন। এটাই হানাফী মাযহাবের মত। (শামী : ২/২৫)

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নিয়তে ঘুমালে সওয়াব পাওয়া যাবে

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه النسائى فى بَابِ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي الْقِيَامَ فَنَامَ–١/١٩٩)

অনুবাদ : হযরত আবু দারদা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করার নিয়তে শয্যা গ্রহণ করে, অতঃপর ঘুমের চাহিদা প্রবল হওয়ার কারণে সে ভোর পর্যন্ত উঠতে না পারে তাহলে তার জন্য তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব লেখা হবে। আর ঘুম তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ হয়ে যাবে। (নাসাঈ : ১৭৮৮, ইবনে মাযা : ১৩৪৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح হাদীসটি সহীহ। (জামেউল উসূল-৪১৮৬ নং হাদীসের আলোচন-ায়)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি খালেছ মনে তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ত করে এবং এলার্ম বা অন্য কোনভাবে জাগবার ব্যবস্থা করে যদি তার ঘুম না ভাঙ্গে, আর এ কারণে সে তাহাজ্জুদে উঠতে না পারে, তবুও খালেছ নিয়তের কারণে সে তাহাজ্জুদের নেকী পেয়ে যাবে।

ইশরাকের নামায

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بن عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بن الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: مَنْ صَلَّى صَلاةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

অনুবাদ : হযরত আবু উমামা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জিকিরে রত থাকে। অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করে; সে একটি হজ্ব ও একটি উমরার সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে (আল মু'জামুল কাবীর লিত্ তবারানী-৭৬৪২)।

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা হাইসামী বলেন, إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ এ হাদীসটির সনদ উত্তম। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১৬৯৩৮) আল্লামা মুনযেরী রহ.ও বলেন যে, হাদীসটির সনদ উত্তম। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِد كَثِيرَة হাদীসটির সমর্থনে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব-৬৭২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে এবং সূর্য পূর্ণভাবে উঠার পরে দু'রাকাত নামায আদায় করে তারা একটি হজ্ব ও একটি উমরার ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং সুযোগ হলে এ নামায পড়া উচিত।

চাশত-এর নামায

عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ. (رواه مسلم فى بَابِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ– ٥٧/١)

অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. একদল লোককে চাশতের নামায আদায় করতে দেখে বললেন, এরা কি জানে না যে, অন্য সময় অর্থাৎ আরো পরে গিয়ে নামায আদায় করা বেশি ফযীলতপূর্ণ? রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন: আওয়াবীনের নামায সে সময় হয় যখন উট শাবকের পায়ে গরম ছেকা লাগার সময় হয়ে যায়। (মুসলিম : ১৬১৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, চাশতের নামাযের ওয়াক্ত হলো সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পেলে। উল্লিখিত হাদীসসহ আরো অনেক হাদীসে চাশতের নামাযকে আউওয়াবীনের নামাযও বলা হয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা: ৭৮৭৪, মুসনাদে আহমদ : ১৯২৭০) হযরত উম্মে হানী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.কে মক্কা বিজয়ের দিন চাশতের সময় আট রাকাত নামায আদায় করতে দেখেছেন। (বুখারী : ১১০৬) তবে এ নামায তিনি নিয়মিত পড়তেন বলে প্রমাণ মেলে না।

আউওয়াবীনের নামায

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ رَحِمَهُ اللهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ الْخَلْوَةُ الَّتِي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى يَثُوبَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه محمد بن نصر بن الْمَرْوَزِي فى بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ سِوَى الرَّكْعَتَيْنِ).

অনুবাদ : হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির রহ. বলেন, রসূল স. ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি মাগরিব এবং ইশার মাঝে নামায পড়বে সেটা হবে সলাতুল আউওয়াবীন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আউওয়াবীনের নামায হলো মানুষ ইশার নামাযের জন্য উঠার পূর্বে মাগরিব ও ইশার মাঝে নির্জন সময়ে যা আদায় করা হয়। (কিয়ামুল লাইল লিল মারওয়াযী, অধ্যায়: মাগরিব এবং ইশার মাঝে নামাযের জন্য উৎসাহিত করা)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন, وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَا يُعَارِضهُ مَا فِي الصَّحِيحِ এটা যদিও মুরসাল কিন্তু সহীহ হাদীসের মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এর কোন বৈপরীত্য নেই। (নাইলুল আওতার, অধ্যায়: মাগরিব ও ইশার মাঝে নামায পড়া)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাগরিবের পরে পঠিত

নফল নামাযকে আউওয়াবীনের নামায বলে। হযরত হুযাইফা রা. থেকে একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. মাগরিবের নামায শেষ করে ইশা পর্যন্ত নামায পড়তে থাকলেন। অতঃপর ইশার নামায পড়ে বের হলেন। (মুসনাদে আহমদ-২৩৪৩৬)

জ্ঞাতব্য : চাশতের নামাযকে আউওয়াবীনের নামায বলার কথাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং উভয় নামাযকেই আউওয়াবীনের নামায বলা যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: وَكَذَلِكَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ (رواه ابو داود فى بَابِ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ– ١/١٨٧)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী " **كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ** " তাঁরা রাতে খুব কম ঘুমাতেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মাগরিব এবং ইশার মাঝে নামায পড়তেন। ইয়াহইয়ার বর্ণনায় আরো বাড়তি রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার বাণী " **تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ** " এর ব্যাখ্যায়ও হযরত আনাস রা. অনুরূপ বর্ণনা করেন। (আবূ দাউদ-১৩২২)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী-৩১৯৬) আর জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। (জামেউল উসূল-৮১৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম ব্যাপকভাবে মাগরিব বাদ নফল নামায পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং এটা ছুন্নাত।

জ্ঞাতব্য : আউওয়াবীন নামাযের রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে চার রাকাত (আব্দুর রাজ্জাক-৪৭২৮) হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে ছয় রাকাত। (তিরমিযী-৪৩৫) তবে সনদের বিবেচনায় এ দুটি হাদীসই জঈফ। আর সহীহ হাদীসে রাকাত সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং চার বা ছয় রাকাতও পড়া যেতে পাারে। আর নফল নামায হিসেবে প্রত্যেকের সময় ও সামর্থ অনুযায়ী রাকাত বেশি/কমও হতে পারে। অবশ্য হানাফী মাযহাবে ছয় রাকাতের আমলকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। (মিনহাতুল খালেক)

সালাতুত তাসবীহ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى عُمُرِكَ مَرَّةً. (رواه

ابو داود فى بَابِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ–١٨٤/١)

অনুবাদ : হযরত আবু রাফে’ থেকে বর্ণিত, রসূল স. হযরত আব্বাস রা.কে বললেন, হে চাচা, আমি কি (একটি জিনিস শিক্ষাদানের মাধ্যমে) আপনার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করবো না? আমি কি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে দশটি গুণ শিক্ষা দিবো না? যখন আপনি তা করবেন আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বের-পরের, নতুন-পুরান, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, ছোট-বড় এবং গোপনে-প্রকাশ্যে সব ধরনের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। গুণ দশটি হলো আপনি চার রাকাত নামায পড়বেন প্রত্যেক রাকাতে ছূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি ছূরা পড়বেন। যখন প্রথম রাকাতের কিরাত পড়ে অবসর হবেন তখন দাঁড়িয়ে পনেরো বার سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ বলবেন। এরপরে রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় দশবার পড়বেন। অতঃপর রুকু হতে মাথা উত্তোলন করবেন এবং দশবার পড়বেন। এর পর সিজদার জন্য ঝুঁকবেন এবং সিজদারত অবস্থায় দশবার পড়বেন। অতঃপর সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করবেন এবং দশবার পড়বেন। এর পর ২য় সিজদা করে দশবার পড়বেন। অতঃপর মাথা উত্তোলন করে (দাঁড়ানোর পূর্বে) দশবার পড়বেন। এ হলো প্রত্যেক রাকাতে পঁচাত্তর বার। অনুরূপভাবে চার রাকাতে করবেন। রসূল স. বলেন, আপনি পারলে দৈনিক একবার পড়বেন? যদি তা না পারেন তাহলে সপ্তাহে একবার পড়বেন। যদি তা না পারেন তাহলে মাসে একবার পড়বেন। যদি মাসে একবার না পারেন তাহলে বছরে একবার পড়বেন। আর যদি তাও না পারেন তাহলে পূর্ণ জীবনে একবার পড়বেন। (আবূ দাউদ : ১২৯৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ বলেন, هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ এ সনদটি স্পষ্ট সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম-১১৯৬) আর আবূ দাউদ শরীফের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন إسناده حسن وله شواهد يصح بها হাদীসটির সনদ হাসান। তবে এর সমার্থক অনেক হাদীস রয়েছে যার সমর্থনে এটা সহীহ সাব্যস্ত হয়। (আবূ দাউদ-১২৯৭ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী : ৪৮২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা সলাতুত তাসবীহ'র ফযীলত প্রমাণিত হলো। অতএব, এ হাদীস অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করা উচিত।

জ্ঞাতব্য : এ হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়ে তারপরে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে এ বৈঠকটির ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনা বিভিন্ন রকম হওয়ায় হযরত ইবনুল মুবারক রহ. সলাতুত তাসবীহ আদায়ের আরো একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যাতে উক্ত বৈঠক করার প্রয়োজন হয় না। উক্ত পদ্ধতি এই যে, তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়ে উক্ত তাসবীহ ১৫ বার বলবে। এরপর **اعوذ بالله** ও **بسم الله** বলে ছূরা ফাতিহা এবং অপর একটি ছূরা পড়ে উক্ত দুআটি ১০ বার পড়বে। আর অবশিষ্ট সব ক্ষেত্রে পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী তাসবীহ পাঠ অব্যাহত রাখবে। তাহলে দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে প্রতি রাকাতে নির্ধারিত ৭৫ বার তাসবীহ পাঠ পূর্ণ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে ১৫ বার তাসবীহ পড়বে। আর ছূরা ফাতেহা এবং অন্য ছূরা শেষ করে ১০ বার তাসবীহ পড়বে। আর অবশিষ্ট সব ক্ষেত্রে পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী তাসবীহ পাঠ অব্যাহত রাখবে। তাহলে সিজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়ার প্রয়োজন হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর এ বর্ণনাটি তিরমিযী : ৪৮১, মুসতাদরাকে হাকেম-১১৯৭ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। আর এ পদ্ধতিকেই হানাফী মাযহাবে উত্তম বলা হয়েছে। (শামী : ২/২৭)

ইস্তিখারার নামায

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ (رواه البخارى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى-١/١٥٥)

অনুবাদ : হযরত জাবের রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে কুরআনুল কারীমের ছূরার মতো প্রত্যেক ব্যাপারে ইস্তিখারা শিক্ষা দিয়েছেন। যখন কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করবে তখন দু'রাকাত নামায আদায় করে নিচের দুআটি পড়ে নিজের প্রয়োজন উল্লেখ করবে। দুআটি এই : اللهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي (বুখারী : ১০৯৩) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩৫৭)

জ্ঞাতব্য : ইস্তিখারার নামায আল্লাহ তাআলার নিকট হতে কল্যাণ কামনার ছুন্নাত তরীকা। এটা ঐ সকল কাজে প্রযোজ্য হবে যা করা বা না করা উভয়টিই জায়েয। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মানা ও নিষেধ বর্জন করা সম্পূর্ণই কল্যাণ। সুতরাং কোন কাজে আল্লাহ বা তাঁর রসূলের নির্দেশ বা নিষেধ বিদ্যমান থাকলে সে ক্ষেত্রে তা পালন করা বা না করার জন্য কোন ইস্তিখারা চলবে না। বরং সেটা মানতে হবে।

উল্লেখ্য, দুআর মধ্যে যেখানে هَذَا الأَمْرَ শব্দটি উল্লেখ আছে সেখানে এ শব্দের পরিবর্তে নিজের প্রয়োজনে যে কাজের জন্য ইস্তিখারা করছে সেটা উল্লেখ করবে।

সলাতুল হাজাত

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَفَائِدٌ هُوَ أَبُو الْوَرْقَاءِ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الحَاجَةِ–١/١٠٨)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার নিকট বা মানুষের নিকট কারো কোন প্রয়োজন হলে ভালোভাবে অযু করে দু'রাকাত নামায পড়বে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ স.-এর উপর দুরূদ পড়ে এই দুআটি বলবে: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ " ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীস-টি হাসান-গরীব। এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে কিছু কথা আছে। ফায়েদ ইবনে আব্দুর রহমানকে হাদীসের ক্ষেত্রে জঈফ সাব্যস্ত করা হয়। আর ফায়েদের উপনাম হলো আবুল ওয়ারকা। (তিরমিযী : ৪৭৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগাইরিহী। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীস-টি ইবনে মাযা এবং মুসতাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হয়েছে। সকল সনদেই

ফায়েদ ইবনে আব্দুর রহমান বিদ্যমান রয়েছেন যিনি জঈফ রাবী। অবশ্য হাকেম তাঁকে **مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ** হাদীস বর্ণনায় সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম-১১৯৯) তবে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। (ছূরা বাকারা-১৫৩) আর নামাযের শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফের পরে দুআ করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (বুখারী-৭৯৫) সুতরাং ফায়েদ ইবনে আব্দুর রহমান জঈফ হলেও হাদীস গ্রহণযোগ্য।

জ্ঞাতব্য : নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা কুরআনের নির্দেশ। (ছূরা বাকারা-১৫৪) আর যে কোন বিপদে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তাআল-ার শরণাপন্ন হওয়া রসূল স.-এর বৈশিষ্ট্য। (মুসনাদে আহমদ-২৩২৯৯) সুতরাং যে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সলাতুল হাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনার আমল করা উচিত।

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. (رواه البخارى فى بَابِ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ–١/٦٣)

অনুবাদ : হযরত আবু কতাদা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগেই দু'রাকাত নামায আদায় করে। (বুখারী : ৪৩১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩৫৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামায বা যে কোন কাজে মাসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মাসজিদের দু'রাকাত নামায পড়া রসূল স.-এর নির্দেশ। অবশ্য এ নির্দেশটি ফরয-ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। আর দৈনন্দিন ১২ রাকাত ছুন্নাতে মুআক্কাদার তালিকায়ও রসূল স. এ নামাযের নাম উল্লেখ করেননি। (তিরমিযী : ৪১৫) আর দৈনন্দিন আবশ্যকীয় নামাযের তালিকায়ও রসূল স. এ নামাযের নাম

উল্লেখ করেননি। (বুখারী-৪৪) তাই এ সবকিছু সামনে রেখে ইমামগণ এটাকে মুস্তাহাব নির্দেশ হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: اسْتَحَبُّوا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ المَسْجِدَ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ এ হাদীসের উপর আমাদের সাথীদের আমল রয়েছে। কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে তার উপর দু'রাকাত নামায আদায় করাকে তারা মুস্তাহাব মনে করেন। তবে ওযর থাকলে ভিন্ন কথা। (তিরমিযী-৩১৬) ইমাম তিরমিযী রহ.-এর উক্তি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এটা মুস্তাহাব। সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈদের আমল থেকেও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটা আবশ্যকীয় নামায নয়। এ বিষয়ের প্রমাণ তুলে ধরতে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈদের আমল সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ، وَآنَيْتَ.

অনুবাদ : হযরত আবু যাহরিয়া রহ. বলেন, জুমুআর দিনে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র রা.-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, রসূল স. খুৎবারত অবস্থায় এক লোক মানুষের গর্দান ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো। তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি বসে পড়ো। তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো এবং বিলম্ব করে ফেলেছো। (মুসনাদে আহমদ : ১৭৬৯৭, আবূ দাউদ : ১১১৮, নাসাঈ : ১৪০২, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫১, হাদীস নং-২১৫৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح على شرط مسلم "হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ : ১৭৬৯৭ নং হাদীসের আলোচনায়) হাকেম এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও এ হাদীসের ব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (মুসতাদরাকে

হাকেম : ১০৬১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামায পড়া জরুরী নয়। অন্যথায় রসূল স. আগত লোকটিকে বসতে না বলে আগে দু'রাকাত নামায পড়তে বলতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَلاَ يُصَلُّونَ، قَالَ: وَرَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রহ. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবাগণ মাসজিদে প্রবেশ করতেন, অতঃপর বের হয়ে আসতেন। অথচ কোন নামায আদায় করতেন না। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর রা.কে এমন করতে দেখেছি। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৪৪৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلاَ يُصَلِّي فِيهِ.

অনুবাদ : হযরত নাফে' রহ. বলেন, হযরত ইবনে ওমর রা. মাসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতেন অথচ সেখানে নামায পড়তেন না। (ইবনে আবী শাইবা-৩৪৪৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَّ تُصَلِّي ؟ قَالَ: إِذنْ وَرَبِّي لاَ نَزَالُ نُصَلِّي.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওন রহ. বলেন, আমি ইমাম শা'বী রহ.-এর সাথে কুফার মাসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমি তাঁকে বললাম, আপনি নামায পড়বেন না? তিনি বললেন, রবের কসম, তাহলে তো আমি সর্বদা নামাযই পড়তে থাকবো। (ইবনে আবী শাইবা-৩৪৪৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-

মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের উপরিউক্ত আমল ও মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামায পড়া জরুরী নয়। অনুরূপ আমল হযরত সালেম এবং সুআইদ ইবনে গাফালা রহ. থেকেও বর্ণিত রয়েছে। (ইবনে আবী শাইবা-৩৪৫০ ও ৩৪৫১)

তাহিয়্যাতুল অযু

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةُ، قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِلاَلاً فَقَالَ " يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشَرَّفٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ فَقُلْتُ أَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قُلْتُ أَنَا قُرَشِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ قُلْتُ أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ بِلاَلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمَا (رواه الترمذى فى بابٍ تحت بابِ مَنَاقِبِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ–٢/٢٠٩)

অনুবাদ : হযরত আবু বুরদা রা. বলেন, প্রত্যুষে রসূলুল্লাহ স. বিলাল রা.কে ডেকে বললেন, হে বিলাল! তুমি কী কারণে আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছে গেলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখনই আমার সামনে তোমার (জুতোর খসখস) আওয়াজ শুনেছি। গতকাল আমি (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করে তোমার জুতোর খসখস আওয়াজ শুনেছি। অতঃপর আমি স্বর্ণের তৈরী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি মহলের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার? উত্তরে তারা বললো, আরবের এক ব্যক্তির। আমি

বললাম, আমি তো আরবী লোক, তবে এটা কার? তারা বললো, কুরাইশী এক ব্যক্তির। আমি বললাম, আমি তো কুরাইশী, তবে এটা কার? তারা বললো, মুহাম্মাদ স.-এর এক উম্মতের। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ, তবে এটা কার? তারা বললো, ওমর ইবনুল খত্তাব রা.-এর। হযরত বিলাল রা. তখন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'রাকাত নামায আদায় করেছি। আর যখনই আমার অযু ভেঙ্গেছে তখনই অযু কওে নিয়েছি এবং এ বিশ্বাস করেছি যে, এখন আল্লাহর জন্য দু'রাকাত নামায পাওনা রয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এ দুটিই (তোমার জান্নাতে আগে প্রবেশের) কারণ। (তিরমিযী : ৩৬৮৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ . হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (মুসনাদে আহমদ-২৩০৪০ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, অযুর পরে দু'রাকাত নামায পড়া বড় ধরনের নেক কাজ। অতএব, যথাসম্ভব আমলের চেষ্টা করা উচিত। তবে এটা যেহেতু নফল নামায সেহেতু ঐ সময়টা নফল নামায পড়ার জন্য মাকরূহ ওয়াক্ত হলে তখন নামায পড়বে না।

ইস্তিস্কার নামায

ইস্তিস্কা শব্দের মূল অর্থ বৃষ্টি কামনা করা। সময়মত বৃষ্টিবর্ষণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ। নিয়মিত বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ হলে বান্দার বুঝা উচিত যে, আমাদের কোন কাজে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর রহমত উঠিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং বান্দার দায়িত্ব হলো ঐ সকল আমল বাড়ানো যাতে আল্লাহ তাআলার অসন্তোষ দূর হয়ে যায় এবং তিনি খুশি হয়ে রহমতের বৃষ্টি দান করেন। উক্ত আমলের মধ্যে প্রথমেই নাফরমানী ছেড়ে দেয়া। অতঃপর নামায, দান-ছদকা, দুআ এবং রোযা রাখা। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর হবে তওবা ও ইস্তিগফার। কারণ আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে বৃষ্টিবর্ষণ করাকে তওবা ও ইস্তিগফারের পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। (ছূরা হুদ-৫২, ছূরা নূহ-১০,১১) বৃদ্ধ, শিশু এবং দুর্বল মানুষকে দুআয় শরিক করা। যেহেতু দুর্বলদের কারণে আল্লাহ

তাআলা সবল ব্যক্তিদের প্রতি দয়া করেন। (তিরমিযী-১৭০৮) রসূল স. থেকে ইস্তিস্‌কার দুটি পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে। **এক.** জনসাধারণকে সাথে নিয়ে সরাসরি বৃষ্টির জন্য সম্মিলিত দুআ করা। **দুই.** জনসাধারণকে সাথে নিয়ে ইস্তিস্‌কার নামায পড়ে সম্মিলিত দুআ করা।

প্রথম পদ্ধতি : সরাসরি বৃষ্টির জন্য সম্মিলিত দুআ করা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَحطَ المَطَرُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَدَعَا فَمُطِرْنَا، فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، قَالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهم حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمْطَرُونَ وَلاَ يُمْطَرُ أَهْلُ المَدِينَةِ (رواه البخارى فى بَابِ الاسْتِسْقَاءِ عَلَى المِنْبَرِ– ١/١٣٨)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, একবার রসূল স. জুমুআর খুৎবা দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে দুআ করেন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি দুআ করলেন ফলে (এত তাড়াতাড়ি) আমাদেরকে বৃষ্টি দান করা হলো যে, আমরা ঘরে পৌঁছাতে না পারার উপক্রম হয়ে গেলাম। পরের জুমুআ পর্যন্ত টানা বৃষ্টি চলতে থাকলো। হযরত আনাস রা. বলেন, ঐ ব্যক্তি বা অন্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন তিনি আমাদের থেকে মেঘ সরিয়ে দেন। অতঃপর রসূল স. বললেন, اللهمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে বৃষ্টি দিন; আমাদেরকে নয়। হযরত আনাস রা. বলেন, আমি দেখেছি মেঘমালা টুকরো টুকরো হয়ে ডান-বামে সরে যাচ্ছে। আশপাশের লোকদের উপর বর্ষণ হচ্ছে কিন্তু মদীনাবাসীদের উপর হচ্ছে না। (বুখারী-৯৬০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৮৯)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৃষ্টির জন্য দুআ করতে নামায আবশ্যকীয় নয়। বরং আল্লাহ তাআলার কাছে সরাসরি বৃষ্টির জন্য দুআ করা যেতে পারে। অনুরূপ আমল হযরত ওমর রা. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

একবার তিনি ইস্তিস্কার জন্য বের হলেন। অতঃপর ইস্তিগফার ব্যতীত বাড়তি কিছুই না করে ফিরে আসলেন। বৃষ্টি কামনা না করার বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ছূরা নূহ এর ১০ ও ১১ নং আয়াত এবং ছূরা হুদ এর ৫৩ নং আয়াত পাঠ করে বুঝালেন যে, ইস্তিগফারের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা বৃষ্টির দান করে থাকেন। (সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর-১০৯৫, সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৬৪২৪)

সুতরাং ইস্তিস্কা যেমন নামাযের মাধ্যমে হতে পারে অনুরূপভাবে ইস্তিগফারের মাধ্যমেও হতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ইস্তিসকার নামায পড়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করা

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ.

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স. একবার বৃষ্টি কামনার জন্য বের হলেন। অতঃপর আযান ইকামাত ব্যতীত আমাদেরকে দু'রাকাত নামায পড়ালেন। এরপর খুৎবা দিলেন এবং কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তারপরে চাদর পরিবর্তন করে ডান পাশ বাম দিকে এবং বাম পাশ ডান দিকে নিলেন। (মুসনাদে আহমদ-৮৩২৭, ইবনে মাযা-১২৬৮)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, صحيح لغيره হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। (মুসনাদে আহমদ-৮৩২৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিস্কার নামাযের জন্য আযান-ইকামাত ব্যতীত দু'রাকাত নামায আদায় করতে হবে। নামাযান্তে খুৎবা দিতে হবে। আরো প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযের মতো ইস্তিস্কার নামাযেও খুৎবা পড়া হবে নামাযের পরে। অবশ্য কোন কোন হাদীসে খুৎবা এবং পরে নামাযের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, খুৎবার পরে কাপড় উল্টিয়ে দুআ করবে। কাপড় উল্টানোর পদ্ধতির ব্যাপারে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন, "কাপড় যদি চার কোণ বিশিষ্ট হয় তাহলে উপরের দিকটা নিচে নিবে আর নিচের দিক উপরে নিবে। কাপড় গোলাকার হলে ডান দিক বাম দিকে আর বাম দিক ডান দিকে নিবে। আর যদি আবাকাবা অর্থাৎ ঢিলা জামা হয় তাহলে ভেতরের দিকটা বাইরে আর বাইরের দিক ভেতরে দিয়ে পরবে"। (রদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : ইস্তিস্কা) অনুরূপ পদ্ধতি পাঞ্জাবী, শার্ট বা সেলাইকৃত জামার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي العِيدِ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ-١/١٢٤)

অনুবাদ : হযরত ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, মদীনার আমীর হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা রহ. রসূল স.-এর ইস্তিস্কার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমাকে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, রসূল স. সাধারণ কাপড়ে নম্রভাবে ইবনেয়ের সাথে বের হয়ে ঈদগাহে গেলেন। তোমাদের মতো এমন খুৎবা পড়লেন না। বরং তিনি দুআ, ইবনেয় প্রকাশ এবং তাকবীরে মগ্ন থাকলেন। আর ঈদের নামাযের মতো দু'রাকাত নামায পড়লেন।

(তিরমিযী-৫৫৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৮৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিস্কার নামায ঈদগাহে হতে হবে এবং সাধারণ কাপড়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে ময়দানে যেতে হবে। আরো প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিস্কার নামায ঈদের নামাযের মতো পড়া হবে। তবে অতিরিক্ত তাকবীর দেয়া হবে না। নামাযান্তে ঈদের নামাযের মতো দুটি খুৎবা দিতে হবে। কিন্তু ইস্তিস্কার নামাযের খুৎবা অন্যান্য খুৎবার মতো নয়। বরং এ খুৎবার অধিকাংশ জুড়ে থাকবে দুআ, ইস্তিগফার, তাকবীর এবং মিনতি প্রকাশ। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. ইস্তিস্কার জন্য দু'রাকাত নামায আদায় করলেন যাতে সশব্দে কুরআন পড়লেন। (বুখারী : ৯৬৮) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিস্কার নামাযের কিরাত ঈদের নামাযের মতো উচ্চস্বরে পড়তে হয়।

عَنْ عَبَّاد بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ القِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا (رواه البخارى فى بَابِ الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا– ١/١٣٩)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. বলেন, রসূল স. লোকজন নিয়ে তাদের জন্য বৃষ্টি কামনা করতে বের হলেন। অতঃপর দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়ে দুআ করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে চাদর উল্টিয়ে দিলেন। এর ফলে তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হলো। (বুখারী-৯৬৭) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৮৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম দাঁড়িয়ে দুআ করবে। আর মুক্তাদীদেরকে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়নি। সুতরাং তারা বসে বসে ইমামের দুআয় আমীন বলবে অথবা নিজেরা ইমামের সাথে দুআ করতে থাকবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন,

(قَوْلُهُ هُوَ دُعَاءٌ) وَذَلِكَ أَنْ يَدْعُوَ الْإِمَامُ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، وَالنَّاسُ قُعُودٌ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ.

অর্থাৎ ইস্তিস্‌কা মূলত দুআ। আর তার পদ্ধতি হবে ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দুআ করবে আর মুক্তাদীগণ কিবলামুখী হয়ে বসে বসে তাঁর দুআয় আমীন বলতে থাকবে। (রদ্দুল মুহতার, অধ্যায় : ইস্তিস্‌কা)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا يَعْنِي وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ (رواه ابو داود فى بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ–١/١٦٥)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন এভাবে অর্থাৎ দু'হাত প্রসারিত করলেন এবং হাতের তালু জমিনের দিকে রাখলেন, এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। (আবূ দাউদ-১১৭১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ-১১৭১ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এবং নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪২৯২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. ইস্তিসকার দুআর সময় হাত উল্টিয়ে হাতের তালু জমিনের দিকে রেখে দুআ করেছিলেন। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইস্তিস্‌কার দুআর সময় ইমাম সাহেব হাত উল্টিয়ে হাতের তালু জমিনের দিকে রেখে দুআ করতে পারেন। তবে ইস্তিসকা ব্যতীত অন্য কোন দুআয় এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। কারণ হাতের পাতা দ্বারা দুআ করতে রসূল স. নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ-১৪৮৬) মুল্লা আলী ক্বারী রহ.ও এ পদ্ধতিকে শুধু ইস্তিসকার দুআর বৈশিষ্ট্য বলেছেন। (মিরকাত-২২৪৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়) অনাবৃষ্টি বা এ জাতীয় কোন বিপদ দূরীকরণের দুআর ক্ষেত্রে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণের কথা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.ও বলেছেন। (শরহু সুনানি আবি

দাউদ-১১৭১ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়) দুআর এ পদ্ধতির ব্যাপারে আরো দেখুন: আল বাহরুর রায়েক বিতির ব্যতীত কুনূত পাঠের আলোচনায় এবং রদ্দুল মুহতার ফারসী ভাষায় কুরআন পড়ার আলোচনায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللهمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ (رواه البخارى فى بَابِ سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الِاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا–١/١٣٧)

অনুবাদ : হযরত আনাস রা. বলেন, তাঁদের সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত ওমর রা. হযরত আব্বাস রা.-এর অছিলা দিয়ে দুআ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর অছিলা দিয়ে তোমার কাছে দুআ করতাম, আর তুমি বৃষ্টি দিতে। এখন তাঁর চাচার অছিলা দিয়ে তোমার কাছে দুআ করছি তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করো। হযরত আনাস রা. বলেন, এ দুআর পরে বৃষ্টি হতো। (বুখারী-৯৫৫) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সহীহ ইবনে খুযাইমাতেও বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে খুযাইমা-১৪২১)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুআর মধ্যে নবী অথবা উম্মতের কোন নেক ও বুজুর্গ মানুষের অছিলা দিয়ে দুআ করা বৈধ এবং কবুল হওয়ার বেশি উপযুক্ত। কেউ কেউ দলীলবিহীন জীবিত আর মৃত মানুষের পার্থক্য করে থাকেন। অথচ এ হাদীসে এমন কোন কথা উল্লেখ নেই যে, নবী মারা গেছেন বলে তাঁর অছিলা দিতে পারছি না। বরং হযরত ওমর রা.-এর উদ্দেশ্য হতে পারে নবী ব্যতীত উম্মতের কোন নেক মানুষের অছিলা দিয়ে দুআ করার বৈধতার আমলী প্রমাণ পেশ করা। আর নবীর মৃত্যুর পরে তাঁর অছিলা দিয়ে দুআ করার স্পষ্ট হাদীস ইমাম তবারানী তাঁর মু'জামে কাবীর ৮৩১০ নম্বরে এবং আল্লামা হাইসামী তাঁর মাযমাউজ যাওয়ায়েদ ৩৬৬৮ নম্বরে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন যে, তবারানী রহ. বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করে এটাকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ،

فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللهمَّ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ، أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. (رواه ابو داود فى بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ١/١٦٥)

অনুবাদ : হযরত আয়শা রা. বলেন, লোকেরা রসূল স.-এর নিকট বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করল। অতঃপর রসূল স.-এর নির্দেশে ঈদগাহে মেম্বার স্থাপন করা হলো। তিনি লোকজনের সাথে অঙ্গীকার করলেন যে, তিনি সেখানে একদিন যাবেন। হযরত আয়শা রা. বলেন, যখন সূর্যের কিনারা প্রকাশ পেলো তখন রসূল স. বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর মেম্বারে বসে আল্লাহু আকবার বললেন, এবং আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা করলেন। তারপরে বললেন, তোমরা আমার নিকট তোমাদের শহর শুষ্ক হয়ে যাওয়া এবং নির্ধারিত সময় বৃষ্টি না হওয়ার অভিযোগ করেছো। আর আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে দুআ' করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কবুল করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এরপরে বললেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللهمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ অতঃপর রসূল স. হাত উঠালেন এবং হাত উঠিয়েই রাখলেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেলো। তারপর মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন এবং হাত তোলা অবস্থায় চাদর উল্টিয়ে দিলেন। অতঃপর মানুষের দিকে ফিরলেন এবং (মেম্বার থেকে) নেমে দু'রাকাত নামায পড়ালেন। তারপর আল্লাহ তাআ'লা মেঘ সৃষ্টি করে দিলেন। তাতে বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করলো এবং গর্জন করতে লাগলো। এরপর আল্লাহর নির্দেশে বৃষ্টি হলো, এমনকি মাসজিদে পৌছার পূর্বেই নালা প্লাবিত হলো। রসূল স. তাদেরকে দ্রুত আশ্রয়স্থলের দিকে ধাবিত হতে দেখে এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ পেলো। অতঃপর বললেন, أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ (আবূ দাউদ-১১৭৩, মুসতাদরাকে হাকেম-১২২৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আবূ দাউদ রহ. এ হাদীসটির সনদকে উত্তম বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে বর্ণিত খুৎবা ও দুআর অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও ভিন্ন কোন দুআ পড়া যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত রসূল স.-এর ইস্তিস্কার নামাযের খুৎবা ও দুআ আরো বিস্তারিতভাবে ইবনে আসাকির রহ.-এর লিখিত কিতাব তারীখে দিমাশ্ক থেকে পেশ করা হলো রসূল স. বলেন,

اللهم ضاحت بلادنا واغبرّت أرضنا، وهاجت دوابّنا اللهم منزل البركات من أماكنها، وناشر الرحمة من معادنها بالغيث المغيث، أنت المستغفر للأنام، فنستغفرك للجمّات من ذنوبنا، ونتوب إليك من عظيم خطايانا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، واكِفًا مَغْزُوْرًا من تحت عرشك ينفعنا غيثا مغيثا، دارعا رائعا مُمْرِعًا طَبَقًا غَدَقًا خصبا، تسرع لنا به النبات، وتكثر لنا به البركات، وتقبل به الخيرات، اللهم، إنك قلت في كتابك وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ اللهم فلا حياة لشيء خُلِقَ مِنَ الماء إلا الماء، اللهم وقد قنط الناس أو مَنْ قَنَطَ مِنْهُمْ وَسَاءَ ظَنُّهُمْ، وَهَامَتْ بَهَائِمُهُمْ، وَعجت عجيج

الثكلى على أولادها، إذ حبست عنها قطر السماء، فدقّ لذلك عظمها، وذهب لحمها، وذاب شحمها، اللهم، ارحم أنين الآنّة، وحنين الحانّة، ومن لا يحمل رزقه غيرك، اللهم، ارحم البهائم الجاثمة ، والأنعام السائمة، والأطفال الصائمة، اللهم، ارحم المشايخ الركّع، والأطفال الرضّع، والبهائم الرتّع، اللهم، زدنا قوة إلى قوتنا، ولا تردّنا محرومين، إنك سميع الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين.(رواه إبن عساكر فى تاريخ دمشق فى ترجمة سلّام بن سلمة، ويقال: ابن سليم: رقم الترجمة– ٩٩٣٠ : وأخرجه الخطابى فى غريب الحديث مختصرًا– ١/٣٣٦)

(তারীখে দিমাশ্‌ক সাল্লাম ইবনে সালাম রাবী নং ৯৯৩০ এর জীবনী আলোচনায় এবং উক্ত কিতাবের বরাতে কানঝুল উম্মাল ২৩৫৪৬ নম্বর হাদীসে, ইমাম খত্তাবী তাঁর গরীবুল হাদীস কিতাবে, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৩৬) এ খুৎবাও পাঠ করা যেতে পারে।

ফায়দা : ইস্তিস্‌কার পদ্ধতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণিত আলোচনার সংক্ষিপ্ত রূপ এই যে, ইস্তিস্‌কার জন্য হয়তো সকলে আল্লাহ তাআলার কাছে ইবনেয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর এরই মাধ্যমে বৃষ্টি পাওয়ার আশা করবে। অথবা ইস্তিস্‌কার জন্য নামায পড়বে। নামাযের জন্য পূর্ব থেকে রোযা রেখে, ছদকা করে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং শিশুদেরকে সাথে নিয়ে সাধারণ কাপড়ে ইবনেয় ও নম্রতার সাথে মাথা নীচু করে ঈদের ময়দানে যাবে এবং আযান-ইকামাত ব্যতীত উচ্চস্বরে কুরআন পাঠের মাধ্যমে দু'রাকাত নামায আদায় করবে। অতিরিক্ত তাকবীর দিবে না যেমনটি ঈদের নামাযে দেয়া হয়ে থাকে। নামাযান্তে দুটি খুৎবা দিবে যার অধিকাংশ জুড়ে থাকবে দুআ, ইস্তিগফার, তাকবীর এবং মিনতি প্রকাশ। খুৎবার শুরুর দিকে ইমাম সাহেব কাপড় উল্টিয়ে নিবে। কাপড় যদি চার কোণ বিশিষ্ট হয় তাহলে উপরের দিকটা নিচে নিবে আর নিচের দিক উপরে নিবে। গোলাকার হলে ডান দিক বামে আর বাম দিক ডানে নিবে। আর পাঞ্জাবী, শার্ট বা সেলাইকৃত জামা হলে ভেতরের দিকটা বাইরে আর বাইরের দিক ভেতরে দিয়ে পরবে। ইমাম ব্যতীত সাধারণ মানুষ কাপড়

উল্টাবে না। খুৎবা শেষে ইমাম সাহেব কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুআ করবে। দুআর সময় ইমাম সাহেব হাতের তালু জমিনের দিকে এবং হাতের পাতা আকাশের দিকে রেখে দুআ করবে। আর মুক্তাদীগণ স্বাভাবিক নিয়মে বসে বসে ইমামের দুআয় আমীন বলবে। অথবা নিজেরা ইমামের সাথে দুআ করতে থাকবে। দুআর মধ্যে নবী অথবা উম্মতের কোন নেক মানুষের অছিলা দিয়ে দুআ করা বৈধ এবং কবুল হওয়ার বেশি উপযুক্ত। পূর্ববর্ণিত খুৎবা ও দুআর অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও ভিন্ন কোন দুআ পড়া যেতে পারে।

সূর্য গ্রহণের নামায ও তার পদ্ধতি

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.

অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. আমাদেরকে নিয়ে সূর্য গ্রহণের নামায আদায় করেছেন, আমি তাঁর কোন আওয়াজ শুনিনি। (তিরমিযী-৫৬২, আবূ দাঊদ-১১৮৪, নাসাঈ-১৪৮৭ ও ১৪৯৮, ত্বহাবীঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩১, হাদীস নং-১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরিমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের ভাষ্যমতে রসূল স. সূর্য গ্রহণের নামায জামাতে আদায় করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূর্য গ্রহণের নামায জামাতে আদায় করতে হয়। রসূল স.-এর কুরআন পাঠের শব্দ তাঁর পিছনে থাকা মুসল্লী হযরত সামুরা রা. না শুনতে পারা থেকে অনুমেয় হয় যে, তিনি নীরবে কুরআন পাঠ করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূর্য গ্রহণের নামাযে কুরআন পাঠ নীরবে করতে হয়।

এর বিপরীতে রসূল স. সূর্য গ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করেছেন বলেও সহীহ হাদীসের বর্ণনা আছে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, **جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ** রসূল স. সূর্যগ্রহণের

নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করেছেন। (বুখারী-১০০৫) এ হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের দুই ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ রহ. সূর্য গ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করার আমলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে উক্ত নামাযে রসূল স. কোন ছূরা পাঠ করেছিলেন সে ব্যাপারে কোন স্পষ্ট বর্ণনা না থাকায় এবং জামাতের নামাযে মহিলাদের অবস্থান পুরুষের পেছনে থাকার কারণে তাদের কথা শায তথা তুলনামূলক অপ্রবল হওয়ায় হানাফী মাযহাবে সূর্য গ্রহণের নামাযে নীরবে কুরআন পাঠ করার আমলকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ رُكُوعِهِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ "

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যু হলে সূর্য গ্রহণ লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ স. দু'রাকাত নামায আদায় করলেন, তাতে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর কিয়ামের মতো লম্বা রুকু করলেন। এরপর রুকুর মতো লম্বা সিজদা করলেন। এভাবে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। (মুসনাদে আহমদ : ৭০৮০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح "হাদীসটি সহীহ"। (মুসনাদে আহমদ-৭০৮০ নং হাদীসের আলোচনায়) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে অনুরূপ বর্ণনা সহীহ সনদে মুসনাদে আহমাদের ৬৪৮৩ ও ৬৮৬৮ নম্বরেও বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূর্য গ্রহণের নামায অন্যান্য নামাযের মতো আদায় করতে হয়। এখানে বাড়তি রুকুর কোন বর্ণনা নেই। সূর্য গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাতে একাধিক রুকু করার আমলও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। প্রতি রাকাতে দুটি রুকু, (হযরত

আয়েশা রা. থেকে বুখারী: ৯৮৭, মুসলিম : ১৯৬২) প্রতি রাকাতে তিনটি রুকু, (হযরত আয়েশা রা. থেকে মুসলিম : ১৯৬৮, হযরত জাবের রা. থেকে মুসলিম: ১৯৭৪) প্রতি রাকাতে চারটি রুকু (হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে মুসলিম : ১৯৮৩) এবং প্রতি রাকাতে পাঁচটি রুকু। (হযরত আলী রা. থেকে বুখারী-মুসলিমের রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত- মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৩২৬৫) অতিরিক্ত রুকুর বিষয়ে যখন সহীহ হাদীসে এত মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে যা একত্রিত করে আমল করা সম্ভব নয়। আবার কোন এক আমলকে প্রাধান্য দেয়াও সম্ভব নয়। তখন মতবিরোধপূর্ণ অতিরিক্ত রুকু ছেড়ে দিয়ে আমরা প্রতি রাকাতে একটি করে রুকুর আমল গ্রহণ করেছি। কারণ এর পক্ষে যেমন রয়েছে সহীহ হাদীসের বর্ণনা তেমনি রয়েছে নামাযের প্রসিদ্ধ ও চির পরিচিত পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্য। উপরন্তু রসূল স. ফজরের নামাযের বেশ কিছু পরে গিয়ে সূর্য গ্রহণের নামায আদায় করেন অতঃপর ইরশাদ করেন, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ "পুনরায় তোমরা এমনটা দেখলে সদ্য আদায়কৃত নামাযের অনুরূপ নামায আদায় করবে। (নাসাঈ-১৪৮৮) অতএব, এ পদ্ধতিকে প্রাধান্য না দিয়ে বিরোধপূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। উপরোক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও এই যে, সূর্য গ্রহণের প্রতি রাকাতে একটি করে রুকু হবে। (শামী : ২/১৮২)

লাইলাতুল বারাআতের ফযীলত

حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আশআরী রা. রসূল স. থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা অর্ধ শা'বানের রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে আপন সব মাখলুকের প্রতি বিশেষ দয়ার দৃষ্টি দেন। আর মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাযা-১৩৯০)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইবনে মাযা শরীফের তাহকীকে শায়খ

শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حَسَنٌ بِشَوَاهِدِه বিভিন্ন হাদীসের সমর্থনের কারণে এ হাদীসটি হাসান। সহীহ।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তাআলা অর্ধ শা'বানের রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে আপন মাখলুকের প্রতি বিশেষ দয়ার দৃষ্টি দেন। আর হিংসুক ও আত্মহত্যাকারী এ দু'শ্রেণির মানুষ ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (মুসনাদে আহমদ-৬৬৪২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ লিগাইরিহী। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح بِشَوَاهِدِه বিভিন্ন হাদীসের সমর্থনের কারণে এ হাদীসটি সহীহ।

শিক্ষণীয় : এ সহীহ হাদীস থেকে শা'বান মাসের অর্ধেক তথা ১৫ তারিখ রাতের ফযীলত প্রমাণিত হয়। হিজরী তারিখ অনুযায়ী দিনের পূর্বে রাত আসার কারণে ১৫ তারিখের রাত অর্থ ১৪ তারিখ দিবাগত রাত। এ রাতে আল্লাহ তাআ'লা বান্দার গুনাহ ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। ফারসী ভাষায় শব অর্থ রাত। আর গুনাহ ক্ষমা করার অর্থ প্রকাশের শব্দসমূহের মধ্যে একটি শব্দ হলো براءة (বারাআত) অর্থাৎ মুক্তি। তাই মুক্তি রজনী বুঝাতে গিয়ে ফারসী ভাষায় এ রাতটি শবে বরাআত নামে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

জ্ঞাতব্য : আরো যেসব হাদীস দ্বারা অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলত প্রমাণিত হয় তার মধ্যে রয়েছে- হযরত আয়েশা থেকে, (তিরমিযী : ৭৩৭, মুসনাদে আহমদ : ২৬০১৮) হযরত মুআয ইবনে জাবাল থেকে, (আল-মু'জামুল কাবীর লিত্তবারানী : ১৬৬৩৯, ইবনে হিব্বান : ৫৬৬৫ ও ৫৬৬৩), আবু মুসা আশআরী থেকে, (কিতাবুস ছুন্নাহ লিইবনে আবী আসেম :

৫১০, শুআবুল ঈমান : ৩৮৩৩) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে, (মুসনাদে বায্যার: ২০৪৫, কিতাবুত তাওহীদ লিইবনে খুযাইমা: ১৩৬, শুআবুল ঈমান: ৩৮২৮ ও ৩৮২৯, কিতাবুস ছুন্নাহ লিইবনে আবী আসেম: ৫০৯), হযরত আবু সা'লাবা আল্ খুশানী থেকে, (কিতাবুস ছুন্নাহ লিইবনে আবী আসেম : ৫১১, শুআবুল ঈমান: ৩৮৩১ ও ৩৮৩২) হযরত আবু হুরায়রা থেকে, (মুসনাদে বায্যার : ২০৪৬) হযরত কাসীর ইবনে মুররাহ হাযরামী রা. থেকে (শুআবুল ঈমান : ৩৫৫০) এবং হযরত আওফ ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত হাদীস (মুসনাদে বায্যার : ২০৪৮) এবং হযরত আলী রা. থেকে। (ইবনে মাযা-১৩৮৮, আখবারু মক্কা লিলফাকেহী-১৮৩৭)

মুসনাদে আহমদ : ৬৬৪২ নম্বর হাদীসের আলোচনায় শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, **وإن كان في إسناد كل منها مقال إلا أنه بمجموعها يصح الحديث ويقوى**. "প্রত্যেকটি হাদীসের উপর যদিও আপত্তি আছে, কিন্তু সম্মিলিতভাবে হাদীসটি সহীহ ও শক্তিশালী।

লাইলাতুল বারাআতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস দশজন সাহাবা থেকে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবের বরাতে পেশ করা হয়েছে। হাদীস সহীহ-জঈফ হওয়ার নীতিমালা সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তারা কোনদিন এ হাদীসকে জঈফ বলতে পারে না আর ঐ মানের কোন ইমাম তা বলেননি। সহীহ হাদীসের বাইরে কিছু না মানার দাবীদার শায়খ আলবানীও এ হাদীসকে সহীহ বলতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ ইল্‌মে হাদীসে অজ্ঞ কিছু মানুষ যারা নিজেদেরকে তাকলীদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত এবং সহীহ হাদীসের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে তারা ডানে-বামে না তাকিয়ে কারো শেখানো বুলি আওড়াতে আরম্ভ করেছে। হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও তার সহীহ-জঈফের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে চোখ বন্ধ করে এ হাদীসকে জঈফ বলে মুসলিম সমাজে নতুন ফিতনা ছড়াচ্ছে। জানিনা, এরা কি সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে ভুল করছে? নাকি মুসলিম সমাজের ঐক্য ইবনেষ্ট করতে কারো এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

লাইলাতুল বারাআতের নামায

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيّ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ،

حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بِكِ؟ قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: أَتَدْرِينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطلعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَوْلُهُ قَدْ خَاسَ بِكَ يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا غَدَرَ بِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُؤْتِهِ حَقَّهُ قَدْ خَاسَ بِهِ، قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَهُ مِنْ مَكْحُولٍ وَاللهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. নামায আদায় করলেন। তাতে সিজদা এত লম্বা করলেন যে, আমি ধারণা করলাম রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। তাই আমি উঠে গিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর (পায়ের) বৃদ্ধাঙ্গুল নাড়া দিলাম। আর তা নড়ে উঠলো। অতঃপর আমি ফিরে এলাম। পরে যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং নামায শেষ করলেন তখন বললেন,: হে আয়েশা! বা হে হুমাইরা! তুমি কি ধারণা করেছ যে, নবী স. তোমার সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি? আমি বললাম: না, ইয়া রসুলাল্লাহ! বরং আপনার লম্বা সিজদার কারণে আমি ধারণা করেছি যে, আপনার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন, তুমি কি জানো, আজকের এ রাত কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এ রাত হলো অর্ধ শা'বানের রাত। আল্লাহ তাআলা এ রাতে সব বান্দার প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্টি দেন। ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করে দেন, রহমত প্রত্যাশী ও প্রার্থীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে

দেন। ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, এটা উত্তম মুরসাল। হতে পারে আলা ইবনে হারিস এ হাদীসটি হযরত মাকহুল রহ. থেকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তখন আর এ হাদীসটি মুরসাল থাকবে না। (শুআবুল ঈমান : ৩৮৫৪)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মুরসাল। ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, : قُلْتُ هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ "আমি বলি এটা উত্তম মুরসাল"। আর মুরসাল হাদীসের পক্ষে কোন সমার্থক বর্ণনা থাকলে চার ইমামসহ অনেক নীতিনির্ধারক ইমামের নিকট সেটা গ্রহণযোগ্য। (শরহু নুখবাতিল ফিকার: মুরসাল হাদীস অধ্যায়) আর এ হাদীসের পক্ষে বহুসংখ্যক সমার্থক হাদীস রয়েছে এবং অনেক ইমাম এটাকে সহীহ বলেছেন। ইমাম বায়হাকী আরো বলেন, وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَاء بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَهُ مِنْ مَكْحُولٍ "হতে পারে আলা ইবনে হারেস এ হাদীসটি হযরত মাকহুল রহ. থেকে গ্রহণ করেছেন"। আর মাকহুল হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এ হিসেবে হাদীসটি তখন আর মুরসালও থাকে না; বরং সরাসরি সহীহ মুত্তাসিল হয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ : লাইলাতুল বারাআতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিশেষ কোন নামায নেই। তবে উল্লিখিত হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রসূলুল্লাহ স. বিশেষ আগ্রহ ও যত্নসহকারে দীর্ঘ রাকাতে উক্ত রাতের নামায আদায় করতেন। সুতরাং এ রাতের ইবাদাতের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। সাথে সাথে এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে যে, فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ "আল্লাহ তাআলা ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করেন আর রহমতপ্রার্থীদেরকে রহমত দান করেন"। এ ইরশাদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন এ আশায় বসে না থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও রহমত চাওয়ার দ্বারা এ রাতের যথাযথ ব্যবহার হওয়া দরকার। উল্লেখ্য এ রাতে ইবাদাত করাকে হানাফী মাযহাবে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। (শামী : ২/২৫)

অধ্যায় ২৩ : জানাযা

জানাযার নামায মাসজিদে নয়; বরং ময়দানে পড়া

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ "

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাসজিদে জানাযার নামায পড়লো তাতে তার কোন সওয়াব হলো না। (মুসনাদে আহমদ-৯৭৩০, ইবনে মাযা : ১৫১৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা ইবনুল কয়্যিম বলেন, **وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ** এ হাদীসটি হাসান। (ঝাদুল মাআদ, অধ্যায় : মৃত্যু ব্যক্তির দাফন-কাফন দ্রুত করা)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ (رواه البخارى فى بَابِ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ–١٠٩٠/٢)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, ইহুদীরা রসূল স.-এর নিকট একজন ব্যভিচারী পুরুষ ও একজন ব্যভিচারিনী নারীকে নিয়ে আসলো। রসূল স. তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন ফলে তাদেরকে মাসজিদের নিকটবর্তী যে স্থানে জানাযা রাখা হতো সেখানে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। (বুখারী-৬৮৩২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-১৮৫৩)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জানাযার নামায মাসজিদের বাইরে হতো এবং লাশ রাখার জন্যও মাসজিদের বাইরে

নির্দিষ্ট একটি স্থান ছিলো। সুতরাং জানাযার নামায মাসজিদে না পড়ে ময়দানে পড়া উচিত এটাই রসূল স.-এর ছুন্নাত। তবে রসূল স. মাসজিদের ভেতরে জানাযা পড়েছেন মর্মেও সহীহ হাদীসের বিবরণ রয়েছে। উভয় হাদীসের সমন্বয় করে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন, وَأَنَّ سُنَّتَهُ وَهَدْيَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ، وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ. وَاللهُ أَعْلَمُ রসূল স.-এর ছুন্নাত হলো কোন ওযর না থাকলে জানাযার নামায মাসজিদের বাইরে পড়া। (ঝাদুল মাআদ, অধ্যায় : মৃত্যু ব্যক্তির দাফন-কাফন দ্রুত করা)

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি-বাদল বা এ জাতীয় কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মাসজিদে জানাযার নামায পড়া ঠিক হবে না। আর কোন সমস্যার কারণে মাসজিদে জানাযা পড়তে হলে লাশ বাইরে রেখে ইমাম ও মুক্তাদীগণ মাসজিদের ভেতরে দাঁড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা করা দরকার যেন লাশের শরীর থেকে কোন নাপাকী বের হয়ে মাসজিদ নাপাক হতে না পারে। হানাফী মাযহাবের মতামত এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। (শামী : ২/২২৫)

জানাযার নামাযের কাতার

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

(رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِي كيفية الصَّلَاةِ عَلَى الميت وَالشَّفَاعَةِ لِه–١/٢٠٠)

অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুবাইরা রা. যখন জানাযার নামায পড়তে যেতেন আর মুসল্লীদের সংখ্যা কম মনে হতো তখন তিনি তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করতেন। এরপর বলতেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির জানাযা তিন কাতার লোক আদায় করে তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো। (তিরমিযী : ১০২৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটি হাসান বলেছেন। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (আবূ দাউদ-৩১৫২)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযায় মানুষের উপস্থিতি কম হলে মৃত্যু ব্যক্তির ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় মুসল্লীদেরকে তিন কাতারে দাঁড় করানো উত্তম। এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত (শামী : ২/২১৪) এখানে উদ্দেশ্য কমপক্ষে তিন কাতার হওয়া। তার বেশি হলে বেজোড় হতে হবে তা বলা উদ্দেশ্য না।

ইমাম মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে

عَنْ سَمُرَةَ . رضى الله عنه . قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا. (رواه البخارى فى بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا–١/١٧٧)

অনুবাদ : হযরত সামুরা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর পিছনে এমন এক মহিলার জানাযা পড়েছি, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিলো। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়ালেন। (বুখারী : ১২৫০) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩২৭)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযা পড়ানোর সময় ইমাম মৃত্যু ব্যক্তির মাঝামাঝি দাঁড়াবে। অবশ্য আরবীতে وَسْطَ শব্দটি দ্বারা হুবহু মধ্য স্থান হওয়া জরুরী নয়। বরং শরীরের মধ্যভাগ বরাবর হলেই এ ছুন্নাত আদায় হয়ে যায়। এ কারণে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন যে, ইমাম মৃত্যু ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৬, হাদীস নং-২৮১৭)

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ عِنْدَ الصَّدْرِ»

অনুবাদ : হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি জানাযার নামায পড়লে সে মৃত্যু ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। (ইবনে আবী শাইবা-১১৬৭১)

হাদীসটির স্তর : হাসান, মাকতূ'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর লাইস ইবনে আবী সুলাইমের ব্যাপারে অনেকের আপত্তি থাকলেও তিনি মুসলিমের রাবী। তাই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আছে।

حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا.

অনুবাদ : হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়বে সে মৃত্যু ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। (ইবনে আবী শাইবা-১১৬৭২)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

সারসংক্ষেপ : এ সকল হাদীস ও আছারের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এই যে, ইমাম মৃত্যু ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। (শামী : ২/২১৬)

জানাযার নামাযের পদ্ধতি

مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللهِ، أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللهمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (رواه مالك فى باب مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ-৭৯)

অনুবাদ : আবু সাঈদ মাকবুরী রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: তিনি হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর নিকট জানাযার নামায কীভাবে পড়তে হবে তা জানতে চাইলে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর স্থায়ীত্বের কসম, আমি তোমাকে সে সম্পর্কে বলবো। আমি মৃতের পরিবারের হয়ে জানাযার সাথে চলি। জানাযা রাখা হলে তাকবীর বলি। এরপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি (ছানা পড়ি) এবং রসূলুল্লাহ স.-এর উপর দুরূদ পড়ি। অতঃপর এই দুআ পড়ি–

اللهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ

فِي إِحْسَانِهِ. وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللهمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ. وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

(মুয়াত্তা মালেক: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৯, অধ্যায়: জানাযার নামাযে মুসল্লী কী পড়বে)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. এবং আইমান সালেহ শা'বান বলেন, إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (জামেউল উসূল-৪৩১২ নং হাদীসের আলোচনায়)

জ্ঞাতব্য : এ হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রা. জানাযার নামাযের যে বিবরণ পেশ করলেন আমরা এ পদ্ধতিতেই জানাযার নামায আদায় করে থাকি। এটি মাউকূফ হাদীস হলেও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমলও মারফু'র অনুরূপ। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম এটা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে বর্ণনা করেছেন।

জানাযার নামায যেহেতু মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ। তাই দুআ করার ছুন্নাত তরীকা থেকেও আমরা জানাযার পদ্ধতি পেতে পারি। এ বিষয়ে হযরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ রা. থেকে হাসান-সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করবে তখন আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা এবং রসূলুল্লাহ স.-এর উপর দুরূদ পড়বে। এরপর যা ইচ্ছা দুআ করবে। (তিরমিযী : ৩৪৭৭) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ : فِي الأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَفِي الثَّانِيَةِ صَلاَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ.

অনুবাদ : আবু হাশেম রহ. বলেন, আমি ইমাম শা'বী রহ. থেকে শুনেছি: প্রথম তাকবীরে (ছানা) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, দ্বিতীয় তাকবীরে নবীর প্রতি দুরূদ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্য দুআ এবং চতুর্থ তাকবীরে সালাম। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৪৯৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

জ্ঞাতব্য : ইমাম শা'বী রহ. হযরত ওমর রা.-এর খিলাফাত কালে ১৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী তাবিঈ। তিনি পাঁচ শতাধিক সাহাবীকে দেখেছিলেন। দীর্ঘ দিন তিনি কুফার কাযী ছিলেন। প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম

থেকে তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন এবং তাঁদের যুগেই তিনি বড় ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অতএব, জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে তাঁর এ ফতওয়ার মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের আমলেরই প্রতিফলন ঘটেছে। জানাযার নামাযের অনুরূপ পদ্ধতি অপর একজন বিখ্যাত তাবিঈ হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, **لا قراءة على الجنائز، ولا ركوع ولا سجود، ولكن يسلم عن يمينه وعن شماله إذا فرغ من التكبير** জানযার নামাযে কিরাত নেই, রুকু-সিজদাও নেই। তবে তাকবীর বলা শেষ হলে ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এ আছারটি বর্ণনান্তে মন্তব্য করেন যে, □□□ **نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى** আমরা এ মতকেই গ্রহণ করি; আর এটাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত। (কিতাবুল আছার লিমুহাম্মাদ-২৩৬)

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পরে ছানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পরে দুরূদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরের পরে দুআ এবং চতুর্থ তাকবীরের পরে সালাম ফিরাতে হবে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী : ২/৩১৩)

এ নিয়ম অনুযায়ী জানাযার নামাযে কুরআন পাঠের কোন সুযোগ নেই। হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে এ কথাটি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না।

উল্লেখ্য, জানাযার নামাযে রুকু-সিজদা নেই, বিধায় দুই লাইনের মাঝখানে সিজদা পরিমাণ জায়গা খালি রাখারও কোন প্রয়োজন নেই। যারা বলেন, এতটুকু জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে তাদের কথাটা ভিত্তিহীন।

জানাযার নামাযে কিরাত নেই

مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ (رواه مالك فى مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ–٧٩)

অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর রা. জানাযার নামাযে কুরআন পড়তেন না। (মুয়াত্তা মালেক : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৯, অধ্যায় : জানাযার নামাযে মুসল্লী কী পড়বে)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. এবং আইমান সালেহ শা'বান বলেন, **إسناده صحيح** হাদীসটির সনদ সহীহ। (জামেউল উসূল-৪৩১০ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযে কিরাত নেই। এটি মাউকূফ হাদীস হলেও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমল মারফূ'র অনুরূপ। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম এটা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে বর্ণনা করেছেন।

مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللهِ،أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللهمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (رواه مالك فى مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ– ٧٩)

অনুবাদ : আবু সাঈদ মাকবুরী রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: তিনি হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর নিকট জানাযার নামায কীভাবে পড়তে হবে তা জানতে চাইলে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর স্থায়ীত্বের কসম আমি তোমাকে সে সম্পর্কে বলবো। আমি মৃতের পরিবারের হয়ে জানাযার সাথে চলি। জানাযা রাখা হলে তাকবীর বলি। এরপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি (ছানা পড়ি) এবং রসূলুল্লাহ স.-এর উপর দুরূদ পড়ি। অতঃপর এই দুআ পড়ি: اللهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللهمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ. وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (মুয়াত্তা মালেক, অধ্যায়: মুসল্লী জানাযায় কী পড়বে)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। জামেউল উসূলের তাহকীকে শায়খ আব্দুল কাদের আরনাউত রহ. এবং আইমান সালেহ শা'বান বলেন, إسناده صحيح "হাদীসটির সনদ সহীহ"। (জামেউল উসূল-৪৩১২ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রা. জানাযার নামাযের যে বিবরণ পেশ করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, জানাযার নামাযে কিরাত নেই। জানাযার নামাযে আমরা এ পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকি। এটি মাউকূফ হাদীস হলেও ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমলও

মারফু'র অনুরূপ। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম এটা রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা তাঁকে করতে দেখে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لاَ.

অনুবাদ : হযরত আলী ইবনে রবাহ রহ. বলেন, আমি হযরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ রা.কে জিজ্ঞেস করলাম: জানাযার নামাযে কি (কুরআন থেকে) কিছু পাঠ করা হবে? তিনি বললেন,: না, পাঠ করা হবে না। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৫২৫)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাউকূফ। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : হযরত ফুযালা ইবনে উবায়েদ রা.-এর বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, জানাযার নামাযে কিরাত নেই। জানাযার নামাযে কিরাতের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বুখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. (মৃত্যু- ৪৪৯ হি.) বলেন,

وَمِمَّنْ كَانَ لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وينكرذالك: عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب وَابْن عمر وَأَبُو هُرَيْرَة، وَمن التَّابِعين: عَطاء وطاووس وَسَعِيد بن الْمسيب وَابْن سِيرِين وَسَعِيد بن جُبَير وَالشعْبِيّ وَالحكم، وبه قال مالك والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه، قال مالك: الصلاة على الجنازة إنما هو دعاء، وليس قراءة فاتحة الكتاب معمولاً بها ببلدنا. (ذكره العَلاَّمَةُ، أَبُو الحَسَنِ إبنِ بَطَّالٍ المتوفى– **٤٤٩**هـ فى شرح البخارى فى بَاب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

অনুবাদ : জানাযার নামাযে যারা কিরাত পড়তেন না বরং বিরোধিতা করতেন তাদের মধ্যে রয়েছে: হযরত ওমর, আলী ইবনে আবী তালিব, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা রা.। তাবিঈদের মধ্যে হযরত আতা, তাউস, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইবনে ছীরীন, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, ইমাম শা'বী এবং হাকাম রহ.। আর এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম মালেক, হযরত সুফিয়ান সাওরী এবং আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীগণ। ইমাম মালেক রহ. বলেন, জানাযার নামায মূলত দুআ। আমাদের শহর মদীনায়

জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করা প্রচলিত নয়। (শরহুল বুখারী লিইবনে বাত্তাল: জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ অধ্যায়) এ বর্ণনায় পেশকৃত সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈনের আমল থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করার কোন প্রচলন সে যুগে ছিলো না। ইমাম মালেকের উক্তি থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করার কোন প্রচলন মদীনাতেও বিদ্যমান ছিলো না। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত ১২৫৪ নম্বর হাদীস যা দ্বারা জানাযার নামাযে ফাতেহা পাঠকারীগণ দলীল দিয়ে থাকেন সে হাদীসের বর্ণনা দেখেও মনে হয় যে, এ আমলের প্রচলন সে যুগেও ছিলো না। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ না করার আমল আরো যে সকল তাবিঈ ও তাবে তাবিঈদের থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম নাখাঈ, (আব্দুর রাযযাক : ৬৪৩৩) মুহাম্মাদ ইবনে ছীরীন, (ইবনে আবী শাইবা : ১১৫২৩) আবুল আলিয়া, (ইবনে আবী শাইবা : ১১৫২৪) আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা, (ইবনে আবী শাইবা : ১১৫২৬) হযরত তাউস এবং আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. অন্যতম। (ইবনে আবী শাইবা-১১৫২৯)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ: فِي الْأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَفِي الثَّانِيَةِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ

অনুবাদ : আবু হাশেম রহ. বলেন, আমি ইমাম শা'বী রহ. থেকে শুনেছি: প্রথম তাকবীরে (ছানা) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, দ্বিতীয় তাকবীরে নবীর প্রতি দুরূদ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্য দুআ এবং চতুর্থ তাকবীরে সালাম। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৪৯৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী।

উল্লেখ্য, ইবনে আবী শাইবা থেকে বর্ণিত এ হাদীসসমূহ বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ অথবা শুধু মুসলিমের শর্তে সহীহ। কারণ এ হাদীসসমূহের রাবীদের মধ্যে কেউ বুখারী-মুসলিম বা শুধু মুসলিমের রাবীর বাইরের নয়। আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রহ. এ সকল তাবিঈদের মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ

جِيَادٍ "হযরত ইবনে আবী শাইবা রহ. উত্তম সনদে এ সব মতামত বর্ণনা করেছেন"। (আল ইসতিজকার, অধ্যায় : মুসল্লী জানাযার নামাযে কী বলবে)

সারসংক্ষেপ : উপরিউক্ত হাদীসসমূহে সহীহ সনদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী তাবিঈগণ জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না; বরং অনেকে বিরোধিতা করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষা ছিলো জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ না করা। ইতিপূর্বে সহীহ সনদে হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবু হুরায়রা এবং হযরত ফাযালাহ ইবনে উবায়েদ রা. থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সব সাহাবায়ে কিরাম জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না। আর সাহাবায়ে কিরামের আমলের ভিত্তি যেহেতু রসূলুল্লাহ স.-এর আমল বা তাঁর মুখনিঃসৃত পবিত্র বাণী সেহেতু বলা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ স. নিজেও জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করতেন না। সাহাবা এবং তাবিঈগণের মধ্যে উপরিউক্ত মহামনীষীদের আমল বা বাণী থেকে রসূলুল্লাহ স.-এর যে আমলের সন্ধান মেলে আমরা তার অনুসরণে জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করা পরিত্যাগ করে থাকি।

এর বিপরীতে বর্তমান সমাজের কিছু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকজন রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাযের মতো জানাযার নামাযেও ছূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য ছূরা মিলিয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করে থাকে।

আমার জানামতে পূর্বসূরীদের কারো থেকে এ ধরনের আমল বর্ণিত নেই। এ সব লোকেরা দলীল হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি পেশ করে থাকে।

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ (رَوَاه النَّسَائِيْ فِيْ بَابِ الدُّعَاء–٢١٨/١)

অনুবাদ : হযরত তলহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ রহ. বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর পেছনে জানাযার নামায পড়লাম। তিনি সে নামাযে ছূরা ফাতিহা এবং আরো একটি ছূরা এতটুকু উচ্চস্বরে পাঠ করলেন যে, তিনি আমাদেরকে আওয়াজ শুনিয়ে দিলেন। নামায

শেষে আমি তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা ছুন্নাত ও হক। (নাসাঈ : ১৯৯২)

হাদীসটির স্তর : শায। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু হাদীসটি সহীহ নয়। ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, وَذِكْرُ السُّورَةِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ "এ হাদীসের মধ্যে ছূরা পাঠের উল্লেখটা অসংরক্ষিত"। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী : ৬৯৫৪) ইমাম বায়হাকী রহ.-এর এ মন্তব্যের কারণ হলো, হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি এর চেয়ে আরো অনেক শক্তিশালী সনদে বুখারী : ১২৫৪, নাসাঈ : ১৯৯২, আবূ দাউদ : ৩১৮৪, তিরমিযী : ১০২৭ এবং ইবনে মাযা শরীফ : ১৪৯৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। এ সব সনদে কেবল ফাতিহা পাঠের কথা এসেছে। ফাতিহার সাথে অন্য ছূরা মিলানোর কথা বলা হয়নি। হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ (رَوَاه الْبُخَارِيُّ فِيْ بَابِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى الجَنَازَةِ)

অনুবাদ : হযরত তলহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর পেছনে জানাযার নামায আদায় করলাম। তিনি সে নামাযে ছূরা ফাতিহা পাঠ করলেন আর বললেন, আমি এটা করলাম যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা ছুন্নাত। (বুখারী : ১২৫৪)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পরে শুধু ছুরা ফাতেহা পাঠ করেছেন। ছূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন ছূরা পাঠ করেননি। অনুরূপভাবে হযরত আবু উমামা রা. থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافتة□ "জানাযার নামাযের ছুন্নাত হলো প্রথম তাকবীরের পরে নীরবে ছূরা ফাতেহা পাঠ করা"। (নাসাঈ-১৯৯৩, আহাদীসুল মুখতারাহ-৮/৮৮) ইমাম নববী রহ. 'খুলাছাতুল আহকাম' কিতাবে (২/৯৭৫, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত থেকে প্রকাশিত), হাফেজ জিয়াউদ্দীন মাকদেসী 'আহাদীসুল মুখতারাহ' কিতাবে (৮/৮৮), মুল্লা আলী কারী 'মিরকাতুল মাফাতীহ' কিতাবে (৩/১১৯৭) ইবনুল মুলাক্কিন 'তুহফাতুল মুহতাজ' কিতাবে (১/৫৯৫) এবং হাফেজ ইবনে

হাজার আসকালানী রহ. 'ফাতহুল বারী' কিতাবে (৩/২০৪) এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অনেকে এটাকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পরে শুধু ছুরা ফাতেহা নীরবে পাঠ করার আমল সংক্রান্ত বর্ণনা সংরক্ষিত। ছুরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন ছুরা পাঠ করার বর্ণনা শায তথা অসংরক্ষিত। কোন কোন বর্ণনায় উচ্চস্বরে ফাতেহা পাঠের বিবরণ থাকলেও বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম এটাকে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন; আমলের জন্য নয়। যেমনটি রসূল স. কখনো কখনো যোহরের নামাযের কিরাতে করতেন । (বুখারী-৭৪২)

জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পরে ছূরা ফাতেহা পাঠের যে আমল সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে আমরা এটাকে স্বীকার করি এবং ছুন্নাত বলে বিশ্বাস করি। তবে এটা কিরাত হিসেবে নয় বরং ছানার বিকল্প দুআ হিসেবে। কারণ জানাযার নামাযে কিরাত তথা কুরআন পাঠের বিপরীতে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের ব্যাপক আমল ও মন্তব্য বর্ণিত রয়েছে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু, রসূলুল্লাহ স. নিজে কখনো জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করেছেন বলে আমার জানামতে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম তিরমিযী রহ. এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করে নিজেই সেটাকে শক্তিশালী নয় বলে মন্তব্য করেছেন। (তিরমিযী : ১০২৬)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছানা হিসেবে ফাতিহা পাঠ করতেন; কিরাত হিসেবে নয়। হাদীসটি এই : أَنَّهُ كَانَ يُسمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَازَةِ "তিনি মানুষকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসাবাণী শুনাতেন এবং তাকবীর দিতেন"। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৫৩৩) অর্থাৎ তিনি ছূরা ফাতিহা পাঠ করতেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা হিসেবে। এ হাদীসের সকল রাবীই বুখারী-মুসলিমের রাবী। হযরত আবু উমামা রা. থেকে জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পরে ছূরা ফাতেহা পাঠের আমল সংক্রান্ত সহীহ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ রহ. দুআ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম নাসাঈ রহ.ও জানাযার নামাযে ছূরা ফাতেহা পাঠের আমলকে কিরাত মনে করেন না। বরং ছানা বা দুআ মনে করেন।

আবার হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত ছূরা ফাতেহা পাঠের আমলও হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সব সময়ের আমল ছিলো না। সাথে সাথে সেটা সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও প্রচলিত ছিলো না। যে কারণে হযরত ইবনে আব্বাস রা. জানাযার নামায শেষে সকলকে বললেন, যে, আমি এ কারণে ফাতেহা পাঠ করেছি যেন লোকেরা জানে যে, এটা ছুন্নাত। পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন! যদি জানাযায় ছূরা ফাতেহা পাঠের ব্যাপক প্রচলন সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের মাঝে থাকতো তাহলে ইবনে আব্বাসের এ কথা বলার কোন প্রয়োজন হতো না।

জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠের আমল অপ্রচলিত হওয়ার আরো একটি প্রমাণ হলো, ইবনে আব্বাস রা. থেকে উক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী তলহা ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেও জানাযার নামাযে কুরআন পাঠের আমল গ্রহণ করেননি। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ.

অনুবাদ : কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করা হবে না। জানাযা হলো আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি দুরূদ এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ। আর এটা সুফিয়ান সাওরী, অন্যান্য কুফাবাসী এবং তলহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ-এর মত। ইমাম যুহরী তাঁর থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী : ১০২৭)

জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠের আমল অপ্রচলিত হওয়ার আরো একটি প্রমাণ হলো ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত মন্তব্য। তিনি বলেন, জানাযার নামায মূলত দুআ। আর আমাদের শহর মদীনায় জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করা প্রচলিত নয়"। (শরহু সহীহিল বুখারী লিইবনে বাত্তাল, অধ্যায় : জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ) অনুরূপ মন্তব্য ইমাম ত্বহাবী রহ.ও করেছেন তাঁর 'মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা' নামক কিতাবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি আছার দ্বারা জানাযার নামাযে কিরাত না থাকার বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়। আছারটি এই যে,

عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي كِتَابِ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ أُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ قَالَ كَمَا تُصَلِّي فِي الْجِنَازَةِ تُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَلَا تَرْكَعُ وَلَا تَسْجُدُ.. وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

অনুবাদ : হযরত আবু হামজা বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কা'বার মধ্যে কীভাবে নামায পড়বো? জবাবে তিনি বলেন, যেভাবে জানাযায় পড়ে থাকো। তাসবীহ ও তাকবীর বলবে; রুকুও করবে না, সিজদাও করবে না। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, আছারটির সনদ সহীহ। (ফাতহুল বারী, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৬৯) এ আছারের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. কা'বার নামাযকে জানাযার নামাযের অনুরূপ বলে তিনি যে পদ্ধতি পেশ করলেন তাতে তাসবীহ ও তাকবীরের বর্ণনা রয়েছে; কিরাতের কথা বলেননি। এ থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, জানাযার নামাযে ফাতেহা পাঠের যে সকল বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে পাওয়া যায় তা মূলত ছানা হিসেবে; কিরাত হিসেবে নয়।

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কিছু মানুষ জানাযার নামাযে ছূরা ফাতিহা পাঠের দলীল হিসেবে হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদীসটি পেশ করে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ছূরা ফাতিহা পড়লো না তার নামায হলো না। (বুখারী : ৭২০) এটা যদিও কোন আলেমের পেশকৃত দলীল নয় তবুও এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এ হাদীসে জানাযার নামাযের ব্যাপারে কোন কথা উল্লেখ নেই। যদি এ নিয়মের ব্যাপকতার আওতায় জানাযার নামাযও শামিল হয় তাহলে রুকু, সিজদা, আখেরী বৈঠকসহ আরো যা কিছু ছাড়া নামায হয় না সেগুলোকেও জানাযায় জরুরী বলতে হয়। তখন এর নাম আর জানাযা থাকবে না।

মোটকথা, জানাযার নামাযে কিরাত পড়া প্রমাণিত নয়। ফাতিহা পাঠ প্রমাণিত হলেও সেটা ছানা হিসেবে, কিরাত হিসেবে নয়। এতদ্সত্ত্বেও এটা অপ্রচলিত আমল, নিয়মিত আমল নয়। সুতরাং ছানা হিসেবে কেউ মাঝে মধ্যে পড়তে পারে। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী : ২/৩১৩)

জানাযার নামাযের তাকবীর চারটি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (رواه البخارى فى بَابِ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ أَرْبَعًا–١/١٧٨)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিনেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনালেন এবং ঈদগাহে গিয়ে তাদেরকে কাতারবন্দী করলেন। অতঃপর চার তাকবীরে তাঁর জানাযা পড়লেন। (বুখারী : ১২৫২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩০২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযের তাকবীর চারটি। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী : ২/৩১৩)

জানাযার নামাযের দুআ

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، قَالَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ.

অনুবাদ : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. যখন জানাযার নামায পড়তেন, তখন এই দুআ বলতেন: اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ (মুসনাদে আহমদ-৮৮০৯, নাসাঈ-১৯৮৬, তিরমিযী-১০২৪)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, حديث صحيح بطرقه وشواهده বিভিন্ন সনদ ও সমর্থনের কারণে হাদীসটি সহীহ।

সারসংক্ষেপ : হাদীসে বর্ণিত দুআটি পাঠ করা উত্তম হবে। আর এটাই

হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী : ২/৩১৩) তবে মৃত ব্যক্তির জন্য এ ছাড়াও যে কোন দুআ পড়া যেতে পারে। আমাদের দেশের কোথাও কোথাও জানাজার নামায শেষে জানাজার কাতার ভেঙ্গে দিয়ে মাইয়েতের ঈসালে সওয়াবের নামে ইজতেমায়ী মুনাজাতের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যা সঠিক নয়। কারণ লাশ দ্রুত দাফন করা সংক্রান্ত হাদীসগুলির সাথে এ প্রথাটি সাংঘর্ষিক। ঈসালে সওয়াব করতে চাইলে দাফন কার্য শেষ করে তবেই করবে। এত সময় পর্যন্ত লোকজোন থাকবে না এই ঠুনকো অযুহাতে একটি নতুন আমল চালু করা শরয়ী মিজাযের সাথে সাংঘর্ষিক যা বর্জনীয়।

জানাযার নামাযে দুই দিকে সালাম ফিরানো

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ , إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ.

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তিনটি কাজ যা রসূল স. করতেন, মানুষ তা ছেড়ে দিয়েছে। তম্মধ্যে একটি হলো নামাযের সালামের মতো জানাযার নামাযে সালাম ফিরানো। (সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী-৬৯৮৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। ইমাম নববী রহ. বলেন, رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد ইমাম বায়হাকী রহ. হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম : ৩৫০৭ নং হাদীসের আলোচনায়)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার সালাম সাধারণ নামাযের সালামের অনুরূপ। সুতরাং সাধারণ নামাযে যেভাবে ডানে বামে দু'দিকে সালাম ফিরাতে হয় জানাযার নামাযেও তদ্রুপ উভয়দিকে সালাম ফিরাতে হয়। এ ছাড়াও জানাযার নামাযে দুই দিকে সালাম ফিরানোর আমল হাসান সনদে বর্ণিত আছে হযরত ইবরাহীম নাখাঈ রহ. থেকে (ইবনে আবী শাইবা : ১১৬২৮) এবং সহীহ সনদে হযরত আতা রহ. থেকে।

(আব্দুর রাজ্জাক : ৬৪৪৮) ইমাম নববী রহ. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল্ মিনহাজে বলেন, وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ تَسْلِيمَتَيْنِ সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ এবং সালাফে ছালেহীনের এক দল আলেম জানাযার নামাযে দুই সালামের মত গ্রহণ করেছেন। (আল মিনহাজ, কবরের উপর জানাযা পাঠ অধ্যায়ের প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায়) হানাফী মাযহাবের মত এভাই বর্ণিত হয়েছে। (শামী : ২/৩১৩)

উল্লেখ্য : সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈদের থেকে জানাযার নামায শেষে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরানোর আমলও সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

অনুমতি ছাড়া জানাযা হলে অভিভাবক পুনরায় পড়তে পারেন

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ. قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه البخارى فى بَابِ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ–١/١٧٦)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. এমন একটি কবর অতিক্রম করলেন, যে কবরবাসীকে রাতে দাফন করা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তাকে কখন দাফন করা হয়েছে? তাঁরা বললেন, গত রাতে। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আমাকে তোমরা কেন জানাওনি? তাঁরা উত্তরে বললেন, আমরা তাকে অন্ধকারে দাফন করেছি এ জন্য আপনাকে জাগ্রত করা ভালো মনে করিনি। তখন রসূলুল্লাহ স. দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। ইবনে আববাস রা. বলেন, আমি তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। (বুখারী : ১২৪২) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩৪০)

শিক্ষণীয় : রসূলুল্লাহ স. হলেন মুমিনদের সবচেয়ে বড় অভিভাবক। (ছূরা আহযাব : ৬) এ ছাড়া রাষ্ট্রের শাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন জনগণের প্রধান অভিভাবক। তাই তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারো জানাযা পড়া হলে তিনি তা বাতিল করে নতুন জানাযা পড়তে পারেন।

আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী : ২/৩১১)

বাচ্চাদের জানাযার নামায

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ

(رواه النسائى فى الصَّلَاةِ عَلَى الصِّبْيَانِ–١/٢١٤)

অনুবাদ : হযরত আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট একটি আনসারী বালকের মৃতদেহ আনা হলে তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, জান্নাতের চড়ুই পাখিদের মধ্য থেকে এ চড়ুই পাখিটি কতইনা ভাগ্যবান। সে কোন পাপ কাজ করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শও করেনি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, হে আয়েশা! এর ব্যতিক্রম কিছু হতে পারে না? আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানকার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। আর তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্বীয় পিতার পৃষ্ঠে থাকতে। তিনি জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানকার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন স্বীয় পিতার পৃষ্ঠে থাকতে। (নাসাঈ : ১৯৪৯)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح على شرط مسلم হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। (মুসনাদে আহমদ-২৫৭৪২ নং হাদীসের আলোচনায়) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৭৫৯৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ (رواه ابن ماجة فى بَابِ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ)

অনুবাদ : হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রা. বলেন, আমি রসূল স.কে বলতে শুনেছি যে, বাচ্চার জানাযা পড়া হবে। (ইবনে মাযা-১৫০৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. বলেন, إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। (ইবনে মাযা-১৫০৭ নং হাদীসের আলোচনায়) ইমাম আহমদ রহ. বলেন, صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ হাদীসটি সহীহ, মারফু'। (ঝাদুল মাআদ, অধ্যায়ঃ বাচ্চার জানাযা)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাচ্চাদের জানাযার নামায পড়তে হয়। আর এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (শামী : ২/৩০৯)

বাচ্চাদের জানাযার নামাযের দুআ

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ، زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ (رواه ابو داود فى بَابِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ–٢/٤٥٣)

অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন, আরোহনকারী চলবে জানাযার পিছনে আর পদাতিকগণ চলবে জানাযার আগে-পিছে, ডানে-বামে জানাযার নিকটবর্তী হয়ে। গর্ভপাত হওয়া শিশুর জানাযার নামায পড়া হবে। আর তার মাতা-পিতার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দুআ করা হবে। (আবূ দাউদ : ৩১৬৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী-১০৩১) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাযা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩২৪)

উল্লেখ্য, এ হাদীসে গর্ভপাত হওয়া শিশুর বিবরণ না থাকলেও হযরত

জাবের রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, শিশু ভুমিষ্ট হওয়ার পর যতক্ষণ চিৎকার না দিবে অর্থাৎ জীবিত ভুমিষ্ট না হবে ততক্ষণ তার জানাযা পড়া হবে না। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৭২৪, ইবনে মাযা-১৫০৮) হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসেও শিশু বাচ্চার জানাযার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষণীয় : এ হাদীসে শিশুর মাতা-পিতার জন্য দুআ করা ও মাগফিরাত চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন দুআ হাদীসে বলে দেয়া হয়নি। অতএব, যে কোন দুআই শিশুর মাতা-পিতার জন্য করা যেতে পারে।

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللهم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا.

অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি শিশুর জানাযায় এ দুআ পড়তেন : اللهم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا (ইবনে আবী শাইবা : ৩০৪৫৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/ মুসলিমের রাবী।

জ্ঞাতব্য : হযরত হাসান বসরী রহ.-এর দুআর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ দুআ হিদায়াহ কিতাবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে : اللهم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا এ দুআটি পুত্র সন্তানের জন্য। যদি কন্যা সন্তানের জানাযার নামায পড়া হয় তাহলে দুআটি এ রকম পড়বে : اللهم اجْعَلْها لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْها لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْها لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً

শহীদদের জানাযার নামায

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَ «يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ، يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ»

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধের দিন

রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে শহীদের লাশ রাখা হলো। রসূল স. দশজন দশজনের জানাযা পড়তেন আর হামযা রা.-এর লাশ সেভাবে রাখা থাকতো। অন্যদের লাশ উঠানো হতো আর হযরত হামযার লাশ রাখা থাকতো। (ইবনে মাযা-১৫১৩, ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২২, হাদীস নং-২৮৮৫)

হাদীসটির স্তর : হাসান। আল্লামা সিন্দী রহ.ও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (হাশিয়াতুস সিন্দী আলা ইবনে মাযা)

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শহীদদের জানাযা পড়তে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকেও হাসান সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল স. উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত হামযা রা.-এর জানাযার নামায পড়লেন এবং তাতে নয়টি তাকবীর বললেন,। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩১, হাদীস নং-২৮৮৭) শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (ইবনে মাযা-১৫১৩ নং হাদীসের আলোচনায়) শহীদদের জানাযা পড়ার ব্যাপারে হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, গ্রাম্য এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে ঈমান আনলো এবং তাঁর অনুসরণ করলো। কোন এক যুদ্ধে সে শহীদ হলে রসূলুল্লাহ স. তাকে নিজ কাপড়ে কাফন পরিয়ে তাঁর জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর বললেন, **اللهمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ**. "হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দা তোমার পথে হিজরতে বেরিয়েছে। তোমার পথে শহীদ হয়েছে। আর আমি তার সাক্ষী। (নাসাঈ : ১৯৫৫) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নুখাবুল আফকার, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪০০) হযরত উকবা ইবনে আমের রা. থেকে অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, **أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ** "একদিন রসূলুল্লাহ স. বের হলেন এবং উহুদের শহীদদের জন্য সেভাবে নামায আদায় করলেন মৃত ব্যক্তির জন্য যেভাবে জানাযার নামায আদায় করা হয়। (বুখারী : ১২৬৩) এ সকল হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, শহীদদের জানাযার নামায পড়তে হয়।

এর বিপরীতে উহুদ যুদ্ধের শহীদদের ব্যাপারে হযরত জাবের রা. থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, **وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ** তাদেরকে রক্তসহ দাফন করার নির্দেশ দেয়া হলো। আর তাদেরকে গোসলও দেয়া হয়নি এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়া

হয়নি। (বুখারী-১২৬২) পূর্ববর্ণিত হাদীসসমূহের বিপরীতে এ হাদীসটিকে শায তথা অপ্রবল মনে করা হয়। কারণ এ হাদীসটি হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত যিনি নিজে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। হতে পারে তাঁর জানামতে এটা সঠিক হলেও প্রকৃত বিষয় এটা ছিলো না। পূর্ববর্ণিত একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়া হয়েছে। অথবা হতে পারে যে, রসূল স. তখন জানাযা না পড়লেও পরে তা পড়েছেন। আর এরই প্রমাণ মেলে বুখারী : ১২৬৩ নম্বর হাদীসে। আবার এমনও হতে পারে যে, لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থ রসূল স. নিজে পড়েননি। উহুদ যুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়ার অনেক প্রমাণ সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলোর মোকাবেলায় এটাকে প্রাধান্য দেয়া যায় না। এসব কিছুর আলোকে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও এই যে, শহীদদের জানাযার নামায পড়া আবাশ্যক। (শামী : ২/৩২৪)

আত্মহত্যাকারীর জানাযায় নেতৃস্থানীয় আলেম শরিক হবেন না

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

অনুবাদ : হযরত আবুয্যুবায়ের বলেন, আমি হযরত জাবের রা.কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন মহিলা ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তান প্রসবকালে মারা গেলে তার জানাযা পড়া হবে কি? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ বলে তার জানাযা পড়ো। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৯৮১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী/মুসলিমের রাবী।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ، أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلاَ التَّابِعِينَ تَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا.

অনুবাদ : হযরত ইবনে ছীরীন রহ. বলেন, গোনাহগার হওয়ার কারণে কোন মুমিনের জানাযা তরক করেছেন এমন কোন আলেম বা তাবিঈন সম্পর্কে আমার জানা নেই। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৯৮৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। হাদীসটির সকল রাবীই বুখারী-

মুসলিমের রাবী।

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কালিমা পাঠকারী যে কোন মুসলমানেরই জানাযা পড়তে হবে। সে যত বড় গুনাহগারই হোক। অতএব, আত্মহত্যা যদিও বড় গুনাহ তবুও তার জানাযা পড়তে হবে।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجلاً، قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (رواه الترمذى فى بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ–١/٢٠٥)

অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে রসূলুল্লাহ স. তার জানাযা পড়েননি। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান। (তিরমিযী : ১০৬৮)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

শিক্ষণীয় : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা পড়েননি। আর উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন ঈমানদার মারা গেলেই তার জানাযা পড়তে হবে। হাদীসে বর্ণিত বিধানের ভিন্নতার কারণে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতামতেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা পড়া হবে। (শামী : ২/২১১) অবশ্য এ দুই ধরনের হাদীসের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়তে হবে। তবে বাদশা বা তার প্রতিনিধি অথবা সমাজের মান্যবর উলামায়ে কিরাম উক্ত জানাযায় শরিক হবেন না; যেন এ জাতীয় ঘৃণ্য কাজ থেকে অন্যরা বিরত থাকে। এমনই মত পোষণ করেছেন ইমাম আহমদ রহ.। (তিরমিযী : ১০৬৮ নং হাদীসের আলোচনায়)

ফরয নামাযের সময় জানাযা হাজির হলে আগে ফরয পড়া

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسَيَّبِ، وعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا إِذَا حَضَرَتِ الْجَنَازَةُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ يُبْدَأُ بِصلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

অনুবাদ : সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, হাসান বসরী এবং ইবনে ছীরীন রহ. বলেন, জানাযা ও ফরয নামায একত্রিত হলে আগে ফরয পড়া হবে। (ইবনে আবী শাইবা : ১১৪৪৭)

হাদীসটির স্তর : সহীহ, মাকতু'। ওয়ালীদ ইবনে আবী মালেক ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী। আর ওয়ালীদ ইবনে আবী মালেক ثقة নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব : ৮৩৭৫)

শিক্ষণীয় : এ আছার থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের সময় জানাযা হাজির হলে আগে ফরয নামায তারপর জানাযা পড়বে। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। (আল মাবসূত লিস্সারাখসী : ২/৬৮)

গায়েবানা জানাযার বিধান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ (رواه مسلم–٣٠٩/١ والبخارى –١٧٦/١ كلاهما فى بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, কালো বর্ণের একজন মহিলা বা পুরুষ মাসজিদ ঝাড়ু দেয়ার খেদমত করতো। রসূল স. তাকে না পেয়ে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বললো, সে মারা গিয়েছে। রসূল স. বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না? মানুষ তার বিষয়টাকে কেমন যেন হেয় দৃষ্টিতে দেখলো। রসূল স. ইরশাদ করলেন, তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা কবর দেখিয়ে দিলে তিনি তার জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: কবরবাসীদের জন্য কবর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আর আমি তাদের জানাযার নামায পড়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কবর আলোকিত করে দেন। (মুসলিম-২০৮৬, বুখারী-১২৫৬) শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযা এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৪৩৪০)

শিক্ষণীয় : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের জানাযার নামায পড়া তাদের জন্য কবর আলোকিত হওয়ার কারণ। আর রসূল স. সাহাবায়ে কিরামের কল্যাণ কামনায় বিশেষ করে আখেরাতের কল্যাণে যতটা তৎপর ছিলেন তাতে গায়েবানা জানাযা শরীআতে অনুমোদিত থাকলে তাঁর জীবদ্দশায় যত সাহাবায়ে কিরামের মৃত্যু সংবাদ মদীনায় থেকে পেয়েছেন তাদের সকলের বা অনেকের জানাযার নামায তিনি পড়তেন। আবার বিভিন্ন জিহাদে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম শহীদ হয়েছেন বা মদীনার বাইরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং জিহাদের আমীর বা অন্যরা তাদের জানাযা পড়েছেন রসূল স. তাদের আখেরাতের কল্যাণ কামনায় পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারতেন। অথচ কেবল নাজ্জাশীর জানাযা ব্যতীত কোন গায়েবানা জানাযা পড়েছেন মর্মে সহীহ হাদীসের কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মুআবিয়া ইবনে মুআবিয়া আল মুঝানীর গায়েবানা জানাযা পড়েছেন মর্মে আরো একটি হাদীস বর্ণিত থাকলেও তা সহীহ নয়। (মু'জামুল আওসাত লিত্‌তবারানী-৩৮৭৪, মুসনাদুশ শামীঈন লিত্‌তবারানী-৮৩১, তবাকাতে ইবনে সাআদ- মুআবিয়া ইবনে মুআবিয়া-এর জীবনী আলোচনায়) এ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম নববী রহ. বলেন, اتَّفقُوا عَلَى ضعفه. مِمَّن ضعفه الْبَيْهَقِيّ মুহাদ্দিসীনে কিরাম সর্বসম্মতভাবে এ হাদীসকে জঈফ বলেছেন। যারা জঈফ বলেছেন তাদের একজন হলেন ইমাম বায়হাকী রহ.। (খুলাছাতুল আহকাম, অধ্যায় : গায়েবানা জানাযা) ইমাম নববী আরো বলেন, قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ হাদীসটি আরো কিছু জঈফ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ওয়াকেদী রহ. কিতাবুল মাগাযীতে গায়েবানা জানাযার আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, মুতার যুদ্ধের ফলাফল মদীনাতে আসার পূর্বেই রসূল স. উক্ত যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের নাম মাসজিদে নববীর মেম্বারে বসে ঘোষণা করেছেন। তাদের জন্য দুআ করেছেন এবং তাদের জানাযা পড়েছেন। (আল-মাগাযী লিল ওয়াকেদী-২/৭৬২) এ বর্ণনায় গায়েবানা জানাযার ভাষা স্পষ্ট হলেও সনদের বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ নয়। এটা একদিকে মুরসাল এবং অপরদিকে শায। কারণ এ হাদীসে সাহাবার নাম উল্লেখ ব্যতীত তাবিঈ নিজে রসূল স. থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অথচ কোন সাহাবার মাধ্যম ছাড়া তিনি এটা সরাসরি বর্ণনা করতে পারেন না। আবার

বুখারীসহ অসংখ্য হাদীসের কিতাবে সহীহ সনদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেসকল বর্ণনার কোনটিতে শহীদদের গায়েবানা জানাযা পড়ার কথা উল্লেখ নেই। বরং কোন কোন বর্ণনায় তাদের জন্য শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা উল্লেখ রয়েছে। মোট কথা নাজ্জাশীর জানাযা ব্যতীত কোন গায়েবানা জানাযা রসূল স. কখনো পড়েছেন মর্মে সহীহ হাদীসের বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আর নাজ্জাশীর জানাযা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গায়েবানা জানাযা হলেও সাহাবায়ে কিরাম এটাকে গায়েবানা জানাযা মনে করেননি। বরং তাঁরা এটাকে হাজেরানা জানাযা অর্থাৎ লাশ সামনে রেখে জানাযার নামায পড়া হয়েছে বলে মনে করেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে আপনাদের খেদমতে উক্ত জানাযার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মন্তব্য সহীহ সনদে পেশ করা হচ্ছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ " قَالَ: فَصَفَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَمَا نَحْسِبُ الْجِنَازَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ.

অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন, রসূল স. আমাদেরকে খবর শুনালেন যে, তোমাদের নাজ্জাশী ভাই মারা গিয়েছেন। তোমরা তাঁর জানাযা পড়ো। এ কথা বলে রসূল স. কাতারে দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হলাম। অতঃপর রসূল স. তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন। আর আমরা মনে করি যে, নাজ্জাশীর লাশ রসূল স.-এর সামনেই ছিলো। (মুসনাদে আহমদ-২০০০৫, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩১০২) মুসনাদে আহমদ ও ইবনে হিব্বানের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

পর্যালোচনা : সাহাবায়ে কিরামের এ মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, গায়েবানা জানাযার দলীল হিসেবে পেশকৃত একমাত্র সহীহ হাদীসের আমলটিও মূলত গায়েবানা জানাযা ছিলো না। বরং শত শত মাইল দূরে রাখা মরদেহ অলৌকিকভাবে রসূল স.-এর সামনে উপস্থিত ছিলো। এ

থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসটি সকলের জন্য দলীলযোগ্য মনে হলেও আসলে এটা রসূল স.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কারণ শত শত মাইল দূরে রাখা মরদেহ সামনে রেখে নামায পড়ার অলৌকিক শক্তি আল্লাহ তাআলা তাঁকেই দিয়েছিলেন। রসূল স.-এর মৃত্যুর পরে খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগেও এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না যে, তারা কারো গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। তবে গবেষক আলেমগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, কোন মুসলমানের মরদেহ যদি এমন অমুসলিম অঞ্চলে থাকে যেখানে তার জানাযা পড়ার কেউ নেই। আর মরদেহের অবস্থানও এমন দিকে হয় যে দিকে ফিরলে লাশ এবং কা'বা উভয়টিই সামনে পড়ে তাহলে গায়েবানা জানাযা পড়া যেতে পারে। এ শর্তের ব্যতিক্রম হলে পড়া যাবে না। আমাদের দেশে যত্র-তত্র গায়েবানা জানাযার যে প্রচলন রয়েছে বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে তার কোন বৈধতা কুরআন হাদীস বা গবেষক আলেমগণের অভিমত থেকে আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না বলে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ ফতওয়া প্রদান করেছেন। (বাদায়েউস সানায়ে' : ১/৩১২) সুতরাং এ জাতীয় জানাযাকে গায়েবানা জানাযা না বলে রাজনৈতিক জানাযা বললেও অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। অতএব দ্বীনের স্বার্থে এটা পরিহার করা উচিত।

একাধিকবার জানাযা নামাযের বিধান

গায়েবানা জানাযার বিধান শিরোনামের অধিনে উল্লিখিত প্রথম হাদীসের সারসংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসের আলোকে রসূল কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের জানাযার নামায পড়া তাদের জন্য কবর আলোকিত হওয়ার কারণ বলা যায়। আর রসূল স. সাহাবায়ে কিরামের কল্যাণ কামনায় বিশেষ করে আখেরাতের কল্যাণে যতটা তৎপর ছিলেন তাতে একাধিকবার জানাযার নামায পড়া শরীআতে অনুমোদিত থাকলে তাঁর জীবদ্দশায় যত সাহাবায়ে কিরামের মৃত্যু হয়েছে এবং তিনি জানাযার নামায পড়াতে পারেননি তিনি হয়তো কবরের উপর হলেও তাঁদের জানাযার নামায পড়তেন। কিন্তু রসূল স.-এর পূর্ণ নবুওয়াতি জীবনে এমন এক/দুইটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় যে, তাঁকে না জানিয়ে অন্যরা জানাযা পড়ে কারো লাশ দাফন করেছে। আর রসূল স. উক্ত কাজের প্রতি

অসন্তোষ প্রকাশ করে কবরের উপর পুনরায় জানাযার নামায পড়েছেন। আবার সাথে সাথে কারণও বর্ণনা করেছেন যে, কবর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো রসূল স.-এর জানাযা পড়ার কারণে আল্লাহ তাআলা কবরকে আলোকিত করেছেন। রসূল স. যেহেতু সকল মুমিনদের অভিভাবক। (ছূরা আহযাব-৬) সেহেতু তাঁকে না জানিয়ে অন্য কেউ জানাযা পড়ে লাশ দাফন করে দিলে অভিভাবকের এ অধিকার থাকবে যে, তিনি ইচ্ছা করলে ঐ জানাযার নামায বহাল রাখবেন। আবার মন চাইলে তা ভেঙ্গে দিয়ে নতুনভাবে জানাযার নামায পড়াবেন। এটাকে বারংবার জানাযা বলা যাবে না। কারণ অভিভাবক যখন পূর্বের জানাযা গ্রহণ করেননি তখন সেটা আর জানাযা হিসেবে স্বীকৃত থাকেনি। বরং দ্বিতীয়বার পড়ানো জানাযাই ঐ মৃত ব্যক্তির প্রথম ও একমাত্র জানাযা। রসূল স.-এর মৃত্যুর পরে খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগেও বহু মহামানবের মৃত্যু হয়েছে; মৃত্যু হয়েছে খুলাফায়ে রাশেদারও। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না যে, তারা কারো জানাযা একাধিকবার পড়েছেন। বা তাঁদের কারো জানাযার নামায একাধিকবার পড়া হয়েছে। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক বা সামাজিক কোন মহামানবের জানাযার নামায একাধিকবার পড়ানো শরীয়তসম্মত হলে চার খলীফার জানাযা বিশেষভাবে হযরত ওমর রা.-এর জানাযা শতাধিকবার হওয়ার কথা ছিলো। কারণ তাঁর দ্বীনদারী ছাড়াও ইনসাফ ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার সুখ্যাতি এখনো বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

জানাযার নামাযের মূল বিধানের প্রতিও যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, কোন মুসলমান মারা গেলে জীবিত মুসলমানদের উপর তার জানাযার নামায পড়া ফরযে কিফায়া। যথাযোগ্য নিয়মে একবার তা আদায় করা হয়ে গেলে ফরযে কিফায়া দায়িত্ব পালনের পরিসমাপ্তি হয়ে যায়। পরবর্তীতে আদায়কৃত জানাযার নামাযের কোন অবস্থান বা স্তর শরীআতে থাকে না। ওয়াক্তিয়া ফরয নামায আদায় করার পরে আবার পড়লে তা নফলে পরিণত হয়। কিন্তু জানাযার নামায বারংবার আদায় করলে পরবর্তী নামাযগুলো নফল হিসেবেও গণ্য হয় না। ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন,

قَدْ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ هِيَ فَرْضٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا. مِنْهَا الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهِيَ فَرْضٌ وَلَا يَجوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِهَا وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ يَتَطَوَّعُ بِالْآخِرَةِ مِنْهُمَا.

অনুবাদ : আমরা এমন কিছু ইবাদাত দেখি যা ফরয অথচ সেগুলোর নফল আদায় করা বৈধ নয়। তম্মধ্যে একটি হলো জানাযার নামায। এটা ফরয অথচ এর নফল আদায় করা বৈধ নয়। কারো জন্য এটাও বৈধ নয় যে, একজন মৃত্যু ব্যক্তির জানাযা দু'বার পড়বে আর দ্বিতীয় জানাযাটাকে নফল বানিয়ে দিবে। (ত্বহাবী : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৫, হাদীস নং-১৭৩৯-এর আলোচনায়)

জ্ঞাতব্য : ইমাম ত্বহাবী রহ.-এর অভিমত থেকেও প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যু ব্যক্তির জানাযার নামায যথাযোগ্য নিয়মে একবার আদায় করা হয়ে গেলে দ্বিতীয় বার জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়; আর এ মতই গ্রহণ করা হয়েছে হানাফী মাযহাবে। (বাদায়েউস সানায়ে' : ১/৩১১) আবার পরবর্তীতে আদায়কৃত জানাযার নামাযকে নফল হিসেবে আখ্যা দেয়ারও সুযোগ নেই। কারণ জানাযার নামায নামক ফরযে কিফায়ার নফল হয় না। সুতরাং রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রচলনের কারণে বা কারো মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ হয়ে একাধিকবার জানাযার নামায আদায়ের পথ অবলম্বন না করে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ, ছদকা বা এ জাতীয় অন্য কোন ইছালে ছওয়াবের সঠিক পন্থা অবলম্বন করাই তার জন্য কল্যাণকর হবে।

একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞার দলীল হিসেবে আমরা উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যকেও পেশ করতে পারি। কারণ রসূল স.-এর মরদেহ মোবারক তাঁর কবরে অক্ষত ও অবিকৃত রয়েছে বলে হাদীসের বর্ণনা রয়েছে এবং উম্মতেরও তা বিশ্বাস রয়েছে। আবার কবর সামনে রেখে জানাযার নামায পড়াও বৈধ বলে প্রমাণিত। (অর্থাৎ, কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া না হয়ে থাকলে তার কবর সামনে রেখে তার জানাযার নামায পড়া বৈধ বলে প্রমাণিত।) [মুসলিম-২০৮৬, বুখারী-১২৫৬] এখন যদি একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার বৈধতা উম্মতের নিকট স্বীকৃত হতো, তাহলে রসূল স.-এর রওযা মুবারক সামনে রেখে সর্বদাই জানাযার নামায চলতে থাকতো। কেননা একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা ছাড়া উম্মতের সামনে এ বরকতময় কাজের ব্যাপারে আর কোন বাধা থাকতো না। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদীর এ বরকতময় কাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, তারা একই মৃত ব্যক্তির একাধিকবার জানাযার নামায পড়া বৈধ

বলে বিশ্বাস করে না। এটা উম্মতের নীরব ইজমার পর্যায়ভুক্ত। অতএব উম্মতে মুহাম্মাদীর ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, একই মৃত ব্যক্তির একাধিকবার জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়। কাজেই আমাদের উচিত হবে দুনিয়াবী কোন স্বার্থে কিংবা আবেগপ্রবন হয়ে একাধিকবার জানাযার নামায পড়ার পথ অবলম্বন না করা। বরং মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী হয়– এমন কোন সহীহ পন্থা গ্রহণ করা। যেমনঃ দুআ, ছদকা প্রভৃতি ইছালে ছওয়াবের কাজ করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবকিছু সহীহভাবে বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

মাকতাবাতুল আবরার কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

■ আহকামে যিন্দেগী

জীবনের সব রকমের বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। একজন মুসলমানের ইসলামী যিন্দেগী পরিচালনার জন্য যত ধরনের বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, সংক্ষেপে সে সবকিছু এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৩৩০/=

■ ফাযায়েলে যিন্দেগী

নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও কুরআনের আলোকে রচিত জীবনের সব বিষয়ের ফাযায়েল সম্বলিত। ঘরে মসজিদে ও মজলিসে তালীমের উপযোগী। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন হাদীছ এ গ্রন্থে আনা হয়নি।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৩৮০/=

■ ফিক্‌হুন নিছা

নারী জীবনের ব্যাপক বিধি-বিধান জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৩৮০/=

■ বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবালিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: (প্রতি খণ্ড) ৪৩০/=

■ আহকামে হজ্জ

এ গ্রন্থে সব প্রকার হজ্জ এবং উমরা ও যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের পেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারত সংশিষ্ট স্থানসমূহের মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ১৪০/=

■ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা এবং এ সব আকীদা থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। দেশী বিদেশী, নতুন পুরাতন সব ধরনের ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৫০০/=

■ইসলামী মনোবিজ্ঞান

এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২৪০/=

■কথা সত্য মতলব খারাপ

রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতা এবং সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বদ মতলব সিদ্ধি করা ও প্রতারণা করার অপপ্রয়াসের সমালোচনা।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৯০/=

■কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র

এক পৃষ্ঠার এ মানচিত্রে কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের বর্তমান অবস্থান ও বর্তমান নাম উলেখসহ সংশিষ্ট স্থানসমূহের প্রাচীন সীমানা ও বর্তমান সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

প্রস্তুত: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ৭০/=

■চশমার আয়না যেমন

পৃথিবীতে মতবাদের শেষ নেই। মত মতান্তরের অন্ত নেই। এই মত বিভিন্নতা বা মতবিরোধের মূলে রয়েছে কে কোন্ বিষয়কে কোন্ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন, কে কোন্ বিষয়কে কোন্ দৃষ্টিভংগিতে বিচার করছেন সেটা। যার চশমার আয়না যেমন, তিনি সব কিছুকে দেখছেন তেমন। এ বিষয়টার উপরই একটি রম্য রচনার প্রয়াস হল "চশমার আয়না যেমন"।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ১৩০/=

■ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ

এতে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মৌলিক রচনার নিয়ম-নীতি ও অনুবাদের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। বর্ণের নাম ও উচ্চারণ থেকে শুরু করে ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য সমালোচনা, কবিতা ও ছড়া রচনার নিয়ম-নীতি, সংবাদ, কলাম ও ফিচার লেখা এবং বাংলা ভাষার অলংকার ইত্যাদি সব বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর উচ্চারণ সম্পর্কিত একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। আর শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহীদের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২৪০/=

■যদি জীবন গড়তে চান

শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জীবন গড়ার পদ্ধতি। সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি। সব বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ, সকল বয়সের সবশ্রেণীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় এক অনবদ্ধ গ্রন্থ।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২৯০/=

■তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (১-৪ খণ্ড, পূর্ণ সেট)

বৈশিষ্ট্যাবলি : ● তাহকীকী তরজমা। ● তরজমার বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। ● প্রয়োজনীয় শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির উল্লেখ। ● প্রতি আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে নম্বরবদ্ধ করে উল্লেখ।

লেখক: বিশিষ্ট কয়েকজন আলেম কর্তৃক রচিত ও মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য : ১৩০০/=

■চার ইমাম

ফিকহের চার ইমাম– ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ, ইমাম শাফিঈ রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.–এর প্রামাণ্য জীবন কথা। লেখক দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ একাডেমির তত্তাবধায়ক মাওলানা কাজি আতহার মুবারকপুরি রহ.। গ্রন্থটির প্রতিটি তথ্য নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স সমৃদ্ধ।

অনুবাদক: মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ ও অন্যান্য।

সম্পাদনায়: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২৪০/=

□ الاستفادة بشرح سنن ابن ماجة

এটি সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। আরবীতে রচিত এ শরাহর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ :

١. بيان من أخرج الحديث مسندًا غير ابن ماجة.
٢. كلام موجز حول أحوال الحديث ورواته.
٣.شرح المفردات.
٤.الشرح الإجمالي للحديث ليقرب معنى الحديث وغرضه إلى الأذهان.
٥.بيان المباحث المتعلقة بالحديث على المنهج التدريسي.
٦. بيان ما يستفاد من الحديث موجزًا.
٧.بيان مطابقة الحديث للترجمة.

গ্রন্থনায়: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ১০০০/=

■ চিন্তা-চেতনার ভুল

এ গ্রন্থে মৌলিকভাবে জানা যাবে–

" চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়।
" চিন্তা-চেতনার মৌলিক গলদসমূহ।
" চিন্তা-চেতনার ভুল কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তার বিবরণ।
" ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সব দিকে কি কি ভুল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে তার বিবরণ।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২০০/=

■ নফ্স ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

নফ্সের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলামের বিভিন্ন আমল ও আখলাক সম্বন্ধে যত ধরনের কুট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে এ গ্রন্থে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২০০/=

বিশেষ নোট

১. উপরোল্লিখিত পুস্তকাদি ছাড়াও "মাকতাবাতুল আবরার" য়ে পাবেন 'মজলিসে দাওয়াতুল হক' ও 'মজলিসে ইল্‌মী' যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় বই-পুস্তক।

২. মাকতাবাতুল আবরার প্রকাশিত ও পরিবেশিত যাবতীয় বই-পুস্তক সমমূল্যে "আল-কুরআন পাবলিকেশন্স" (কিতাব মার্কেট, যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসা সংলগ্ন) থেকেও সংগ্রহ করা যায়।